রীনার প্রথম শাড়ি !
মা বলেছেন এবার শাড়ি পরতে
তাই বাবা দিয়েছেন শাড়ি।
কিন্তু রীনা বলেছে এবার থেকে
তার জন্য চাই মায়ের মত
এক শিশি
লক্ষ্মীবিলাস !
এম. এল. বসু এণ্ড
কোম্পানী
প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ১৬

গ্রীষ্মকালে শীতল আরাম
Bata

বৈশাখ
তেরশ' তিরাশী

চতুর্বিংশ বর্ষ
১ম সংখ্যা

আনন্দবর্দ্ধন ও ধ্বন্যালোক

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর

'তার সান্নিধ্য আর বিরহ, এ-দুটির মধ্যে আমার কাম্য তার বিরহই, কারণ সে কাছে থাকলে এ ত্রিলোকে শুধু একমাত্র তাকেই দেখি, সে আমার দু'চোখ জুড়ে একটিই, কিন্তু তার বিরহ এলে, সেদিকে ফিরাই আঁখি শুধুই তাহারে দেখি' তাই বলছিলাম সঙ্গমের চেয়ে মিলনের চেয়ে বিরহই ভাল, ত্রিভুবনে শুধু সেই থাকে তখন'

সঙ্গম বিরহ বিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ।
সঙ্গে সৈব তথৈকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে॥

(ধ্বন্যালোকে আনন্দবর্দ্ধন)

নৈর্ব্যক্তিক রসানুভূতির ধ্বনিবাদ।

অথবা—'দিন গেল গো, এবার বাসনায় আগুন দিতে হবে'

'কপিত্থমুষ্টিঃ বামনাঙ্গুষ্ঠকাঃ' (উদ্ভট) এ প্রবাদও ধ্বনিবাদের অন্তর্ভুক্ত।

অথবা—নূতন বধূ শ্বশুরবাড়ি এসেছে, কিছুদিন শ্বশুর-শাশুড়ী নিয়ে ঘর করবে, আর স্বামীকে আড়ালে আবডালে দেখা পাওয়ার মধ্যে যে তৃপ্তি পাবে তার মধ্যেই অতৃপ্ত কামনা পূর্ণ করবে নিশার শয়নে, তাও আবার এত ভোরে বিছানা ছেড়ে আসতে হবে যে, শ্বশুরবাড়ির কেউ যেন তখনও না জেগে ওঠে, তেমনি মন নিয়েই উঠেছিল সেদিন নববধূটি কিন্তু সেটা এত ভোরে যে রাত্রির শেষটুকু শেষ হয়নি, স্বামী একাই বিছানায় থাকলেন। অল্প পরেই বধূ ঘরে ফিরে এসেছিল পা টিপে টিপে, বিছানায় শুয়েছিলেন স্বামী তখনও, চোখ দুটিও বোজা ছিল, তাঁর, কিন্তু একি ! এ যে গাঢ় ঘুমের ভাণ ! এটা অনুভব করতে কয়েকটা ক্ষণই লাগলো। লজ্জায় বুকের কাঁচল সামলাতে সামলাতে ছুটে পালিয়ে যেতে যেতেই মুখ ফিরিয়ে মাথায় ঘোমটা তুলতে তুলতে স্বামীর মুখের পানে চেয়ে দেখলে

তাঁর কপালে গালে নিজের সিঁথির সিঁদুর লেগে আছে, ওদিকে শ্বশুর-শাশুড়ীর জেগে ওঠাও জানতে পারলে (ধ্বন্যালোকে উদ্ধৃত শ্লোকের অনুবাদ) না পারছে কাছে গিয়ে বলতে, না পারছে দোরের চৌকাঠ পেরিয়ে আসতে।

এর মধ্যেও অলংকার নেই, অত্যন্ত ঘরোয়া চিত্র, কিন্তু রসানুভূতির চিরন্তনী কল্পনা বা বক্তব্য আছে। তবুও এতে আর একটি আস্বাদনের উৎস রয়েছে। সেটি ধ্বনি। এমনি ধ্বনির অস্তিত্বই রামায়ণ কাব্যের জন্মলগ্নে ঘটেছিল এক ব্যাধের তীরে নিহত পতির কলেবর দেখে ক্রৌঞ্চীর আকুল ক্রন্দনের শোকে।

একথা বলেছেন রসবাদের প্রকৃত উৎস ধ্বনিবাদের জন্মদাতা আনন্দবর্ধন। আমরাও জানতে পেরেছি তাঁকে রাজতরঙ্গিনীর লেখক কলহণের গ্রন্থ থেকে, কে সেই আনন্দ বর্ধন, কি তাঁর দান?

মহাকবি কলহণ যদি এইটুকুও না লিখতেন, তবে আমরা শুধু প্রখ্যাত ধ্বন্যালোক রচয়িতা আনন্দ বর্ধন এইটুকুমাত্র জানতাম।

কলহণ বলেছেন—যে সময় কাশ্মীরের অধিপতি অবন্তী বর্মা, সেই সময়েই কবি আনন্দ বর্ধন, আর মুক্তাকণ এবং শিবস্বামী রত্নাকর। এঁরা বিদ্যার গৌরবেই খ্যাতিলাভ করেছিলেন—

মুক্তাকণঃ শিবস্বামী কবি রানন্দবর্ধনঃ।

প্রথাং রত্নাকরশ্চাগাৎ সাম্রাজ্যেঽ বন্তি-বর্মণঃ॥ (রাজতরঙ্গিণী ৫।৩৪)

আনন্দ বর্ধন নিজের পরিচয় তেমন কিছুই রেখে যাননি। শুধু বলেছেন আমি 'নোণসুত', একথা দু'বার ব'লেছেন 'দেবীস্তোত্রে' এবং বিখ্যাত গ্রন্থ 'ধ্বন্যালোকে' নোণোপাধ্যায়াত্মজঃ'।

টুকরো ইঙ্গিত হলেও পণ্ডিতরা স্থির করেছেন কাশ্মীরের রাজা অবন্তীবর্মা যখন ৮৫৫-৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তখন এই আনন্দবর্ধন পণ্ডিতের জীবন এ কেটেছে কাশ্মীরে এবং ৯ম শতাব্দীতে।

অতএব ৯ম শতাব্দীর ভারত এবং কাশ্মীরের রাজনৈতিক ইতিহাস সমাজ ও ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতেই আনন্দ বর্ধনকে সহজেই খুঁজে নেওয়া যায়। এ শতাব্দীতে লক্ষণীয় ছিল পুরাতন ভারতের অনেক গতানুগতিক ভাবকে ঠেলে নূতনের দিকে অগ্রসর হওয়া। কাশ্মীরের জনজীবনের চর্চাতেও এসেছিল নূতন করে ভাবতে শেখা, সাহিত্য সৃষ্টির অভ্যন্তরেও যে আর একটি সত্তা রয়েছে এইটাই আবিষ্কার করলেন আনন্দ বর্ধন।

তিনি তাঁর পূর্ববর্তী (১) নাট্যরসবাদী ভরত সম্প্রদায় (২) ভামহ-উদ্ভট রুদ্রের অলংকার সম্প্রদায় (৩) দণ্ডী-বামনের রীতি সম্প্রদায় (৪) কুন্তকের বক্রোক্তি সম্প্রদায়ের আবিষ্কার থেকে আরও নূতন বিদ্যার প্রতিবেশ ঘটালেন।

অর্থাৎ ভারতের রস সাহিত্যের ভাণ্ডারে যে ছয়টি মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আনন্দ বর্ধনের দান তাদের মধ্যে পঞ্চম।

ঐসব আচার্য রসের বিশ্লেষণে যে সব মত প্রতিষ্ঠা করার জন্য সুতীক্ষ্ণ বিচার বিচারণার গ্রন্থ রচনা করেছেন, কিন্তু আনন্দ বর্ধনের মত ধ্বনিবাদের অভিনবত্ব কারোর মধ্যেই বিকাশ পায় নি। তাঁরা দেখেছেন সাহিত্য কুক্ষিতে আছে আলংকারিক জীবনাদর্শ, আর আনন্দ বর্ধন আমাদিকে বুঝিয়েছেন—না, সাহিত্যের প্রাণ ধর্মিতা নিহিত থাকে ধ্বনিতে। যারা সাহিত্যে অলংকার সৃষ্টি

নিয়েই অনুশীলন করেন তাঁরা সাহিত্যের প্রাণ কোথায় তা বুঝতে না পেরে ঘুর পাক খেতে খেতে সেই অলঙ্কারের অংকারে ফিরে যান। কেউ বলেন সাহিত্যের প্রাণ থাকে বক্রোক্তিতে; কেউ বলেন অলঙ্কারে কেউ বলেন রীতিতে এমনি আরও, কিন্তু আনন্দবর্ধন বলেছেন সাহিত্যের প্রাণ ধ্বনিতে।

সেই ধ্বনিবাদ বোঝাতেই আনন্দ বর্ধন এমন এক গ্রন্থ রচনা করলেন যার নাম রেখেছেন ধ্বন্যালোক। এই একখানি গ্রন্থের দ্বারাই তাঁর অমরত্ব লাভ, যদিও আরও রচনা রয়েছে, যেমন (১) দেবীশতক (২) বিষম বাণ লীলা (৩) অর্জুন চরিত। এদের মধ্যে দ্বিতীয় গ্রন্থটি রচনা করেছেন প্রাকৃত ভাষায়। অর্থাৎ এই ভারতে তখনকার দিনে সাধারণ লোক যে সব ভাষায় কথা বলতেন এবং সে সব ভাষার সংখ্যা প্রচুর থাকলেও সবার মধ্যে ব্যাকরণ রীতি ছিল না, এখনও ভারতে অমনি ধরণের লোক ভাষা, রাজস্থান, উড়িষ্যার কাডখণ্ডে, বিহার, বুন্দেলখণ্ডে, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট প্রভৃতি বহু ভূখণ্ডে প্রচলিত। কিন্তু তৎকালে এই রকম ভাষার অস্তিত্ব থাকলেও প্রধানভাবে ৬টি ভাষাকে পণ্ডিতরা সম্মান দিতেন নিজেদের সাহিত্য নাটকেও স্থান দিতেন। যে ছয়টির মধ্যে ব্যাকরণ ছিল এবং সেগুলি পড়লেই বোঝা যেত এইটি এই ভাষা, যেমন (১) মাগধী (২) শৌরসেনী (এই দুটি বিহার এবং উত্তর প্রদেশের পণ্ডিতরা গ্রহণ করতেন) (৩) পৈশাচী (এটি কাশ্মীর প্রদেশের লোকভাষা) (৪) চূলিকা (এটি সুরাট ও সিন্ধু দেশের) (৫) অপভ্রংশ (এটি সর্বভারতীয়) (৬) মাহিষী (এটি বিদর্ভ, কর্ণাট, কেরল, অন্ধ্রের পণ্ডিতরা গ্রহণ করতেন)।

এতগুলির মধ্যে আনন্দ বর্ধন কাশ্মীরের পৈশাচীভাষা এবং চূলিকাভাষায় বিষমবাণলীলা কাব্যটি রচনা করেছেন। আনন্দ বর্ধন নিজে ছিলেন দার্শনিক। সে দর্শন ছিল বৌদ্ধদের ক্ষণিক ও শূন্যবাদ। তাই বৌদ্ধসম্প্রদায়ের একখানি গ্রন্থ যার নাম 'প্রমাণ বিনিশ্চয়' এবং তার লেখক আচার্য ধর্মোত্তর, সেই গ্রন্থেরই টীকা লিখেছেন আনন্দ বর্ধন। লিখেছেন নাম রেখেছেন তার 'ধর্মোত্তমা'।

এমন পরিচয় বহিরঙ্গ তাঁর; কিন্তু অন্তরঙ্গ পরিচয় হলো "ধ্বন্যালোক" রচনায়। আনন্দ বর্ধনের প্রকৃত হৃদয় পরিচয় পাওয়া যায় এই ধ্বন্যালোকে, বলা যায় এটি তাঁর জীবন দর্শন। আর এক কথায় বলা যায় আনন্দ বর্ধনের যাঁরা ছিলেন পূর্বসূরী তাঁরা যেন জন্মান্তর পরিগ্রহ করে আনন্দ বর্ধনকে বন্দনা করেছিলেন অবনত শিরে। কারণ জীবন ও সাহিত্যের মধ্যে রস ও ধ্বনি যে আত্মশক্তিতে সমাহিত হয়েছিল যা বামন, উদ্ভট, দণ্ডী প্রভৃতির চিন্তেও বিকশিত হয় নাই, তাই যেন জাগ্রত হয়ে আনন্দ বর্ধনের জীবনকে সাহিত্যের জীবনানন্দে পূর্ণ করে দিয়েছে, আনন্দবর্ধন সেই জীবনানন্দকে পরিপূর্ণ রূপ দিয়েছেন, ধ্বন্যালোকে, চিরদিনের অমরত্ব খ্যাতি পেতে গেলে যে সাহিত্য রচনার প্রয়োজন তা আছে ধ্বন্যালোকে, তাই আনন্দবর্ধনের দৃষ্টি নিয়েই সাহিত্যরসিকবৃন্দ বুঝেছেন আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম ধারক 'রামায়ণ মহাকাব্যটি' ধ্বনিবাদের জনক।

পরবর্তীকালের আর এক সাহিত্য মনীষী অভিনব গুপ্ত মহাশয় আনন্দ বর্ধনকে এমন ভাষায় বন্দনা করেছেন যার দ্বারা খুব সহজেই মনে করা যায় প্রকৃত গুণীর সম্মান প্রকৃত গুণীই করে থাকেন। অভিনব বলেছেন 'স আনন্দ বর্ধনাচার্য এতংশাস্ত্র দ্বারেণ সহৃদয় হৃদয়েষু প্রতিষ্ঠাম্। দেবতায়তনাদিবদ অনশ্বরীং স্থিতিং গচ্ছতু ইতি।

অর্থাৎ সেই আচার্য আনন্দবর্ধন এই শাস্ত্রধারেই যে প্রতিষ্ঠা করেছেন তা চিরকালের অবিনশ্বর মন্দিরের মত হয়ে থাকুক।

আনন্দবর্ধনের সময় পর্যন্ত সাহিত্যিকদের ধারণা ছিল সাহিত্যাধানেই অলংকারের সামগ্রিক পরিভাষা, তাঁহাদের বক্তব্যটি নিহিত ছিল অলংকার বিশ্লেষণই অর্থাৎ বর্ণ, শব্দ, রস উপমা পরিবেশ, ঔচিত্যরীতি ইত্যাদি নিয়েই সাহিত্য। আনন্দ বর্ধন তাঁদের সেই ধারণাতেই আঘাত করেছেন। অর্থাৎ আরও পরিষ্কার করে বললে এই বলা যায় যে ভামহ, দণ্ডী, উদ্ভট, বামন, রুদ্রট প্রভৃতি প্রাচীন সাহিত্যিকবৃন্দের অভিমত হ'লো সাহিত্যে থাকবে গুণ, অলঙ্কার, রীতিবৃত্তি-প্রভৃতি। সেইগুলিই সাহিত্যে প্রাধান্য স্থাপন করে। আনন্দ বর্ধন এইখানেই কড়া কড়া যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছেন আমার পূর্বসূরিবৃন্দ নিশ্চিত হয়েছেন 'ভরতের রস প্রাপ্ততা' অপর পক্ষে তাঁর রস গুরু ভরতের অমর্যাদাই করেছেন।

এই অভিমত জোরাল ভাষায় প্রকাশ করার নাম দিয়েছেন 'উদ্যোত্'। সেইজন্য তাঁর ধ্বন্যালোক গ্রন্থটির প্রতিটি অধ্যায়ের নাম দিয়েছেন 'উদ্যোত্'। এ গ্রন্থের উদ্যোত্ চারটি, তবে মূলতঃ দুটি, একটি কারিকা অপরটি তার বৃত্তি। সেই বৃত্তিটিই ধ্বন্যালোকের পরিস্ফুট রূপ। আর অস্ফুট রূপ কারিকাগুলি। সংস্কৃতভাষাশ্রয়ী পণ্ডিতরা অনেক সময় ভ্রমে পড়েন যে আনন্দ বর্ধনেরই কি কারিকাগুলি? তবে এত অস্ফুট কেন?

তবে তাঁদের মনে এমন সংশয় জাগাটার পিছনে যুক্তি আছে, সেটা হ'লো এই যে, ধ্বন্যালোকের কারিকার সঙ্গে বৃত্তির সামঞ্জস্যের অভাব। কারণ মূল কারিকায় বলা হ'য়েছে সাহিত্যের মধ্যে ধ্বনি থাকে মূল অভিধা হ'য়ে। কিন্তু সেই অভিধা বললে কি বোঝান যায়, তা আর বোঝাই যায় না। অর্থাৎ অভিধা যদি ব্যঞ্জনা হয়, তবে তার প্রাণ শক্তি কিসে আছে? বৈয়াকরণিকদের স্ফোটশক্তির ওপরেই কি ব্যঞ্জনা নিহিত থাকে না? এ মীমাংসা কারিকায় নেই, আছে বৃত্তিতে। বৃত্তি পড়লেই বোঝা যায় ব্যঞ্জনার প্রাণ স্ফোটে।

তবে আনন্দ বর্ধন তাঁর কারিকায় এবং বৃত্তিতে সাহিত্যের ধ্বনিবাদ স্থাপন করতে যে সব তীক্ষ্ণ যুক্তির উপনিবেশ করেছেন, তাতে তাঁর পূর্বসূরিদের সাহিত্য সংজ্ঞার দিকগুলি খণ্ডবিখণ্ড হয়ে গিয়েছে—যেমন সাহিত্যের প্রাণ কি রসতত্ত্ব? সেটা কি স্ব-শব্দবাচ্য? না তা হ'তেই পারেনা; কারণ শব্দের অভিধাতেও রস বোধ হয় না, আর শব্দকে লক্ষণা করলেও রসতত্ত্ব জাগেনা, এমন কি শব্দের তাৎপর্য কি তা জানলেও রসের বোধ হয় না অতএব এর মধ্যে এমন একটি অভিনব ব্যাপার আছে যেটির দ্বারা রস বোধ হয়; সেই অভিনব ব্যাপারটি হোলো ব্যঞ্জনাশক্তিতেই রসের বোধ হয়; তাই পরিষ্কার করে বলতে চাই ব্যঞ্জনা শক্তিতেই রসের বোধ হয় বলেই—রস হোলো ব্যঙ্গ, ওটি কখনও বাচ্য নয়, অর্থাৎ ওই শব্দের অর্থ মাত্র বোঝাতেই সাহিত্যিক কখনও শব্দ প্রয়োগ করেন না। এইজন্য শব্দের বাচ্যতাই যখন রসকে উপলব্ধি করায় না, তখন বুঝে নিতে হবে রসও কখনও বাচ্য হ'য়ে শব্দে সমাহিত হয়ে থাকে না।

এর সঙ্গে আরও এগিয়ে এলে দেখা যায় সাহিত্যিকের বক্তব্য যখন রসসৃষ্টি হয় তখন সেটি বস্তুই হোক আর অলঙ্কারই হোক্ সে কখনও শব্দের মুখ্য বাচিব হ'য়ে চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করে না।

একমাত্র ব্যঙ্গ হ'য়েই চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করে। অতএব বস্তু, অলঙ্কার এবং রস এরা সবাই ব্যঙ্গ হয়েই অর্থাৎ ব্যঞ্জনার মাধ্যমেই সাহিত্যের প্রাণ হয়। সে ক্ষেত্রে আর একটু অভিনিবেশ করতে হবে বস্তু অলংকার এবং রসের মধ্যে রসই সার, আর দুটি গৌণ।

রসহীন সাহিত্য নিষ্প্রাণ, নিষ্প্রাণ সাহিত্যে অলংকার যোজনা করা হাস্যকর ব্যাপার। তবে যদি কেউ বলেন গুণ, অলংকার ও রীতির মধ্যে কোনেরও অস্তিত্ব উপলব্ধি করে সাহিত্যকে সাহিত্যপদ বাচ্য করা যায়, সে কিন্তু সেটা রসেরই উৎকট অপকর্ষ বোঝাচ্ছে।

এইরকম সিদ্ধান্ত করে আনন্দবর্ধন তার যুক্তি ও সিদ্ধান্তকে এমন চরমে টেনে এনেছেন যে সেখানেও স্পষ্ট বলে ফেলেছেন যে, শব্দ অর্থগত অনুপ্রাস উপমা প্রভৃতি বাকবিভূতিগুলিকে যদি কবিরা রসতাৎপর্য শূন্য করেই প্রয়োগ করে থাকেন এবং বলেন এগুলি কাব্য বা সাহিত্যপদ বাচ্য, তবে হয়তো উৎকৃষ্ট সাহিত্য না হতে পারে, সেখানে আমি বলবো ওগুলি সাহিত্যই নয় 'পরিপাক বতাং কবীনাং রসাদি তাৎপর্য বিরহে প্রয়োগএব ব্যাপারমাত্রং শোভতে'।

কারণ রসসমাহিতচিত্ত সাহিত্যিক যিনি তাঁর তো কোন অলংকার প্রয়োগেরই প্রয়োজন হয় না, কারণ অলংকার হয় রসাক্ষিপ্ত এবং অ-পৃথকযত্ননির্বর্ত্য।

'রসাক্ষিপ্ত তয়া যস্য বন্ধঃ শক্য ক্রিয়া ভবেৎ।
অপৃথক যত্ননির্বর্ত্যঃ সোঽলংকারো ধ্বনৌমতঃ ॥ (কারিকা)

(এইখানেই উদ্ধৃতি দিয়েছেন সেই নব বধূর শ্বশুর বাড়ি আসা। ওখানে রস আছে, সঙ্গে কোন অলংকার নেই, অথচ ধ্বনিটি এত সুন্দর যে তাতেই রসানুভূতি ঘটে)

হাঁ! প্রসঙ্গতঃ আর একটা কথা বলে নিই—সাহিত্য বললেই বুঝতে হবে শ্রব্য ও দৃশ্য কাব্য-নাট্য মাত্রই সাহিত্য, সেই সাহিত্যকে কেউ বলেছেন অলংকার, কেউ বলেছেন কাব্য, কিন্তু ৮৯৩ থেকে ৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের রাজশেখর বলেছেন 'শব্দার্থয়ো যথা বৎসহ ভাবেন বিদ্যাসাহিত্যম' অর্থাৎ শব্দ ও অর্থ যদি সহাবস্থান করে কোন রচনায় তারই নাম সাহিত্য, এমনটি কবি বিহ্লনও স্বীকার করে বলেছেন 'সাহিত্য পাথোনিধি মন্থনোত্থং'। আর ভর্তৃহরি তো সোজাসুজি বলেই ফেলেছেন—

সাহিত্য সঙ্গীত কলাবিহীনঃ
প্রায়ঃ পশুঃ পুচ্ছ বিষাণ হীনঃ।
চরত্যসৌ কিন্তু তৃণং ন ভুংক্তে
তদ্ভো পশূনাং বহুভাগ্যমেতৎ ॥

যে সাহিত্য বোঝেনা সঙ্গীত উপলব্ধি করেনা আর কোন চিত্রকলা শিল্পও বুঝতে পারে না, ওরা ল্যাজ আর শিং শূন্য জানোয়ার। এরা চরে বেড়ায় কিন্তু ঘাস খায় না, এটা পশুদেরই সৌভাগ্য।

অতএব সাহিত্যের সংজ্ঞা বললে রাজশেখরও ভর্তৃহরির দৃষ্টি আনন্দ বর্ধনের তুলনায় খুব স্বচ্ছ নয়।

আনন্দ বর্ধন রচনা করলেন ধ্বন্যালোক। এ গ্রন্থটির আকৃতি প্রকৃতির সঙ্গে যদি একটি মন্দিরের তুলনা করা যায় এবং তার চারটি দুয়ারও প্রস্তুত করা যায় তবে বলা যায় এও হবে একটি সাহিত্য মন্দির।

সে মন্দিরের মধ্যকেন্দ্রে রসের প্রতিষ্ঠা, আর সেখানে চারটি দুয়ার দিয়ে এসে প্রবেশ করেছেন কত জ্ঞানীগুণী। প্রতিটি দুয়ারেই রয়েছে উজ্জ্বল স্নিগ্ধ আলোর স্তম্ভ। ঠিক এমনি ভাবেই আনন্দ বর্ধন ঐ ধ্বন্যালোকের চারটি প্রবেশ পথ নির্মাণ করেছেন, তাদের নাম দিয়েছেন উদ্যোত।

প্রথম উদ্যোত ধ্বনিবাদের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা। এখানে বলেছেন সাহিত্যে যে রসার্থবোধ করা হয় সেটা কি ব্যঞ্জনার দ্বারা, নাকি শব্দগত শক্তি দ্বারা? এ প্রশ্ন উঠলেই বলবো শব্দের বাচ্যার্থ অপেক্ষা ব্যঙ্গার্থের চমৎকারিত্বই সেখানে রস উপলব্ধি করায়।

কারণ সাহিত্যে লুকিয়ে আছে রসসমাহিত চিত্তের ধ্বনি, সেটি উপমার অন্তর্ভুক্ত নয়, এবং রূপকেরও নয়, তাছাড়া ওটি শ্লেষ, প্রসাদগুণ, বৈদর্ভী, পাঞ্চালী প্রভৃতি রীতিরও অন্তর্গত নয়, অথবা পরুষা, মধ্যমা, ললিত প্রভৃতি বৃত্তিরও অন্তর্গত নয়, তবে সেটি এক অভিনব তত্ত্ব, সেটি সাহিত্যের আত্মধর্ম ধ্বনি। এখানে যদি কেউ প্রশ্ন করেন এ ধ্বনি এল কোথা থেকে আর পূর্বাচার্যদের মধ্যে কে একে এনেছেন?

হ্যাঁ, তাঁদের এ প্রশ্নের উত্তরে বলি—প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যের ধ্বনিবাদটি এসেছে বৈয়াকরণ ও দার্শনিকদের কাছ থেকে। সেটির নাম স্ফোটবাদ। যাঁরা সাহিত্যের শব্দার্থের মধ্যে ক্ষণিকবাদ কিংবা শূন্যবাদ খোঁজেন কিংবা স্থাপন করেন তাঁদের চক্ষুরুন্মীলন করতেই আমার অভিযান। তাঁরা শব্দার্থের মধ্যে অভাব পদার্থেরই সৃষ্টি করতে চান শব্দশক্তির নিত্যতা স্বীকার করতে চান না, কারণ তাঁরা সাহিত্যে বাচ্যার্থ বা অভিধেয়ার্থই প্রতিপন্ন করতে চান, কিন্তু ব্যঙ্গার্থই যে রসবোধ করায় এই বুঝতেই পারেন না। আমি জিজ্ঞাসা ক'র আলোর সাহায্যেই তো প্রিয়ার মুখখানি দেখলেন, আচ্ছা! আলোটি সরিয়ে নিলে প্রিয়ার মুখও তো লুকিয়ে গেল, তারপর আবার কি আলো চাই? নাকি আলো ছাড়াই সে মুখ দেখা যায়?

তাই তো বলতে চাই, ওঁরা ক্ষণিকবাদী, ওঁরা ধ্বনির অনুরণনে প্রিয়ার কথা সার শুনতে পান না, প্রিয়ার স্মৃতিই ওঁদের থাকে না। আচ্ছা কুসুম কি থাকে সর্বদা! থাকে না, কিন্তু আঁচলে তার গন্ধ লুকিয়ে থাকেতো! আবার কুসুমের সঙ্গে তার গন্ধওতো নিজেকে পৃথক করে ভোগ করায়! ঠিক তেমনিই শব্দের স্ফোটশক্তি, ওটি না থাকলে সে বস্তুবোধ করবে কি করে সর্বদা। সে নিজের অস্তিত্বটি অপরের সঙ্গে কি অভিন্ন হয়ে তালগোল পাকিয়ে দেয়? স্মৃতিময় মুখখানি আর তার সারা দেহটিতেতো কোনদিনই তার যথাস্থানে যথাযোগ্য আপ্যায়ন থেকে বঞ্চিত করে না।

এই যে যথাস্থানে যথা প্রাপনের বোধ সেকি শব্দের অভিধা শক্তি থেকে আসে? সে আসে শব্দের অভিনব শক্তি ব্যঞ্জনা থেকে, ব্যঞ্জনাই ব্যঙ্গ, আর সেইটিই ধ্বনি।

এরপর আনন্দ বর্ধন ধ্বন্যালোকের দ্বিতীয় উদ্যোত্‌ নির্মাণ করেছেন। এখানে পূর্বের বলা ধ্বনিবাদটিকে দু'টি মৌলিক যুক্তি দিয়ে দু'টি ভেদ দেখিয়েছেন, অর্থাৎ সে দু'টিকে বিশ্লেষণ করেছেন। প্রথমটি অবিবক্ষিত বাচ্যত্ব, দ্বিতীয়টি বিবক্ষিতান্য বাচ্যত্ব। তারপর সেই দুটি বাচ্যই যে অর্থান্তর বাচ্য, সংক্রমিত বাচ্য, অত্যন্ত তিরস্কৃত বাচ্য, অসংলক্ষ্য ক্রমব্যঙ্গ, সংলক্ষ্যক্রম ব্যঙ্গ হয়ে পাঁচ প্রকারে বিভক্ত হয় সেটি খুব সরল করে ব্যক্ত করেছেন।

এ ছাড়া দ্বিতীয় উদ্যোতে পরিষ্কার করে বলেছেন উপমা, রূপক, প্রভৃতি যে সব অলংকার

সংযোজিত করা হয় সেগুলি কিন্তু সাহিত্যে সাক্ষাৎভাবে অভিধাশক্তির সাহায্যকারী হয় না, ওগুলি সেই ধ্বনিরই অঙ্গপুষ্ট করে।

আনন্দ বর্ধনের দ্বিতীয় উদ্দ্যোত্‌টি তাঁর অসাধারণ প্রতিভার অভিজ্ঞান। কারণ, ওখানে তিনি বলেছেন, ভামহ প্রভৃতি মাননীয় সাহিত্যরসিক সাহিত্যে মাধুর্য, ওজ এবং প্রসাদ সংজ্ঞক যে তিনটি গুণের কথা বলেছেন, সেগুলি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রসধর্মকে অতিক্রম করে উদ্ভূত হয় না, ওগুলি অনুপ্রাস, উপমা, প্রভৃতির মত আলংকারিক শব্দধর্মী মাত্রও নয়। এর জন্য প্রচুর যুক্তি স্থাপন করেছেন।

তৃতীয় উদ্দ্যোত্‌টি ব্যঙ্গবিবেচনা, অর্থাৎ ব্যঙ্গ কতরকমে ব্যঞ্জকের সাহায্যে অভিব্যক্ত হতে পারে তা দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝিয়েছেন 'সূর্য পাটে বসেছে' শুনলেই অভিসারিকার সংকেতিত ভূমি, কাল নায়কের অসমাপ্ত কথা মনে পড়ে। আবার গোপাল ক্ষেত্রে গো-পাল নিয়ে, কিংবা সান্ধ্য ঘণ্টার আবর্তির সময় হলো স্মরণ করিয়ে দেয়। তাছাড়া ব্যঞ্জনাও যে কখনও অব্যক্তিত হর্ষ, ঈর্ষা, মান, শোক, স্পর্ধা প্রভৃতি সঞ্চিত মানস প্রবৃত্তিকে ব্যক্ত করে তাও এর সঙ্গে যুক্ত হয়।

এসবক্ষেত্রে সাহিত্যিক কোন কোন শব্দ প্রকাশ ক'রে তাতে ব্যঙ্গার্থ নিবেশ করেন এবং কোনগুলিই বা ব্যঙ্ প্রকাশ্য, আর কোনগুলিই বা বর্ণসংঘটন মাত্র তাও দেখিয়েছেন। অর্থাৎ হাস্য, করুণ, শৃঙ্গার রসের ব্যঞ্জনায় কোন কোন শব্দের সংঘটনাটি ঐকান্তিক, এবং নায়ক নায়িকার মুখে বসালে সেগুলি রসের উদ্বোধন করে কিংবা বিরোধ সৃষ্টি করে, এবং বিরোধ পরিহারের পথ দেখাতে কি কি উপনিবেশ করতে হয় সেটি সুন্দর করে দেখিয়েছেন, যেমন করুণ রসের বিরোধী রস হাস্যরস, কিন্তু তাদের বিরোধ পরিহারের পথ কি? যেমন চোখের জলে কাউকে বিদায় দেওয়ার সময় পাশের গোয়াল ঘরের দিকে দৃষ্টি পড়লো এক রাখাল তাকেই দেখেছ হয়তো সমবেদনা প্রকাশ করার দৃষ্টিতেই বা হবে, আর সে স্বাভাবিক অভ্যাসেই গাইয়ের বাঁটে হাত রেখে দুধ দুচ্ছিল, কিন্তু গাইর সামনে ঘাস দেখে একটা ষাঁড় আসতেই গাইটা কখন পালিয়েছে আর সেই জায়গায় ষাঁড়টা দাঁড়িয়ে ঘাস খাচ্ছে, রাখাল তা জানতে পারেনি তাই সে অভ্যাস বসেই দুধ দুচ্ছিল, কিন্তু—যে দৃশ্য তাতে হয়েছে ব্যাথাতুরা নায়িকা অমন বেদনাপ্রকাশের সময়ও হেসে ফেললেন, দৃশ্যটা ছিল রাখাল ষাঁড়ের ল্যাজটাই দুচ্ছিল।

একদিকের ধ্বনি হ'লো রমণীর প্রতি সমবেদনা প্রকাশ, অপরদিকের রাখালের মন কি প্রণয়াকৃষ্ট হ'য়েই তাকে দেখছিল?

এক্ষেত্রে রসসমাহিত সাহিত্য সাধকের চিত্ত তখনও বেদনায় ভরপুর হয়েই উঠেছিল বলেই নায়িকাকে অমন করে কাছে টেনে নিলেন আবার তা অসহ্য হওয়াতে মুখে হাসি ফুটিয়ে ব্যথার ক্ষতে প্রলেপ দিলেন। এই হোল বিরোধ পরিহার।

এই তৃতীয় উদ্দ্যোতে তিনি আর একটি বিষয়ের উদ্ঘাটন করেছেন সেটি হোল সাহিত্যের আর একটি রূপ আছে, সেটি গুণীভূত ব্যঙ্গতা প্রকাশের ক্ষেত্রে হ'য়ে ওঠে, এটিকে প্রকাশ করার রীতি কেমন? তার ক্ষেত্রই বা কেমন?

তাছাড়া আরও দেখিয়েছেন যে, ব্যঞ্জনার ব্যাপারটি অনুমান গম্যই নয়, ওটি বস্তুতাত্ত্বিকবিচারের মাধ্যমেই জানাযায়, রসাস্বাদভূতিটি শব্দের অভিধাশক্তির সাহায্য এতদূর থেকে নেয় যে শব্দ সত্যি সত্যি

দাবী করতে পারে না যে আমার অভিধা শক্তির সাক্ষাৎ প্রয়োগের দ্বারাই রসানুভূতি ঘটলো। তবে ওটি কেবল কার্যের অনুকার মাত্র। অর্থাৎ ছুটি পেলব বাহুর দোলনকে যেমন বিটপী পল্লব অনুকরণ করে মৃদুবায়ুর হিল্লোল। রসের অনুকারের ক্ষেত্রে অভিধাও তেমনি।

চতুর্থ উদ্যোত্‌টি চিরকালের জন্য কবি আনন্দবর্ধনকে চিহ্নিত করে রেখেছে, কারণ এ উদ্যোতে তাঁর অসাধারণ প্রতিভার ছাপ ছড়ে ছড়ে।

এখানে তিনি বলেছেন ব্যঞ্জনা শক্তির সাহায্যেই সাহিত্যের অর্থ নূতন নূতন দিক খুলে দেয়, তাই না রামায়ণের মত একখানি মহাকাব্যের জন্ম হ'য়েছে ঐ ধ্বনিবাদের মাধ্যমে, যে বাদটি শব্দের ব্যঞ্জনা শক্তির প্রকৃষ্ট উদাহরণ, ওখানে করুণ ও শান্ত প্রভৃতি রস মুখ্য হয়েছে, আর সেই সঙ্গে একটি অমর কাব্যের প্রকাশ হ'য়ে অন্যান্য রসকে কি সুন্দর করে আনুগত্যে এনে তাদিকে গুণীভূত করে চিরকালের সাহিত্যের প্রাণ কেন্দ্রটি অব্যক্ত রসের ব্যক্ত রূপ জাগাতে প্রেরণা জোগাচ্ছে।

এই প্রেরণা এনেছে ব্যাধের তীরে নিহত ক্রৌঞ্চের শোকে ক্রৌঞ্চির আর্তনাদ। তারই ধ্বনি সৃষ্টি করে রামায়ণ কাব্যের সমগ্র দেহ।

আনন্দ বর্ধন চতুর্থ উদ্যোতের শেষশ্লোকগুলিতে দেখিয়েছেন সাহিত্যের প্রতিবিম্ব বলে কাকে বোঝায়, আলেখ্য সৃষ্টি করতে কি কি উপাদান প্রয়োজন, আর সাহিত্যের তুল্যদেহিত্বাই বা কেমন, এই তিনটির বেশী সাহিত্যের আর কোন ভেদই হয় না।

আনন্দ বর্ধনের ধ্বন্যালোক অনুশীলন করলে স্বতঃই মনে হবে বস্তু, অলংকার, আর রস এদিকে জানার জন্যই এই গ্রন্থের জন্ম হলেও রসই যে সাহিত্যের আত্মা এবং সেই রসটি ব্যঙ্গ, সেটি শব্দের দ্বারা জানা যায় না,সাহিত্যস্রষ্টার এ অনুচিন্তনা যদি না থাকে তবে তাঁর সাহিত্যকৃতি অমর হয় না—তা হবে কালিক ছায়া। এটি তাঁর প্রথম উদ্যোতের কারিকায় বলেছেন—

কাব্যস্যাত্মা স এবার্থ স্তথা চাদি কবেঃ পুরা।
ক্রৌঞ্চদ্বন্দ্ব বিয়োগোত্থ শোকঃ শ্লোকত্ব মাগতঃ॥

এই দৃষ্টান্তেই সাহিত্য স্রষ্টা মনে রাখবেন—

ব্যঙ্গ-ব্যঞ্জকভাবেঽস্মিন্ বিবিধে সম্ভবত্যপি।
রসাদি ময় একস্মিন্ কবিঃ স্যাদবধানবান্॥

তাই পণ্ডিতবৃন্দ মনে করেছেন ভরতের রসপ্রস্থানের পরিপূরক আনন্দ বর্ধনাচার্য এবং তাঁর অমর রচনা 'ধ্বন্যালোক'।

সঙ্গীত ও প্রকৃতি

নরেন্দ্রকুমার মিত্র

সঙ্গীতকে ভারতীয় শাস্ত্রমতে দুভাগ করা হয়েছে—দেখার আর শোনার। নাট্য আর নৃত্য পড়ছে প্রথম ভাগে, দ্বিতীয় ভাগে—গীত। গীতের আবার প্রকাশ দুভাগে,—কণ্ঠ ও যন্ত্র। অবশ্য কণ্ঠও যন্ত্র বিশেষ বটে কারণ আস্য বা মুখবিবর দিয়ে কথা বের হলেও কণ্ঠ-যন্ত্রের সাহায্যেই স্বরের উৎপত্তি।

সঙ্গীতশাস্ত্র পরিকল্পনায় অবশ্য কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীতের মধ্যে কোনও ভেদসীমা বেঁধে দেওয়া নেই।

শুধু কণ্ঠ সঙ্গীতে ভাষার যোগসাজস যে ভাবময় জগতকে অতি অল্প আয়াসে ফুটিয়ে তোলে শুধুমাত্র ধ্বনির মাধ্যমে ঠিক তত্‌ সহজে কোনও শিল্পকর্মের অভিব্যক্তি সম্ভব হয় না বলেই নানান রকমের রীতির আশ্রয় নিতে হয় অশাব্দময় সঙ্গীতকে। প্রথমেই তাই সঙ্গীত প্রকৃতির আশ্রয়ে লালিত হয়।

প্রকৃতি যে সঙ্গীত স্বরের উৎস সে কথা সত্যি। তার স্বরূপটা কি রকম সেটা কিন্তু বিচার করা চাই। স্বর হল ধ্বনি বিশেষ তবে ধাতুগত অর্থে 'স্বর' হল 'স্ব-রঞ্জক'। স্বরের অবস্থান হল তিন পর্যায়ে,—উত্থান, স্থিতি ও লয়। প্রকৃতির মধ্যে নিয়তই শব্দ সৃষ্টি হচ্ছে। সব শব্দ থেকে সুর আসে না।

বিভিন্ন বস্তু—ঘন, তরল বা বায়বীয়—পরস্পর আহত হলেই শব্দের সৃষ্টি হয়। এমনি করে মেঘের ডাক, পত্রমর্মর, ঝড়ের হাওয়ার গর্জন, ঝরণার কুলুধ্বনি ইত্যাদি প্রকৃতি উদ্ভূত শব্দ আমরা শুনতে পাই। এমনি করেই শত সহস্র শব্দ একই সঙ্গে বা আলাদাভাবে আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করছে। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে আমাদের কাণ গ্রহণ করছে শব্দ তরঙ্গ। আমাদের কাণের মধ্যে একটা আড়াই পেঁচ সুড়ঙ্গ আছে যাকে বলা হয় কুহর। সেই কর্ণকুহরে সাজানো আছে অসংখ্য তন্তুকোষ, যেমন পিয়ানোর তারগুলো। এই প্রত্যেকটি কোষ এক একটি ধ্বনি তরঙ্গের আঘাতে অনুরণিত হবার ক্ষমতা রাখে। শুধু তাই নয়—ধ্বনি তরঙ্গের উৎসগুলোর বিভিন্নতাও এই কোষগুলো বুঝে ফেলে। অর্থাৎ শব্দ ও স্বরের প্রকার ভেদ বোঝাবার বন্দোবস্তও প্রকৃতির দান।

চারুশিল্প হিসাবে সঙ্গীত সৃষ্টির কাজে প্রকৃতি অনেক সাহায্য করে। প্রথমতঃ প্রকৃতিই সঙ্গীত সৃষ্টির উপাদান যোগায়। কণ্ঠস্বর ছাড়া সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য যে বাজনা তার জন্যে কাঠ, প্রাণীর চামড়া, নাড়ীভুঁড়ি, নানান রকমের ধাতু এই সমস্ত সুর সৃষ্টির উপাদান প্রকৃতি যুগিয়ে থাকে আর বাহ্যিক জগত যোগায় রূপ। এই দুটোই সঙ্গীত সৃষ্টির জন্য খুবই দরকারী যদিও কাঁচামাল হিসাবেই এর ব্যবহার। সুতরাং একথা পরিষ্কার যে মানুষ যে সুর বা ধ্বনি বের করবার চেষ্টা করে তার মূল উপাদানগুলো প্রকৃতি যোগান দেয়। এই সমস্ত কাঁচামাল থেকেই উঁচু নীচু পর্দার স্বর বা পরিমেয় স্বর আমরা পাই যা সব সংগীতেরই প্রাথমিক প্রয়োজন।

সঙ্গীত স্বর বা সুরকে শব্দ বললে ভুল হবে না কিন্তু সব শব্দই সুর নয়। এইখানেই শুরু হল

প্রকৃতির অবদানগুলোকে সঙ্গীতের পরিপ্রেক্ষিতে যাচাই করা। যে শব্দ সুর নয় সেটা কোলাহলের পর্যায় পড়ে। সাধারণতঃ দেখা দেখা গেছে যে সঙ্গীত সুর-তরঙ্গ আসে সরল স্থিতিস্থাপক বস্তু থেকে—(simple elastic bodies)—যেমন পেতলের ঘণ্টা। তার আওয়াজ অনেক দূর থেকেও শোনা যায়। তার থেকেও জোরে কোনও কোলাহলের আওয়াজ এত দূর ছড়িয়ে পড়ে না। আমরা সঙ্গীত সৃষ্টির জন্য প্রকৃতি থেকে কাঁচামাল আহরণ করেছি মাত্র। এ পর্যন্ত এটাই প্রমাণ হল।

ভারতীয় সঙ্গীত মানেই রাগরাগিণী। তার গঠন প্রকৃতির প্রাথমিক পর্যায় হল পরিমেয় স্বর যার থেকে আমরা সা, রে, গা, মা ইত্যাদি স্বরগুলিকে সুর শ্রুতির ঘরিকোঠায় চিহ্নিত করেছি বুদ্ধি দিয়ে। নিজেদের অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি দিয়ে এই স্বরগুলির মধ্যে শ্রুতিমধুর স্বর সংযোগ আমরাই উপলব্ধি করেছি এবং এমনি করেই সঙ্গীত তৈরী হয়েছে। এই সঙ্গীত তৈরীর কাজে প্রকৃতির কোনও অবদান নেই। এই রাগগুলো প্রকৃতির দান নয়। সগপ, রেমধ ইত্যাদি মাত্রিকা (chord) প্রকৃতি নিঃসৃত কোনও শব্দের অনুকরণে গঠিত হয়নি। রাগ রাগিণীর দিক থেকে প্রকৃতি নিঃস্ব।

একথা যদিও অস্বীকার করলে চলবে না যে নদীর কুলুধ্বনি, তরঙ্গের গর্জন বা পত্রমর্মরে ধ্বনি ঐশ্বর্য আছে এবং এই সব শব্দ মনকে আপ্লুত করে কিন্তু ধ্বনি ঐশ্বর্য সঙ্গীতের একটা উপাদান মাত্র,—সঙ্গীত নয়। কারণ শিল্পকলা হিসাবে সঙ্গীতের সঙ্গে সাহিত্য বা চিত্রশিল্পের প্রকাশরীতির মিল নেই। সাহিত্য বা অন্য শিল্পকলা প্রথমত বাস্তব রূপনির্ভর। মুখের ওপর জেগে ওঠা দুঃখের ছাপ এঁকে বা ভাষার বিন্যাসে দুঃখ কাহিনী বর্ণনার উপর যে শিল্পের ভিত্তি সঙ্গীতের সঙ্গে সেই প্রকাশরীতির মূলগত প্রভেদ। সঙ্গীত পরিবেশকের সামনে অনুকরণ করার মতন কোনও বিষয়বস্তু থাকে না যাকে স্বরসঙ্গতি (harmony) বা রাগরাগিণীর মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। ভারতীয় সঙ্গীত যা প্রকাশ করে তা রাগ বা রাগিণী ছাড়া আর কিছুই নয় আর আগেই বলা হয়েছে যে প্রকৃতির মধ্যে রাগ প্রকাশের কোনও নিদর্শন নেই।

এত কথা বলার পরও একটা কথা বাকি থেকে গেল। ভারতীয় সঙ্গীতের অনেক বিখ্যাত চিন্তায় পশু-পাখীদের ডাক বা আওয়াজকে সঙ্গীতের আওতায় ফেলা হয়েছে। প্রাচীন সঙ্গীত একটি বিখ্যাত সংস্কৃত শ্লোকে 'সা, রে, গা, মা', ইত্যাদি স্বরগুলোর উৎপত্তিস্থল হিসাবে ময়ূরের ডাক, ষাঁড়ের ডাক ছাগলের ডাক ইত্যাদি ৭টি পশু পাখীর ডাকের কথা বলা হয়েছে। কবিরা কথায় কথায় পাখীর গানের কথা বলে থাকেন। অনেক ইউরোপীয় সঙ্গীতবিদরাও পাখীর গানকে সঙ্গীত বলে চালাবার চেষ্টা করেছেন যদিও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে এই কথা ধোপে টেঁকেনি। তার কারণ খুঁজতে গেলে সঙ্গীতকে বস্তু হিসাবে বিচার করতে হয়।

সঙ্গীতের প্রাথমিক প্রয়োজন হল পরিমেয় স্বর। একথা ঠিক যে প্রাকৃতিক শব্দ জগতে সবচেয়ে বিশুদ্ধ স্বর হল 'পাখীর গান' কিন্তু সেই গান থেকে কি আমরা সা, রে, গা, মা, ইত্যাদি প্রাথমিক পরিমেয় স্বর পেতে পারি ? 'পাখীর গান' কে যদি আবেগের প্রকাশ বলে ধরে নিই এবং সেই কারণে তাকে সঙ্গীত বলে চালাই তাহলে বহু সঙ্গীতের স্বর কে তো আর সঙ্গীত আখ্যা দেওয়া চলেনা।

কিছু বুলিবোলা পাখী হয়ত সঙ্গীত সুরের নকল করতে পারে কিন্তু সেটা তো আর প্রকৃতির অবদান বলা যাবেনা।

এতক্ষণ ধরে আমরা দেখেছি যে প্রকৃতি সুর সৌন্দর্যের দিক থেকে নিঃস্ব কিন্তু সেই সুর কে যে সংযত করে এবং গতির নিয়ন্ত্রণ করে তা হল ছন্দ। এই ছন্দ প্রকৃতির মধ্যে মানুষ জন্মাবার আগেই ছিল সুতরাং এটা মানুষের সৃষ্টি নয়। প্রকৃতি ছন্দোময়। মানুষের দেহসৌষ্ঠবে শরীর মাঝবরাবর একটা রেখা টানলেই দেখা যাবে এবং গাছের লতায়, পাতার গঠন প্রকৃতি দেখলেই এই ছন্দের অস্তিত্ব ফুটে উঠবে। আবার ছন্দ ও রয়েছে যথেষ্ট। চলায় ছন্দের শব্দ সে মানুষেরই হোক বা ঘোড়ারই হোক প্রতিনিয়তই সময়কে শব্দ দিয়ে ভাগ করে চলেছে। সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মুর্গীর ডাকের মধ্যে অর্দ্ধ, হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত এই চার রকমের ছন্দের খবর পেয়েছেন। এ ছাড়া গায়ক পাখীর বা তিতির পাখীর ডাকে বা কোকিলের ডাকে বিভিন্ন লয়ের নির্দিষ্ট কাল ব্যবধানে আবর্তনের উপাদান পাওয়া যায়। প্রকৃতির ছন্দ সুরবিহীন হয়েও প্রকাশ পায়। কিন্তু সঙ্গীতছন্দ সুরকে সহযোগী করে নেয়। আদিম লোক সঙ্গীতগুলো এবং কাযের ছন্দের সামিল করে গানগুলো ছন্দকেই প্রকাশ করে থাকে। তাই বাউলসঙ্গীত ছন্দপ্রধান। ছাদ পিটতে, পাল্কী বইতে তাই কর্মীরা গানের ভিতর দিয়েই ছন্দের প্রকাশ করে থাকে।

প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গীতের কতখানি সম্পর্ক বা সঙ্গীত সৃষ্টির শিল্পরীতি প্রকৃতির কাছ থেকে কতখানি নেওয়া হয়েছে এর যাচাই করার প্রয়োজন আছে। কারণ প্লেটো, আরিষ্টটল ইত্যাদি দার্শনিকরা সব চারুকলাকেই অনুকরণবাদের আওতায় আনতে চেয়েছেন এবং পরবর্তীকালের অনেক অনেক মনীষীরাও সেই কথার প্রতিধ্বনি করে সঙ্গীতকে এক অদ্ভুত তত্ত্বের মাধ্যমে বিচার করেছেন। ভারতীয় সঙ্গীত তত্ত্বে অবশ্য এই অনুকরণবাদের গোঁড়ামী প্রাচীন যুগে দেখা দেয়নি। আধুনিক সঙ্গীতে যদিও এর কিছুটা ছাপ পড়েছে।

যা দেখা যায় তা দিয়ে ছবি আঁকা চলে। তার বর্ণনা করে কাব্য বা সাহিত্য রচনা করা যায়। প্রকৃতির মধ্যে এমন অনেক সুন্দর বস্তু আছে যাকে এইভাবে চারুশিল্পের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে এমন কি সুন্দর শ্রাব্য বস্তু আছে যাকে সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়? আমি এখানে সঙ্গীত বলতে কেবল যন্ত্র-সঙ্গীতের কথাই বলছি কেননা কথা বাদ দিয়ে শুধু সুরটাই সঙ্গীত হিসাবে এখানে যাচাই করা হবে।

আমরা দেখেছি যে প্রকৃতির মধ্যে সঙ্গীতসুর নেই আছে ছন্দ। আমাদের কাজের মধ্যে, শোক দুঃখ বা আনন্দ প্রকাশের মধ্যে এক একটা বিশেষ ছন্দ ও লয় ভঙ্গিমা দেখা যায়। শোকাকুল মানুষের অভিব্যক্তি ধীর লয়ে কান্না। আনন্দের অভিব্যক্তি দ্রুত লয়ে হাসি। ঝড়ের বাতাসে আন্দোলিত বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে পরস্পর সংঘাতের শব্দ বা ঝরণার জল উপলখণ্ডে ব্যাহত হবার ফলে যে শব্দ তারও একটা বিশিষ্ট ছন্দ আছে। ইউরোপীয় কনসার্ট জাতীয় বাজনায় এই সব ছন্দের প্রতিধ্বনির প্রতিফলন দেখা গেছে। কিন্তু ভারতীয় সঙ্গীতে—যেখানে শুধু রাগ রাগিণীরই কারবার সেখানে এইজাতীয় অনুকরণের অবকাশ কোথায়?

শিল্প বস্তু হিসাবে রাগ-রাগিনীর বিচার তাই একান্ত প্রয়োজন। ভারতীয় সঙ্গীত সৌন্দর্য্যের যথার্থ নির্ণয় করতে হলে এই বস্তুটিকে যাচাই না করে উপায় নেই। প্রসঙ্গতঃ সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল মহাশয়ের একটি উক্তি তুলে ধরে আপাততঃ আমি এই বিষয়ের যবনিকা টানছি—'সুরের জগত,—অর্থাৎ অতৃপ্ত আকাঙ্খার জগত। আমরা পত্রমর্মরের মধ্যে, বিহগ কাকলির মধ্যে সুর খুঁজি। কিন্তু-বস্তুতঃ সেখানে সুর নেই, আছে শুধু মর্মর ধ্বনি, কুলকুল শব্দ, কিচির মিচির, কোলাহল। শব্দের জগতে সুরের চেয়ে অ-সুরের প্রাধান্যই চিরন্তন সংবাদ। নেহাৎ দেহ সংবিদের মধ্যে সুর বোধের ব্যবস্থা ছিল বলেই আমাদের অনার্য্যিক পূর্ব পুরুষগোষ্ঠী অ-সুর কোলাহলের মধ্যে জীবন যাপন করতে থেকেই কিছু সুর ও স্বর সৌন্দর্য্য অনুভব করতে পেরেছিলেন।'*

* 'সুরের সন্ধানে'—সমকালীন—শ্রাবণ সংখ্যা ১৩৬৮ সাল

মুখা শিল্প

ভোলানাথ ভট্টাচার্য

নব্যাশ্মীয় শেষপর্ব থেকে এবং কোথাও কোথাও মধ্যাশ্মীয় পর্ব থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি অংশে এবং অন্যান্য কয়েকটি দেশে মৃত আত্মজন সম্পর্কে বিচিত্র ভাবনা জীবিতদের মধ্যে দেখা দেয়। এই ভাবনা থেকে অসংখ্য কৃত্যের জন্ম হয় সেগুলি আত্মার নিবাস তত্ত্বের সঙ্গে জড়ানো। পৃথিবীর প্রায় সবদেশে সভ্যতার আদিম অবস্থায় মানুষের মাথাকে অলৌকিক শক্তির আধার বলে গণ্য করা হয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলে এই তত্ত্ব শেষ পর্যন্ত যেমন মস্তক শিকারে ধর্মীয় উন্মাদনা জুগিয়েছে তেমনি আবার সমতল ও অরণ্যাঞ্চলে মৃতজনের মস্তক সংরক্ষণে উৎসাহদান করেছে। যাযাবর মানুষ যেদিন চাষবাস শুরু করে কোন বিশেষ অঞ্চলকে বাস্তুভূমি বলে মানতে থাকে সেদিন থেকেই পরিবারে মৃত ব্যক্তিদের সম্পর্কে তার ভাবনা দ্রুতলয়ে এগিয়ে চলে। শেষ পর্যন্ত বিশ্বের অনেকগুলি দেশ বিশ্বাস করতে থাকে যে, আত্মার নিবাস মস্তকটি যখন সামনে আছে তখন মৃতব্যক্তি আর মৃত নয়, সে অতিশয় জীবিত। মৃত্যু এবং মৃতব্যক্তি সম্পর্কিত এই চিন্তা থেকে আদিম মানুষের শিল্পপ্রয়াস অগণিত যাদুধর্মী কলাকর্মে নিয়োজিত হয়েছে। কৌম জীব হিসাবে সে অনেকগুলি কুকর্ম থেকে বিরত থেকেছে এই সংস্কারবশে যে, সংরক্ষিত মস্তক বা আত্মা সবকিছু দেখে ফেলবে। তেমনি কোন নতুন কিছুকে কোন পরিবর্তনকে সে স্বাগত জানাতে পারেনি কারণ ঐ রক্ষিত মস্তক চায় যে তাদের জীবিতকালে যা যা যেমন যেমন ভাবে চলত পরবর্তী পুরুষেও ঠিক তেমনিভাবে চলুক। নতুনকে অশুভ বলে তারা চিহ্নিত করে। নতুন মানে অপরীক্ষিত আর সনাতন হল পরীক্ষিত।

মস্তক সংরক্ষণ ব্যাপারে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিচিত্র সব পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মৃতদেহ থেকে মস্তকটি বিচ্ছিন্ন করে সেটি ভিন্ন ভিন্ন আঞ্চলিক পদ্ধতিতে রক্ষা করার চেষ্টা হয়েছে। কোন কোন অঞ্চলে মৃতের সৎকারের পরে একটি কাঠের অথবা অন্য কোন বস্তুর তৈরি মাথাকে ঐ বিদেহীর আত্মার আধার বলে ধরা হয়েছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে মৃতব্যক্তির মাথাটিকে প্রাচীর ইত্যাদি দিয়ে ঘিরিয়ে রাখা হয়েছে। বিশেষ বিশেষ দিনে ঐ মাথাটির অর্থাৎ বিদেহী আত্মার তৃপ্তির জন্য কিছু কিছু নাচগান প্রভৃতি আনন্দোৎসবের আয়োজন এবং কখনো কখনো মৃতব্যক্তির জীবিতকালের চলন-বলন প্রভৃতি মুখা বা মুখোশ অভিনয়ে প্রকাশ করে সেই আত্মার তুষ্টি সাধন করা হয়েছে।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও প্রাগৈতিহাসিককাল থেকে মস্তক সংরক্ষণের প্রতীক মুখা বা মুখোশ প্রস্তুত করা হয়েছে এবং উৎখননে পাওয়া সিন্ধুসভ্যতার নিদর্শনের মধ্যে তার স্থান হয়েছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য সেই যুগে ঐ মুখার ব্যবহার ঠিক কী ছিল তা আজ আর নিশ্চিত করে বলা যায় না। শুধু অনুমান করা চলে সেযুগের ব্যক্তি ও গোষ্ঠীজীবন অতিপ্রাকৃতে আচ্ছন্ন ছিল। প্রাকৃতিক শক্তিকেন্দ্রগুলি পরিগণিত হয়েছিল লোকোত্তর ক্ষমতাধর দেবতাত্মা বা অপদেবতায়। তথাকথিত এইসব দেবতা বা অপদেবতার তুষ্টির জন্য তখনকার মানুষ অনুকরণের ঢঙে

যে নড়াচড়া করেছে পরবর্তীকালের মানুষের কাছে তা কলাকর্ম বলে বিবেচিত হয়েছে। এই কলাকর্ম জন্ম, মৃত্যু, যুদ্ধ ও নানা আনুষ্ঠানিক কৃত্য উপলক্ষে যেমন উন্নত হয়েছে তেমনি দেবতা অপদেবতা তুষ্টি, শিকার, শস্য উৎপাদন, অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ, যোগাযোগ, যাদুক্রিয়া এবং সর্বোপরি মৃতব্যক্তির আত্মকুশলাপাতের আশায় পরিকল্পিত হয়েছে।

আজও দক্ষিণপূর্ব এশিয়া এবং অন্যত্র কোন কোন দেশে নানা ভাবের ও নানা রসের বিচিত্র মুখা প্রস্তুত হয় যার অধিকাংশ আত্মায় বিশ্বাস তত্ত্বের সঙ্গে জড়িত আর কতকগুলি নেহাৎ সাজসজ্জার উপকরণ। পৃথিবীর বিভিন্ন সংগ্রহ শালায় রক্ষিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মুখার বিশদ প্রতিলিপি লোমেল তাঁর 'প্রি হিস্টরিক এ্যাণ্ড প্রিমিটিভ ম্যান' গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন। মুখা সম্পর্কিত গ্রন্থ না হলেও এতে স্থান পেয়েছে এস্কিমোদের উনিশ শতকের বিখ্যাত ইন্থুয়া মুখোশ। কাঠ রঙ করে তার সঙ্গে পাখির পালক মিলিয়ে মুখাটি তৈরী হয়েছে। ঐ মুখায় যাদুচিত্রণে রূপায়িত হয়েছে একটি স্যামন মাছের আত্মা। বিশ্বাস করা হয় এই যাদুধর্মী মুখা পরলে শিকারীরা প্রাণীজগতের ওপর সহজে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। দক্ষিণপূর্ব আলাস্কা থেকে এই মুখাটি সংগৃহীত হয়েছিল। আস্ত্রে রেটন সংগ্রহে আরেকটি যাদুধর্মী এস্কিমো মুখা রয়েছে যেটি কুশককউইম নামে খ্যাত। মুখার রাজ্যে চীনের ঐতিহ্য প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে। খৃঃ পূঃ ১৫০০—১০২৭-এর চীনদেশীয় যাতুচাঙাইয়ের অসাধারণ মুখানমুনা হল একটি সুরাপাত্র। মানুষ এবং তার রক্ষক-সত্তার একীভূত মুখা এটি। কলোনের সংগ্রহশালায় রয়েছে একটি চীনদেশীয় বাঘমুখা (খৃঃ পূঃ ১০২৭—২২১)। চক্রাকার মোটিফের বিস্ময়কর প্রয়োগে শিল্পকর্ম হিসাবে এটি নিঃসন্দেহে উত্তীর্ণ। সম্পূর্ণ চক্রাকার মোটিফে অলঙ্কৃত আরেকটি চী। মুখা মিউনিক সংগ্রহশালায় রয়েছে। পঞ্চম থেকে দ্বিতীয় খৃষ্ট পূর্বাব্দের এই শিল্পনমুনা উত্তর চীনের জীবমস্তক হিসাবে খ্যাত। ঐ সংগ্রহশালায় চীনদেশীয় ব্রোঞ্জ মুখার একটি নমুনা (খৃঃ পূঃ ২য় শতক) আছে যেটি স্বভাবচিত্রণের সঙ্গে চক্রাকার মোটিফের সংমিশ্রণের এক সার্থক উদাহরণ। এই সঙ্গে উত্তরচীনের একই সময়কালের বিখ্যাত একশৃঙ্গী মুখাটি স্মরণ করা উচিত। সুমাত্রার বাটক যাদুমুখার উল্লেখযোগ্য নমুনা সংগৃহীত হয়েছে ব্রিটিশ মুজিয়ামে। পিতৃপূজার হাঁটুমোড়া মোটিফের ওপর মুখাটি দাঁড়িয়ে আছে। মেলানেশীয় উলি মূর্তির দুটি অসাধারণ মুখা সংগৃহীত রয়েছে মিউনিক সংগ্রহশালায় (লোমেল, পৃঃ ৮৮-৮৯)। ঐ সংগ্রহে পলিনেশীয় কুকদ্বীপের যে দুটি পিতৃপূজার মুখা রয়েছে এই সূত্রে সেগুলি স্মরণে আসা স্বাভাবিক। প্রসঙ্গত পাপুয়ার সেইবই দ্বীপের জগৎ বিখ্যাত মুখার কথা এসে পড়ে। ছোবড়া, বুনো কাঠ, ঝিনুক এবং ঘাস দিয়ে এই মুখা তৈরী হয়। কৃষি উৎসবের সঙ্গে এটি জন্মসূত্রে জড়িত। এডিনবার্গের রয়্যাল স্কটিশ মুজিয়ামে এই ধরণের একটি মুখা সংরক্ষিত আছে। রবার্ট উড্স্ ব্লিস সংগ্রহে মুখার তালিকায় একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হল মেক্সিকোর টিলানটোঙ্গোর কাছ থেকে সংগৃহীত মুখা। হাজা রঙের খেলা করে কেমন সহজে মৃত্যুর ভয়াবহতা এখানে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। অনুরূপ ভয়াবহতা লক্ষ্য করা যায় মিউনিক সংগ্রহের বাটক কাঠের মুখায়। একটি আকর্ষণীয় নাচের মুখোশ রয়েছে ঐ সংগ্রহে। মেলানেশীয় এই দীর্ঘনাসা মুখাটির বিস্ময় নকল তৈরী হয়েছে যা থেকে একটি রূপারোপের সাফল্য সম্পর্কে সহজেই ধারণা জন্মায়। দক্ষিণপূর্ব তানজানিয়া থেকে সংগৃহীত একটি কাঠের মুখা মিউনিক

সংগ্রহের উল্লেখযোগ্য সামগ্রী। ঐ সংগ্রহে কঙ্গোর একটি রঙকরা কাঠের মুখা রয়েছে। কড়ি, পুঁতি প্রভৃতি এই মুখায় ব্যবহার করা হয়েছে। তাহিতি দ্বীপের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী সমাধিস্থলে শোকস্মারক যে পোষাক ব্যবহৃত হয় সেটি আসলে একটি পূর্ণাঙ্গ মুখা। ঐ পোষাক-মুখার সুন্দর নমুনা রয়েছে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে। এই মিউজিয়ামের একটি উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ হল নাইজেরিয়ার হাতির দাঁতের পেণ্ডেন্ট মুখা। এটি ষোড়শ শতকের এক চমকপ্রদ শিল্পকীর্তি। নাইজেরিয়ার জস মিউজিয়ামের সংগ্রহে রয়েছে খৃঃ পূঃ ২য়—১ম শতকের একটি পোড়ামাটির মুখা। সারা পৃথিবীর সংগ্রহশালায় এ ধরণের বিভিন্ন সময়কালের ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির ফসল অসংখ্য মুখা রয়েছে। আমাদের সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনায় দীর্ঘ তালিকা থেকে মাত্র কয়েকটি এখানে বেছে নিয়েছি।

আমাদের দেশে সভ্যতার আদিপর্ব থেকে বিবিধ কারণে নানারকম মুখা তৈরি হয়েছে। এগুলি কাঠে, পটে, পোড়ামাটিতে, বিবিধ ধাতুতে, প্রস্তরে, হাতির দাঁতে, কাগজে, মণ্ডে, কাপড়ে, লাউ-কুমড়োর খোলে এবং জীবজন্তুর চামড়ায় রূপায়িত হয়েছে। সমতল, অরণ্য এবং পর্বতক্ষেত্রে অধিবাসীদের ব্যবহারের মুখায় নানা বৈচিত্র্য এসেছে। উত্তরপূর্ব পার্বত্য অঞ্চলে মুণ্ড শিকারের আবহাওয়ায় মুখা এক বিশিষ্ট চরিত্র পেয়েছে। এ মুখার সর্বাংশে যাদু, তন্ত্রমন্ত্র, টোটেম গন্ধ এবং কুলাচারের খুঁটিনাটি। এমন কি মুখানৃত্যের আভিনায়িক অনুষ্ঠানগুলিতে পর্যন্ত ভয়ানকরসের প্রাবল্য লক্ষিত হয়। এই ভয়ানক আবার আরেক রূপ নেয় অরণ্যাঞ্চলের অধিবাসীদের বোঙা মুখায়। উত্তরপূর্ব সীমান্তের পার্বত্যাঞ্চলে বছরের বিভিন্ন সময়ে নানাধরণের মুখানৃত্যের অনুষ্ঠান হয়। শিঙঅলা একটি বড় গরুর মুখার খোলে দুজন ঢুকে গরু সাজে, পাশে বাঘমুখা, এবং মানুষমুখা, শিঙা-সানাইয়ের ফুঁয়ের তালে এদের নাচ চলতে থাকে এই হল ইয়াছম্ বা ইয়াক নাচ। এই অঞ্চলে আরেকটি জনপ্রিয় মুখানাচ হল সাধাটোপে ইংসিন। এই নাচের সর্বাঙ্গে বৌদ্ধগন্ধ। যুদ্ধের পোষাক এবং রণঢালে মুখার ব্যবহার পার্বত্য সংস্কৃতির একটি বিশেষ দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শত্রুর মুখ ঢালে এঁকে সেই ঢাল নিয়ে রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়লে শত্রুপক্ষের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী এই বিশ্বাস থেকে সম্ভবত ঢাল-মুখার প্রচলন ঘটেছে। এছাড়া উত্তরপূর্ব পার্বত্য অঞ্চলের বিশিষ্ট মুখানাচ হল শিঙ্গীছম, খেপাছম এবং ভয়ঙ্করী ভাইনী নাচ। এই সূত্রে স্মরণ করা যেতে পারে নেপালীদের মহাকালী লাখে নাচ, মহিষাসুর বধ ও দেবদানবের যুদ্ধবিষয়ক মুখানাচ। পার্বত্য অঞ্চল থেকে একটু নেমে এলে নকশাল-খড়িবাড়ি, এখানেও মুখোস নাট্যের একটি সুদীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে। নাট্যবিষয় সাধারণত হল রামায়ণী কথা। রামায়ণের অংশ বিশেষ নিয়ে নাট্য শুরু এবং শেষ হয় রাবণবধে। এখানকার মুখায় বিশেষ করে রাবণ, বিভীষণ, হনুমান প্রভৃতির দেখায় যোজনীয় এবং ভোটচিত্রবর্তী মোটিফের প্রভাবের চাইতে জলপাইগুড়ির খেইলের প্রভাব বেশি। কাঠের মুখায় বিনা মহলায় নাটক পরিবেশনে জলপাইগুড়ি হল পশ্চিম বাঙলায় অদ্বিতীয়। সাদামাটা লোকশিল্পের নমুনা এই আধ-কোঁদা বাটালির দাগঅলা মুখাগুলি শিল্পগুণে অসাধারণ। অন্যত্র নাটকের মুখাতে রূপারোপে যে বিশেষ প্রয়াসের ছাপ, যে মার্জনা থাকে জলপাইগুড়ির মুখাখেইলের মুখায় সে ছাপ নেই। এ মুখা স্বল্পপ্রয়াসে শুধুমাত্র কল্পনার প্রাধান্য দিয়ে তৈরি। মুখাখেইলের নাট্যপ্রযোজনায় যেমন কোন পূর্ব-প্রস্তুতি থাকে না তার সঙ্গে যথাযথ সামঞ্জস্য রেখে এই মুখশিল্প গড়ে উঠেছে।

দার্জিলিঙ ও জলপাইগুড়ির সংলগ্ন জেলা মালদহ মুখাশিল্প ও গম্ভীরা বা গম্ভীরার জন্ত বিখ্যাত। উত্তরবঙ্গের বহুদেবদেবীর উপরের অংশ আজও মুখা দ্বারা আবৃত দেখা যায়। জহুরাতলার জহুরাকালীর মুখ মুখায় রূপায়িত। এছাড়া তুর্কী আক্রমণে ভগ্ন ও ভিন্ন ধর্মীয় বহু মূর্তি মুখা'র কল্যাণে এখন নতুন পরিচয় নিয়ে বিরাজ করে। গম্ভীরা উৎসবের সঙ্গে সাধারণত কালিকা, চামুণ্ডা, নৃসিংহ, বাশুলী, রাম-লক্ষণ, হনুমান, বুড়াবুড়ি, ভূত-প্রেত, শিব, কার্তিক, গণেশ, পক্ষী বা পৈরী প্রভৃতির মুখা জড়িত। এছাড়া হুকাহুকি উৎসবের চাঁদা তোলার মুখা প্রভৃতি বহুরকমের মুখার ব্যবহার এখানে প্রচলিত। মালদহের মুখাশিল্প সম্পর্কে আজ থেকে সত্তর বছরের বেশি আগে হরিদাস পালিত মহাশয় তাঁর 'আদ্যের গম্ভীরা' গ্রন্থে যে আলোচনা রাখেন তা থেকে সামান্ত অংশ উদ্ধার বোধহয় এই সূত্রে প্রাসঙ্গিক। 'মুখা বা মুখোস কাষ্ঠ নির্মিত বা মৃত্তিকা নির্মিত হইয়া থাকে। পূর্বকালে কাষ্ঠনির্মিত মুখাই ব্যবহৃত হইত। নিমকাষ্ঠের মুখা প্রশস্ত।

সকল সূত্রধর মুখা খোদিত করিতে পারে না। শাস্ত্রোক্ত প্রমাণানুসারে মুখা নির্মিত হইয়া থাকে। পটুয়ারা মুখার উপর বর্ণবিন্যাস করিয়া দেয়। কুম্ভকারেরা কালী প্রভৃতি মুখা গড়িয়া ও তাহাতে বর্ণ ফলিত করিয়া বিক্রয় করে। মালাকারেরা উক্ত মুখার শিরভূষণ নির্মাণ করিয়া দেয়।

নৃত্য করিবার পূর্বে ভক্ত গম্ভীরা গৃহে পূজকের নিকট নূতন কাষ্ঠনির্মিত মুখার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া লয়। যাহাদের মুখা আছে তাহারা বিজয়া দশমীর দিবস পূজাদি প্রদান করিয়া থাকে। এদেশের সাধারণের বিশ্বাস, কোন কোন মুখা জাগ্রত এবং কোন কোন মুখার অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভীষণ ক্রোধপরায়ণা। অনেকে মুখা লইয়া নৃত্য করিতে গিয়া প্রাণ হারাইয়াছে। পূর্বে যাহারা দেবদেবী —বিশেষত কালী, চামুণ্ডা, বাশুলী, নরসিংহ প্রভৃতি দেবদেবীর মুখা লইয়া নৃত্য করিত, তাহারা তৈলাদি বর্জন এবং হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া পবিত্র মনে পবিত্র বসন ভূষণে ভূষিত হইয়া নৃত্য করিত।

মুখার উপর দিকে ও পশ্চাদংশে একটি এবং দুই কর্ণের পশ্চাতে দুইটি ছিদ্র দৃষ্ট হয়, তাহাতে রজ্জু সংবদ্ধ থাকে। সেই রজ্জু দ্বারা মুখা মুখের উপর বন্ধন করা হয়। ঘোড়া নাচের ঘোড়া বংশনির্মিত ও কাগজাদি দ্বারা মণ্ডিত। কার্তিকের ময়ূরাদির নৃত্যও ঐ প্রকার। এতদ্ব্যতীত ভালুক নাচও হইয়া থাকে।...কালী মুখার নৃত্যকালে কখন কখন চারখানি হস্ত বিশিষ্ট দেখা যায় উহার চারখানি হস্তই কাষ্ঠের।...বুড়াবুড়ি নৃত্য কৌতুকপ্রদ।'

বাঙলার আরণ্যক লোকসংস্কৃতিতে মুখা বেশ একটু ভোল পাল্টেছে। দক্ষিণপশ্চিম সীমান্তে যেখানে ভূমি হয়েছে অসমান, শাল-কেঁদ মাথা তুলেছে পাহাড়-টিলা টাঁড়-ডুংরির খোঁকড়ের ভেতর দিয়ে যেখানে মানভূম, ধলভূম এবং মল্লভূম পরস্পর আলিঙ্গন করতে চেয়েছে সেই মাল-মাহাত, সাঁওতাল-মুণ্ডা, ভূমিজ-মাহলি, মানকি-খাড়িয়ার অরণ্যলালিত জীবনচর্যায় মুখা তার সনাতন মহিমা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে চেয়েছে। সেরাইকিল্লা বা ময়ূরভঞ্জের ছৌ-নাচের সঙ্গে আমাদের সীমান্ত বাঙলার ছৌ প্রায় সমস্ত দিক থেকে পার্থক্য বজায় রেখে চলেছে। এ পার্থক্য রয়েছে পদক্ষেপের বলিষ্ঠতায়, সতেজ এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ গতিছন্দে এবং সর্বোপরি মুখার যাদুস্পর্শে বিস্ময়জনক পরিবেশ সৃষ্টিতে। সম্প্রতি দক্ষিণপশ্চিম সীমান্ত বাঙলার এই মুখাসম্বল নৃত্যনাট্য দেশের সীমানার বাইরে পরিবেশিত হয়ে বিশ্বের বহু কলারসিকের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। পুরুলিয়া থেকে মেদিনীপুরের জঙ্গলমহল

পর্যন্ত যদি ছো-নাচের প্রভাবসীমা টানা যায় তাহলে এর মধ্যে আরেকটি ধর্মীয় মুখা নৃত্যের ভিত্তি-ভিত্তিক স্রোত দেখা যায়। এই মুখা নাচ ছো-এর মতো জাঁকজমকে ভরা না হলেও পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সহজ সরল মুখা ব্যবহারে কম আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে না। বিষ্ণুপুরের হনুমানতলায় পরিবেশিত এই বীররসাত্মক নাচ রাবণকাটা মুখা নাচ বলে পরিচিত।

বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে পার্বত্য ও আরণ্যক সংস্কৃতির আবহাওয়ায় মুখার যে বৈচিত্র্য দেখতে পাই তা স্থানিক বর্ণনার সঙ্গে জড়িত। কলাক্ষেত্রের অন্যান্য শাখার মতো মুখা নৃত্যেও রস ও ভাবকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আমাদের দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, রস ও ভাবের মধ্যে যে আত্মীয়তা সেটি স্মরণে রেখে মুখা শিল্পীকে কাজে হাত দিতে হবে। গম্ভীরার মুখা প্রসঙ্গে স্বর্গীয় পণ্ডিত মহাশয় যে শাস্ত্রীয় নির্দেশের কথা বলেছেন তারই প্রতিধ্বনি যেন শুনতে পাওয়া যায় বীরভূমি-চড়িদার এককালের দিকপাল মুখা শিল্পী শ্রীসন্তোষ মাহাত এবং মালদহ বাউলপুরের মুখা শিল্পী শ্রীকামদা কারের বক্তব্যে। শ্রীরা মুখার লেখকর্মে মনের ধর্মের ওপর সবচেয়ে গুরুত্ব দিতেন। এই ধর্মকে আমরা বলে থাকি বৃত্তি। মুখা চরিত্রের বিকাশ বা বিকৃতি বৃত্তির সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়। কোমল ধর্মের বিকাশ চাইলে বলি ভারতী; বীররস অদ্ভুত এবং রৌদ্ররসের প্রকাশ চাইলে সাত্বতী; প্রেম-ভালবাসা ইত্যাদির জন্য কৌশিকী এবং যাদু, অলৌকিক, দ্বন্দ্ব, যুটাচার ইত্যাদির লেখা হয় আরভটী।' অশীতিপর বৃদ্ধ শ্রীমাহাত কথায় কথায় সংস্কৃত শ্লোক বলেন এবং নয় ভাব ও নয় রসের ওপর জোর দেন। 'জানেন, ঐ নয়ের ওপরে কিছু মুখায় সম্ভব নয়। যদি নির্বেদ, গ্লানি বা ঐ রকম কোন কিছু বলেন তাহলে মুখায় তা পাবেন না। ঐ তেত্রিশ ভাব আপনাকে শিরকর্ম, দৃষ্টি বা পুট ইত্যাদি দিয়ে ভরে নিতে হবে। সবচেয়ে সুবিধে হবে আপনার করুণ দিয়ে।'

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার সর্বত্র এবং হাওড়া-হুগলীর কোন কোন জায়গায় পৌষ সংক্রান্তি বা তার পরের দিন পূজিত হয় যে দক্ষিণ রায়ের বারামূর্তি, মেদিনীপুর জিলায় ভৈরব বারামূর্তি, ঘট-সলসীতে, ধাতুপাত্রে দেবী কালিকা ও অন্যান্য দেবদেবীর বারামূর্তি এবং আদিবাসীদের পোড়ামাটির ঘোড়া মুখার পরিকল্পনা সম্ভবত মৃত সংরক্ষণ ও পূজার আদিম প্রয়াসের সঙ্গে দূর অতীতে জড়িত।

দক্ষিণ ভারতের কথাকলি নাচে পুরুষ চরিত্রের রূপারোপে যে কিরীটম্ ব্যবহৃত হয় তা যথার্থ মুখ না হলেও শেষ পর্যন্ত মুখার পর্যায়ে এসে যায়। 'তোড়া, চেভিপুরু, চুট্টিতুনি, নারা এবং চামরম্ দিয়ে যে রূপসজ্জা তা মুহূর্তে মুখাকে স্মরণ করায়। অনুষ্ঠান চলার সময়ে বারে বারে মুখার পরিবর্তনের ঝক্কি না নিয়ে মুখার রূপসজ্জা ও লেখনিক কাজকে আদর্শ মানদণ্ড হিসাবে সামনে রেখে পাচ্চা, কাত্তি, তাড়ি, কারি এবং মিনিক্কু রূপসজ্জা করা হয়। কথাকলিতে বিভিন্ন চরিত্রের অঙ্গরাগ ও রূপারোপ কারো খেয়ালখুশিতে হবার উপায় নেই, এখানেও রয়েছে মুখারই মতো শাস্ত্রীয় নির্দেশ। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রনৃত্য এবং প্রেক্ষণ নৃত্যের ধারা অনুসরণ করলে বোঝা যায় অতীতের মুখা ও পুতুলনাচ আজও সারা ভারতে রূপারোপের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে চলেছে।

বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে মুখা ক্রমে তার সনাতন তাৎপর্য অনেকাংশে হারিয়ে ফেলেছে। ভারতবর্ষের প্রায় সব কয়টি প্রদেশে আবহমানকাল মুখার ব্যবহার চলে আসছে। কোন কোন মুখা নৃত্য অনেক রাজ্যের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে। আজও ভারতজুড়ে বিভিন্ন উৎপাদনকেন্দ্রে

মুখা তৈরি হয় এবং একটু লক্ষ্য করলে উড়িষ্যার রাবণের সঙ্গে বাঘমুণ্ডি বা রাঁচীর রাবণমুখার পার্থক্য নজরে আসে। এ পার্থক্য নির্দেশ করেছে আঞ্চলিক শিল্পরীতির পার্থক্য।

ধাতুনির্মিত মুখার জন্য তাঞ্জোর, রাজস্থান এবং মোরাদাবাদের খ্যাতি যথেষ্ট। ধাতুপাতে মুখা সংযোগের কাজে পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন শহরাঞ্চলের কংসবণিকদের কাজ প্রশংসনীয়। পাথরের মুখা পাওয়া যায় বিকানীর, গোয়ালিয়র এবং মথুরায়। কাঠের মুখার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য স্থান হল পুরী, কোণ্ডাপল্লী, ত্রিবাঙ্কুর, গুজরাট, শাহরানপুর, আজমগড়, আলীগড় এবং কাশ্মীর। পশ্চিম বাংলায় প্রায় সব জেলাতে কোন না কোন উৎপাদন কেন্দ্রে মুখা নির্মাণ করা হয়। পাঁচমুড়োর ঘোড়া মুখা এবং ; পুরুলিয়া ছো-এর মুখা আন্তর্জাতিক বাজারে পর্যন্ত হাজির হয়েছে।

ধাতু থেকে শুরু করে মণ্ড বা পাট যে বস্তুতেই মুখা তৈরি হক না কেন তা মোটামুটি কয়েকটি শ্রেণীপর্যায়ে পড়ে : (১) দেবদেবী বিষয়ক মুখা (২) মানুষের মুখাকৃতি কিন্তু হুবহু সদৃশ পর্যায়ের নয় (৩) সদৃশ পর্যায়ের বা ব্যঙ্গাত্মক পর্যায়ের সঙের মুখা (৪) পশু মুখা (৫) হাস্য, ভয়ানক অথবা নবরসের যে কোন একটির প্রাধান্যযুক্ত মুখা (৬) সাজসজ্জা, রূপারোপ, নাচ ও অভিনয়ের মুখা (৭) আদিবাসী টোটেম বা অন্য সংস্কার সম্পৃক্ত মুখা বিশেষ বিশেষ পরিবারের পক্ষে শুভঙ্কর মুখা (৮) মৃত জীবজন্তুর আসল মাথা বা তার নকল দিয়ে তৈরি যাত্রামঙ্গল মুখা।

পাত্রচিত্র ঃ রঞ্জিত সরা

কনককান্তি বসু

বাংলার পল্লীজীবনে মধুর পরিবেশ বৈষয়িক উন্নতির সহায়ক না হলেও এ থেকে এমন এক মানসিকতার জন্ম হয়েছে যা ধর্মীয় বা ধর্মনিরপেক্ষ যাবতীয় পরিবেশকে শিল্প-প্রভাবিত তথা শিল্পসুষমামণ্ডিত করে তোলে। আজকের ফ্রেমে-বাঁধানো ছবির যখন জন্ম হয়নি তখনো ঘরে ঝোলানোর জন্য কোন না কোন চিত্রসামগ্রীর অস্তিত্ব ছিল এবং সেকালের দেবদেবীর ভক্তরা বা নেহাৎই শিল্পপ্রেমীরা তা ঘরে ঝুলিয়ে আনন্দ পেতেন। দেবদেবীর চিত্রসম্বলিত পোড়ামাটির রঞ্জিত সরা যুগ যুগ ধরে তৈরী হয়ে আসছে এবং আজও সাংস্কৃতিক উৎসবের মণ্ডপ থেকে দেবালয়, পর্ণকুটির থেকে বিত্তশালীর প্রাসাদে তা সাদরে ও সগৌরবে শোভিত।

গোলাকার পাত্রে ছবি আঁকা বা ঠোকাইয়ের কাজ ধাতু, পাথর, কাঠ এবং পোড়ামাটির ওপর কারুকর্ম অতি প্রাচীনকাল থেকে ভারতসমেত পৃথিবীর আরো কয়েকটি দেশে চলে আসছে। প্রমাণ-স্বরূপ কোন প্রাচীন সরাচিত্র এখন উপস্থিত করা না গেলেও শীলমোহর বা মুদ্রার লিখনশৈলী পরোক্ষভাবে ঐ সত্যের সাক্ষী। পূজার থালার ঠোকাইকাজ, মূল্যবান্ ধাতুনির্মিত গোলাকার ঢাল এবং বর্মের শিল্পকাজ, তাঞ্জোরী থালা ইত্যাদি সমবেত ও পৃথক পৃথক ভাবে প্রমাণ করে যে গোলাকার আধারে চিত্রলেখা ঐতিহ্যের ধারা বেয়ে আজও চলেছে।

বোস্টনের সংগ্রহশালায় খ্রিস্টের জন্মের কয়েক সহস্র আগেকার এক চিত্রিত পোর্সেলিনের সরা রয়েছে। প্রায় আট ইঞ্চি ব্যাসের এই গোলীয় পাত্রটি আফ্রিকান মোটিফ, জ্যামিতিক ঢেউতোলা রেখা এবং বিমূর্ত জলপ্রাণীর বহিঃরেখায় সমৃদ্ধ। এটির আলোকচিত্র দেখামাত্র আমাদের রঞ্জিত সরা স্মরণে আসে. আলেপ্পো সংগ্রহশালায় সিরিয়ার এক প্রাচীন (খ্রীষ্টপূর্ব ১৪ শতক) সোনার সরা রয়েছে। এটির চিত্রবিন্যাস থেকে ঠোকাইয়ের দক্ষতা আমাদের সরাচিত্রের সংগে অবশ্যই তুলনীয়। উদাহরণ বাড়ালে পৃথিবীর নানা সংগ্রহশালায় এই ধরণের দেওয়ালে ঝোলানো গোলাকার পাত্রচিত্রের সংখ্যা শতাধিক হয়ে যায়। ভারতের গোলাকার পাত্রচিত্রের নমুনা আমরা হরপ্পায় পেয়েছি, পাঞ্চমার্ক ও কপার কাষ্ট মুদ্রায়, মৌর্যযুগের পাথর খোদাইয়ে, শুঙ্গ, কুষাণ, গুপ্ত, পাল-সেন যুগের ভাস্কর্যে, পাঠান ও মুঘলদের দৈনন্দিন ব্যবহারের সামগ্রী থেকে অলঙ্করণে। অর্থাৎ মেডালিয়ানের ধারার সঙ্গে আমাদের আজকের ধর্মীয় পাত্রচিত্র সরা আকৃতিগত দিক থেকে এবং কখনো কখনো চিত্রবিন্যাস-শৈলীতে এক ও অভিন্ন। ভারহুত, অমরাবতী এবং সাঁচীর স্তূপে অগণিত পাথরের পাত্রচিত্র রয়েছে যার সঙ্গে আমাদের সরার লিখনধর্মের অমিলের চাইতে মিল বেশী। এমন কি সরার যে পিঠে চিত্রণকাজ করা হয় ঠিক সেই রকম উঁচু অংশে পাথর ও ধাতুতে পাত্রচিত্র ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভগ্নস্তূপ থেকে পাওয়া গেছে।

তবে কি চিত্রিত সরার ব্যাপারে বাংলার বৈশিষ্ট্য কিছুই ফুটে উঠেনি? এই প্রশ্নটির সামনে হাজির হতে গেলে বাঙালীর চিত্রণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা একটু ঝালাই করে নিতে হয়। একথা

প্রায় সর্বজনবিদিত যে আবহাওয়াও অন্যবিধ নানা কারণে বাংলার আদি চিত্রকলার প্রায় বিলুপ্ত। দশম শতাব্দীর আগেকার কোন অঙ্কিত চিত্রনমুনা আজ আর আমরা উপস্থিত করতে পারছি না। কিন্তু গুপ্ত-কুষাণ, আদি-মধ্য ও অন্তঃপর্বের শুভ্র কলাকর্মের নমুনাস্বরূপ যে ভাস্কর্যের সম্ভার আমরা দেখতে পাই তা থেকে তৎকালীন বাঙালী শিল্পমনের সম্পর্কে ধারণা আপনা থেকে জন্ম নেয়। বাংলার চিত্রণ বৈশিষ্ট্যের সাক্ষী এইসব ভাস্কর্য ও আভরণ থেকে একটু গভীর পর্যবেক্ষণে বেরিয়ে আসে সেই রজতস্পর্শ বহিঃরেখা যা যুগ যুগ ধরে বাংলার শিল্পকর্মকে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর করে তুলেছে। বাঙালী শিল্পীর এই বিদ্যুৎগতি বহিঃরেখা একদিনে দেখা দেয়নি, মহাকালের পায়ের ছন্দে ও শিল্পরসিকের সপ্রশংস উৎসাহে এবং সর্বোপরি ভোক্তা তথা ক্রেতাসাধারণের পৃষ্ঠপোষকতায় এই রেখাসম্বল চিত্রণরীতি লালিত হয়েছে। আমাদের আলোচ্য পাত্রচিত্র রঞ্জিত সরা বাঙালী শিল্পীর দীর্ঘকালের সাধনালব্ধ ঐ বহিঃরেখার প্রয়োগে নিঃসন্দেহে বিশিষ্ট এবং সম্ভবত দ্বিতীয় রহিত। পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যবাদের স্বীকৃত দেবদেবী আমাদের সরার চিত্রবিষয় হলেও লিখনধর্মে এবং দরিদ্র লোকসমাজের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকার ফলে এটি সর্বতোভাবে লোকশিল্পের নমুনা হয়েই দাঁড়িয়েছে। আর একটি ব্যাপার এই সূত্রে নজরে আসে যে পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় পূর্ববঙ্গে চিত্রিত সরার প্রচলন বেশী। আজও শহর বা গ্রামাঞ্চলে সরার উৎপাদক ও ক্রেতার ভূমিকায় পূর্ববঙ্গবাসী সংখ্যাগরিষ্ঠ।

তবু পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সর্বত্র সরা লেখা হয়। কখনো ভবিষ্যতে মেলা বা পালপার্বণে বিক্রয় হবার আশায় আবার কখনো বা বাবুদের হুকুম অনুযায়ী। চব্বিশ পরগণার ফতেপুর ও খাঁকড়াপুলিতে, হুগলীর ত্রিবেণীর কাছে এবং কাঞ্চনগরের উদ্বাস্তু পল্লীতে, বীরভূমের আবাডাঙ্গায়, মেদিনীপুরের আকুবপুর, নানকারচক, হরিচক, দাসপুর ঘেঁসা অঞ্চলে, কলকাতার কাছাকাছি প্রায় সবগুলি উদ্বাস্তু পল্লীতে বিশেষ করে উল্টোডাঙ্গা দাসপাড়ায় এখনো পাত্রচিত্র রঞ্জিত সরা উৎপন্ন হয়। সরার শিল্পীরা সকলেই যে পটুয়া, কুম্ভকার বা সূত্রধর এমন নয়। সাধারণ নিম্নবিত্ত সংসারে অন্যান্য উপজীবিকার সঙ্গে সরাচিত্রণের কাজও করা হয় এমন উদাহরণ অসংখ্য আছে। সাক্ষাৎকার সূত্রে এঁরা বলেছেন, মাটির প্রতিমার মূল্য বেশী বলে লোকে সরা দিয়ে পুজো সারে। কিন্তু ক্রেতাদের জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বলেন, আবহমান কাল সরা দিয়ে পুজো হয়ে আসছে কাজেই এখনও লক্ষ্মী আসবেন সরাতে। এই সূত্রে ভারহুতের গজলক্ষ্মীর মূর্তি সম্বলিত পাথরের সরার কথা স্মরণে আসছে। ঐ গজলক্ষ্মী যেন তাঁর সমস্ত পারিষদ নিয়ে, একই চিত্রবিন্যাস নিয়ে আজো আসর জাঁকিয়ে বসে আছেন। দেবী দুর্গা এবং তাঁর পরিবারের কোন কোন সদস্য-সদস্যা যেমন সরার চিত্রবিষয় হয়েছে, তেমনি বৈষ্ণবের পরম আরাধ্য রাধাকৃষ্ণ যুগল মূর্তিতে সপারিষদ সরায় দেখা দিয়েছে। সরা তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে শাক্ত-বৈষ্ণবের মিলন ক্ষেত্র। তাছাড়া সর্বভারতীয় অন্যান্য পৌরাণিক দেবদেবী এমনকি ইন্দ্রাণী-ব্রহ্মাণী পর্যন্ত সরায় চিত্রিত হয়েছেন। মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণাংশে, কৃষ্ণনগরের ঘূর্ণিতে এবং কলকাতার কুমারটুলিতে চালচিত্রের ভাব ও ভাষা সরাসরি রঞ্জিত সরায় এসে গেছে। কৈলাসের দেবাদিদেব মহাদেব তাঁর নন্দী-ভৃঙ্গী ও অলৌকিক ঐশ্বর্য নিয়ে এখানে এসেছেন, এসেছে কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা শ্রীবৃন্দাবন, ভক্তসহ এসেছেন শ্রীরামচন্দ্র এবং একে একে আমাদের দশজন অবতার। বিভিন্ন অভিজাত দেবদেবী সরার চিত্রবিষয় হওয়া সত্বেও কাঞ্চনগরের কারিগর শ্রীকুমুদ দাস এক সাক্ষাৎকারে বলেন,

'আমরা চিরকাল কই লক্ষীসরা বা লক্ষীপট। আমাগো নিজেগো কথা হইল নয় মূর্তি, সাত মূর্তি, পাঁচ মূর্তি আর কখন কখন তিন মূর্তি।' সরার কারিগররা অঙ্কিত সরার মূর্তি সংখ্যা গুণে অনুসারে সাত পাঁচ ইত্যাদি নামে সরার পরিচয় দেয়। কুমুদবাবুকে নয়, সাত, পাঁচ, তিন ইত্যাদির তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করায় তিনি কোন সদুত্তর দেন নি। বলেছেন, 'আমাগো জোড় মূর্তি করা নিষেধ, বিজোড় করতেই হয়।' লোকসমাজে সংখ্যার সংস্কারে বিজোড় সংখ্যা আদরণীয় হতেই পারে। কিন্তু সরার চিত্রবিষয় তো লৌকিক দেবদেবী নয়, তাহলে? মনে হয় বিজোড় সংখ্যা আদিতেও বেছে নেওয়া হয়েছিল চিত্রের কেন্দ্রীয় চরিত্রের প্রয়োজনে।

বাংলার লৌকিক ধর্মাচরণের অনেকটা স্থান অধিকার করে আছে মেয়েলি ব্রত এবং এই ব্রতের কৃত্যের মধ্যে লুকিয়ে আছে অনেকগুলি সনাতন আচার, বিশ্বাস ও সংস্কার। মেয়েলি ব্রতের হাতে পড়ে বৈদিক ও পৌরাণিক বেশ কিছু দেবদেবী যেমন লৌকিক স্তরে নেমে আসতে বাধ্য হয়েছেন তেমনি অনেক লৌকিক দেবদেবী জনপ্রিয়তার কারণে অভিজাত-ধর্মে উন্নীত ও গৃহীত হয়েছেন। যেমন ষষ্ঠী কিংবা চণ্ডী বা মনসা দেবী। এঁদের লৌকিক পরিচয় আজ আর সহজে ধরা পড়ছে না, গভীর এষণার সাহায্যে তা খুঁজে বার করতে হচ্ছে। অনুমিত হয় সওদাগর স্বামীর বাণিজ্যের সাফল্যের কামনায় সপ্তাহের একটি দিন পতিপ্রাণা নারী শ্রী ও ঐশ্বর্যের দেবীর কাছে যে প্রার্থনা করতেন তারই প্রয়োজনে ঘরে ঝোলানো লক্ষ্মী সরার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া ভাদুলক্ষ্মী, কোজাগরী, কেতোলক্ষ্মী, ক্ষেত্রলক্ষ্মী, পোষলক্ষ্মী এবং চোতে-লক্ষ্মীর পূজানুষ্ঠানে এই সরার প্রয়োজন হয়। ব্রতের আলপনার ধানছড়াই থেকে সরলীকৃত জলরেখা, গহনা-নৌকো সব কিছু তাই এসে সরার হাজির হয়েছে।

বাংলাসরার চিত্রণধর্মে রুক্ষতার সঙ্গে হরগৌরী মিলন হয়েছে বিন্যাস কৌশলের। এই বিন্যাসকৌশলে দৃষ্টিক্ষেপের দূরত্ব, উচ্চতা এমনকি পার্শ্ব-দৃষ্টি পর্যন্ত মূল চিত্রণের কোন প্রেক্ষা-বিপর্যয় ঘটায় না। অঙ্কিত সরার এই মৌলিক গুণ সুনিশ্চিত দীর্ঘকালের সাধনার গড়ে উঠেছে। সরার ওপরে চিত্রণ না করে বা রিলিফের যে নমুনা দেখা যায় সেগুলি সম্ভবতঃ মন্দির মসজিদের প্রস্ফুটিত পদ্ম বা লতা-পাতার কেয়ারী থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলার লোকশিল্পে এই ধরণের অধিগ্রহণ সর্বস্তরে ঘটেছে এবং ঘটছে। বিন্যাসের ক্ষেত্রে শুঙ্গ কুষাণের বেতালিয়ান থেকে যাবতীয় গোলীয় নক্সা ও চিত্রবিন্যাস প্রভাবিত হয়েছে। এই প্রভাব শুধু যে সরার ক্ষেত্রে এসেছে তা নয়, সবচেয়ে বেশী করে এসেছে অলঙ্কার ও আভরণের ক্ষেত্রে। ভারহুতের প্রস্ফুটিত পদ্ম, পদ্মবনে মত্তহাতি, গোটমালার কেন্দ্র পদ্ম, যৌবদ্ধনে পদ্ম; সাঁচীর পদ্মকোরকের কেন্দ্র শতদল পদ্ম; পদ্মসহ পূর্ণ ঘট, নৃত্যরত ময়ূর, শ্রীবৎসচিহ্নাঙ্কিতপূর্ণ ঘট, দীর্ঘ দণ্ডযুক্ত পদ্ম, পদ্মবনে নাগ, হংসযূথ, তালপত্রের অলঙ্করণে পদ্ম, পদ্ম ও ত্রিরত্ন। কাকালি টিলা ও মথুরার মীনপুচ্ছ হাতি, ষাঁড়, সেকোকালের লতার নক্সা এইভাবে তালিকা বাড়ালে শতাধিক খাঁটি ভারতীয় বিন্যাস ও মোটিফ পাওয়া যাবে যা অন্ততঃ দুহাজার বছর ধরে আমাদের যাবতীয় শিল্প ও কারুকর্মকে প্রভাবান্বিত করে আসছে। আমাদের বাংলার সরা এই আন্তর প্রভাব থেকে মোটেও মুক্ত নয় বরং সেইসঙ্গে অধিগ্রহণ ঘটেছে বেশকিছু একেবারে বাইরের সামগ্রীর তবে সরাসরি নয় হাতবদলের মাধ্যমে।

১৩৩৩ সালে স্বর্গীয় গুরুসদয় দত্ত মহাশয় রঙিন সরার দিকে শিল্পরসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছেন। উনি অনুরাগে গ্রামবাংলার প্রচলিত সরার কথা তখন বলেছিলেন। গ্রামবাংলার ঐ সরার চারটি সুস্পষ্ট রীতি লক্ষ্য করা যায়, ও (১) ঢাকাই (২) ফরিদপুরী (৩) আচার্যী (৪) সুরেশ্বরী। ঢাকাই সরা রুচিবোধের আদর্শ উদাহরণ হয়ে আছে। ফরিদপুরী কৌমি সরা (বিভাগপূর্ব) কালীঘাটের শেষপর্বে ব্যবহৃত মুক্তাফল কাজ দিয়ে আজও সর্বোচ্চদরে বিক্রয় হয়। আচার্যী কলমের লেখা প্রায় উঠে যেতে বসেছে।

নিশি আচার্য যাঁর লেখার খ্যাতি একদা সমগ্র উত্তরবঙ্গ জুড়ে ছিল তিনি ১৩৫০ সালে কলকাতায় আসেন এবং কমিশনে তিরাত্তর বৎসর বয়সে মিস্ত্রির দোকানে কারিগরের কাজ করেন। অবসর সময়ে শখাবশতঃ গোটা পঞ্চাশেক সরা লেখেন কিন্তু ফরিদপুরী কৌমি সরার তুলনায় কোন দাম পায় না। সুরেশ্বরী সরার বৈশিষ্ট্য ছিল মুক্তাফলের জাঁকজমকে। গাঢ় রঙে লেখার ওপর সাদা বিন্দু প্রয়োগের নাম মুক্তাফল। এককালে কালীঘাটের চৌকস এই মুক্তাফল দিয়ে অসাধারণ সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছিল। মেদিনীপুরের গ্রাম চিত্রকরের হরিশচন্দ্র পটে এই মুক্তাফলের সুন্দর প্রয়োগ লক্ষ্য করা গেছে।

গ্রামবাংলার ঐ সরার পাশে পাশে আরেকটি তীব্রগতির পরিচ্ছন্ন শৈলী শান্তিপুর-কৃষ্ণনগর এবং কুমারটুলীকে কেন্দ্র করে চালু হয়। এই শৈলী পরবর্তীকালে নাগর প্রভাবে পড়ে প্রায় শেষ হতে চললেও বেশ কিছু গুণী শিল্পী এই গুরুকুলীন বাংলা কলমে কাজের নমুনা রেখে গেছেন। কুমারটুলীর কমলা পাল, হরি পাল, এ্যালবার্ট হরি, লোহারাম, অন্নদা পাল, প্রিয়লাল এবং কাঙালী পাল অসংখ্য সরা লিখে গেছেন যা বহু বিত্তশালীর ঘরে অতি আদরের শিল্পসামগ্রী ছিল। কুমারটুলীতে এখন সরা লেখার লোক খুবই কম। খ্যাতিমান সরাশিল্পী ছিলেন যতীন পাল। গত কয়েকবৎসর ধরে তিনি পক্ষাঘাত রোগে ভুগছেন। শ্যামপাল এবং নিতাই কোনরকমে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। মহেশ পাল মোটামুটি বাজার রেখে চলেছেন। কিন্তু একসময়ে বাঙালী ঢঙের লেখায় তিনি যথেষ্ট খ্যাতি পেয়েছিলেন সেই নরেন পাল এখন প্রতিমার ব্যবসায়ে থাকলেও সরা লেখেন না। নরেনবাবুকে প্রশ্ন করেছিলাম, 'আপনার বয়েস এমন কিছু নয়, হাত কাঁপে না তবু সরা লেখা বন্ধ করলেন কেন?' হাসতে হাসতে নরেনবাবু বললেন, 'সরা লিখলে ঘরে বাসন উঠবে না ভাই'। নরেনবাবু নিজে শুধু নন তাঁর ভাই মুরারী পালও সরা লেখা বন্ধ করে দিয়েছেন। কৃষ্ণনগরের অবস্থা এমন কিছু ভালো নয়; তবে আশার কথা, হারু পালের মতো নতুন ছেলে দুয়েকটি এই লেখার কাজে আসছে। শান্তিপুরের সরার পাট চুকে গেছে। কৃষ্ণনগর সারা বাংলার বাজার ভরাচ্ছে হারেন পাল, ষষ্ঠী পাল, ধর্মদাস পাল এবং হারুর কাজ দিয়ে।

বাংলার অধিকাংশ লোকশিল্প যা একসময়ে জীবন্ত ছিল আজ তার সেই জোয়ার নেই। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছুরই পরিবর্তন হয়েছে। তবে ধর্মনির্ভরতা যে শিল্পের অবলম্বন সেখানে কিন্তু যুগের ঠাণ্ডা হাওয়াটি এগিয়ে আসতে পারেনি। বাংলার রঙিন সরা মূলতঃ পূজার সামগ্রী হিসাবে, আজও লোকে পূজা উপলক্ষে সরা কেনে এবং পূজার পরে তা ঘরে টাঙায়।

চিত্রোপম হস্তলিপি

মঞ্জুলা সরকার

ভারতবর্ষে কোন্ সময়ে লিখন-পদ্ধতির সূত্রপাত হয়েছিল সঠিক বলা যায় না। হরপ্পা আর মহেঞ্জোদারোর পুনরুদ্ধারের আগে পণ্ডিত সমাজের ধারণা ছিল ভারতের ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী লিপি পশ্চিম এশিয়ার কোন বিশিষ্ট লিপি থেকে উদ্ভূত এবং সম্রাট অশোকের কিছু আগে থেকেই ঐ লিপিগুলি এদেশে প্রচলিত হয়েছিল। কিন্তু সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গে পরিচয়ের পরে প্রমাণিত হল ভারতীয় লিখনশৈলীর ঐতিহ্য বহু প্রাচীন।

প্রত্যেক হরফের মধ্যে যে একেকটি চিত্ররূপ সংহত হয়ে আছে, এই সত্য প্রমাণ করেছে মধ্যপ্রাচ্য, চীন, জাপান, তিব্বত প্রভৃতি দেশের চিত্রানুগ বর্ণলিপি। পারস্য, চীন আর জাপানে তুলি দিয়ে অক্ষর আঁকা হত। ভারতবর্ষে কিন্তু ঠিক তার উল্টো, এখানে ছবি আঁকা হত কলম দিয়ে। তাই 'চিত্র অঙ্কন বলা হত না, বলা হত 'চিত্র লেখা' বা 'পট লিখন'। কলমের মুখে সৃষ্টি বলে ছবির নাম হল 'আলেখ্য'। কলম দিয়ে আঁকার দরুণ আমাদের দেশের সর্বত্রই ছবি হল রেখা প্রধান, যার জলন্ত প্রমাণ—বাংলার পট বিশেষতঃ কালীঘাট পট।

জাপান, চীন কিম্বা পারস্যে তুলি দিয়ে হরফ আঁকার ফলে সেখানকার চিত্রশিল্পীদের আঁকার রীতি-নীতি, হাতে তুলি ধরার কৌশল প্রথম থেকেই ভারতীয় শিল্পীদের থেকে আলাদা ছিল। তাই পারসিক হস্তলিপির বৈশিষ্ট্য ইরাণী কলমের মধ্যে দিয়ে মুঘল চিত্রকে স্পর্শ করার ফলে মুঘল মিনিয়েচার পেন্টিং ভারতীয় ক্ষুদ্রকার চিত্রের থেকে চিরকাল স্বতন্ত্র হয়ে রইল।

বিভিন্ন রকমের লিপিকৌশল সম্পর্কে প্রাচীন ভারত যথেষ্ট সচেতন ছিল, তাই চিত্রের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে চিত্রলিপি আর মুদ্রার উপাদানের সঙ্গে সমতা রেখে মুদ্রালিপির উদ্ভব ঘটেছিল ভারতেরই মাটিতে। মৎস্যপুরাণ, গরুড়পুরাণ প্রভৃতি হিন্দুধর্মগ্রন্থে আদর্শলিপি রচনা সম্পর্কে বিধান দেওয়া আছে।

লেখা পদ্ধতি নামে একটি প্রাচীন নিবন্ধের 'সমরূপ পদ্ধতি' নামক অংশে অক্ষর বিন্যাস সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, হরফগুলি পরস্পরের সঙ্গে সমতা রেখে সম আয়তন ও সমান মাত্রাবিশিষ্ট হবে। আর আকৃতিতে হবে বর্তুল। সুডোল চাঁদের মোটা রেখার টানে লিখিত হবে অক্ষরমালা। খরোষ্ঠী আর ব্রাহ্মীলিপি থেকে উদ্ভূত নানা লিপিতে রচিত হিন্দু রাজত্বকালীন বহু অনুশাসনলিপি, দানপত্র, মূল্যবান দলিল এবং বিবিধ বিষয়ের পাণ্ডুলিপি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পাওয়া গেছে। কলকাতার ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে আছে ষষ্ঠ শতাব্দীর গুপ্ত ব্রাহ্মীলিপির খণ্ডাংশ, পালপূর্বযুগের কাগজের ওপর লিপি লিখনের নিদর্শন, সপ্তদশ শতাব্দীর নেওয়ারীলিপিতে লিখিত পঞ্চরক্ষা বৌদ্ধতন্ত্র পুঁথি, নাগরী হরফে লেখা সচিত্র ভাগবত। এগুলি ব্যতীত মধ্যযুগের একাধিক লিপিকারের হস্তলিপির নমুনা এই মিউজিয়ামের বিশেষ সম্পদ।

রাজস্থানের রাগমালা চিত্রগুলিতে হাতে লেখা চমৎকার দেবনাগরী লিপি ছবির সঙ্গে সমান

গুরুত্ব পেয়েছে। মানুষ, পশু, পাখীর আকৃতি অথবা জ্যামিতিক নক্সার সঙ্গে সুন্দরভাবে মানিয়ে নিয়ে লিপি অংশবিন্যস্ত। বাংলার কোন কোন পটের সঙ্গেও হস্তলিখন যুক্ত হয়েছিল, উদাহরণ হিসেবে, পূর্ববঙ্গের মুনসের জমিদার পরিবারকে কেন্দ্র করে আঁকা পটগুলি উল্লেখযোগ্য। বনপকথ্যায়ের একটি পুরাতন পুঁথিও প্রমাণ করে একসময়ে বঙ্গদেশে হস্তলিখন এবং বর্ণাঢ্য চিত্র পরস্পরের কি নিবিড় সহযোগী ছিল।

বাংলা, উড়িষ্যা ও দক্ষিণভারতে তালপাতার পুঁথির প্রচলন বেশী ছিল, কারণ ঐ সব অঞ্চলে তালপাতা সহজলভ্য। তালপাতায় সাধারণ কালি-কলম দিয়ে লেখা যায়না। তাই সরু আর লম্বা করে কাটা কাঁচা তালপাতার নরম বুকে সরু অথচ গোলালো মুখ লৌহ শলাকার চাপে লিপিকার হরফ ফুটিয়ে তুলতেন। তারপর কাঠকয়লার মিহি চূর্ণ পৃষ্ঠার ওপরে বুলিয়ে দিলেই গভীর অংশগুলিতে কালো গুঁড়ো ঢুকে হরফগুলিকে স্পষ্ট করে তুলত। শলাকা দিয়ে কৌণিক এবং সরল রেখাই অঙ্কন করলে পাতা ছিঁড়ে যাবে তাই বৃত্তাকারে রেখা টানা হত। বোধহয় সেজন্যই বাংলা, ওড়িয়া এবং দক্ষিণভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে বিশেষ করে তামিল হরফগুলিতে কোণালো রেখার বদলে গোলালো গড়নের দিকে প্রবণতা বেশী দেখা দিয়েছিল। ওড়িয়া ও তেলেগু হরফের মধ্যে গঠনকৌশলগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। দক্ষিণভারতের সঙ্গে উড়িষ্যার বরাবরই গভীর যোগ ছিল। তার একটি কারণ উড়িষ্যা একসময়ে বিজয়নগর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। অপরদিকে গুজরাটী চিত্রনীতির অনেক রীতি-পদ্ধতি বাণিজ্যের পথ বেয়ে বিজয়নগরে এসেছিল। সুতরাং বিজয়নগরের মাধ্যমে গুজরাটি লিপিকলা বা ক্যালিগ্রাফিক গুণ ওড়িয়া লিপিকে স্পর্শ করাও বিচিত্র নয়।

ব্রাহ্মী বা দেবনাগরীর মত প্রাচীন অক্ষরমালা এবং ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার হরফ আকৃতিতে পরস্পরের থেকে পৃথক হলেও লিখনের ক্ষেত্রে কিন্তু সর্বত্রই প্রায় একই ধারা অনুসরণ করেছে। প্রতি ক্ষেত্রেই ঘন সন্নিবিষ্ট একাধিক পংক্তিতে অক্ষরগুলি বাম থেকে দক্ষিণে খুব কাছাকাছি সাজানো। কাগজ বা ঐ জাতীয় বস্তুর ওপর লেখার জন্য সর্বত্রই কৃষ্ণবর্ণ মসী ব্যবহৃত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, বাংলার গ্রামাঞ্চলে হীরাকষ গাছের পাতার রস থেকে ঘন কালো কালি তৈরীর রেওয়াজ আজও আছে। লোকসমাজে প্রচলিত এই রীতি খুব প্রাচীন হওয়াই সম্ভব। বাঁকুড়া, বীরভূম, সাঁওতাল পরগণা, বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর হীরাকষ গাছ জন্মায়। এই গাছের পাতা দেখতে অনেকটা তেঁতুল পাতার মত।

সামগ্রিক বিচারে ভারতীয় লিখনশৈলী চিরকালই সুসামঞ্জস্যপূর্ণ, স্পষ্ট এবং পরিচ্ছন্ন। কিন্তু মুঘলযুগের আগে ভারতবর্ষে, হস্তলিপিতে প্রয়োজনাতিরিক্ত সৌন্দর্য ও মাধুর্য আরোপের সচেতন প্রয়াস সম্ভবত হয়নি। মুঘল আমলে বিশেষ করে আকবর শাহের পৃষ্ঠপোষণায় হস্তলিপি প্রথম সারির শিল্পরূপে চিহ্নিত হয় এবং অসাধারণ উৎকর্ষতা লাভ করে। কিন্তু মুঘল যুগের এই ব্যাপক লিপিচর্চা বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার অক্ষরমালাকে বিশেষ স্পর্শ করেনি।

মুঘল মিনিয়েচার চিত্রে বিশেষ করে ছবির ফ্রেমিং অর্থাৎ পাড়ের কাজে যে লিখনশিল্প নিজের সৌন্দর্যের জোরে প্রাধান্য পেয়েছিল, তার ইতিহাস বড় বিচিত্র। ইসলামধর্মে প্রতিকৃতি আঁকা নিষিদ্ধ হবার ফলে, শিল্পীরা নিজেদের প্রতিভা বিকাশের পথ খুঁজে নিয়েছিলেন 'ক্যালিগ্রাফি' অর্থাৎ

হস্তলিপির মধ্যে। সম্ভবত পবিত্র কোরাণ লিখিত হবার মুহূর্ত থেকেই হস্তলিপিচর্চা শুরু হয়েছিল। মুঘল শাসিত হিন্দুস্থানে অনুশীলিত লিপিশিল্পের মূল নিহিত রয়েছে আরব ও পারস্যের মাটিতে। আরবে লেখনীশিল্পের সূচনা হয়, আর তার পুষ্টি ও সমৃদ্ধি ঘটে পারসিক শিল্পীগোষ্ঠীর হাতে।

উদার তির্যক রেখাবহুল আরবী লিখনভঙ্গি নিজেই অপূর্ব সুন্দর নক্সার মত। আরবী ক্যালিগ্রাফির স্রষ্টারূপে খ্যাত হলেন শিল্পী আলরাতানি। ইনি খলিফা আবদুল্লা আল মামুন-এর সমসাময়িক (৮১৩-৮৩৩ খৃষ্টাব্দ) শিল্পী। এঁর লিখনভঙ্গি 'খটট্ রয়হানি' নামে পরিচিত। আরবী লিপির সৌন্দর্য এত প্রসিদ্ধ ছিল যে মার্সিয়ার খৃষ্টান রাজা অফ্‌ফা তাঁর স্বর্ণ মুদ্রায় কুফিক্ লিপি খোদাই করান। ঐ রকম কিছু মুদ্রা ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আছে। ইউরোপের বহু আলঙ্কারিক নক্সাই আরবীলিপিভঙ্গি থেকে কর্জ করা বলে মনে হয়।

আইন-ই আকবরীর লিপি ও চিত্রশিল্প নামে ৩৪তম অধ্যায়ে আট রকম লিপির উল্লেখ করেছেন আবুলফজল। এগুলি ইরাণে (পারস্যে), তুরস্কে এবং ষোড়শ শতকে ভারতে খুব আদৃত হয়েছিল। আরবী হরফের এই লিপিকৌশলগুলির নাম হল যথাক্রমে সুল্‌স, রিকা, তৌকি, মুবার মুহাক্কিক, রায়হান্, নাসখ এবং তালিক্। তুলনামূলকভাবে স্বল্পখ্যাত কয়েকরকম লিখনশৈলী হল জুলেক্-ই-উরুস, মনশূর, বাহার ও হিলালি। গুলজার, মাহি, তাউস, শার্জা এবং জুমুরা এগুলি হল ইসলামিক হস্তলিপির কতকগুলি বিশেষ আলঙ্কারিক নক্সা। আবার পৃথক পৃথক লিখনশৈলীও বলা চলে।

মুখ্য লিপিকৌশল হিসাবে কুফিক্, নাসখ, (মাঘরিবি ও আন্দালুসি), নাস্তালিক ও শিকাস্তা— এই চারটি নাম উল্লেখযোগ্য। সাধারণতঃ কুফিক্ ও নাসখ্ আরবীতে আর নাস্তালিক ও শিকাস্তা পারসিক ভাষায় ব্যবহৃত হত। কুফিক্‌রূপে লেখা পাঁচশো বছরের পুরাতন কোরাণ পাওয়া গেছে। কলকাতার ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে ১০৩৫ খ্রীষ্টাব্দেতে পাথরে খোদিত কুফিক্‌লিপির নমুনা আছে। কিব্বওয়াতুল ইসলাম মসজিদে, কুতুবমিনারে, মুহম্মদ ঘোরির সমাধিতে, সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুতমিসের সমাধি সৌধের দেওয়ালে, আজমীঢ়ের আড়াই-দিনকা ঝোপড়ার পশ্চিম দেওয়ালে উৎকৃষ্ট কুফিক্ লিপি দেখতে পাওয়া যায়। আকবরী মোহরে, সেকেন্দ্রায় আকবরের সমাধি সৌধে, ফতেপুরসিক্রিতে, জামা মসজিদে এবং মিরহাবে রয়েছে ঘন নীলরঙের ওপর সোনালী অক্ষরে নাসখ্ লিপিতে লেখা কোরাণের অংশবিশেষ।

হরফের রেখাটানার নানা রকম ফেরে পৃথক পৃথক রীতির উৎপত্তি হয়েছিল। লিপিগুলির পরস্পরের মধ্যে যে পার্থক্য, তা মূলতঃ রেখার সরলতা ও বক্রতার পরিমাণের ওপর নির্ভরশীল। কুফিক্ লিপিতে অধিকাংশ অক্ষরের রেখা সোজা তীরের মত তীক্ষ্ণ এবং তীর্যক। মাকোয়ালি হরফগুলিতে বাঁকানো ঘোরানো রেখা নেই বললেই চলে। সুল্‌স এবং নাসখ্ প্রত্যেকটিতে হরফগুলি তিনভাগের একভাগ বাঁকারেখা আর দুই-তৃতীয়াংশ সরলরেখা বহুল। সুল্‌স লিপিকে 'জালি' নামেও অভিহিত করা হয়, যার অর্থ স্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন ও বলিষ্ঠ। আর নাসখ্‌কে বলা হয় খাফি অর্থাৎ জটিল এবং সূক্ষ্ম চরিত্রের। তৌকি ও রিকা লিপির মধ্যে প্রথমটি 'জালি' চরিত্রের আর দ্বিতীয়টির তিন-চতুর্থাংশ বক্ররেখা ও এক ভাগ মাত্র সরলরেখা বহুল। রিকোয়া লিপিশৈলীটি 'খাফি' বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

শিকাস্তার বিশেষত্ব, ছেড়ে ছেড়ে লেখা ভাঙা ভাঙা আকৃতির হরফ। যাহাকন্ আর যায়হান প্রধানত সমগোত্রধর্মী হলেও মহাকক্কে 'জালি' এবং রায়হানকে 'খাফি' বলা চলে।

সম্রাট আকবরের অতি প্রিয় নাস্তালিক হরফ চমৎকার সুগোল গড়নের। এই লিপিতে যেন ভারতভূমির কোমলতা ও পেলবতা মিশে আছে। আর কুফিক-এর মধ্যে রয়েছে মরুদেশের প্রচণ্ড রুক্ষতা। নাস্তালিক হরফের প্রাচীনতম নিদর্শন হল ১০১০-১১ খ্রীষ্টাব্দের একটি আরবি বিক্রির দলিল। দলিলখানি ডাঃ হের্জে আবিষ্কার করেন।

ভারতবর্ষে বিশেষ করে মুঘল আমলে লিপিশিল্পীরা ছিলেন অত্যন্ত সম্মানের পাত্র। এঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন ইবন-ই-মুকলাহ্। আইন-ই-আকবরীতে উল্লিখিত আটরকম লিপির মধ্যে ছ'টিই তাঁর সৃষ্টি। সুলতান নাসিরুদ্দিন মুহম্মদশাহ্ (১২৪৬-১২৬৫ খ্রীঃ) নিজে ভাল লিপিবিদ ছিলেন। ইয়াকুত মুস্তাসিমি ছিলেন শ্রেষ্ঠ নাসখ্ লিপিকার। এঁর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন শেষ আব্বাসিদ খলিফ। হায়দ্রাবাদের সালারজঙ্গ মিউজিয়ামে মুস্তাসিমির হস্তাক্ষরে করা লিপি অংশ আছে। জাহিরুদ্দিন মুহম্মদ বাবুর (১৪২৬-১৫৩০ খ্রীঃ) 'খট্-ই-বাবরি' নামে নূতন লিপি সৃষ্টি করেন। কৃতী লিপিবিদ হিসেবে সম্রাট হুমায়ুনের (১৫৩০-১৫৫৬ খ্রীঃ) দরবার অলঙ্কৃত করেছিলেন নাসখ্ ও সুলস্ রীতির শ্রেষ্ঠ লিপিকার খাজা মুহম্মদ, মৌলানা শামসুদ্দিন কাশানি এবং মীর কাশিম। এঁরা ছিলেন পারসিক। আর ছিলেন হুসেন আহম্মদ, ইনি সম্রাটের এক প্রাক্তন দাস।

আবুল ফজল, বদাউনি এবং নিজামুদ্দিনের রচনায় তৎকালীন একাধিক লিপিবিদের নাম উল্লিখিত আছে। এঁদের মধ্যে সেরা ছিলেন মুহম্মদ হুসেন কাশ্মিরী। সম্রাট আকবর এঁকে 'জরিন কলম' খেতাবে ভূষিত করেন। আর ছিলেন হীরাটের খোজা মীর আলি, মৌলানা বাকির, মুহম্মদ আমিন মাশহাদি, আবদুল হাই, মৌলানা দাওরি, নবাব আশারফ খান, ইনায়েৎউল্লা শিরাজী, খোজা আবদুল সামাদ, মৌলানা আলি আহমেদ নিশানি। আবুল ফজল, ফৈজি, উর্ফি এবং বদাউনিও এই শিল্পে যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন।

সম্রাট জাহাঙ্গীর (১৬০৫-১৬২৭ খ্রীঃ) খোজা মীর আলির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর দরবারের অত্যন্ত নিপুণ লিপিকারদের মধ্যে আবদুল রহিম খান-ই-খানান ও মুল্লা মহম্মদ আমিন অন্যতম। গুণজ্ঞ লিপিবিদ সম্রাট শাজাহানের সময়ে (১৬২৭-১৬৫৮) খ্রীঃ মীর ইমাদ আলি হুসেনী ছিলেন সেরা নাস্তালিক লিখিয়ে। আকা আবদুল রশিদ, হাফিজ নুরউল্লাহ্, মুহম্মদ মুকিম, সৈয়দ আলি তাব্রিজি ও আবদুল বাকি প্রমুখেরা লিপি রচনায় অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দেন।

ঔরঙ্গজেবের রাজত্বে অন্যান্য সব সুকুমার শিল্প ধ্বংসোন্মুখ হলেও রক্ষা পেয়েছিল শুধু লিপিশিল্প। স্বয়ং সম্রাটের লিপিশিক্ষক ছিলেন মুহম্মদ আরিফ। আশরফ খান, কাজী ইসমাতুল্লাহ্, হাজি ইলাহি, নুরউদ্দিন এঁরাও ছিলেন সম্রাটের প্রিয় লিপিকার। ঔরঙ্গজেবের পরেও কিছুকাল অবধি লিপিচর্চা হয়েছিল। মুহম্মদ শাহের দরবারে (১৭১৯-১৭৪৮ খ্রীঃ) মুর্তিজখান্ ছিলেন নিপুণ শিকাস্তা লিপিবিদ। আর ছিলেন মুহম্মদ আফজল। পরবর্তী মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর (১৮৩৭-১৮৫৮ খ্রীঃ) নাসখ্ লিখনে অদ্বিতীয় ছিলেন। দিল্লী মিউজিয়ামে বাহাদুর শার লিখিত নাসখ্ ও তুঘরাশৈলীর নমুনা আছে। মুঘল সাম্রাজ্যের অবসানের পর লিপিশিল্পের উল্লেখযোগ্য পৃষ্ঠপোষক ছিলেন হায়দ্রাবাদের নিজাম।

বাংলায় পাওয়া চিত্র সম্বলিত হাতে লেখা পুঁথির ক্ষেত্রে লিপি বিন্যাসের উপর লেখকেরা যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করতেন বলে সহজেই অনুমান করা যায়। পাল আমলের যে সব পুঁথি পাওয়া গেছে, সেই সব পুঁথিতে ব্যবহৃত লিপিমালার সঙ্গে সমসাময়িক তাম্রফলকে উৎকীর্ণ লিপির সাদৃশ্য লক্ষণীয়। নেপালের রাজা সিদ্ধদেবের আমলের কাগজে লেখা যে বৌদ্ধতান্ত্রিক পুঁথিটি আশুতোষ সংগ্রহশালায় আছে, সেটিতেও সুবিন্যস্ত ও বর্ণাঢ্য ক্ষুদ্রায়তন চিত্রগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বেশ সুন্দরভাবে লিপির হরফগুলি বিন্যস্ত হয়েছে। এরপর নেপাল থেকে পাওয়া চর্যাপদের পুঁথিতে যে লিপির সমাবেশ দেখা যায় সেই লিপির হরফকে পরবর্তীকালের বাংলা হরফের প্রারম্ভিক রূপ বলে অনুমান করা হয়। প্রায় ষোড়শ শতাব্দীথেকে বাংলায় ব্যাপকভাবে পদাবলী সাহিত্য এবং অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হতে থাকে। এইসব বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থের যে সব প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে বাংলা-লিপির ক্রমবিবর্তনের রূপরেখা যেমন চোখে পড়ে, তেমনি লিপির অক্ষরগুলিকে ছন্দোবদ্ধ চিত্রের অনুলেখ করে ব্যবহার করবার প্রয়াসও দেখা যায়। এই লিপির বিকাশ ঠিক পারসিক লিপির মত ক্যালিগ্রাফিক গুণ সম্পন্ন সম্বলিত হয়ে না উঠলেও, কোন কোন ক্ষেত্রে বেশ লীলায়িত এবং সুঠাম চিত্ররূপে গ্রহণ করেছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ঊনবিংশ শতকের শেষদিকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বাংলালিপিও দরবারী লিপিকারদের দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিল। তাছাড়া মানুষ আর বিভিন্ন জীবজন্তুর আকৃতি নানা ঢংয়ে সাজিয়ে বিচিত্র ধরনের বাংলা লিপি তৈরী করা কিছুদিন আগেও এক বাহাদুরির কাজ ছিল। বাংলার প্রবীণ চিত্রকর এই ধরনের কাজে চৌকশ ছিলেন। 'আজ নগদ কাল ধার' 'জন ভিক্ষা হবে ঘুরাবে, বেচব নগদ দেব না ধারে' এই দুটি লিপি তার বিশেষ উদাহরণ। দাঁড়ানো, বসা, শায়িত এবং আরও নানা ভঙ্গির মানুষের আকৃতি দিয়ে শিল্পী উপরিউক্ত লিপিগুলি সৃষ্টি করেছিলেন। ঐ লিপিগুলির সঙ্গে প্রায় ভি. টি. কৃষ্ণমাচারির সংগৃহীত ওয়াসলির সাদৃশ্য আছে বলে মনে হয়।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উন্মেষের যুগ ঊনবিংশ শতক থেকে ক্রমশঃ ব্যক্তিগত লেখনী বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হতে শুরু করে, যার স্বীকৃতি ঘটে রবীন্দ্রিক ছাঁদের লিখনে।

বটেশ্বরনাথ ও বটপর্বতিকা

সরিৎশেখর মজুমদার

বটেশ্বরনাথ একটি পুরানো তীর্থ। যেতে হবে পূর্বরেলওয়ের ভাগলপুরের নিকটবর্তী রেলওয়ে স্টেশন কলগঙ অর্থাৎ কহলগাঁয়ে নেমে। সেখান থেকে প্রায় সাত-আট মাইল দূরে, একটি ছোট পাহাড়ের ওপর এই বটেশ্বরনাথ মন্দির। পাহাড় ছুঁয়ে আছে গঙ্গাকে ; গঙ্গা এখানে উত্তরবাহিনী। আর যেখানেই গঙ্গা উত্তরবাহিনী সেখানেই যে তীর্থমাহাত্ম্য এটা সুবিদিত।

মুঙ্গের অর্থাৎ মুদ্গগিরি থেকে আরম্ভ করে প্রাচীন অঙ্গরাজ্যের ভাগলপুর, সুলতানগঞ্জ, কহলগাঁ, পীরপৈঁতী, সাহিবগঞ্জ, সকরিগলি পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকার ইতিহাস-প্রসিদ্ধি আছে ; যদিও সব ইতিহাস তথ্যাতীতভাবে এখনও উদ্ধার হয়নি। সুলতানগঞ্জের গঙ্গাগর্ভে বিচ্ছিন্ন এক গ্র্যানাইট পাহাড়ের ওপর অবস্থিত গৌরীনাথ অর্থাৎ মহাদেবের মন্দির বহুকাল থেকে হাজার হাজার তীর্থযাত্রীকে আকর্ষণ করে। ভাগলপুর হলো প্রাচীন চম্পানগরী। রাহুল সাংকৃত্যায়ন বলেছেন তাঁর 'নিষিদ্ধ দেশে সওয়া বৎসর' গ্রন্থে, প্রাচীন অর্থাৎ পালযুগ সংক্রান্ত তিব্বতীসাহিত্যে ভাগল ও সহোর-এর উল্লেখ আছে। ভাগলপুর ও সাবোর তার আধুনিক নাম। কহলগাঁ ও পীরপৈঁতী সম্পর্কে এই নিবন্ধকারের মতামত সন্নিবিষ্ট হয়েছে, 'পীঠিরাজ্য কোথায় ছিল ?' শীর্ষক 'সমকালীন', বৈশাখ-১৩৭৪ সংখ্যায় প্রকাশিত নিবন্ধে। কহলগাঁ প্রাচীন কোট্টলগ্রাম, তাম্রশাসনে যার উল্লেখ আছে। এই কহলগাঁ ও বটেশ্বরনাথ অঞ্চলের এখন সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর সংবাদ হলো, এখানে প্রাচীন বিক্রমশিলা মহাবিহার আবিষ্কৃত হয়েছে এবং ভারত সরকারের প্রত্নতাত্ত্বিকবিভাগ উৎখনন কার্যে নিযুক্ত রয়েছেন। এ-অঞ্চল আর একটি নামে বিশেষ পরিচিত। সেটি হলো পাথরঘাট্টা। কয়েকজন ঐতিহাসিক অনেক আগেই এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন এবং এই নিবন্ধকারেরও দৃঢ়বিশ্বাস তাই ছিল যে, বটেশ্বরনাথ বা পাথরঘাট্টা অঞ্চলেই কোথাও একদা বিরাজিত ছিল বিক্রমশিলা। সব অনুমান ও তর্কের আজ অবসান ঘটেছে।

বটেশ্বরনাথ হলেন শিব। এ-মন্দির কতদিনের, সঠিক বলা কঠিন : স্থানীয় পাণ্ডার কোনো কাল-জ্ঞান নেই ; সংক্ষেপে যে কাহিনী আওড়াবে তা হলো এই যে, কোনো এক খুনী আসামী আত্মগোপনের আশায় এখানে এক স্বপ্ন পেলো, আমি এখানে অবহেলিত হয়ে পড়ে আছি, আমায় তুই প্রতিষ্ঠা করলে তোর মুক্তি। এবং সেই থেকেই মন্দির প্রতিষ্ঠা। এটা নিছক মাহাত্ম্য আরোপের প্রচেষ্টাজাত বলেই মনে হয়। যাই হোক, এখানে আবার রাহুল সাংকৃত্যায়ন বর্ণিত তিব্বতী পুঁথি ভিত্তিক কাহিনীটি স্মরণ করলে দেখা যায়, ঠিক এই মন্দিরধারী পাহাড়ের ওপারেই এসে পৌঁছেছিলেন তিব্বতাগত সেই সব অতিথি, যাঁরা তিব্বতরাজ দেশে-ও যারা প্রেরিত হয়েছিলেন—যে কোনো উপায়ে অতিশা অর্থাৎ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে সে-দেশে নিয়ে যাবার জন্য। তখন রাত্রি নামছে। খেয়া তরী তাঁদের আশ্বাস দিল, বিক্রমশিলার দ্বার যদিও বন্ধ এখন, বিহারসংলগ্ন ধর্মশালায় তাঁদের রাত্রিবাস সম্ভব হবে।

তোম্-তোন্ রচিত গুরু-গুণ-ধর্মাকরে এই সব বর্ণনা আছে। তোম্-তোন্ গুরু দীপঙ্করের ছাত্রার মতন সুদীর্ঘকাল অনুসরণ করে লিখেছিলেন উক্ত গ্রন্থ। অতএব তা বহুলাংশে নির্ভরযোগ্য। সেখানে পাহাড়ের কথা, গঙ্গার কথা যা আছে, এবং ইদানীংকার বিক্রমশিলা আবিষ্কার থেকে যা পাওয়া যায়, তাতে অঞ্চলটির বর্ণনার নিখুঁতত্বই প্রমাণিত। তিব্বতী অতিথিরা কোন হিন্দু মন্দিরের কথা উল্লেখ করেন নি। অতএব মনে হয়, সেই সময়—অর্থাৎ একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, যখন বজ্রযানী বৌদ্ধপণ্ডিতদের গরিমায় ঐ অঞ্চল প্রভাবান্বিত, তখন পাহাড়ের ঐ বটেশ্বরনাথ ছিলেন না। বটেশ্বরনাথের পাহাড়ে একটি ছোট গুহা আছে, এখনও হিন্দু ও বৌদ্ধপ্রভাবমণ্ডিত পাথরের মূর্তি এখানে বিক্ষিপ্তভাবে রয়েছে এবং কিছু সারিবদ্ধ মূর্তি দেখিয়ে স্থানীয় লোকেরা বলে—ওগুলো 'চুরাশী ঋষি'! চুরাশীজন বিখ্যাত তান্ত্রিক বৌদ্ধ সিদ্ধার কথা এই সঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে।

• এবার বটেশ্বরনাথ মন্দিরগাত্রে বাংলা হরফে উৎকীর্ণ একটি পাথরের ফলকের কথা বলি। প্রবেশপথের মাথায় সেটি গাঁথা কালো পাথর। সব পাঠোদ্ধার করা গেল না। বিষয়টা খুব প্রাচীন নয়। তবু উল্লেখযোগ্য। "বাংলা ১১১৬ সাল। শ্রীশ্রীচরণ মিত্র শ্রীবটেশ্বরনাথ দয়া নং শ্রীশ্রীভবানীচরণ পুত্র শ্রীশ্রী অনঙ্গ মিত্র × × × × মোটামুটি যা বোঝা গেল, প্রায় ১৬৬ বছর আগে কোন এক শ্রীচরণ মিত্রের পৌত্র ও শ্রীভবানীচরণের পুত্র—যাঁর নাম শ্রীঅনঙ্গ মিত্র উক্ত মন্দিরটির সংস্কারসাধন করে থাকবেন। আমার পাঠোদ্ধার চেষ্টায় স্থানীয় পাণ্ডা 'হাঁ' করেই রইলেন এবং সেটা যে কি বস্তু তার কোন খবরই জানেন না। উল্টোদিকে পূবে,—কিন্তু বটেশ্বরনাথের দিকে মুখ করে যে মন্দিরটি সেটি কালীমাতার। সেখানেও প্রবেশদ্বারের শীর্ষে একটি পাথরের ফলকে নিতান্ত বাঁকাচোরা হরফে খোদাই: "তারিখ ১ ভাদ্র, ১২৭২ সাল। শ্রীশ্রীকালিমাতা আপনার মন্দির আপনি বানায়া মথুরানাথ চট্টো ও বিশম্ভর সেন ঠিকন বাজায়া সাং চাপতা জেলা হুগলি।" মোটামুটি সব বোঝা গেল। মা কালী যেন স্বয়ং তৈরী করিয়ে নিলেন এই মন্দির, হুগলী জেলার চাপতা গ্রামের মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায় ও বিশম্ভর সেন মহাশয়দের দিয়ে, বাংলার ১২৭২ সালের ১লা ভাদ্র তারিখে। অর্থাৎ এ-ব্যাপার ১১০ বছর আগের। উপরিউক্ত 'ঠিকনবাজায়া' যে কি, দুর্বোধ্য।

বটেশ্বরনাথের ঐ 'বট' শব্দটি আলোচনার বিষয় মনে হচ্ছে। শিবের অপর নাম বটুকেশ্বর। বট ও বটু সম্পূর্ণ পৃথক অর্থ। 'বট'-এর সঙ্গে শিবের সংযোগসূত্র পাওয়া যাচ্ছে না। কোনো অভিধানে দেখলাম না। স্থানটি কি বটবৃক্ষবহুল ছিল? এবং সেই কারণে প্রতিষ্ঠিত শিব যুক্ত হয়েছিলেন বটের সঙ্গে? এই সূত্রে আর একটি বিষয় লক্ষণীয়। পালরাজারা তাঁদের শাসনকার্যের সুবিধানুযায়ী রাজ্যের বিভিন্ন দিকে সামরিক গুরুত্বের দিক দিয়ে বিচার করে বহু 'বিজয়স্কন্ধাবার' স্থাপন করেছিলেন। পাললিপিতে মুদ্গগিরি, বটপর্বতিকা, বিলাসপুর, হরধাম, রামাবতী নগর, কপোতকোঠি এবং পাটলিপুত্র জয়স্কন্ধাবারের উল্লেখ আছে। শ্রীনীহাররঞ্জন রায় তাঁর বাঙালীর ইতিহাসে লিখছেন: 'বটপর্বতিকার অবস্থিতিনির্ণয় কঠিন; পর্বতিকার উল্লেখ হইতে অনুমান হয়, রাজমহল পর্বতের সংলগ্ন গঙ্গার তীরেই কোথাও এই জয়স্কন্ধাবার ছিল। এবং সোজাসুজি বটপর্বতিকাও গঙ্গার তীরে। এই গঙ্গা বাহিয়া রাজমহলের তেলিগড়ি ও সিক্রিগলির সংকীর্ণ গিরিবর্ত্মের ভিতর দিয়াই বাংলায় প্রবেশের পথ। এবং পাটলীপুত্র হইতে আরম্ভ করিয়া রামাবতী পর্যন্ত সমস্ত পথটিই

সুরক্ষিত রাখা প্রয়োজন ছিল।'

এই নিবন্ধের গোড়াতেই সাহিবগঞ্জ সকরিগলির উল্লেখ করা হয়েছে। সাহিবগঞ্জের মাইল দুয়েক পশ্চিমে রেল-লাইন-সংলগ্ন রাজমহল পাহাড়ের গায়ে তেলিয়াগড়ীর ভগ্নদুর্গ আজও চোখে পড়ে। এককালে গঙ্গা বইতো ঠিক দুর্গের পাদদেশে। উপরে ছিল সংকীর্ণ গিরিবর্ত্ম। এই তেলিয়াগড়ী ছিল প্রাচীন বাঙলার ভাগ্যনিয়ন্তা। দুর্গের পতন মানেই বাঙলার পতন। এই নিবন্ধকার লিখিত তেলিয়াগড়ী দুর্গের ধারাবাহিক ইতিহাস ১৯৬৯ সালের Proceedings of the Indian History Congress গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী পাঠক সেটি পাঠ করলে এই অঞ্চলের সামরিক গুরুত্ব উপলব্ধি করবেন। যাই হোক, এখানে যেটা লক্ষণীয় তা হলো ঐ 'বট' শব্দ। বটেশ্বর এবং বটপর্বতিকা। অর্থাৎ সেই একই শব্দের যোগ। পালেদের সেই জয়স্কন্ধাবার কি এখানে অবস্থিত ছিল? নাকি, তেলিয়াগড়ী অঞ্চলে, অর্থাৎ বটেশ্বরনাথ থেকে আরও পঁয়ত্রিশ মাইল পূর্বে খাস রাজমহল পাহাড়ে? তবে, একথা ঠিক যে এই বটেশ্বরনাথের কাছাকাছি জায়গায় অতীতের বিশালকীর্তি বিক্রমশিলা আবিষ্কৃত হওয়ায় বটপর্বতিকা নামক জয়স্কন্ধাবারটির অবস্থিতি এইখানে ধরে নেওয়ার পক্ষে কিছু যুক্তি পাওয়া যাচ্ছে।

আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করার আছে বলে আমি মনে করি। এই 'বট' শব্দটির সঙ্গে গৌড়বঙ্গ অঞ্চলের বৌদ্ধ-বিহারেরও যেন যোগ পাচ্ছি। পাহাড়পুরের সোমপুরী মহাবিহারের কথা সর্বজনবিদিত। বিক্রমশিলার উৎখননকার্যে নিযুক্ত প্রত্নতত্ত্ববিভাগের মতে, সেখানকার আবিষ্কার থেকে এটি স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে বিক্রমশিলার বিহারের ভূমি নকশার সঙ্গে আশ্চর্য মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে পাহাড়পুরের বিহারের। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে পাহাড়পুরের অন্তত একাংশের নাম ছিল 'বটগোহালী' এবং এখানে এক জৈন বিহার ছিল। এখানেও এই বিহারের কাছেও এই যে 'বট' শব্দযুক্ত একটি স্থান, এটা কি কেবলই আকস্মিক একটা কিছু কিংবা জৈন বিহার বা বৌদ্ধবিহারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এক ব্যাপার, এটা অনুসন্ধান করে দেখা যেতে পারে।

বটেশ্বরনাথ যে পাহাড়ের ওপর অধিষ্ঠিত সেই পাহাড়ই 'বটপর্বতিকা' নামে পরিচিত, এবং বটপর্বতিকা হলো পাললিপিমালায় উল্লিখিত জয়স্কন্ধাবার, এই সিদ্ধান্তে আসতে একটা বড় অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়—যদি অবশ্য এই কথা ঠিক হয় যে প্রত্যেক জয় স্কন্ধাবারেরই একটা দুর্গজাতীয় গুরুত্ব ছিল। যে অঞ্চলে বটেশ্বরনাথ অবস্থিত এবং যেখানে বিক্রমশিলা এখন আবিষ্কৃত সেখানকার দুর্গজাতীয় গুরুত্ব মোটেই নেই বা ছিল না। বিক্রমশিলা পালদেরই কীর্তি, বজ্রযানী বৌদ্ধদের পীঠস্থান, মূলতঃ ধর্মক্ষেত্র। ঠিক সেখানেই অত কাছাকাছি কোথাও সৈন্যাবস্থান বা সামরিক গুরুত্বপূর্ণ দুর্গরচনার উপযুক্ত স্থান নেই। 'জয়স্কন্ধাবার' নামটার ঐ সামরিক গুরুত্বগত অর্থ ধরে ধারণা হয়—পীরপৈঁতী (যা আগে পীঠিরাজা ছিল, সমকালীন বৈশাখ ১৩৭৪) থেকে তেলিয়াগড়ী সকরিগলি পর্যন্ত বিস্তৃত রাজমহল পাহাড়ের কোনো এলাকাতেই ছিল বটপর্বতিকা জয়স্কন্ধাবার। 'স্কন্ধ' শব্দটির আভিধানিক অর্থ যা পাচ্ছি তাতে আবার চিন্তা ভিন্নমুখী হয়। স্কন্ধ মানে, জ্ঞানের পাঁচটি অংশ:

বিষয়গ্রাহক—রূপস্কন্ধ

বিষয়জ্ঞানগ্রাহক—বেদনাস্কন্ধ

আলয়বিজ্ঞানপ্রপঞ্চ—বিজ্ঞানস্কন্ধ

নামপ্রপঞ্চ—সংজ্ঞাস্কন্ধ

বাসনাপ্রপঞ্চ—সংস্কারস্কন্ধ।

'স্কন্ধ' মানে রাশি বা সৈন্য। 'স্কন্ধাবার' বলতে শিবির বা তাঁবুও বোঝাচ্ছে; কিন্তু ঐ যে বৌদ্ধদর্শনের 'পঞ্চস্কন্ধ' তার সঙ্গে যদি ঐ জয়স্কন্ধাবার জড়ানো থাকে তাহলে বজ্রযানীদের পীঠস্থানে বিক্রমশিলাকে বটপর্বতিকা জয়স্কন্ধাবারের সঙ্গে সম্যক কারণেই এক করা যায়।

এই আলোচনাসূত্রে নিবন্ধকারের মনে আর একটি প্রশ্ন জেগেছে। 'বটপর্বতিকা' কি সমগ্র রাজমহল পাহাড়টির প্রাচীন নাম? পর্বতিকা শব্দটি যেন ইংরাজী (হিল) শব্দের যথার্থ পরিভাষার অর্থবহ। পরবর্তীকালের এই যে রাজমহল হিল্স্, অতীতে তার কি নাম ছিল?

ভূগর্ভ রেলপথ ও অতীতের ভূগর্ভস্থ স্থাপত্যরীতি

শহরের ইতিকথায় ভূগর্ভের বিবরণ বার বার এসে পড়েছে। তাকে এড়ানো যায় নি কোনকিছুতেই। এমনকি শহর-গ্রাম-গঞ্জ সৃষ্টি হওয়ার বহু আগেও মানুষকে সমাধির জন্য মাটি খুঁড়ে শবদেহকে নিরাপদে শায়িত করার প্রথার প্রচলন করতে হয়েছে। ভূগর্ভের নাগরিক ব্যবহার এসেছে স্বাভাবিক ভাবে। কোথাও মাটির তলায় মানুষ ইচ্ছে করে যায়নি, মাটির তলায় যাবার প্রয়োজন এসেছে মাটির উপরের জীবনের ও সামাজিক পরিবেশের তাগিদ থেকেই।

ভারতের উত্তর-পশ্চিমে; কাশ্মীরে যে নব্য প্রস্তরযুগের মানবগোষ্ঠীর সন্ধান পাওয়া গেছে তারা মাটির তলাতেই বসবাসের জন্য গর্ত করে থাকার ব্যবস্থা করে নিয়েছিল। এদের বসবাস করার গর্তগুলির উপরের মুখটা থাকত সরু আর তলার দিকটা হত চওড়া আর বড়সড়। গর্তের মাথায় পাতা আর ডালপালার আচ্ছাদনী। সুরক্ষার জন্য এরা মনে হয় সরিয়ে রাখা যায় এ প্রকারের সিঁড়ি ব্যবহার করত। এসব হল খৃষ্টপূর্ব দ্বি-সহস্রাধিক বৎসর অর্থাৎ এখন থেকে চার হাজার বৎসর পূর্বেকার কথা।

ভারতের বহুবিস্তৃত নদীবিধৌত সমভূমিতে মানুষ যখন এক বিরাট লিখন ও লিপিসমন্বিত তাম্রপ্রস্তরীয় সভ্যতা গড়ে তুলেছিল তখনও তার প্রয়োজন হয়েছিল ভূগর্ভে অবতরণের। শহরাঞ্চলের নাগরিক পরিবেশে ভূগর্ভের নাগরিক ব্যবহার প্রাথমিকভাবে পয়ঃপ্রণালীকে সুবিন্যস্ত করার জন্য। কারণ দূষিতজল বাহিরে ফেলার ব্যবস্থা না থাকলে নাগরিক জীবন দুঃসহ হয়ে উঠতে পারে। কাজেই মহেঞ্জোদড়োর স্নানাগার সংলগ্ন সুবৃহৎ জলবিতরণ ও জলনিরোধক প্রণালী দিয়ে জল বাহিরে নেওয়ার ব্যবস্থা আশ্চর্য দক্ষতার সন্ধান দেয় আমাদের। 'কব্‌বেল্‌' পদ্ধতির বড় বড় পয়ঃপ্রণালী ছাড়াও মাটির কাছাকাছি থাকা শাখা প্রণালীর ব্যবহারও এই সময়ে ছিল উল্লেখযোগ্য। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পা সহ প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের প্রায় সমগ্র উত্তর পশ্চিম প্রান্তের সহর ও পশ্চিম প্রান্তের সিন্ধুসভ্যতার পরিচায়ক কৃষিক্ষেত্রে এইপ্রকারের ভূগর্ভের নাগরিক ব্যবহার চোখে পড়বে। গুজরাটের লোথালের জাহাজঘাটাও প্রকারান্তরে ভূগর্ভের প্রযুক্তিবিদ্যার সাক্ষ্য দিচ্ছে। হরপ্পীয় আমলে পয়ঃপ্রণালীতে যেরকম জল শোষক গর্ত থাকত সেটা পরের যুগেও দেখা যায়। পোড়ামাটির চক্রবেড় দিয়ে গড়া পাতকূয়ার ব্যবহার অনেকদিন ধরেই ভারতে চলে আসছে। এসবও প্রত্ন-বিশ্লেষণে চার-পাঁচ হাজার পূর্বেকার কথা।

ভারতের ভূগর্ভের স্থাপত্য প্রযুক্তিবিদ্যা যে যথেষ্ট উন্নত ছিল সেকথা বুঝতে খুব কষ্ট হয় না। 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকে মাটির তলায় সুড়ঙ্গের ব্যবহারের একাধিক উল্লেখ দেখা যায়। এই প্রকারের উল্লেখ আমাদের আরও বহুগ্রন্থে ছড়িয়ে আছে। তবে ভূগর্ভ-স্থাপত্যের সবচাইতে ধারাবাহিক ও

সহস্রাধিক বৎসর কালের অতুলনীয় নিদর্শন ছড়িয়ে আছে আমাদের দেশের নানা অংশের পার্বত্য দেবালয়ে ও গুহাস্থাপত্যে। পূর্ব-ভারতের রাজগৃহের 'সোনভাণ্ডার' কক্ষ থেকে নিয়ে গয়ার নিকটস্থ বরাবর পাহাড়ের লোমশ ঋষিগুহা প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে উড়িষ্যার উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি উৎখনিত স্থাপত্য, সমগ্র পশ্চিমঘাট পর্বতমালার বিভিন্ন প্রান্তে ও তার নিকটস্থ অজন্তা, ইলোরা, নাসিক বাদামী, কার্লে, ভাজা, এলিফান্টা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না। দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ুর মহাবলীপুরম বা মমল্লপুরমের মণ্ডপগুলিও পাথর কেটে স্থাপত্যপ্রয়াসকে চিরস্থায়ী করবার সাক্ষ্য বহন আজও অতীতের সাক্ষ্য দিয়ে চলেছে।

এর পরবর্তীকালে এবং উপরে বর্ণিতযুগের সমসাময়িক কালেও ভূগর্ভে স্থাপত্যমূলক ব্যবহারের বহু নিদর্শন দৃষ্ট হয়। উদাহরণস্বরূপ ঔরঙ্গাবাদের নিকটস্থ দৌলতাবাদের কেল্লা অথবা পূর্বতন কালের দেবগিরির গিরিদুর্গের কথা বলা চলে। এখানে দুর্গ-পরিখা, অতিক্রম করার পর একটা ঘোরানো সুড়ঙ্গ-সোপান পথে দুর্গের শীর্ষের দিকে উঠবার একটা ব্যবস্থা করা আছে। শুধু বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা একাধিক বাঁকে আচ্ছাদিত গোপন প্রকোষ্ঠ থেকে দুর্গ আক্রমণকারীদের দিকে অস্ত্রনিক্ষেপের সুবন্দোবস্ত দেখবার মত শিক্ষণীয় বিষয়। মধ্যযুগের একটা বিখ্যাত প্রাসাদদুর্গ ও কারাগার গোয়ালিয়রের দুর্গের মধ্যে দেখা যায়। এখানে প্রাসাদের এক বিরাট অংশ রয়েছে পাহাড়ের অভ্যন্তরে ভূগর্ভের মধ্যে। এই দুর্গটিও বহুকাল থেকেই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে একাধিক রাজশক্তির হাতে এসেছিল। গোয়ালিয়রের দুর্গ-প্রাসাদ ছাড়াও এখানে পর্বতগাত্রে খোদিত ভাস্কর্য আমাদের কাছে স্থানীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ধারাবাহিকতার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয়। ভীলসা-উদয়গিরির ভাস্কর্য ও উৎখননের রীতিও মধ্যভারতের স্থানীয় ধারার পরিচায়ক।

ভূগর্ভের মধ্যে অতি সুন্দর ও স্থাপত্য সুষমামণ্ডিত ভাস্কর্য বা স্থাপত্যকীর্তির পরিচয় লাভ করতে গেলে আমাদের পুনরায় মধ্য ভারতের ও গুজরাটের দিকে অনুসন্ধান করতে হবে। মাণ্ডু দুর্গের মধ্যে 'উজালা বাউলি' ও 'আন্ধেরি বাউলি' দেখলে আমাদের ভূগর্ভস্থ স্থাপত্যের দুটি সুন্দর নিদর্শন দেখা হবে। এর মধ্যে প্রথমটি চারকোণা এবং একাধিক ছোট ও বড় সোপান দিয়ে এতে অনেকটা নীচে থাকা জলাশয়ের কাছে পৌঁছবার ব্যবস্থা করা আছে। অন্যটি উপর থেকে একটি মস্ত বড় গম্বুজ দিয়ে ঢাকা দেওয়া। এর অভ্যন্তরেও চারদিকে বারান্দাসহ জলের দিকে ধাপে ধাপে নেমে যাওয়ার ব্যবস্থা করা। গুজরাট রাজস্থান তথা পশ্চিম ভারতের 'বাওলি' অথবা 'ওয়াও' নাম পরিচিত ভূগর্ভস্থ জলাশয় অপূর্ব স্থাপত্য সুষমা মণ্ডিত। আহমদাবাদের নিকটস্থ 'দাদা হরি' ও 'মাতা ভবানী' দু'টি বিখ্যাত জলাশয়ের কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমটিতে বারোটি থামের উপরে রক্ষিত একটি ছাউনীর মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করতে হয়। এরপরে মাটির তলায় বারান্দাসহ তিন থাক স্তম্ভের উপর নির্ভর করে জলাশয়ের উপরের ছাদ বাঁধা আছে। মধ্যে আছে জল নেওয়ার একটি অষ্টকোণী কূপ। বেড়া দেওয়া আর একটি কুণ্ড এবং সেচের জন্য নির্দিষ্ট বৃত্তাকার জলাশয়। এখানে ভূগর্ভস্থ সকল কিছুই সুষম অনুপাতে ও সুষ্ঠু অলঙ্করণে মণ্ডিত। 'মাতা ভবানী'র বাওলি প্রথম জলাশয়টি অন্যটির চেয়ে কয়েকশত বৎসরের পুরাতন। অলঙ্কৃত বারান্দা যুক্ত সোপান-স্থাপত্য এটির অন্যতম সম্পদ।

৫

মুঘল যুগের বহু প্রাসাদ এবং বিদর বিজাপুর গোলকুণ্ডার স্থাপত্য কীর্তির নিখুঁত পর্যবেক্ষণ করলেও উপরের মত সম্পূর্ণ বা আংশিক ভূগর্ভস্থ স্থাপত্যকীর্তি নজরে আসবে। এদিক থেকে এখনও বহু কিছু অনুসন্ধান করার মত আছে। কি পদ্ধতিতে পশ্চিম ভারতের গুহা মন্দির খনন করা হল। কোন পদ্ধতিতে পর্বত-অভ্যন্তরস্থ সুপ্রাচীন চৈত্যগৃহের মধ্যে দিবালোক প্রসারিত করার ব্যবস্থা করা হল। কোন পরিকল্পনার সাহায্যে বিহারগুলি তাদের স্থাপত্যগুণে আকর্ষণীয় হয়ে উঠল এসব প্রশ্ন আজ প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কিত এবং ব্যবহারিক কারণে আমাদের জানা প্রয়োজন।

ভারতে রেলপথের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের মধ্যদিয়ে সুড়ঙ্গপথে যানবাহনের ব্যবস্থা করার সূচনা হয়েছে আধুনিক পদ্ধতিতে। আধুনিককালে খনিজ আহরণের জন্য যে প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ হয়েছে তাতেও আমরা সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভূগর্ভে কাজ করবার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। আধুনিক সেতুনির্মাণ ও জলস্রোতের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ভূগর্ভস্থ প্রণালী ও মাটির তলায় বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে এবং আধুনিক নগর প্রকৃতির উপযোগী পয়ঃপ্রণালী স্থাপন করে অনেক পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ কৌশল আয়ত্ত করেছি।

আজ জনসংখ্যার চাপে নাগরিক অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান যানবাহনের স্রোতকে মাটির তলায় নিয়ে যেতে চাইছি আমরা ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গপথে যানবাহন ও রেল চালাবার ব্যবস্থা করে। কলকাতায় সর্বপ্রথম এর সূচনা হয়েছে। হয়ত ভবিষ্যতে ভারতের অন্যান্য প্রান্তেও অনুরূপ ব্যবস্থা করার দরকার হবে।

সূচনার ঠিক এই সময়টাতেই আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত, সহস্রাধিক বৎসরব্যাপী আমাদের জাতীয় স্থাপত্যকীর্তির দিকে। হয়ত পুঙ্খানুপুঙ্খ ও যথাযথ বিচারে আমরা আমাদের এই নব পর্যায়ের কর্ম-উদ্যোগে আমাদের দেশের স্থানীয় রীতি থেকে এমন কিছু সাহায্য বা ইঙ্গিত লাভ করতে পারি যেটা আমাদের স্থানীয় প্রয়োজনের পক্ষে হবে অপরিহার্য।

এ পর্যন্ত পৃথিবীর বহু দেশেই শহরাঞ্চলের ভূগর্ভস্থ রেলস্টেশনগুলি অপূর্ব স্থাপত্য অলঙ্করণে সুসমামণ্ডিত। আমরাও আমাদের নগরাঞ্চলের ভূগর্ভস্থ পথ দেশজরীতির স্থাপত্যরীতিতে সুসজ্জিত করতে পারি। এর জন্য আমাদের ভূগর্ভস্থ রেলপথের স্থপতি ও প্রযুক্তিবিদদের ভারতের প্রাচীন ভূগর্ভস্থ স্থাপত্যকীর্তিগুলি বার বার পরিদর্শন করে আসা কর্তব্য।

আমরা কখনই একথা ভুলতে পারি না যে আমাদের দেশে ভূগর্ভে কাজ করা স্থাপত্যকৌশল কত ব্যাপক। এখন পৃথিবীতে ভূগর্ভস্থ রেলপথ বা অন্যান্য যানবাহনের পথ যেসব দেশে আছে সেসব দেশের প্রাচীন কীর্তিতে ভূগর্ভে কাজের নিদর্শন ভারতের মত সমৃদ্ধ নয়।

সমস্ত ব্যাপারে, বিশেষ করে মাটির অভ্যন্তরের স্থাপত্য অলঙ্করণের ক্ষেত্রে বিদেশের রুচিহীন স্থাপত্যসজ্জা মেকি আধুনিকতার ঢালাও আমদানী আমাদের মত দেশের পক্ষে স্বাভাবিক ও সুসঙ্গত নয়। সুড়ঙ্গ রেলপথ হলে তাতে উপর থেকে নিচে প্রবেশ করার স্থান থাকবে অবশ্যই। আমরা যদি সেই প্রবেশপথকে 'বাওলি' বা প্রাচীন অলংকৃত কূপ থেকে স্থাপত্য অনুপ্রেরণা গ্রহণ করে যথাসম্ভব ভাবে আধুনিক আঙ্গিকে সুসজ্জিত করি তাতে কোন বাধা থাকা উচিত নয়। 'বাওলি'র প্রবেশপথ এক্ষেত্রে আমাদের সমস্যায় হয়ত খানিকটা সমাধান করতে পারে।

আমাদের ভূগর্ভস্থ রেলস্টেশনের চত্বরকে যদি আমরা বট-পত্রাশ্রিত লতাপুষ্পের তবকে সজ্জিত তোরণমালায় অলংকৃত করি এতে আমাদের গৌরবই বর্দ্ধিত হবে মাত্র। এর জন্যে ভারতীয় তক্ষণকারী প্রস্তরফলক ভাস্কর্যে সুনিপুণ ওড়িশার ভাস্কর বা পশ্চিমের প্রস্তরকরদের কাজে লাগাই তাহলে তাতে আমাদের বহু কারুশিল্পী নিশ্চিতভাবে কাজ পেয়ে দেশজরীতিকে প্রাণবন্ত রাখতে সমর্থ হতে পারেন। বাংলার স্থানীয় রীতিতে সূত্রধর সমাজের কারিগরদের পোড়ামাটির মন্দির ফলকের অনুরূপ ফলক আরও আধুনিক পদ্ধতিতে তৈরী করে আমরা ভূগর্ভের প্রাসাদকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তুলতে পারি।

ভূগর্ভে পরিবহনের ব্যবস্থা যদি হয় তবে তাতে ভারতীয় পদ্ধতির অলংকরণ প্রযুক্তিবিদ্যাকে অবহেলা করা যাবে না এই আশা নিয়েই এই আলোচনা স্থগিত রাখা গেল। ঠিকমত কাজ করতে গেলে ভারতের প্রাচীন কীর্তি সৌধাদির বিজ্ঞানসম্মত পর্যবেক্ষণ দরকার। উপরের মাটির ভারবহন ও বায়ু-বিতরণের পদ্ধতির দিক থেকে বাতাস চলাচলের পদ্ধতি ও ব্যবহারিক কার্যকরীতায় দৃষ্টিকোণ থেকে এবং খননের কর্মকৌশলের দিক থেকে আলোচ্য বিষয়ে কলিকাতার ভূগর্ভস্থ রেল কর্তৃপক্ষ, ভারতীয় প্রত্নসমীক্ষা বা আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া, রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব দপ্তর এবং স্থপতিরা একযোগে কাজ করলে সুফল পাওয়া যাবে বলে আশা করা অন্যায় হবে না।

নির্মলরঞ্জন চৌধুরী

রাজনগরের ইতিহাস ও অন্যান্য রচনা। গোবিন্দগোপাল সেনগুপ্ত। প্রকাশক : রমানাথ সিংহ, সিউড়ী, বীরভূম। মূল্য তিন টাকা

আজকের দিনে ইতিহাস বলতে যে পৃথক শাস্ত্র দেখা যায় তা আমাদের ছিল না। মধ্যযুগে মুসলমানদের এবং আরো পরে পাশ্চাত্যের ইতিহাস চেতনা আমাদের এই ব্যাপারে প্রভাবিত করেছে। সাম-সময়িককালে ঘটনাপুঞ্জের ধারাবিবরণী আমাদের দেশে আগে লিখিত হয়নি, পরোক্ষ নিত্য ব্যবহার্য উপাদান থেকে তা গড়ে নিতে হয়েছে। প্রাক্-ইতিহাস, প্রায়-ইতিহাস পর্বের ক্ষেত্রে তো বটেই এমনকি ইতিহাসেরযুগের আদি ও মধ্যপর্বের ক্ষেত্রেও পুরাসামগ্রী, সাহিত্য এবং লোকশ্রুতি ও লোককথা প্রভৃতির সাহায্য নিয়ে সুদীর্ঘ কালগত ব্যবধানে অনুমানকে প্রমাণের ভিত্তিতে দাঁড় করাবার চেষ্টা হয়েছে। 'পুরাণে প্রত্ন-প্রশ্ন পুরাতন-চিন্তনা।' একদিন যা নতুন ছিল আজ তা পুরনো এবং এই আজকের নতুনও একদিন পুরনো হয়। এই নিয়মের কারণেই জন্ম হয় ইতিহাসের, আঞ্চলিক ইতিকথার।

মধ্য ও পর-মধ্যযুগে বীরভূমির যে রাজনগর অতুল ঐশ্বর্য, অশ্বের হ্রেষা ও মদকলের বৃংহতিতে মুখর ছিল আজ তার হৃতশ্রী রূপ দেখে সেই অতীত গৌরবের দিনগুলি অনুমান করা বোধহয় সহজসাধ্য নয়। এই সত্যটি মেনে নিয়েও 'বহুদিন—বহুদিন পরে আবার দেখিলাম, নয়নময় হইয়া, বাঙলার অতীত কীর্তির চিতাচুল্লী হইতে সমাহৃত অর্ধদগ্ধ কাষ্ঠখণ্ডের পরিদর্শনের ন্যায়, আবার দেখিলাম……' সেই রাজনগর। সেই অতীত রাজনগর। বীরভূমসন্তান গোবিন্দগোপাল সেনগুপ্ত ইতিহাসের যে মায়াকাজল পরিয়ে দিলেন তাতে ধীরে ধীরে কালসঞ্চিত আঁধার সরে গিয়ে সেই রাজনগর যেন মুখর হল : 'একবার শুন, একবার দেখ—বাঙালী যেমন ভাবে শুনিলে সব শুনিতে পায়, বাঙালী যে নয়নে দেখিলে সব দেখিতে পায়, তেমনই শ্রবণময় ও নয়নময় হইয়া আমার ভাববিহ্বল অস্ফুট ভাষা ও আমার আশাসুখকম্পিত লেখনী লিখিত আলেখ্য শুন ও দেখ : আমার বাঙালীজন্ম সার্থক হউক।'

পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ইতিহাস সম্পর্কিত দৈন্য নিজেদের কাছে পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে। ১৭৮৩ সালে উইলিয়াম জোন্স সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি হিসাবে ভারতে এলেন। মূলত তাঁর চেষ্টায় পরের বছর যে সোসাইটির জন্ম হল সেই প্রতিষ্ঠান থেকে ইতিহাস রচনার উদাত্ত আহ্বান সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। প্রাচ্যবিদ্যার ইতিহাস শাখায় কর্মচাঞ্চল্যের জোয়ার এল। বঙ্কিমচন্দ্র দেশবাসীর উদ্দেশ্যে ঐতিহাসিক প্রশ্ন রাখলেন : 'রাজ্যশাসনপ্রণালী কিরূপ ছিল, শান্তিরক্ষা কিরূপ হইত? রাজসৈন্য কতছিল, কি প্রকার ছিল, তাহাদিগের বল কি, বেতন কি, সংখ্যা কি? রাজস্ব কি প্রকারে আদায় করিত কে আদায় করিত, কি প্রকারে রক্ষিত হইত, কে হিসাব রাখিত? কত প্রকার কর্মচারী ছিল, কে কোন কার্য করিত, কি প্রকারে বেতন পাইত, কোনরূপে কার্য সমাধা

করিত ? কে বিচার করিত বিচারের নিয়ম কি ছিল, বিচারের সার্থকতা কিরূপ ছিল, প্রজার সুখ কিরূপ ছিল ? ধান্য কিরূপ হইত ? রাজা কি লইতেন, মধ্যবর্তীরা কি লইতেন, প্রজারা কি পাইত ? ...' প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের ধর্ম, লক্ষণ ও সংজ্ঞা বিশদভাবে সাধারণের বোধগম্য করে তুললেন।

জেলায় জেলায় গেজেটিয়ার, প্রথাবদ্ধ শিক্ষাদান, আঞ্চলিক গর্ব অঞ্চলপ্রীতি থেকে ইতিহাস-চেতনা, শুদ্ধ জ্ঞানলাভের আশায় ইতিহাস চর্চা, নিতান্তই কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্য ইতিহাস চর্চা এবং কখনো কখনো মনান্তরের অপপ্রয়োগে ইতিহাস মন্থতা মিলেমিশে প্রায় সারা ভারতের ইতিকথার একটা রূপরেখা গড়ে তুলল। বলাইবাহুল্য, এই বহিঃরেখায় বেশ কিছু ফাঁক রয়ে গিয়েছিল। সে ফাঁক পূরণের সাধনা শতাধিক বছর ধরে চলেছে। বীরভূম সংক্রান্ত সরকারী ও বেসরকারী অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হবার পর যে ফাঁকটুকু পড়ে আছে সেটুকু পূরণের জন্য কিছু পূর্বসংগৃহীত তথ্য যথাযথ বিশ্লেষণের জন্য এবং অনালোচিত স্থানে আলোক সম্পাতনের জন্য গোবিন্দগোপাল সেনগুপ্ত তাঁর 'রাজনগরের ইতিহাস ও অন্যান্য রচনা' গ্রন্থবদ্ধ করেছেন। এ গ্রন্থরচনায় তিনি একদিকে যেমন পূর্বপ্রকাশিত আকর গ্রন্থ ও রচনার সাহায্য নিয়েছেন তেমনি অন্যদিকে আঞ্চলিক লোকশ্রুতি ও লোককাহিনীকে যথার্থ ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে যাচাই করে উপস্থাপন করেছেন। মধ্যযুগের রাজনগর তাঁর গ্রন্থের মূল আলোচ্য বিষয় হলেও 'অন্যান্য রচনা' প্রসঙ্গে লেখক যে সমস্ত বিষয়ের অবতারণা করেছেন সেগুলিও কম আকর্ষণীয় নয়। কয়লা শিল্পের ইতিহাস, শতবর্ষ আগে বীরভূমের পুলিশ বিভাগ পরিচালনা, বাদশাহী সড়ক, শতবর্ষ আগে চাল উৎপাদন, বৈদ্যনাথের মন্দির ও শিরোমবাজ, বীরভূমে আখ চাষের পুরাতন কাহিনী, বীরভূমের চীপ সাহেব, বীরভূমের ফরাসী কুঠিয়াল ও কম্যার্শিয়াল এজেন্ট জন চার্জ এবং বীরভূমের পুরানো দিনের কথা—রাজনগরের ইতিহাসের সঙ্গে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোচনাগুলি উপরি লাভ হিসাবে গণ্য করা যায়। এগুলি যেন নানা জাতের এবং নানা রঙের ফুল। গ্রন্থকার শ্রী সেনগুপ্ত পৃথক পৃথক ফুল হিসাবেই তা উপহার দিয়েছেন, রঙ ও জাত অনুসারে মালা গাঁথেন নি। অথচ ফুল মালাকারের ভূমিকা পালন করলে, ভরসা হয়, হয়ত তিনি সমগ্রবীরভূমের আস্ত ইতিকথা আমাদের শোনাতে পারতেন। সহজ ঢিলেঢালা ভাষায় আটপৌরে পরিবেশনে তাঁর গবেষণা সম্ভার সাধারণের উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। রাজনগরের ইতিহাস শুধুমাত্র সাল-তারিখের কচকচিতে তিনি ভরে দেননি, সমাজ-সংস্কৃতি তথা প্রসঙ্গক্রমে তাঁর গ্রন্থে উল্লেখযোগ্য স্থান নিয়ে থেকেছে। ভবানীপুর গ্রামের দেবী ভবানী (যে মূর্তি চুরি অপহৃত হয়েছে) সম্পর্কে তিনি চিত্তাকর্ষক বিবরণী দান করেছেন তা প্রচলিত গ্রন্থে সুলভ নয়। এ ধরণের তথ্য নিঃসন্দেহে গ্রন্থ-সার্থকতার দিক নির্দেশ করে। সর্বোপরি যে দুর্লভ গুণটি না থাকলে আঞ্চলিক ইতিহাস লেখায় হাত দেওয়া উচিত কাজ নয় সেই নির্মোহ তথ্য প্রদানের দক্ষতা তিনি পূর্বের মতো এই গ্রন্থেও দেখিয়েছেন। সাধারণতঃ ভূমিসন্তানদের লিখিত ইতিহাস বহুলাংশে অন্ধতা তথা আত্যন্তিক অঞ্চলপ্রীতি দোষ দুষ্ট হয়। আশার ও আনন্দের কথা, বর্তমান গ্রন্থকার ঐ দুর্বলতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

লিপির শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ। ভূদেব চৌধুরী। জিজ্ঞাসা। কলি-২৯। মূল্য: আট টাকা।

সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিজস্বতা এত বিপুল এবং স্বতন্ত্র যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পারিবারিক সম্পর্কের তকমা জড়িয়ে সে সম্বন্ধে কিছু না বললেও চলে। এত বড় মৌলিক সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব আমাদের সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে খুব বেশী একটা নেই। অথচ পরম পরিতাপ এবং মর্মান্তিক লজ্জার কথা অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অধিক মূল্য বিচার হয়েছে এমন একখানিও গ্রন্থ লিখিত হয়নি। যে সমস্ত ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আলোচনা এবং সামান্য ছচারখানা বই লিখিত হয়েছে তা অধিকাংশই অবনীন্দ্রনাথের জীবনীমূলক রচনা অথবা জীবনস্মৃতি চারণা। বোধহয় অবনীন্দ্রনাথ: স্রষ্টা ও দ্রষ্টার পূর্ণাঙ্গ বিচার বিশ্লেষণের জন্য যে অধিকার দরকার তার অভাবই এতদিন অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একখানি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ রচনার বাধা হয়েছিল। ছবি, ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান না থাকলে অবনীন্দ্রনাথের সঠিক মূল্যবিচার সম্ভব নয়। অতি আনন্দের কথা এতদিনে অবনীন্দ্রনাথের উপর নির্ভরযোগ্য একখানি মূল্যবান গ্রন্থ রচিত হয়েছে। অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরীর জ্ঞান মনীষার আর এক সফল ফসল এই গ্রন্থ। বাংলা ভাষার সারস্বত সাধনার যে ধারাটি এখনো প্রবহমান রাখতে সহায়তা করে আসছেন সেই 'জিজ্ঞাসা' প্রকাশন এবারেও একেত্রে অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

'লিপির শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ' মোট একশ' ছিয়ানব্বই পৃষ্ঠার বই। 'নির্ঘণ্ট' এবং 'তথ্যপঞ্জি' (১৮৭ পৃষ্ঠা—১৯৬ পৃষ্ঠা) ব্যতীত মূল গ্রন্থটির ৫টি অধ্যায়: অবতরণিকা শিল্পী: ব্যক্তি: ব্যক্তিত্ব গদ্যের শিল্পী | রূপ-বাণীর শিল্পী | শিল্পের সন্ধানী।—এই বইতে লেখক অবনীন্দ্রনাথের শিল্পমানসিকতার স্বরূপ এবং ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের তথ্য ও সত্যনির্ভর পরিচয় দিয়েছেন। এ অতি কঠিন কাজ। বড় কঠিন, বিশেষত যে শিল্পীর লেখা দেখা হয়ে ওঠে, দেখা লেখা হয়ে ওঠে। যাঁর কথাগুলো একাধারে গান ও ছবি, ছবিগুলো একই সঙ্গে সুর ও কথা। অধ্যাপক চৌধুরী সাহিত্য ও শিল্প বিচারের ক্ষেত্রে যে অসাধারণ রসজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে তাঁর বিরল নিষ্ঠা এবং তর্কাতীত সফলতা।

এই গ্রন্থের বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় বক্তব্যের পূর্ণতা সৃষ্টির প্রয়াস। রূপ ও বাণীর শিল্পীর স্বভাব ও স্বরূপ উদ্ঘাটনের ক্ষেত্রে লেখক তাই রচনার ভাষা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও যেমন বিশ্লেষণাত্মক ভঙ্গী গ্রহণ করেছেন তেমনি সে রচনার সহজ নবীন আলোকোজ্জ্বল সাহিত্যিক সৌন্দর্যেরও আস্বাদনধর্মী সন্ধান দিয়েছেন। একেত্রে বোধহয় সেই আস্বেষণই বড় হয়ে উঠেছে। ভাষার যে 'কৌতুক' সৃষ্টি করে 'অবনঠাকুরের ভাষা' প্রকাশিত হয়েছিল, যে শব্দ প্রয়োগে 'রূপকথা'র জগৎ উদ্ঘাটিত হয়েছিল, তার রূপের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের মানসিক স্বভাবের যে সম্পৃক্তি ছিল সে সম্পর্কে অধ্যাপক চৌধুরী অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ের আলোচনা করেছেন। এও দেখিয়েছেন কীভাবে মেয়েলি. খাঁচটি (পৃ: ৩৪) অবনীন্দ্ররচনার 'আটপৌরে' চেহারা বানিয়েছে। দেখিয়েছেন অবনীন্দ্রনাথের গদ্যে, সাধু ও চলিতরীতির প্রয়োগবৈশিষ্ট্যটিও। কীভাবে বদিরে রীতির প্রয়োগ তাঁর রীতিবৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছে; ক্রমশঃ 'ক্ষীরের পুতুলে' এসে লেখা অবনীন্দ্রনাথের

মূর্তি' ধরে 'ছবিতে আঁকা গান' শুনিয়েছে।—কিন্তু একথা তবু স্বীকার করতেই হবে যে বাংলা গদ্যের ইতিহাসে অবনীন্দ্রনাথের গদ্যরচনার একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে;—সে কি কারণে এবং সে কারণের অন্তরঙ্গ স্বরূপটি কী এ বিষয়ে আরো গভীরতর রীতিবিজ্ঞান বিষয়ক বিশ্লেষণধর্মী আলোচনার আকাঙ্ক্ষা থেকে যায়। কোন্ অনির্বৈশিষ্ট্যে অবনীন্দ্রনাথকে 'রূপকথার রূপকার' (পৃঃ ২৯) করে তুললো? বাক্যের দৈর্ঘ্য, 'উচ্চারণ' রূপ, Parenthetic বাক্য দিয়ে কীভাবে ভাষার প্রকাশশীলতা, গদ্যস্পন্দন, তথা গদ্য সৌন্দর্য রচিত হয়েছে,—অবনীন্দ্ররচনায় তাঁর বিস্তৃতর বিশ্লেষণের অবকাশ রয়ে গেছে। বিশেষত যিনি তাজমহল না দেখে, অপূর্ব তাজমহল এঁকেছিলেন, যিনি 'দাদখৎ' ছবি এঁকে 'পদাবলীর রসে নিজের যৌবনতৃষ্ণাকে সাজিয়ে আমাদের এক নূতন প্রেমাতুরতা সৃষ্টি করেছিলেন শিল্পী নিজেই' সেই শিল্পীলেখকের লেখার রূপ ও রাগ দুইই জানা হলে তবেই তার পূর্ণতা আছে।

অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী বিপুল পরিশ্রমে, জ্ঞানে, নিষ্ঠায় যে কঠিন কার্য করেছেন তার তুলনা বিরল। বহু বিষয় সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা করে অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার উপলব্ধিও ঘটিয়েছেন। যেমন তাঁর রচনায় বিদেশী গ্রন্থের প্রভাব বিষয়ে পিটারপ্যান, অ্যাডভেঞ্চার অফ্ নাইলস প্রভৃতি গ্রন্থের মূলের সঙ্গে তুলনা করে অবনীন্দ্রনাথের মৌলিকত্ব সম্পর্কে সিদ্ধান্তে এসেছেন।

অবনীন্দ্রনাথের যাত্রাগানের পালা রচনার পটভূমি হিসাবে ঠাকুরবাড়ীর ঐতিহ্য, গিরীন্দ্রনাথের প্রভাব সম্পর্কে বিশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাও এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। অবনীন্দ্রনাথের কবিতা ও কাব্যচর্চার পরিচয়ও এই যাত্রাগানের মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু কবিতার ছন্দ আলোচনার ক্ষেত্রে লেখকের ব্যবহৃত পরিভাষা এবং অনেকক্ষেত্রে মতামতের সঙ্গে সকলে একমত হবেন না বলেই মনে হয়। যেমন, ১৫১ পৃষ্ঠায় 'প্রচলিত পয়ার ছন্দ'। অথবা ৪৪ পৃষ্ঠায় 'পূব পশ্চিমে…ঘুমো' অংশেরই ছন্দলিপি। পয়ার ছন্দ, না—ছন্দ আকৃতি? 'পয়ার' বন্ধে অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত যে কোন প্রকৃতির ছন্দই রচিত হতে পারে। দ্বিতীয়ত ছন্দলিপিতে 'পূব' 'মেঘ' 'উঠ' 'আর' 'কাল' 'ঘুম' 'মার' শব্দ ও শব্দাংশের মাথায় কষি (—) চিহ্ন কেন ব্যবহৃত হয়, এবং 'পশ্চিমে'র 'পশ্' 'বৃষ্টির বৃষ্, 'রাজ্যে'র 'রাজ' 'দুই'র উপর '—' চিহ্ন ব্যবহৃত হল না কেন? এই চিহ্ন কি রুদ্ধদলের (closed syllable) দ্যোতক? পশ্চিমে (১১১), 'মেঘ' এবং 'ঘুম' হল কেন?—এ সমস্ত প্রশ্ন উঠতেই পারে কিন্তু মনে রাখতে হবে 'লিপির শিল্পী অবনীন্দ্রনাথে' কবিতার ছন্দ বিশ্লেষণ মুখ্য বিষয় নয়। বস্তুত কবিতা অবনীন্দ্রনাথের পৃথক ভাবনা নয়। গানের সুরে, কথার রূপে, ছবির রঙে মিলেমিশে সব রঙীন, রামধনুর উজ্জ্বল আকাশ অবনীন্দ্রনাথের সৃষ্টির আকাশ। অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী সেই আকাশেরই ছবি পথে, ধ্বনিতে লিখে উপহার দিয়েছেন।

অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বহু তথ্য, বহু চিন্তা এই বইতে পাঠক পাবেন। লেখক এবং অবশ্যই জিজ্ঞাসার মত প্রকাশকও এজন্য ধন্যবাদার্হ। বাংলা সাহিত্যের সকল অনুরাগীই এজন্য কৃতজ্ঞ থাকবেন।

নবেন্দু সেন

বাঙালীর খেলাধুলা। শঙ্কর সেনগুপ্ত। ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশন্স্। মূল্য ১৮ টাকা।

বাঙালী জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে শ্রীশঙ্কর সেনগুপ্ত নানা ধরণের গ্রন্থ রচনা করে যাচ্ছেন দীর্ঘদিন থেকে। বাংলার লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে। এবার তিনি এসেছেন 'বাঙালীর খেলাধূলা' নিয়ে।

প্রথম পর্বে দিয়েছেন পরিচয়। এখানে নাগরিক খেলার বিবরণের সঙ্গে স্থান পেয়েছে বঙ্গসংস্কৃতির পটভূমিতে খেলাধূলার ভূমিকাটি, পরবর্তী পর্বে আছে দলের খেলা। এখানে হাডুডু, খোখো, ডাণ্ডাগুলি, বউ ছি, গোল্লাছুট প্রভৃতি স্থান পেয়েছে। শিশুতোষ ও ছোটদের খেলার পর্বে আছে আগডুম বাগডুম, টোকাটুকি, এক্কা দোক্কা প্রভৃতি। জলের খেলার বাইচি, নৌকাবাইচ, সাঁতার প্রভৃতির উপর মনোরম আলোচনা, অন্তরীক্ষের খেলায় ঘুড়ি, ফানুস, পায়রা ওড়ানো প্রভৃতি এবং ধর্মীয় ও বুদ্ধির খেলায় আছে আংটিখেলা, কাদা খেলা, রংখেলা, মুরগীর লড়াই,, সাপখেলা, মার্বেল খেলা, সমস্যাপূরণ বা ধাঁধার খেলা প্রভৃতি। এছাড়া গ্রন্থে প্রায় চল্লিশোর্ধিক স্কেচ ও ফোটো। গ্রন্থশেষে নির্ঘণ্ট গ্রন্থের মূল্য বৃদ্ধি করেছে।

গ্রন্থ-প্রসঙ্গে বলেতে গিয়ে লেখক খেলা বলতে কি বোঝেন তা পরিষ্কার করেছেন, পরিষ্কার করেছেন বর্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্যও। সমস্ত খেলাই ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামে আলোচিত। তবে 'পৃষ্ঠা সংখ্যা সীমার মধ্যে এবং গ্রন্থের মূল্য আয়ত্তাধীন রাখতে গিয়ে ক্রীড়াপদ্ধতির পূর্ণ বিবরণ দেয়া যায় নি। কিছু মুদ্রণ প্রমাদও থেকে গেল।...দোষত্রুটি সত্ত্বেও বাঙালীর খেলাধূলা বিষয়ে কতটুকু আলোচনা এখানে স্থান পেয়েছে তার দ্বারাই বাঙালীর জীবন ও সংস্কৃতি বিকাশে খেলাধূলার ভূমিকা নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। এ প্রচেষ্টায় যে অভাববোধ স্পষ্ট তার জন্য লেখকের অজ্ঞতা দায়ী নিশ্চয়ই। কিন্তু তার চেয়েও অনেক বেশী দায়ী তাঁর আর্থিক অসচ্ছলতা। আর্থিক দুর্দশার জন্য ক্ষেত্র-সমীক্ষা করতে গিয়ে বারে বারে দম নিতে হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য বারে বারে ছাটকাট করতে হয়েছে। কোন একটা বিষয় পুনর্বার জানার দরকার হলে পুনরায় গ্রামে ছুটে যাওয়া যায়নি, মূলত আর্থিক অনটনের জন্যই।' এটা মর্মান্তিক। বর্তমানে যখন এ ধরণের কাজের ব্যাপারে সরকার দরাজ ও অকৃপণ বলে ঘোষণা শুনি তখন সত্যিকারের একজন কর্মী বিশ বছরের অধিকাল নিরলস অধ্যবসায় ও সাধনায় নিয়োজিত থাকার পরও যদি এই আক্ষেপ করেন তবে তার চেয়ে লজ্জার কথা আর কি হতে পারে।

বর্তমান গ্রন্থটি প্রত্যেকটি বাঙালীর পাঠ করা উচিত। বিশেষত বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের কাছে এটি বিশেষ উপকারে আসবে। কেননা বহু পাঠ্যখেলা এমন সুন্দর ভাবে এখানে আলোচিত যা পাঠ্যপুস্তকে পাওয়া যায় না। বিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর জন্য এটি অমূল্য গ্রন্থ। তাছাড়া শারীর শিক্ষা ও খেলাধূলার ক্লাব, সংগঠন এবং ক্রীড়ামোদীদের এ গ্রন্থটি ভাল লাগবে।

শ্রীশঙ্কর সেনগুপ্ত বাংলা ও বাঙালী সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্যপূর্ণ ও পরিশ্রমী গ্রন্থ রচনা করে যাচ্ছেন তার জন্য কর্তাভজা বা স্বঘোষিত বিধানদের কাছে যে ধরণের ব্যবহারই পান না কেন, আপামর বাঙালী তাঁকে দীর্ঘদিন মাথায় করে রাখবে। তিনি ইতিহাসে স্থান পাবেন।

আমিনুল ইসলাম বেগ

A
R
U
N
A

DURABLE
STYLISH
SPECIALITIES
Sanforised:
Poplins
Shirtings
Check Shirtings
SAREES
DHOTIES
LONG CLOTH
Printed:
Voils
Lawns Etc.
in Exquisite
Patterns
ARUNA
MILLS LTD.
AHMEDABAD

A
R
U
N
A

সমকালীন

এই সময়ে সহরের সম্পন্ন মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থদিগের গৃহে 'বাবু' নামে এক শ্রেণীর মানুষ দেখা দিয়াছিল। তাহারা পারসী ও স্বল্প ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে প্রাচীন ধর্মে আস্থাবিহীন হইয়া ভোগ-সুখেই দিন কাটাইত।

রামতনু লাহিড়ীর কলকাতা

এই বাবুরা দিনে ঘুমাইয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া, বুলবুলির লড়াই দেখিয়া, সেতার, এসরাজ, বীন প্রভৃতি বাজাইয়া, কবি, হাপ-আখড়াই, পাঁচালি প্রভৃতি শুনিয়া, রাত্রে বারাঙ্গনাদিগের আলয়ে আলয়ে গীতবাদ্য ও আমোদ করিয়া কাল কাটাইত।

শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' হইতে।

এ কাহিনী যখনকার রামতনু লাহিড়ী তখন বালক। আর কলকাতা তখন শিশু। তখনো ফুটপাত তৈরী হয়নি কলকাতায়। রাস্তার দুধারে নর্দমা। পুকুরে পুকুরে পচা জল। ঘরে ঘরে বিষাক্ত অসুখ, যার নাম 'নোনা-লাগা'।

আজকের চোখে সেকালের কলকাতা যেন অনেকটা দুঃস্বপ্নের মতো। কিন্তু আজকের চোখে আজকের কলকাতাও কি কম দুঃস্বপ্ন? কলকাতা বড় হয়েছে। দশদিকে ছড়িয়ে পড়েছে তার কর্মকাণ্ডের বৃহৎ জগৎ। অথচ তার অগ্রগতি ব্যাহত। ব্যাহত, কারণ জীবন যাত্রার পরিবেশ মন্থর। মন্থর, কারণ লোকসংখ্যার তুলনায় যানবাহন অল্প, যানবাহনের তুলনায় পথ সংকীর্ণ। আজকের এই কলকাতাকে নতুন গতিবেগে উজ্জীবিত করতে পারে ভূগর্ভ রেল। ভূগর্ভ রেল মানেই দ্রুতগতি অথচ নির্বিঘ্ন ভ্রমণ।

MTP

কলকাতার নতুন মানচিত্র রচনায় ভূগর্ভ-রেল

মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (রেলওয়েজ)

medium

মহামহোপাধ্যায় ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর (বঙ্গাব্দ, শ্রাবণ ১২৯৪) অবিভক্ত বঙ্গের ঢাকা জেলার ধামরাই গ্রামে মাতুলালয়ে গোপীনাথের জন্ম হয়। অবিভক্ত বঙ্গের মৈমনসিংহ জেলার অন্তর্ভুক্ত ধান্যা গ্রাম গোপীনাথের পিতৃগৃহ ছিল। বারেন্দ্র শ্রেণীর 'বাগ্‌চী' উপাধিধারী এই ব্রাহ্মণ পরিবারের কোন পূর্বপুরুষ চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন করায় এই পরিবার 'কবিরাজ' উপাধিতে পরিচিত হইয়া যান। গোপীনাথের পিতা বৈকুণ্ঠনাথ বাল্যবয়সে পিতৃহীন হইয়া ধান্যাগ্রাম সমীপবর্তী কাঠালিয়া গ্রাম-বাসী মাতুল পণ্ডিত কালাচাঁদ সান্যালের আশ্রয়ে লালিত পালিত হন। বৈকুণ্ঠনাথ অতিশয় মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে সংস্কৃত অনার্স সহ বি-এ পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ডন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা) প্রভৃতি বৈকুণ্ঠনাথের সহপাঠী বা সুহৃদ ছিলেন। কৃতিত্বের সহিত বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৈকুণ্ঠনাথ এম-এ অধ্যয়নের নিমিত্ত কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হন। দুর্ভাগ্যবশতঃ কলেজে অধ্যয়নকালেই ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বৈকুণ্ঠনাথ কিছুকাল পীড়াভোগ করার পর অপ্রত্যাশিত ভাবে পরলোক গমন করেন।

তৎকালীন প্রথানুসারে বাল্যাবস্থাতেই ধামরাই গ্রামনিবাসী হরিশ্চন্দ্র রায় মৌলিকের কন্যা সুখদাসুন্দরীর সহিত বৈকুণ্ঠনাথের বিবাহ হইয়াছিল। বৈকুণ্ঠনাথের মৃত্যুকালে গোপীনাথ মাতৃগর্ভে ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পাঁচ মাস পর তিনি ভূমিষ্ঠ হন।

বৈকুণ্ঠনাথের মৃত্যুর পর গোপীনাথ জননী সহ পিতার মাতুলালয় কাঠালিয়া গ্রামে আশ্রয় লাভ করেন। বৈকুণ্ঠনাথের মাতুল কালাচাঁদের জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম ছিল [illegible]। [illegible] [illegible]

তাঁহার পৌত্র-কন্যা ভাগিনেয়-তনয়ের নাম রাখেন গোপীনাথ। নবম বর্ষ বয়সে উপনয়ন সংস্কারের পর গোপীনাথ নিয়মিত ভাবে এই গৃহদেবতার পূজা করিতেন। এগার বৎসর বয়স পর্যন্ত গোপীনাথ কাঁঠালিয়া গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণ করেন। এই সময় ধামরাই গ্রামে একটি নূতন বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়াতে গোপীনাথ কাঁঠালিয়া হইতে আসিয়া এই বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। পাঁচ বৎসর এই বিদ্যালয়ে পাঠকালে গোপীনাথ পণ্ডিত হারাণচন্দ্র চক্রবর্তী ও প্রসন্নকুমার চক্রবর্তীর নিকট উত্তমরূপে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন।

জন্মাবধি পিতার মাতুল কালাচাঁদ সান্যাল মহাশয়ই গোপীনাথ ও তাঁহার মাতার অভিভাবক ছিলেন। কালাচাঁদের চেষ্টায় ও আগ্রহে মাত্র ১৩ বৎসর বয়সে হাসানিয়া গ্রামনিবাসী পণ্ডিত ব্রজশঙ্করের কন্যা কুসুমকামিনীর সহিত গোপীনাথের বিবাহ হয়। বিবাহের কিছুকাল পরেই কালাচাঁদ অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। কালাচাঁদের মৃত্যুতে গোপীনাথ পরিবার নিরাশ্রয় হইয়া পড়িলে গোপীনাথের শ্বশুর মহাশয়ের সহোদর পণ্ডিত কার্তিকশঙ্কর তর্কালঙ্কার স্বেচ্ছায় এই ক্ষুদ্র পরিবারের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন। ধামরাই বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণী (তদানীন্তনকালের তৃতীয়) পর্যন্ত পড়িয়া গোপীনাথ ঢাকা কে-এল জুবিলী স্কুলে প্রবিষ্ট হন ও ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে এই বিদ্যালয় হইতেই কৃতিত্বের সহিত প্রথম বিভাগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। গোপীনাথ সুপণ্ডিত পিতার সুনির্বাচিত পুস্তকসংগ্রহটি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হইয়া বাল্যকাল হইতেই তাহার সম্যক্ সদ্ব্যবহার করেন। ধামরাই স্কুলে পাঠকালেই তিনি পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি লিখিত 'সিদ্ধান্ত-কৌমুদী টীকা' এবং রামনাথ সরস্বতী-কৃত 'চিত্রবোধ ব্যাকরণ' আয়ত্ত করেন। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও লেখক অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত মহাশয় ধামরাই গ্রামবাসী ছিলেন। এই পণ্ডিত ব্যক্তির সহায়তায় গোপীনাথ বাল্যকালেই সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ জ্ঞানলাভ করেন। ঢাকায় অবস্থিতিকালে তিনি পণ্ডিত রজনীকান্ত আম্বিন ও বিধুভূষণ গোস্বামীর নিকট বিশেষ ভাবে পাণিনি ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। বাল্যকাল হইতেই গোপীনাথ ইংরেজী ভাষায় পাঠ্য বহির্ভূত নানা গ্রন্থ পাঠঅভ্যাস করেন। এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই তিনি সেক্সপীয়র, মিলটন, বাইরন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও ইমার্সনের রচনাবলী পাঠ শেষ করিয়াছিলেন। ঢাকা অবস্থিতিকালে তিনি ধর্মজ্ঞ রামলাল মজুমদার, প্রসিদ্ধ আইনজীবী ও দেশহিতৈষী আনন্দচন্দ্র রায়, অধ্যাপক হেমচন্দ্র মৈত্র, রসায়নবিদ্ হরিনাথ দে, বান্ধব-সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ, দেশনেতা বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি মনীষীগণের সংস্পর্শে আসার সুযোগ লাভ করেন। ছাত্রাবস্থাতেই 'বান্ধব' পত্রিকায় তাঁহার রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। এন্ট্রান্স পরীক্ষার পর গোপীনাথ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া দীর্ঘকাল শয্যাশায়ী থাকেন, এই জন্য যথাসময়ে তিনি কলেজে ভর্তি হইতে পারেন নাই। চিকিৎসকের পরামর্শে তিনি মধুপুর, দেওঘর প্রভৃতি স্থানে প্রায় একবৎসর থাকিয়া কলিকাতায় আসেন। কলিকাতায় কলেজে ভর্তি হইলে পিতৃবন্ধুগণের নিকট হইতে নানাপ্রকার সাহায্য প্রাপ্তির আশ্বাস পাইয়াও গোপীনাথ ম্যালেরিয়া পুনরাক্রমণের ভয়ে কলিকাতায় কলেজে ভর্তি না হইয়া সহায় সম্বলহীন অবস্থায় রাজপুতানায় (বর্তমান রাজস্থান) জয়পুর রাজ্যের জয়পুর সহরে চলিয়া আসেন। এখানে আসিয়া তিনি প্রথমে জয়পুর কলেজের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় দুর্গাপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দেবনাথ ভট্টাচার্যের সহিত পরিচিত হন ও

সাময়িকভাবে তাঁহার আশ্রয় লাভ করেন। কিছুদিন পর জয়পুর রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী সংসারচন্দ্র সেন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ তাঁহার পুত্র জয়পুর মহারাজার উপ-সচিব অবিনাশচন্দ্র সেনের গৃহে গোপীনাথ গৃহশিক্ষকরূপে আশ্রয় লাভ করেন। আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা হইলে গোপীনাথ জয়পুর মহারাজা কলেজের প্রথম বার্ষিক এফ-এ শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। গোপীনাথের ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া মহারাজা কলেজের অধ্যাপক নবকৃষ্ণ রায় গোপীনাথের জন্য কলেজ হইতে মাসিক ১৫্ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দেন। ইতিমধ্যে আত্মীয় ও হিতৈষীগণের চেষ্টায় গোপীনাথের জননী ও সহধর্মিণী গোপীনাথের পিতৃগৃহ কাস্তায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হন। ইহারাই গোপীনাথের জয়পুর অবস্থিতিকালে এই পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করেন। জয়পুর কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পাঠকালে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের যে অধিবেশন* হয় গোপীনাথ তাহাতে একজন প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন। এই অধিবেশনে যোগদান করিয়া তিনি দাদাভাই নওরোজী, বিপিনচন্দ্র পাল, বালগঙ্গাধর তিলক, অরবিন্দ ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাশ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, লালমোহন ঘোষ প্রভৃতি দেশনেতাদের দর্শন ও ভাষণ শ্রবণের সুযোগ লাভ করেন। ১৯০৬ হইতে ১৯১০ পর্যন্ত গোপীনাথ জয়পুর কলেজে অধ্যয়নরত থাকাকালে জয়পুর সাধারণ পুস্তকালয় ও সংসারচন্দ্র সেনের বিশাল পাঠাগারের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন। এই সময় তিনি ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন, প্রাচীন ভারতীয় ও মধ্যযুগীয় ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব এবং চসার হইতে আরম্ভ করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ইংরাজ কবিকুলের রচনাবলী বিশেষ যত্নের সহিত পড়িয়া ফেলেন। ইউরোপীয় সাহিত্যের দিক্‌পালগণের রচনাবলী ও তিনি ইংরেজী অনুবাদের সাহায্যে পাঠ করেন। এই সময় তিনি বৌদ্ধ ও বেদান্ত দর্শনও বিশেষভাবে অনুশীলন করেন। বারাণসী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ আর্থার ভেনিস কর্তৃক ইংরাজী ভাষায় অনূদিত 'বেদান্ত-সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী' ও 'বেদান্ত-পরিভাষা' গ্রন্থদ্বয় পাঠ করিয়া গোপীনাথ ইঁহার পাণ্ডিত্যের প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদ, বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গোপীনাথ ইঁহার নিকট অধ্যয়নার্থ কাশী আগমন করেন। এই সময় কাশীতে কেদারঘাটে তাঁহার এক আত্মীয়া বাস করিতেন। গোপীনাথ তাঁহার আশ্রয় পাইয়া কাশী কুইন্স কলেজে এম-এ অধ্যয়নের নিমিত্ত ভর্তি হন। এই সময়ে কাশী কুইন্স কলেজের দুইটি বিভাগ ছিল, একটি ইংরেজী মাধ্যম এম-এ, এম-এস্‌-সি ও অপরটি প্রাচীন চতুষ্পাঠী প্রথায় 'আচার্য' শ্রেণী পর্যন্ত সংস্কৃত বিভাগ। দুই বিভাগ একই ভবনে অধ্যক্ষ ডঃ আর্থার ভেনিসের পরিচালনাধীন ছিল। কুইন্স কলেজের সংস্কৃত বিভাগটি সাধারণভাবে বারাণসী সংস্কৃত কলেজ নামে অভিহিত হইত। অধ্যক্ষ ডাঃ ভেনিস গোপীনাথের জ্ঞানের গভীরতা পরীক্ষা করিয়া ও তাঁহারই নিকট পড়িবার নিমিত্ত কলিকাতার অধ্যয়নের সুযোগ ত্যাগ করিয়া তিনি কাশী আসিয়াছেন জানিয়া বিশেষ প্রীত হন। ডঃ ভেনিসের পরামর্শে গোপীনাথ 'ডি' গ্রুপে এম-এ শ্রেণীতে এবং একই সঙ্গে সংস্কৃতের আচার্য শ্রেণীতে ভর্তি হন। সংস্কৃত এম-এ পরীক্ষার জন্য ডি গ্রুপে অন্যান্য সাধারণ পাঠ্যের সহিত বিশেষভাবে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি, প্রত্নতত্ত্ব লিপিতত্ত্ব পাঠ্য ছিল। আচার্য বিভাগের ছাত্ররূপে গোপীনাথ ন্যায় শ্রেণীতে বামাচরণ ভট্টাচার্যের নিকট তর্কভাষা ও ভামতী (টীকা) পাঠারম্ভ করেন। একাদিক্রমে প্রায় ১০ খণ্ডিকা পর্যন্ত আচার্য শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়া গোপীনাথ কাশী

ফিরিয়া আহার করিতেন। আহারের পর দিবা ভাগে এম-এ শ্রেণীতে পড়িতে আসিতেন। এই ভাবে প্রত্যহ আট মাইল হাঁটার ফলে তাঁহার শরীর দুর্বল হইয়া পড়ে। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদে প্রথম বার্ষিক পরীক্ষা দিতে গিয়া গোপীনাথ বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়েন ইহার ফলে পরবর্তী জুলাই মাসে দ্বিতীয় বার্ষিক এম-এ শ্রেণীতে অধ্যয়ন তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে। চিকিৎসকের পরামর্শে এক বৎসরকাল পুরী প্রভৃতি স্থানে থাকিয়া ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে তিনি পুনরায় কলেজে যোগদান করেন। এই সময়ে অধ্যক্ষ ডঃ ভেনিস গোপীনাথের কলেজের ছাত্রাবাসে থাকার ব্যবস্থা করিয়া দেন এবং একটি মাসিক বৃত্তিরও ব্যবস্থা করেন। এম-এ শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে গোপীনাথ ফরাসী ও জার্মান ভাষাও শিক্ষা করেন, ইহা দ্বারা তিনি ফরাসী ও জার্মান ভারত তত্ত্ববিদের মূল রচনাগুলি অধ্যয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে গোপীনাথ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত এম-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এই পরীক্ষায় ইতিপূর্বে কোন পরীক্ষার্থীই এত অধিক 'নম্বর' পান নাই। গোপীনাথের এম-এ পরীক্ষার সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর লাহোর কলেজ ও আজমীরের মেয়ো কলেজ হইতে উচ্চ বেতনে অধ্যক্ষ পদ গ্রহণের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ জানান হয়। কিন্তু পরম হিতৈষী শিক্ষাগুরু ভেনিসের অনুরোধে তিনি এই পদ প্রত্যাখ্যান করেন ও তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী একটি বৃত্তি লইয়া অশোকের শিলালিপি সম্বন্ধীয় গবেষণায় রত হন। কিছুদিন পর কাশী সংস্কৃত কলেজ বা কুইন্‌স কলেজ ভবনে অবস্থিত "সরস্বতী ভবন" নামীয় পাঠাগারটি সংগঠনের ভার পাইয়া ডঃ ভেনিস গোপীনাথকে মাসিক ১২৫ টাকা বেতনে ইহার গ্রন্থাগারিক ও তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে গোপীনাথ এই সরকারী পদে নিযুক্ত হন। কিছুদিন পর ডঃ ভেনিসের চেষ্টায় সরস্বতী ভবনে একটি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হয়, ডঃ ভেনিস গোপীনাথকে মাসিক দুইশত টাকা বেতনে ইহার অধ্যক্ষ বা 'ডাইরেক্টর' নিযুক্ত করেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে কুইন্‌স কলেজের ইংরেজী ও সংস্কৃত বিভাগ পৃথক করিয়া দুইজন অধ্যক্ষের অধীন রাখার ব্যবস্থা হয়। ডঃ ভেনিস অতঃপর সংযুক্ত প্রদেশের সংস্কৃত শিক্ষা বিভাগীয় সুপারিন্টেন্‌ডেন্টরূপে অন্যান্য দায়িত্বের সঙ্গে কুইন্‌স কলেজের সংস্কৃত বিভাগ ও সরস্বতী ভবনের কর্তৃত্বও লাভ করেন। এই পদাধিকার বলেই তিনি সরস্বতী ভবন সংগঠন করেন ও একটি গবেষণা বিভাগেরও প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ডঃ ভেনিসের মৃত্যুর পর মহামহোপাধ্যায় ডঃ গঙ্গানাথ ঝা তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। ডঃ ঝা গোপীনাথের মতই ডঃ ভেনিসের প্রিয় ছাত্র ছিলেন এই জন্য উভয়ের মধ্যে ভ্রাতৃ-তুল্য সৌহার্দ ছিল। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গানাথ কুইন্‌স কলেজের সংস্কৃত বিভাগের (গভর্নমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের) অধ্যক্ষ পদ ত্যাগ করিলে গোপীনাথ এই অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে তিনি একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিতরূপে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

সরস্বতী ভবনে লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ হইতে গভর্নমেণ্ট কর্তৃক সংগৃহীত বহু দুর্লভ সংস্কৃত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সরস্বতী ভবনে ছিল। কুইন্‌স কলেজের ভারততত্ত্ব বিষয়ক মুদ্রিত সংস্কৃত সহ বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা ও ইংরাজী সহ বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় প্রকাশিত ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে সরস্বতী ভবনে স্থানান্তরিত করা হয়। ডঃ ভেনিসের নির্দেশে গোপীনাথ এই উভয় বিভাগই সংগঠন করেন। মৃত্যুর পূর্বে ডঃ ভেনিস গোপীনাথকে বলেন যে সরস্বতী ভবনে সংস্কৃত গ্রন্থের

পাণ্ডুলিপির মধ্যে বহু অমূল্যনিধি আত্মগোপন করিয়া আছে। এইগুলি সুসম্পাদন দ্বারা মুদ্রিত করা সরস্বতী ভবন প্রতিষ্ঠানের কর্তব্য হইবে। তিনি আরও পরামর্শ দেন যে মূল পুস্তক ব্যতীত দ্বিতীয় আর এক শ্রেণীর গবেষণামূলক গ্রন্থমালাও প্রকাশ করা হইবে। প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থমালা— '(প্রিন্স অব্ ওয়েলস) সরস্বতী ভবন টেক্সট্স' ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রন্থমালা 'সরস্বতী ভবন ষ্টাডিজ' নামে অভিহিত হইবে। শিক্ষাগুরুর উপদেশ শিরোধার্য করিয়া গোপীনাথ এই গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থ কিরণাবলী ভাস্কর স্বয়ং ভূমিকা সহ সম্পাদন করিয়া ১৯২০ খ্রীঃ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থটি বৈশেষিক দর্শন বিষয়ে উদয়নাচার্য রচিত কিরণাবলী গ্রন্থের পদ্মনাভ মিশ্রকৃত ভাষ্য। সরস্বতী ভবন টেক্সটস গ্রন্থমালায় গোপীনাথ এইরূপ আর নয়টি গ্রন্থ ভূমিকা সহ সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। এই প্রাচীন গ্রন্থগুলি বৈশেষিক ও ন্যায় দর্শন, তন্ত্র ও ভক্তি শাস্ত্র সম্বন্ধীয় ছিল। 'সরস্বতী ভবন টেক্সটস' গ্রন্থমালায় স্বয়ং দশখানি গ্রন্থ সহ-সম্পাদন ব্যতীত গোপীনাথ অপর পণ্ডিতগণ কর্তৃক সম্পাদিত এই গ্রন্থমালায় আর ২১ খানি নানা বিষয়ক গ্রন্থের বিস্তৃত ভূমিকা রচনা করেন। 'সরস্বতী ভবন 'টেক্সটস' সমগ্র বিশ্বের সংস্কৃতানুরাগী সমাজে বহুলভাবে আদৃত হয় এবং ইহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকাগুলির রচয়িতা-রূপে গোপীনাথের পাণ্ডিত্য-খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সরস্বতী ভবন গ্রন্থমালার বাহিরে ভারতের বিভিন্ন স্থানের পণ্ডিত ব্যক্তিগণ কর্তৃক লিখিত আরও প্রায় বারটি মূল্যবান সংস্কৃত গ্রন্থের ভূমিকাও গোপীনাথ কর্তৃক রচিত হয়। এই পুস্তকগুলি ব্রহ্মসূত্রের শক্তিভাষ্য, তন্ত্র, স্মৃতি, ন্যায়-দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে লিখিত ছিল। গোপীনাথ স্বয়ং কোন মৌলিক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন নাই। তাঁহার সর্বশাস্ত্রপারঙ্গমতা ও মৌলিক চিন্তার পরিচয় তাঁহার লিখিত ভূমিকাগুলির মধ্যেই বিধৃত আছে।

জয়পুর, কাশী, সাগর (মধ্যপ্রদেশ) প্রভৃতি স্থান হইতে সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকায় বেদ, যোগ, তন্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে গোপীনাথ অনেকগুলি মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

সরস্বতীভবনের অধ্যক্ষতাকালে গোপীনাথ এইস্থানে রক্ষিত সংস্কৃত-গ্রন্থসমূহের দুইখণ্ড বিবরণাত্মক সূচী ও প্রকাশ করিয়াছিলেন। গোপীনাথের চেষ্টায় সরস্বতী ভবনে রক্ষিত বহু অমূল্য গ্রন্থের সন্ধান লাভ পণ্ডিতদের পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল। সরস্বতী ভবনে রক্ষিত দুর্লভ সংস্কৃত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিগুলি গোপীনাথের নিজের নানামুখী জ্ঞান সাধনায়ও বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল।

'সরস্বতী ভবন ষ্টাডিজ' নামক গবেষণা গ্রন্থমালায় ইংরাজী ভাষায় গোপীনাথ বিভিন্ন বিষয়ে ৩০টি গবেষণামূলক নিবন্ধ রচনা করিয়া প্রকাশ করেন (১—১০, খণ্ড, ১৯২২—৩৮)। ন্যায় বৈশেষিক দর্শন, ভক্তিসূত্র, তন্ত্র, শৈব-দর্শন, সাংখ্যতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয় এই গবেষণামূলক নিবন্ধগুলির উপজীব্য ছিল। 'জার্নাল অব ইউ-পি-হিষ্টোরিক্যাল সোসাইটি', 'এ্যানালস অব দি ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট' জার্নাল অব দি গঙ্গানাথ ঝা রিসার্চ ইনষ্টিটিউট' প্রভৃতি গবেষণা মূলক পত্রিকায় ও 'হিন্দুস্থান রিভিউ' 'মডার্ণ রিভিউ' 'কল্যাণ-কল্পতরু' প্রভৃতি ইংরাজী সাময়িক পত্রে গোপীনাথ বিভিন্ন বিষয়ে অনেকগুলি গবেষণামূলক নিবন্ধ প্রকাশ করেন। ভারত সরকারের শিক্ষাবিভাগের উদ্যোগে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনের যে সুবৃহৎ ইতিহাস বিশ্বের বিশেষজ্ঞ দার্শনিক-মণ্ডলী কর্তৃক লিখিত হইয়া প্রকাশিত হয় উহার শাক্ত-দর্শন সম্বন্ধীয় অধ্যায়টি গোপীনাথ কর্তৃক রচিত হয় (১ম খণ্ড, ১৯৫০—৫১)। এই প্রসঙ্গে গোপীনাথ কর্তৃক রচিত আগমশাস্ত্রে কাশীর

পণ্ডিতগণের অবদান (সিলভর জুবিলী ভল্যুম, ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন, বারাণসী, ১৯৩০), মধ্যযুগে কাশীর বাঙ্গালী পণ্ডিতগণ (বিবেকানন্দ স্মারকগ্রন্থ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৫), বৈতাদ্বৈতবাদে কৈবল্যের স্থান (কাশী বিদ্যাপীঠ রজত জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ) প্রভৃতি ইংরাজী প্রবন্ধাবলীর নাম উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন পণ্ডিতগণ কর্তৃক লিখিত ১৩টি ইংরাজী গ্রন্থের ভূমিকাও গোপীনাথ কর্তৃক রচিত হইয়াছিল। ইংরাজী ভাষায় গোপীনাথ ৩টি গ্রন্থ রচনা করেন।

বাল্যকাল হইতেই গোপীনাথ মাতৃভাষা বাংলার চর্চায় অভ্যস্ত হন। ঢাকায় স্কুলে পাঠকালেই তাঁহার রচিত কবিতা বান্ধব পত্রে প্রকাশিত হয় (১৩১১ বঙ্গাব্দ)। যৌবন হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত বাংলার বাহিরে বাস করিলেও জীবনান্ত কাল পর্যন্ত তিনি বাংলা ভাষার অনুশীলন করেন। বান্ধব (ঢাকা), আরতি (মৈমনসিংহ), প্রবাসী (এলাহাবাদ ও কলিকাতা), প্রতিভা (ঢাকা), প্রবাস জ্যোতি (বারাণসী), অলকা (বারাণসী) বঙ্গসাহিত্য (বারাণসী), সাধন পথ (বারাণসী), বিশ্ব-বাণী (কলিকাতা), উদ্বোধন (কলিকাতা), আনন্দবার্তা (বারাণসী), হিমাদ্রি (কলিকাতা), বিভব বারাণসী), সুদর্শন (কলিকাতা) প্রভৃতি সাময়িক পত্রে গোপীনাথ ধর্ম-দর্শন ও সাহিত্য সংক্রান্ত প্রায় দেড়শত জ্ঞান গর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। গোপীনাথ প্রায় ত্রিশখানি বাংলা গ্রন্থের অতি পাণ্ডিত্য পূর্ণ দীর্ঘ ভূমিকাও রচনা করিয়াছিলেন, ইহাদের মধ্যে ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালের গীতা (ইং ১৯৩০) প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী জপসূত্র (ইং ১৯৫৩), সীতারাম দাস ওঁকারনাথের সাধকজীবনামৃত (১৯৫৬), প্রাণকিশোর গোস্বামী অনূদিত জ্ঞানেশ্বরী (ইং ১৯৬১), ডাঃ রাম অধিকারী অনূদিত প্রত্যভিজ্ঞা হৃদয় (১৯৬৬) প্রভৃতি গ্রন্থের নাম উল্লেখযোগ্য। গোপীনাথের স্বরচিত মৌলিক গ্রন্থের মধ্যে শ্রীবিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ (৩ খণ্ড), অখণ্ড মহাযোগ, ভারতীয় সাধনার ধারা, তান্ত্রিক সিদ্ধান্ত ও সাধনা, শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থের নাম উল্লেখযোগ্য।

আযৌবন হিন্দী-ভাষী অঞ্চলবাসী গোপীনাথ হিন্দী ভাষাতেও বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। কাশীবিদ্যাপীঠ পত্রিকা, কল্যাণ (গোরক্ষপুর), হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন পত্রিকা, নাগরী প্রচারিণী পত্রিকা, আজ (বারাণসী), বিহার রাষ্ট্রভাষা পত্রিকা (পাটনা) প্রভৃতি পত্রপত্রিকায় বিভিন্ন বিষয়ে হিন্দী ভাষায় তিনি দেড় শতেরও অধিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। খ্যাতনামা পণ্ডিতগণ লিখিত ২৩টি হিন্দী গ্রন্থের ভূমিকাও গোপীনাথ কর্তৃক লিখিত হইয়াছিল। হিন্দী ভাষায় গোপীনাথ কয়েকটি মৌলিক গ্রন্থও রচনা করেন। ইহাদের মধ্যে 'তান্ত্রিক বাঙ্ময় মে শাক্ত দৃষ্টি' 'ভারতীয় সংস্কৃতি আউর সাধনা' 'কাশী কী সারস্বত সাধনা', 'তান্ত্রিক সাহিত্য' প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গালী ও বাংলাভাষী গোপীনাথ কবিরাজ রচিত 'তান্ত্রিক বাঙ্ময় মে শাক্ত-দৃষ্টি' গ্রন্থটি ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকারের সাহিত্য একাডেমি কর্তৃক হিন্দীভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ রচনারূপে পুরস্কৃত হয়। এই বৎসরেই 'হিন্দী সাহিত্যসম্মেলন' (প্রয়াগ) কর্তৃক তিনি 'সাহিত্য-বাচস্পতি' উপাধিতে ভূষিত হন।

ধর্মনিষ্ঠ পরিবারের সন্তান গোপীনাথের মনে বাল্যকাল হইতেই ধর্মভাব প্রবল ছিল। ছাত্রাবস্থায় ধর্মাত্মা ব্রজলাল মজুমদার, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির প্রভাবে এই ধর্মভাব প্রবল হয়। জয়পুরে অধ্যয়নকালে গোপীনাথ কাশীতে যোগিরাজাধিরাজ নামে এক যোগী পুরুষের সান্নিধ্যে আসিয়া আধ্যাত্মিক সাধনার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। এই সময় হইতেই কাশীধাম

শিক্ষাগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি জ্ঞান-ভক্তিযোগ সম্বন্ধে অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিতে থাকেন। সাধুদর্শন ও সৎসঙ্গলাভের জন্যও এই সময় তাঁহার আগ্রহ বিশেষ বর্ধিত হয়। কাশীতে সরস্বতী ভবনে নিযুক্তি লাভের পর ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে গোপীনাথ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস নামে এক মহাপুরুষের দর্শন লাভ করেন। ইনি দীর্ঘকাল তিব্বতে 'জ্ঞান-গঞ্জ' নামক সাধনক্ষেত্রে যোগসাধনা দ্বারা অলৌকিক ক্ষমতা অর্জন করেন। দর্শনার্থীদের ইচ্ছামত সুগন্ধি আঘ্রাণ করাইতে পারিতেন বলিয়া ইনি জনসমাজে 'গন্ধ-বাবা' নামে পরিচিত ছিলেন। কিছুদিন এই মহাত্মার সংস্পর্শে থাকিয়া গোপীনাথ ইঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। কাশীধামে এই মহাত্মার আশ্রম 'বিশুদ্ধ-কানন' নামে পরিচিত ছিল। কাশীতে কর্মরত থাকার সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় গোপীনাথকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি উপযুক্ত পদে নিযুক্ত করিতে সচেষ্ট ছিলেন কিন্তু গোপীনাথ ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই। স্বামী বিশুদ্ধানন্দ অধিকাংশ সময় কাশীতে বাস করিতেন, এই জন্য ঐহিক উন্নতির সম্ভাবনা উপেক্ষা করিয়া গোপীনাথ কাশীবাসই শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছিলেন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে স্বামী বিশুদ্ধানন্দ দেহরক্ষা করেন। এই সময়ের মধ্যে গোপীনাথ অধ্যাত্ম-সাধনার পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। স্বামী বিশুদ্ধানন্দ ও স্বামী যোগত্রয়ানন্দ ব্যতীত গোপীনাথ বহু সাধু-সঙ্গ করেন। তাঁহার অধ্যাত্ম সাধনার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান ছিল না। মধ্য ও অন্তিম জীবনে গোপীনাথ শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মাতার সংস্পর্শ লাভ করেন। গোপীনাথ তাঁহাকে মাতৃ স্বরূপিণী মনে করিতেন। লৌকিক রূপে উভয়ের মধ্যে মাতা-পুত্র অথবা পিতা-দুহিতার সম্পর্ক ছিল। গোপীনাথ তাঁহার অলৌকিক মনীষার সাহায্যে তন্ত্র ও আগম মতের রহস্য উদ্ধার করিতে পারিয়াছিলেন। জ্ঞানের সহিত অধ্যাত্মচর্চায় গোপীনাথের জীবন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পরা ও অপরা বিদ্যার একই সঙ্গে প্রসিদ্ধিলাভ জগতের ইতিহাসে একটি বিরল ঘটনা।

জনৈক সাহেবের কিছু পূর্বে গোপীনাথ 'বেরি বেরি' রোগাক্রান্ত হন। কুইন্‌স কলেজের অধ্যক্ষ পদে থাকিয়া প্রশাসনিক কার্যে তাঁহাকে বহু সময় ব্যয় করিতে হইত। জ্ঞান ও অধ্যাত্ম-চর্চার প্রতিকূল এই পরিবেশ হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য গোপীনাথ ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে সরকারী কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ভারতের স্বাধীনতালাভের পর এই কুইন্‌স কলেজ বা কাশী সংস্কৃত কলেজ একটি একটি সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে।

গোপীনাথের সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণের পর তাঁহার অন্তরঙ্গ শিষ্য ও ভক্তদের নির্বন্ধাতিশয্যে কাশীর সিগরা পল্লীতে তিনি একটি নিজস্ব আবাস গৃহ নির্মাণ করিয়া সপরিবারে বাস করিতে থাকেন। অবসর গ্রহণের পর তাঁহার এই গৃহটি শুধু কাশীর নহে সমগ্র ভারতের জ্ঞান-পিপাসুগণের একটি তীর্থ স্থল হইয়া উঠে। প্রত্যহ বহু সংখ্যক ছাত্র, গবেষক ধর্মজিজ্ঞাসু গৃহস্থ এমন কি সাধু সন্ত ও তাঁহাকে দর্শন করিতে এবং তাঁহাদের নিজ নিজ অভীষ্ট বিষয়ে উপদেশ লাভের জন্য এখানে সমবেত হইতেন। গোপীনাথের দর্শনার্থীদের মধ্যে সকল শ্রেণীর সকল অবস্থার নানা মতের মতাবলম্বী থাকিতেন। উচ্চজাতির ব্যক্তিরাও গোপীনাথের সহিত আলোচনা করিতে আসিতেন। গোপীনাথের নিকট উচ্চ নীচ সকলেরই দ্বার উন্মুক্ত থাকিত, সকলকেই তিনি সমভাবে দেখিতেন ও তাহাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিতেন। গোপীনাথের শাস্ত্রালোচনা বিশেষ আকর্ষণীয় হইত, বেদ-বেদ

আগম নাস্তিক ও আস্তিক দর্শনশাস্ত্র মন্থন করিয়া তিনি তাঁহার নিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক বক্তব্য শ্রোতার সম্মুখে তুলিয়া ধরিতেন। তাঁহার বিচার-বিশ্লেষণ ধারা বাচনভঙ্গী শ্রোতাকে এক অনির্বচনীয় অতীন্দ্রিয় লোকে উত্তীর্ণ করিয়া দিত। বিভিন্ন শাস্ত্রকে খণ্ডিত না করিয়া একটি অখণ্ড বোধে তাহা তিনি অনুধাবন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন—তাঁহার আলোচনায় ও রচনায় এই সর্বশাস্ত্রসমন্বয়ী দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যাইত। গবেষক ছাত্রদের নিকট গোপীনাথ কল্পবৃক্ষ স্বরূপ ছিলেন। ভারত-বিদ্যার কোন বিভাগই গোপীনাথের অজ্ঞাত ছিল না। বেদ-পুরাণ-স্মৃতি লৌকিক সাহিত্য-ব্যাকরণ অলঙ্কার দর্শন প্রাচীন ইতিহাস, প্রাচীন লিপি, মুদ্রাতত্ত্ব, সঙ্গীত, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের কোন একটি বিভাগে গবেষণার বিষয় বস্তু সম্বন্ধে কোন ছাত্র তাঁহার পরামর্শ লইতে গেলে এক নিঃশ্বাসে তিনি ঐ বিশেষ বিভাগে প্রায় পঞ্চাশটি বিষয়ের নাম করিয়া দিতেন এবং প্রত্যেক বিষয়ের গবেষণা সহায়ক প্রয়োজনীয় পুস্তকের উল্লেখ করিয়া ঐগুলি অবগত করিতে উপদেশ দিতেন। উপদেশপ্রার্থী ছাত্র ইহার একটি বিশেষ বিষয় বাছিয়া গোপীনাথ নির্দেশিত পুস্তকগুলি পড়িয়া দুরূহ অংশগুলি গোপীনাথের নিকট বুঝিয়া লইতেন এবং পরিশেষে গবেষণা পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করিতেন। বহু ছাত্রকে গবেষণায় সহায়তা দিয়া গোপীনাথ তাঁহাদের জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সাহায্য করিয়াছেন। গোপীনাথের ছাত্র-বৃন্দের অনেকে ভারতের নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। ইঁহাদের জ্ঞান-চর্চা দ্বারাও দেশ উপকৃত হইয়াছে। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কাশী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াও গোপীনাথ কার্যতঃ অধ্যাপনা কোনদিন ত্যাগ করেন নাই, গবেষক ছাত্রদের জন্ত তিনি আজীবন কিছু সময় ব্যয় করিতেন। সাধারণ বিদ্যার্থীদের জন্তও তাঁহার কিছু সময় নির্দিষ্ট থাকিত। অতঃপর নিজস্ব অধ্যয়ন ও লেখার কার্যে নিয়মিত কিছু সময় ব্যয় করিয়া অবশিষ্ট সময় তিনি রুদ্ধদ্বার কক্ষে অধ্যাত্ম সাধনায় নিমগ্ন থাকিতেন।

কাশী কুইন্স কলেজের চাকুরী প্রাপ্তির পর গোপীনাথ কাশীতে সপরিবারে বাস আরম্ভ করেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে গোপীনাথ জননী সুখদাসুন্দরী দেবীর মৃত্যু হয়। গোপীনাথের একটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মিয়াছিল। গোপীনাথের একমাত্র কৃতবিদ্য পুত্র ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে দুইটি কন্যা ও একটি পুত্র রাখিয়া অকালে পরলোকগমন করেন। ইহার কিছুদিন পর তাঁহার পুত্রবধূরও মৃত্যু হয়। একমাত্র উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যুতে গোপীনাথ যে মানসিক স্থৈর্যের পরিচয় দেন তাহা বিস্ময়জনক। পুত্রের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াস্থলেই তিনি শ্মশান বন্ধুদের সহিত ধীরভাবে অধ্যাত্ম বিষয়ে আলাপ করেন এবং গৃহে প্রত্যাগত হইয়া যথারীতি অধ্যয়নে বসেন। গোপীনাথকে সমবেদনা জানাইবার জন্ত অপরাহ্নকালে আগত ভদ্রব্যক্তিগণ দেখিতে পান যে গোপীনাথ সমাগত ব্যক্তিদের সহিত নিত্যকার মত ধর্মালোচনায় রত রহিয়াছেন। সমবেদনাজ্ঞাপনকারীদের নিকট হইতে অজ্ঞাত সমাগত ব্যক্তিগণ গোপীনাথের পুত্রের মৃত্যুর সংবাদ জানিয়া স্তম্ভিত হইয়া যান।

গোপীনাথ পিতৃমুখ দর্শন করেন নাই, তাঁহার অভিভাবকবৃন্দও আকস্মিকভাবে লোকান্তর গমন করায় আত্মীয়স্বজন তিনি হারাইয়াছেন আঘাতও বহু পাইয়াছিলেন। জীবনে তিনি বহুবার অসুস্থ ও দীর্ঘস্থায়ী ব্যাধি ভোগ করিয়াছেন, ব্যাধির যন্ত্রণাতে দুইবার তাঁহাকে শয্যা গ্রহণ করিতে হয়। রোগ-শোক গোপীনাথের নিত্যসহচর হইলেও গোপীনাথকে ইহারা পরাভূত করিতে পারে নাই।

একমাত্র পুত্রের মৃত্যুর পর তাঁহার শরীর স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া পড়ে, পরিশেষে তিনি অসুস্থ হইয়া যান। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে গোপীনাথ কঠিন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। নিজের দেহ সম্বন্ধে উদাসীন গোপীনাথের এই শারীরিক অবস্থার কথা জানিয়া মাতা আনন্দময়ী তাঁহাকে চিকিৎসার্থ নিজে লইয়া যান। অতঃপর তাঁহাকে বোম্বাই লইয়া গিয়া ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডঃ বর্জেস কর্তৃক তাঁহার শরীরে অস্ত্রোপচার করান হয়। মহারাষ্ট্রের তদানীন্তন রাজ্যপাল কাশীর ডঃ শ্রীপ্রকাশ ও গোয়ালিয়রের মহারাণী শ্রীমতী বিজয়রাজে সিন্ধিয়া বোম্বাই এ গোপীনাথের চিকিৎসা ও আরোগ্যলাভে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। অপারেশনের পর গোপীনাথ কাশী ফিরিয়া আসিয়া যথারীতি অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, গ্রন্থ-রচনা ও অধ্যাত্ম চর্চায় পূর্ববৎ আত্মনিয়োগ করেন। পরিণত জীবনে তিনি বিশেষভাবে আগম শাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হন ও তাঁহার অধ্যাত্ম-সাধনা এই পথেই অগ্রসর হইতে থাকে। শেষ জীবনে তিনি আগমশাস্ত্রীয় কতকগুলি লুপ্ত গ্রন্থ সম্পাদন পূর্বক প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সর্বশাস্ত্রের সমন্বয় পূর্বক অখণ্ডমহাযোগ বা সমন্বয় তত্ত্ব-প্রচারেই গোপীনাথের শেষ জীবন ব্যয়িত হয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সহিত গোপীনাথ প্রচারিত অখণ্ড মহাযোগের কোন বিরোধ নাই, ইহা তিনি তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রাচীন শাস্ত্রজ্ঞ গোপীনাথ আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনেও ব্যুৎপন্ন ছিলেন। প্রাচীন ও নবীনের সমন্বয় তাঁহার জীবনসাধনার বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সাহিত্য ধারায় নিষ্ণাত গোপীনাথের ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত ও হিন্দী সকল রচনাই প্রাঞ্জল ও সুখপাঠ্য ছিল। তাঁহার কথোপকথনও সুখবোধ্য ও সুখকর রূপে শ্রোতাকে আকৃষ্ট করিত। কথোপকথনকালে তাঁহার জ্ঞানের সর্বব্যাপীত্ব ও গভীরতা শ্রোতাকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া দিত। গোপীনাথের রচনাসমূহ হইতেও তাঁহার জ্ঞানের বিশালতা ও গভীরতার পরিচয় পাওয়া যায়।

জীবদ্দশাতেই গোপীনাথ নানা সম্মানে ভূষিত হইয়াছিলেন। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুন তিনি ভারত সরকার কর্তৃক 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৪৭, ১৯৫৬, ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যথাক্রমে এলাহাবাদ, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্মানজনক ডি-লিট্ উপাধি লাভ করেন। ভারত সরকার ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ সনদ ও ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে 'পদ্মবিভূষণ' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন। ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে 'দেশিকোত্তম' উপাধিদান করেন। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রয়াগের হিন্দী সম্মেলন তাঁহাকে সাহিত্য-বাচস্পতি ও ১৯৬১ কলিকাতার সংস্কৃত কলেজ তাঁহাকে 'সর্বতন্ত্র সার্বভৌম' অর্থাৎ সর্ববিদ্যাপারঙ্গম উপাধিদানে সম্মানিত করেন। কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে গোপীনাথকে সম্মানিত সদস্য (অনারারী ফেলো) নির্বাচিত করেন। ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে গোপীনাথের সংস্কৃত সাহিত্যে ও ভারতীয় দর্শনে সবিশেষ দক্ষতা ও দানের কথা স্মরণ করিয়া এই সোসাইটি তাঁহাকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিকী স্মারক ফলক (রবীন্দ্রনাথ টেগোর বার্থ সেন্টেনারী প্লেক) দানে সম্মানিত করেন। ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ-এর অখিল ভারতীয় সংস্কৃত পরিষদ গোপীনাথের সম্মানার্থ একটি সুবৃহৎ গ্রন্থ 'কবিরাজ অভিনন্দন গ্রন্থ' নামে প্রকাশ করেন। এই পুস্তকটিতে দেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিতগণের দ্বারা লিখিত মূল্যবান গবেষণামূলক প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হয়। বেদ, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্য, পুরাতত্ত্ব ও ইতিহাস বিষয়ে এই প্রবন্ধগুলি লিখিত হইয়াছিল।

বিদ্যাবত্তার জন্য সর্বোচ্চ এই সম্মানগুলি লাভ করিয়াও গোপীনাথ ব্যক্তিগত জীবনে সম্পূর্ণ নিরহঙ্কার ছিলেন। ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলের সঙ্গেই তিনি সমানভাবে ব্যবহার করিতেন। দর্শনার্থী মাত্রেই তাঁহার নিত্যস্নাত সারল্য, সৌজন্য ও মধুরতার স্পর্শ লাভ করিয়া নিজেদের ধন্য জ্ঞান করিত। ছাত্রগণকে গোপীনাথ পিতৃবৎ স্নেহে অভিষিক্ত করিতেন ও অকাতরে তাহাদের সাহায্য করিতেন। সর্বসাধারণের প্রতি মৈত্রী ভাব ও করুণা গোপীনাথ চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল।

ভাগ্য-বিপর্যয়, পারিবারিক শোক ও নিজের উৎকট শারীরিক অসুস্থতা কোন দিনও এই স্থিত-প্রজ্ঞ ও তেজস্বী পুরুষের মানসিক শক্তি ও ধৈর্য নষ্ট করিতে পারে নাই।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে গোপীনাথের স্ত্রী-বিয়োগ হয়। গোপীনাথের স্বাস্থ্যও এই সময় বিশেষ উদ্বেগজনক অবস্থা ধারণ করে। অতঃপর মাতা আনন্দময়ীর আগ্রহে তাঁহার কাশীর আশ্রমে রাখিয়া তাঁহার পরিচর্যার ব্যবস্থা হয়। অসুস্থ শরীরেও গোপীনাথের জ্ঞান ও অধ্যাত্ম চর্চা অব্যাহত ছিল। এই সময়ের মধ্যেও তাঁহার কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। কিছুদিন পূর্বে গোপীনাথের স্বাস্থ্য-দৌর্বল্য ও বয়সের পীড়াবৃদ্ধি হওয়াতে তাঁহাকে ভাদাইনির মা আনন্দময়ী হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। প্রায় বর্ষকাল পূর্ব হইতেই গোপীনাথ সর্বদা সমাধি মুদ্রায় সম্ভবতঃ অখণ্ড-মহাযোগে নিমগ্ন থাকিতেন। গত ১২ই জুন অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় এই অবস্থাতেই ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। গোপীনাথের বিধবা কন্যা ও একমাত্র পৌত্র শশিশেখর এই সময়ে অনুগত শিষ্য ও সুহৃদের সঙ্গে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন। পরদিবস মণিকর্ণিকা মহাশ্মশানে গোপীনাথের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। গোপীনাথের মৃত্যুতে সমগ্র দেশে শোকের ছায়া পতিত হয় কারণ তিনি ছিলেন প্রাচীন ভারতীয় ঋষিকুলের শেষ প্রতিনিধি। শুধু জ্ঞানসাধনায় গোপীনাথ নিজেকে নিয়োজিত করেন নাই। অখণ্ড মহাযোগসাধকরূপে তিনি অজ্ঞান অন্ধকার ছেদ করিয়া জ্ঞানালোক দ্বারা সকলকে নবীন জীবনের প্রতি আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। মহামনীষী গোপীনাথের বহু রচনা এখনও অপ্রকাশিত আছে। তাঁহার রচনাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

রচনাপঞ্জী : (১) স্বরচিত গ্রন্থ (ক) বাংলা

শ্রীশ্রী বিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ (৩ খণ্ড)। বিশুদ্ধ-বাণী (১-৬ ভাগ)। অখণ্ড মহাযোগ (কলিকাতা)। পূজা—কলিকাতা। সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ (২ ভাগ)। তন্ত্র ও আগম শাস্ত্রের দিগ্দর্শন—কলিকাতা, সংস্কৃত কলেজ। বিশুদ্ধ বাক্যামৃত—বারাণসী। ভারতীয় সাধনার ধারা—সংস্কৃত কলেজ কলিকাতা। সাহিত্য—চিন্তা, কলিকাতা। তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত—বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ—কলিকাতা। পত্রাবলী ১ম খণ্ড। স্বসংবেদন—কলিকাতা।

(খ) হিন্দী

পূজাতত্ত্ব, বারাণসী। তান্ত্রিক বাঙ্ময় মে শাক্তদৃষ্টি, পাটনা। ভারতীয় সংস্কৃতি ঔর সাধনা (২য় খণ্ড), পাটনা। কাশী কী সারস্বত সাধনা (পাটনা)। তান্ত্রিক সাহিত্য কা বিবরণাত্মক সূচী (লক্ষ্ণৌ)। শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ, বারাণসী। সাধুদর্শন এবং সৎপ্রসঙ্গ (২য় ভাগ)—বারাণসী।

ইষ্ট। নাড়ী। ধ্যানধারণা। জপ। উদ্বোধন—কলিকাতা—অনাদি প্রবৃত্তি ও তাহার ক্ষয়। আনন্দ-বার্তা, (আনন্দময়ী আশ্রম বারাণসী):—শ্রীশ্রীমায়ের অমর বাণী ও ব্যাখ্যা। মা বিজ্ঞানের একদিক। আন্তিক দর্শনের। আরোপ সাধনা। অজানা রহস্য। বর্ণবিজ্ঞান ও আত্মার অবস্থা বৈচিত্র্য। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান। অধ্যাত্ম জীবনে গুরুর স্থান। আমি কে? শক্তির জাগরণ। ভক্তি সাধনার একটি দিক। মন হইতে উন্মনা। ষট্ চক্রভেদের রহস্য। অখণ্ড ভগবৎস্মৃতি। ভাব-সাধনার বৈশিষ্ট্য। জীবনের লক্ষ্য। দেহ বিজ্ঞান ও অমরত্ব সাধন। শ্রীভগবানের স্বরূপ ও কৃপা। পরম শিবের পৃষ্ঠভূমি। চক্ষুর উন্মীলন। হিমাদ্রি (সাপ্তাহিক, কলিকাতা)—দেহের সাধন। সাধু-দর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ (বিভিন্ন সাধু-সন্তের কথা)। পথের সন্ধান। বিশুদ্ধ বাণী (কাশী, সম্পাদক—গোপীনাথ কবিরাজ) দেহ ও কর্ম। আরোপ সাধন। জ্ঞান-গঞ্জের পত্রাবলী। অজপা সাধন রহস্য। শ্রীশ্রীনবমূর্তী মহাআসন। বিহঙ্গম যোগ ও মহাপথ। সিদ্ধপুরুষ। তত্ত্বজ্ঞান ও ক্রিয়াজ্ঞান। তিন জন্মের বিচার। দেহ ও কর্ম। সূর্য বিজ্ঞান রহস্য। সনাতন সাধনার গুপ্তধারা। বিন্দুদর্শনের রহস্য। সিদ্ধভূমি। বালকপূজা। জীবের আবির্ভাব ও পূর্ণতা লাভ। আত্মার পূর্ণ জাগরণ ও পরিণতি। হিমাদ্রি (বিভিন্ন শারদীয়া সংখ্যা)—মা। মায়ের স্বরূপ মহিমা। মহাকরুণাময়ী শ্রীশ্রীমা। মাতৃতত্ত্ব। মহাশক্তির আরাধনা। গুরুকে? শক্তি সাধনার রহস্য। প্রবুদ্ধ সর্বদা তিষ্ঠেৎ। যোগমার্গে ইচ্ছাশক্তি ও সৃষ্টি রহস্য। অমরত্ব সাধন—তান্ত্রিক ও যৌগিক। সুদর্শন (কলিকাতা)—দীক্ষা রহস্য। নাম সাধন ও তাহার পরিণতি। অক্লিষ্ট অজ্ঞান খণ্ড। আন্তিক দর্শনের। মার্গদর্শন—তান্ত্রিক সিদ্ধান্ত ও সাধনার রহস্য। মাতৃতত্ত্ব। মানস জপ। শ্রীশ্রীরামঠাকুর শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ-কলিকাতা- রামঠাকুরের কথা। প্রণব (কলিকাতা—প্রণবানন্দ স্মারক অঙ্ক, শাক্ত দৃষ্টিতে জীবের আবির্ভাব ও পূর্ণত্ব লাভ। কৈবল্যম (নয়াদিল্লী)—জীবের পরম লক্ষ্য। বিদেহ আত্মার গতিস্থিতি। আশ্রমিকা (বারাণসী)—স্বয়ং ভগবান। জ্ঞানাজ্ঞান রহস্য। শিবলিঙ্গের উপাসনা।

(খ) সংস্কৃত

সংস্কৃত রত্নাকর। (জয়পুর)—বেদরূপ জিজ্ঞাসা। বৈন্দবং শরীরম্। ভক্তানাং মনম্। অমরভারতী (কাশী)—অস্পর্শ যোগঃ। বেদানাং বাস্তবিকং স্বরূপম। সরস্বতী সুষমা (কাশী)—কার্যসিদ্ধি। সাগরিকা (সাগর মধ্যপ্রদেশ)—শাক্তদৃষ্ট্যা সৃষ্টিতত্ত্ব বিমর্শ। প্রবন্ধ প্রকাশ (কাশী)—ভগবতো বুদ্ধস্য চরিতং উপদেশশ্চ (সম্পাদক ডঃ মঙ্গল শাস্ত্রী)। সূর্যোদয় (বারাণসী)—বেদানাং বাস্তবিকং স্বরূপম্। যোগোক্ত বিভূতীনাং পরিচয়। ভারত বিদেশেষু চ প্রাপ্তিতা তন্ত্রাগম ধারা। তত্ত্বাংশনা।

(গ) ইংরাজী

Journal of the U. P. Historical Society : (a) Notes on Shrugna Vol I, No 1, 1916-17 (b) Notes and Queries Vol I. no 2 ; Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute : Doctrine of Pratima in Indian Philosophy. Vol 5, nos 1 and 2, 1923-24. Kashi Vidyapith Silver Jubilee Vol : Kaivalya and its place in dualistic tantras. Kalyan Kalpataru : faith in God Vol, I no 1, 1934, Modern Review : A plea for a regular Bibliography,

June 1916, Journal of Ganganath Jha Research Institute : The mystic significance of 'Evam' vol 2. no : 1, Nada vindu and Kala vol 3, no 2. History of Philosophy, Eastern and Western (Deptt of Edn. Govt. of India) Vol I : Sakta Philophy. Indian Medical Association, SilverJub. Vol. (Varanasi) contribution of Kasi to Sanskrit Literature (Agama) 1500-1800) Vivekananda Commemoration Volume (Burdwan University) : Bengalee Pundits in Mideaval varanasi : (1965) Indiana (Kasi) Plea for a regular bibliography of Indian periodicals The Princes of Wales Saraswati Bhaban Studies, Govt Sans College, Varanasi : (a) The blue print of Nyaya Vaishesika phlosophy (vol 1, 1922), (b) Nirmana Kaya, vol 1, 1922), (c) Parasuram Misra (Vol 2, 1923), (d) A New Bhakti Sutra (Vol 1923), (e) The system of chakras according to Garakhanath (vol 2), (f) Theism in ancient India (1) vol 2, (g) Some aspects of Vira Saiva Philosophy, vol 2, (h) Nyaya Kusumanjali (Eng tr) vol 2, Sondal Upadhya vol 2, (i) Theism in ancient India 2, vol 3 (1924) (j) History and Philosophy of Nyaya Vaishesika literature (vols 3, 4, 5, 7), (k) The problem of casuality in Sankhya vol 4, (l) Virgin worship (vol 4), The author of Prapanchasara, vol 6 (m) The mimansa mss in the Govt Sanskrit College Varanasi, vol 6, (n) Some aspects of the history and doctrine of the Nathas (vol 6, 1927), (o) Some variants in the reading of Vaishesika Sutras (vol 7), (P) Gleaning from the Tantras (vol 7), (Q) The date of Madhusudan Saraswati (vol 7), (R) Descriptive Notes on Sanskrit Mss (vol 7), (S) Mysycism in Veda (vol 8), (T) The life of a Yogin (vol 9), (U) The philosophy of the Tripura Tantra (vol 9), (V) Notes on Pasupata philophy (vol 9), (W) The conception of physical and superphysical Agnesim in Sansk Lit (vol 10), (X) Some Aspects of the philosophy of Sakta Tantras (vol 10), (Y) A short note on the Tatwa-Samas (Sankhyaya) vol 10 (1938).

([illegible] ভগবতীপ্রসাদ সিংহ, বারাণসী, ১৯৬৮, কবিরাজ অভিনন্দন গ্রন্থ, [illegible], ১৯৬৭)

দশম শতাব্দীর স্থপতি, ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী রাজা ভোজ

শ্রীকৃষ্ণকেতন ঠাকুর

যজুর্বেদের ১৬ অধ্যায়ের ১৯ সূক্তে রুদ্রকে বিশ্বকর্মা এবং তিনি 'স্থপতি' বলা হয়েছে 'নমো রোহিতায় স্থপতয়ে বৃক্ষাণাং পতয়ে নমঃ.........' ।

মহীধর ভাষ্যে 'স্থপতি' শব্দের অর্থ 'স্থা+পতি' অর্থাৎ যারা থাকে তাদিকে যে রক্ষা করে তারা হ'লো বাস্তুবিদ। অতএব মানব সভ্যতার সঙ্গেই স্থপতির উদ্ভব এবং সেই স্থাপত্য যে কখন উন্নত হ'য়ে ওঠে, এটা এশিয়া ভূখণ্ডের এক বিশেষ প্রান্তে 'মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার' আবিষ্কারের দ্বারা আমরা তা বুঝি।

স্থপত্য ও স্থপতি শব্দ পাই ভারতের দুটি সুপ্রাচীন মহাকাব্যে রামায়ণ মহাভারতে। যে সময় রাম নির্বাসিত হ'য়ে ভ্রাতা ও পত্নীসহ অযোধ্যা নগরীর সীমানা ছেড়ে এসে, প্রথম একটি ইঙ্গুদী বৃক্ষের তলায় গাড়ী ঘোড়া রেখে বিশ্রাম নিলেন, সেই স্থানটি ছিল নিষাদ রাজ গুহের। তাঁরই রাজ্য সীমার মধ্যে। রামাদির উপস্থিতির সংবাদ পেয়েই রাজা গুহ সেখানে এসে পড়লেন। এই গুহ শুধু রাজা ই নন স্থপতিও। 'নিষাদ জাত্যো বলবান স্থপতি শ্চেতি বিশ্রুত ঃ' (রামায়ণ সঃ ৫০।৩২ শ্লোক) এই নিষাদ শব্দের অর্থ বিভিন্ন স্বার্থের চেষ্টায় আমাদের মাথায় ঢুকেছে নিষাদ মানে ব্যাধ। মনুসংহিতার ১০।৮ শ্লোকে ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্র কন্যার-গর্ভজাত পুত্রই হবে নিষাদ। যাজ্ঞবল্ক্যও তাই বলেছেন (১।৯১) এদের জীবিকা হবে মাছ ধরা। রামায়ণ কাব্যের ১।২।১৫-র প্রসিদ্ধ শ্লোক' মা নিষাদ...এর টিকায় নিষাদ মানে ব্যাধ বা কিরাত। কিন্তু অত্রি সংহিতার ৩৭১ শ্লোকে বলা হয়েছে যে সেই ব্রাহ্মণকেই বলা হবে নিষাদ' যে ব্রাহ্মণ চৌর্য্যবৃত্তি, দস্যুবৃত্তির দ্বারা জীবিকা অর্জন করে, কর্কশ ভাষায় কথা কয় এবং মৎস্য মাংসে প্রচুর লোভাসক্ত সেই ব্রাহ্মণই নিষাদ। অতএব নিষাদ শব্দটি আমাদের কাছে সম্মান বোধক নয়, কিন্তু রামায়ণ কাব্যে গুহ নিষাদের সম্মাননা রয়েছে, তিনি ছিলেন 'স্থপতি' অর্থাৎ নগর নগরী নির্মাণে দক্ষ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার।

মহাভারত মহাকাব্যের প্রখ্যাত স্থপতি 'ময়' বা ময়দানব। জানিনা সেই ময় থেকেই আমেরিকার মায়া সিটি বা মায়া সভ্যতার সঙ্গে কোন যোগ রেখেছে কিনা। ময়কে বলা হ'তো দানবদের শিল্পী। এঁর পত্নীর নাম হেমা। পুত্র দুন্দুভি প্রভৃতি এবং একটি কন্যা, তার নাম মন্দোদরী। ময় পরিবার দক্ষিণ ভারতীয়। তিনি যেখানে বাস করতেন, সে স্থানটির নাম 'খাণ্ডব'। এইখানেই পরে গড়ে ওঠে এক বিখ্যাত রাজনগরী। সে মহানগরীর শিল্পী ছিলেন 'ময়'। তিনি এই শহরটি গঠন করেছিলেন কৃতজ্ঞতার অভিজ্ঞান দিয়ে। কারণ এই খাণ্ডব নামে ভূখণ্ডটি ছিল একদিন অরণ্যে ভরা। ঐ খানেই কৌরবরাজ অনুমতি দিয়েছিলেন তাঁদের কাছ থেকে পৃথক হ'য়ে পাণ্ডবগণ বাস করুন। তাই খাণ্ডব বন পুড়িয়ে নতুন করে শহর গ'ড়তে হয়েছিল তাঁদের। বন পোড়ানোর সময় স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকেই পুড়ে মারা যান। সেই সময়েই স্থাপিত ময় পরিবার রক্ষা পেয়ে যান অর্জুনের শরণাপন্ন হয়েছিলেন বলে। রক্ষা পাওয়ার পর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ময়দানবই

যুক্ত ভোজের চমৎকার এক বর্ণনাবলী। এ কথা মহাভারতের ২।১।২—৫ শ্লোকে।

ভোজ এবং মহাভারতের স্থপতি ও স্থাপত্য শিল্পের উল্লেখ দেখেই অনুসন্ধান আসে, সেই স্থাপত্য ও শিল্প বিষয়ে কি কোন প্রাচীন ভারতের সংস্কৃত বা প্রাকৃত ভাষায় গ্রন্থ আছে কিনা। এক বন্ধুর কাছে সন্ধান করে জানতে পারি বরোদা গায়কোয়াড় রাজ এস্টেট থেকে প্রকাশিত হয়েছে "সমরাঙ্গন সূত্রধার" নামে একখানি স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের বিশাল গ্রন্থ। এটি সংগ্রহ করে এনে দেন কলকাতা হাইকোর্টের খ্যাত উকিল আত্মীয়-বান্ধব ৺হৃদয়ের মাধব মল্লিক মহাশয়। সেটা বাংলা ১৩৪১ সাল। তখন সংস্কৃত ভাষায় লেখা 'রসেন্দ্র সার সংগ্রহ' গ্রন্থের টীকা লিখছি। তারই প্রসঙ্গ ক্রমে বিষয় ছিল সুপ্রাচীন ভারতে পণ্যবহনের জন্য এবং সমরের সময় অস্ত্র ও সৈন্য বহন করে নিয়ে যেতে 'ছোট ছোট' বিমানের ব্যবহার হতো। সে বিমানকে আকাশে ওড়াবার জন্য তার ভিতরে পারদপূর্ণ কুম্ভ স্থাপন করে এক ধরনের তাপ দিয়ে পারদের ঊর্ধ্বশক্তির স্বাভাবিক শক্তির দ্বারাই বিমানে ইঞ্জিনের কাজ করা হতো।

আমার সে-টীকায় সমরাঙ্গনের সেই শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করেছি। তারপর দীর্ঘদিন কেটে গিয়েছে, সমকালীন পত্রিকায় বহু মনীষীর গবেষণাপূর্ণ নানান্ রচনা পড়তে পড়তে আবার সেই সমরাঙ্গন গ্রন্থের প্রয়োজন হয়। এবার সংগ্রহ করে দিলেন আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু নির্মল বসু মহাশয় আর এ-গ্রন্থের বিশেষ বিশেষ স্থলের ইংরেজি টীকাগুলির জট ছাড়িয়ে দিলেন কল্যাণীয় শ্রীমান শেখররঞ্জন দাশগুপ্ত।

গ্রন্থের আকার প্রকার ক্ষুদ্রও নয় মধ্যমও নয়। ৮৩টি অধ্যায়। প্রতিটি অধ্যায়ের শ্লোক সংখ্যা ১০০-এর কমে নাই সোওয়া শত উপরেও আছে।

গ্রন্থের রচয়িতা মহারাজা ভোজ। ইনি ছিলেন পরমার বংশের। অর্থাৎ মালবের পরমার বংশীয়। এঁর রাজধানীর প্রাচীন নাম ধারা। এখন এটির পরিচয় মধ্যপ্রদেশের ধার জেলার সদর শহর। পণ্ডিতেরা স্থির করেছেন আনুমানিক ১০০০ থেকে ১০৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ভোজরাজা জীবিত ছিলেন। এঁরই রাজত্বকালে ধনপাল, ভট্ট হলায়ুধ (বাংলার হলায়ুধ নন) প্রভৃতি, এবং মেরুতুঙ্গাচার্য উবটের মত পণ্ডিতকুল ভোজের রাজ দরবার অলংকৃত করতেন। এই পরমার বংশীয় ভোজরাজার পরেও তাদের রাজগৌরব বহুদিন ভারতে প্রতিষ্ঠার আসনটিকে সুরক্ষিত করে রেখেছিল। তারপর ত্রয়োদশ শতক থেকে ক্রমশ মলিন হতে থাকে। ১৩০৫ খ্রীষ্টাব্দে এসে তা একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

ভোজরাজকে নিয়ে সংস্কৃত ভাষায় লেখা অনেক নিবন্ধ, অনেক কবিতা পাওয়া যায়। তাছাড়া ভোজরাজেরই লেখা বলে প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে প্রখ্যাত অলংকার গ্রন্থ 'সরস্বতী কণ্ঠাভরণ'। অলংকার পণ্ডিতেরা স্থির করেছেন এই অলংকার গ্রন্থটি প্রকৃতপক্ষে সংগ্রহ গ্রন্থ, প্রাচীন অলংকার গ্রন্থের মূলকারিকা ও উদাহরণ এতে প্রচুর। তাহলেও ভোজের সরস্বতী কণ্ঠাভরণের রচনাশৈলীর একটা বৈশিষ্ট্যও আছে। দ্বিতীয় গ্রন্থ শৃঙ্গার প্রকাশ। এ গ্রন্থটিতে অলংকারশাস্ত্র এবং নাট্যশাস্ত্র দুইটি বেশ অভিনব রূপ নিয়েছে। তৃতীয় গ্রন্থটি দার্শনিক। নাম রাজ মার্তণ্ড। পাতঞ্জল যোগ শাস্ত্রেরই ব্যাখ্যাকে আরও প্রসারিত করেছেন ভোজ। চতুর্থ হোলো যুক্তি কল্পতরু। এটি প্রাচীন রাজনীতির আদর্শ গ্রন্থ। এছাড়া জ্যোতিষ ও ধর্মশাস্ত্র (স্মৃতি) বিষয়েও ভোজের গ্রন্থ আছে। অন্যান্য গ্রন্থের মুদ্রণ হয় নাই, তবে শুনেছি ৮০ খানি গ্রন্থ রচনা করে গিয়েছেন ভোজ। তারমধ্যেই অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ "সমরাঙ্গন সূত্রধার"।

গ্রন্থখানি প্রথম প্রকাশিত হয় গায়কোয়াড় থেকে। এর সম্পাদক ছিলেন মহামহোপাধ্যায় টি, গণপতি শাস্ত্রী। তিনি জানিয়েছেন এই গ্রন্থটির আরও অনেক অধ্যায় অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি, আপাততঃ যে বিপুল অংশ পাওয়া গিয়েছে তার তিনটি পাণ্ডুলিপি বরোদায় সেন্ট্রাল লাইব্রেরীতে, দুখানি করে এবং পাটনায় সরকারী পুঁথির ভাণ্ডার থেকেও একটি। কোথাও সম্পূর্ণ পাওয়া যায়নি এবং নির্ঘণ্টও ছিল না।

সম্পাদকের এই মন্তব্য থেকেই বোঝা যায় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের বিজ্ঞান শিক্ষা ভারতে বহুকাল থেকেই অনাদৃত। তবে যাঁরা মনস্বী তা স্বদেশেরই হোক বা বিদেশী হোন তাঁরা দক্ষিণ ভারতের মন্দির শিল্প এবং পশ্চিম ও মধ্য ভারতের বিশাল প্রাসাদ, মন্দির এবং শিল্প-ভাস্কর্য-মণ্ডিত গুহাগৃহ ও প্রাচীন চিত্র দেখলে অতীত ভারতের পূর্বসূরীদের জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষায় রূপনির্মাণ দক্ষতার কথা অবশ্যই স্বীকার করেন। কিন্তু ঐসব রচনা শৈলীর ঐতিহ্য বার্তাই শোনা যায়, প্রায়শ দুর্লভ হয় তাঁদের রচনা বৈভবের অবলম্বক গ্রন্থমালা।

ভোজরাজের সমরাঙ্গন সূত্রধার গ্রন্থখানি আমাদের সেই দৈন্যতা ঘুচিয়েছে। এই গ্রন্থটি যদিও সম্পূর্ণ নয় তবুও এর দ্বারা আমরা জানতে পারি মহারাজা ভোজ তাঁর ও পূর্বসূরীদের রচিত বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করে এই সমরাঙ্গন সূত্রধার রচনা করেছেন। নামটির অর্থ শ্লেষ করেই স্থাপন করেছেন। স-মর-অঙ্গন অর্থাৎ যারা মৃত্যুশালী অর্থাৎ প্রাণী কুল, তাদের মধ্যে মানব, তাদেরই অঙ্গন অর্থাৎ বাড়ীঘর তৈরী করার সূত্রধার অর্থাৎ ওলন দড়ি। অপর অর্থ সমর বা সংগ্রামের অঙ্গনে যাকে নিয়ে যেতে হয় অর্থাৎ যুদ্ধের জন্য যত কিছু প্রয়োজন বিমান, সৈন্যদের খাদ্য, সংগ্রামের উপকরণ, এমনকি বিমানগুলির নামা ওঠার জন্য অঙ্গন প্রভৃতি ইত্যাদি।

গ্রন্থখানিকে খুব সামান্য করার জন্য ভোজরাজ বলেছেন 'একদিন পৃথিবী পৃথু রাজার ভয়ে গরু হয়েই পিতামহের কাছে উপস্থিত হয়ে বলেছিলেন, 'পৃথুরাজা এই আমার বক্ষে যেখানে সেখানে কোপ দিয়ে মানুষের বসবাস স্থাপন করছেন আপনি অনুগ্রহ করে বিশ্বকর্মাকে আহ্বান করে দেবপ্রাসাদ, রাজপ্রাসাদ, মহানগরী, নগরী, উপনগরী, পার্শ্বনগরী, নির্মাণ করতে বলুন'।

পৃথ্বীদেবীর কথা শুনে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থপতি পিতামহ দ্বিতীয় স্থপতি বিশ্বকর্মাকে আহ্বান করে তাঁকে বক্তব্যগুলি পালন করতে বললেন। আহ্বান করতে গিয়েছিলেন ব্রহ্মার চারজন মানসপুত্র। জয়, বিজয়, সিদ্ধার্থ ও অপরাজিত।

বিশ্বকর্মা ব্রহ্মার কাছে যে সব উপদেশ শুনেছিলেন সেগুলি বাস্তুবিদ্যার। ব্রহ্মা বলেছিলেন ওহে বিশ্বকর্মণ। ইহলোকে ধর্ম, কর্ম, ইষ্টপ্রাপ্তি, লোকসুখ, সবই বাস্তুবিদ্যাটিকে অধিগত করলেই হবে। অর্থাৎ যিনি ভাল স্থপতি হন, বা ইঞ্জিনিয়ার হন তাঁর বিদ্যাই মানবের ইহজীবনের শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। তারপর, চিকিৎসা বিদ্যা। তারপর অধ্যাত্মবিদ্যা।

তুমি বর্ণাশ্রম বিধান অনুযায়ী মানবের বসবাস নির্মাণ করবে। প্রথমে দেবপ্রসাদ তারপর রাজপ্রাসাদ এবং সেই প্রাসাদ ঘিরে থাকবে রাজার পারিষদবর্গের প্রাসাদ। তারপর অন্যান্ নিবেশান্ কুর্বত পৃথগজনকৃতাশ্রয়ান।

নিকটে যদি অবিচ্ছিন্ন ধারায় পার্বত্য নদী থাকে তাকে বহিয়ে নিয়ে আসবে রাজপুরীর

আবার চারদিক থেকে বাঁধ দিয়ে। মধ্যযুগে এই চমৎকার হ্রদ ও জলাধারের প্রশংসা সেযুগে এবং এখনও লোকের মুখে তা ছড়িয়ে আছে 'তাল তো ভোপাল তাল, ঔর সব তলৈয়া' অর্থাৎ জলাশয়ের সর্বোত্তম নিদর্শন ভোপাল তাল বাকী সব ডোবা আর পুকুর।

সেই ভোপাল তালের চারদিকে গড়ে উঠেছিল বিশাল মহানগরী, যেটির সুলক্ষণ ভোজরাজের সমরাঙ্গন সূত্রধারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে মহানগরী নির্মাণের পদ্ধতি হিসাবে। পণ্ডিতরা মনে করেন এই ভোপাল তালের আদর্শ অনুসরণ করেই পরে চিতোরের রাজা 'রাজ হ্রদের' পত্তন করেন।

ভোজের আরও যে সব কীর্তিস্তম্ভ স্থাপিত হয়েছিল, সেগুলি আমাদের পূর্বসূরীদের অসাবধনতায় কিংবা মহাকালের আক্রমণে সব বিলীন হয়ে গিয়েছে। আজকের প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিকগণ মনে করেন স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের দৃষ্টিকোণ থেকে এই সব কীর্তিস্তম্ভ এবং ভোজের সমরাঙ্গন সূত্রধারটির বক্তব্যকে মিলিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করতে জনসাধারণকে প্রলুব্ধ করতে হবে। তবে তার আগে অবশ্যই বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে ভোজের সমরাঙ্গন সূত্রধারের বক্তব্যকে আলোচনা করে দেখতে হবে, কারণ সমরাঙ্গন সূত্রাধারের বক্তব্যগুলি কাব্যকল্পনাভিত্তিক অথবা বাস্তব স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্র-শিল্পের মৌল উৎস এতে আছে কিনা।

ঐতিহাসিকদের ধারণা ভোজরাজার রাজনীতি, ধর্মীয়নীতি ও প্রজাপুঞ্জের সুখ সুবিধা প্রভৃতির জন্য স্থাপত্যশিল্পের সুষ্ঠু প্রবর্তন এগুলিতে সন্দেহ করার অবকাশ নাই, কারণ প্রতিটি স্তরেই তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি অভ্রান্ত গ্রন্থের প্রামাণ্য উক্তির দ্বারা সমর্থিত হয়ে আসছে।

ভোজরাজের সংস্কৃত ভাষায় দখল এবং রচনাশৈলীর পারিপাট্য আজও পণ্ডিতমহলে মান্যতার সঙ্গে স্বীকৃত। এই সমরাঙ্গন সূত্রধার গ্রন্থটির আয়তন যে আরও বড় ছিল তা নিঃসন্দেহ। কারণ পরিষ্কার বোঝা যায় প্রতিটি বিষয়ই অসম্পূর্ণ হয়ে রয়েছে। স্থাপত্যবিদ্যার যে কতগুলি দিক আছে সেটা ভালই বোঝেন বিংশ শতাব্দীর স্থপতিবৃন্দ। এ বিভাগটির অন্তর্গত যন্ত্রবিজ্ঞান। যন্ত্র-বিজ্ঞানেরও কয়েকটি বিভাগ থাকা খুবই স্বাভাবিক, যেমন বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, যানবাহন নিয়ে যাওয়ার সরল পথ, কোর্ট কাছারি বাড়ির মধ্যে কোন ঘরে বিচার, শাসনের অধীক্ষক বসবেন, দলিল-দস্তাবেজ কোন ঘরে নিরাপদে থাকবে, কোষাগার থাকবে কোন ঘরে ইত্যাদি বিবেচনা করেই স্থপতি নির্মাণ করবেন রাজকীয় পরিবেশের ঘরগুলি। তেমনি বিপণি আবাস, বাণিজ্য ভাণ্ডার, শিক্ষালয়, হাসপাতাল প্রভৃতি মহানগরীর কোথায় কি ভাবে স্থাপন করতে হবে তাও বিচক্ষণতার সঙ্গে নির্মাণ করতে হলে তাদের উপাদান বয়ে নিয়ে যেতে অনেক ধরণের যন্ত্রের প্রয়োজন, সেসব যন্ত্র তৈরী করারও যেমন বিভাগ থাকবে, সেগুলির চালনা করার জন্যও শিক্ষিত লোকের দরকার, এমনি আরও কত ব্যাপার আছে। ভোজরাজের সমরাঙ্গন সূত্রধারে, কিন্তু এসব যন্ত্রের সম্পর্কে কোন কিছু নাই, হয়তো সেসব জ্ঞানবিজ্ঞানের শিক্ষামূলক অধ্যায়গুলি হারিয়ে গিয়েছে, তাও বলা যায় না, কারণ ভোজরাজ নিজেই বলেছেন 'এই স্থাপত্যবিদ্যার প্রায়োগিক ব্যবহার বিজ্ঞানটি নির্ভর করে যন্ত্রবিজ্ঞানের উপর, সে বিজ্ঞানটি কিন্তু আমি বলবো না এ গ্রন্থে, তবে পাঠক জেনে রাখুন ওটা যে আমি জানি না তা নয়, আমি কিন্তু বলবো না।

যন্ত্রাণাং ঘটনা নোক্তা গুপ্ত্যর্থং নাজ্ঞতা বশাৎ
তত্র হেতুরয়ং জ্ঞেয়ো ব্যক্তা নৈতে ফলপ্রদাঃ ॥

ভোজের বক্তব্য, এই যন্ত্রবিজ্ঞানী হাতে-কলমে দেখিয়ে দেবার ব্যাপার, তারপর বেশ পরিশ্রম সাধ্যও শাস্ত্রাভ্যাসের প্রয়োজন, যারা বাস্তুবিদ্যার কর্মে উদ্যমশালী হবেন তাঁদের সামগ্রিকক্ষেত্রে বুদ্ধি হবে নির্মল, শুধু আমার প্রয়োজন হবে চিত্র অঙ্কন দেখে নেওয়ার অর্থাৎ ম্যাপ আঁকা থাকলে তাঁরা তা প্রস্তুত করে নেবেন, আমি তেমনি ম্যাপগুলি কি ভাবে তৈরী করতে হবে জানাব এই গ্রন্থে

পারম্পর্যং কৌশলং সোপদেশং শাস্ত্রাভ্যাসো বাস্তু কর্মোদ্যমো যো।
সামগ্রীয়ং নির্মলা যস্য সোঽস্মিন্ চিত্রাণ্যেব বেত্তি যন্ত্রাণি কর্তুম্॥

তেমনি ম্যাপ্ আঁকার কথা ছাড়াও আমি বলবো আরও কতকগুলি যন্ত্রবিজ্ঞানের বিস্ময়কর চাল-চলন, সেসব যন্ত্র নির্মাণ করতে পারলে জনসাধারণের বিস্ময়ের সীমা থাকবে না যেমন 'গজযন্ত্র', এ যন্ত্রটি একাধারে দুটি কাজ করার শক্তি, এখানে ওখানে জিনিষপত্র বয়ে নিয়ে যাওয়া এবং লোকজন নাই অথচ যন্ত্রের হাতী চলে বেড়ায় সীমিত স্থানে। (২) ব্যোমচারী বিহঙ্গ যন্ত্র। এটির প্রধান অঙ্গ হবে খুব মজবুত অথচ পাতলা কাঠ। ঠিক একটা পাখীর মত, এর পেটে থাকবে 'পারদে ভরা নলণী, তার উপরে এবং তলায় থাকবে আগুন ভরা যন্ত্র, যেটি থেকে তাপ ইচ্ছামত সংযত করে ঐ দারুময় ব্যোমচারী যন্ত্রটি ভীষণ শব্দ করে কিংবা ভয়ঙ্কাধিত শব্দ করে আকাশে উড়বে নামবে। (৩) দ্বারপাল যন্ত্র, এটি ধনাগার ও মূল্যবান দ্রব্যের রক্ষণের জন্য আগারটির দুয়ারে থাকবে, চোর কিছুতেই প্রবেশ করতে পারবে না সে ঘরে। দারোয়ান পাকড়াও করবে। (৪) যোধযন্ত্র (গোলন্দাজ মেশিন) (৫) শুকযন্ত্র (পাখীর মত কথা কইবে) তারপর শিশুদের আমোদ দিতে তুরঙ্গ যন্ত্র, মর্কট যন্ত্র, পুত্রিকা যন্ত্র এমনি আরও কত যন্ত্র। এসব যন্ত্রের নির্মাণ পদ্ধতি আমি গোপন করে রাখলাম। এটা প্রাত্যহিক ক্রিয়ার দ্বারাই জানা যাবে।

যন্ত্রেণ করতঃ হস্তী নতন্ গচ্ছন্ প্রতীয়তে।
শুকাদ্যাঃ পক্ষিণঃ কৢপ্তাঃ তালস্যানুগমাৎ মুহুঃ।
জনস্য বিস্ময় কৃতো নৃত্যন্তি চ পঠন্তি চ।
পুত্রিকা বা গজেন্দ্রো তুরগো মর্কটোঽপি বা।
বলনৈঃ বর্তনৈঃ নৃত্যন্ হরতে মনঃ'।

ব্যোমচারী বিহঙ্গ যন্ত্র

লঘুদারুময়ং মহাবিহঙ্গং দৃঢ়সুশ্লিষ্ট তনুং বিধায় তস্য।
উদরে রসযন্ত্র মাদধীত জ্বলনাধারমধোঽস্য চাগ্নিপূর্ণম্।
তত্রারূঢ়ঃ পুরুষঃস্তস্য পক্ষদ্বন্দ্ব উচ্চাল প্রোজ্ঝিতস্তেনানিলেন।
সুপ্তস্যান্তঃ পারদস্যাস্য শক্ত্যা চিত্রং কুর্বন অম্বরে যাতি দূরম্।
ইথমেব সুরমন্দিরতুল্যং সঞ্চলত্যলঘু দারুবিমানম্।
আদধীত বিধিনা চতুরঃ অন্তরস্য পারদপূর্ণান্ দৃঢ় কুম্ভান্॥

সমরাঙ্গন সূত্রধার ৩১ অধ্যায়।

সমরাঙ্গন সূত্রধার গ্রন্থটির বক্তব্য বিষয়গুলি যদিও প্রধানভাবে স্থাপত্য, ভাস্কর্য এবং চিত্রশিল্প, তবুও তাদের সঙ্গে আনুষঙ্গিক বিষয় আরও। যেমন প্রতিমাগঠন, (পূজার জন্য নয়, ঘর সাজাবার)

পূজনীয় পীঠগঠন (বেদীনির্মাণ) শিবলিঙ্গ গঠন, ভূগর্ভ প্রাসাদ নির্মাণ ও কেমন করে করতে হবে সে সম্পর্কেও কয়েকটি অধ্যায় রচিত আছে।

এতগুলি বিষয়ের মধ্যে আর একটি বিষয়ের অবতারণাও চমৎকার, সেটি আছে ৬২ অধ্যায়ে। এখানে ভোজ বলেছেন প্রাসাদ নির্মাণের স্থাপত্যবিদ্যার মধ্যে আরও একটি বিষয় জানতে হবে সেটির প্রকারভেদ ১২ প্রকারের। বিষয়টি হলো দ্রাবিড়দের প্রাসাদের বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্র। তাঁদের বাড়ির ছাদ, কাপোত (বিমান কণিকা) এখানে বিমান মানে সকলের ওপর তলা। দরজার মুখ, বাতায়ন, শালিকা (বারান্দা) এবং গোপুরম্, গর্ভ-গৃহ পৃথক ধরণের।

গ্রন্থের-দুটি অধ্যায়ে অর্থাৎ ৮২।৮৩ অধ্যায়ে বলা হ'য়েছে দেওয়ালে নানান্ রঙ দিয়ে চিত্র আঁকা যায়। সেসব রঙ স্থায়ী করার জন্য কোন্ কোন্ দ্রব্যের ক্বাথ, নির্য্যাস, শঙ্খ শম্বুক চূর্ণ কিংবা অপক্ক শস্য চূর্ণ মেশাতে হবে তা পূর্বের অধ্যায়ে বলেছি। ওগুলি মেশালে কোন বিষাক্ত কীট কেটে দিয়ে চিত্র গাত্র বিবর্ণ করতে পারবেনা।

শেষে দুটি অধ্যায়ে জানাব, দেওয়াল চিত্র আঁকতে হলে রসশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে হবে। অর্থাৎ কোন গল্পের কোন নায়ক নায়িকার ভাবটি ফোটাতে হ'লে রসবোধ থাকা দরকার। সেই রসবোধের প্রকার ভেদ হ'লো ১১টি রসানামথ বক্ষ্যামো দৃষ্টীনাং বেহ লক্ষণম্।

তদায়ত্তা যতশ্চিত্রে ভাব ব্যক্তিঃ প্রজায়তে।
শৃঙ্গার হাস্য করুণা রৌদ্র প্রেয়ো ভয়ানকাঃ।
বীর-মিত্রৌ (?) চ বীভৎসশ্চাদভূতস্তদা।
শান্ত-শ্চৈকাদশেত্যুক্তা রসাশ্চিত্র-বিশারদৈঃ

ভোজের এই রস সিদ্ধান্তটি যদি সুপ্রাচীন বলে মেনে নেওয়া যায় তবে ভরতের পর ১০ম শতাব্দীর মধ্যেই ৯টির ওপরে আরও দুটি রসের পরিভাষা আবিষ্কৃত হয়ে ছিল কারণ শান্ত দাস্য ইত্যাদি পরিভাষা গুলিকেই অন্ততঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর আলংকারিকগণ মানতেন। তারপর তাদের মুখ্য গৌণত্ব প্রাকৃতত্ব অপ্রাকৃতত্ব প্রভৃতি বিচার ভেদ সৃষ্ট হয়েছে।

তা যাক্। এখন এই সমরাঙ্গন সূত্রধার গ্রন্থটি ভারতে এই টুকুই ঘোষণা করেছে যে ঋক যজুর মত সুপ্রাচীনতম গ্রন্থ এবং রামায়ণ মহাভারতের মত কালবিজয়ী মহাকাব্যে যে স্থপতি ও স্থাপত্যবিদ্যা এবং ভাস্কর্য্য ও চিত্র শিল্প কলার প্রচুর শাব্দিক সূক্তি ও শ্লোকের উল্লেখ পাওয়া যায়, সেগুলির বাস্তবতাই ভারতে বিদিত ছিল, কাল্পনিক কাব্য মাত্র নয়।

আর বিংশ শতাব্দীর প্রত্নতাত্ত্বিকগণও ভূগর্ভ থেকে সেই সব স্থাপত্য ভাস্কর্য্যের নমুনা যখন পাচ্ছেন এবং ঐতিহাসিক কাল ও নির্ণয় করছেন, তখন ভোজের সমরাঙ্গন সূত্রধর গ্রন্থটির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য শিল্পের কাব্যও বস্তসত্তানের উৎস বলে প্রমাণিত করে।

ভারতে যে আজও প্রবাদ 'ভোজ বাজি' এবং ভানুমতীর খেলা সেটার উৎস ভোজের অদ্ভুত যন্ত্র বিজ্ঞানের আবিষ্কার এবং ভোজকন্যা ভানুমতী যখন বিক্রমাদিত্যের গৃহিণী হ'য়ে নানান্ যন্ত্রবিজ্ঞানের দ্বারা ভারতীয় সভ্যতাকে শিল্পসম্ভার করে গড়ে তুলতে প্ররোচিত করেন বিক্রমাদিত্যকে। যদিও সেই বিক্রমাদিত্যটি কে তার সন্ধান আজও চলছে।

ভারতের দুর্গ : হরপ্পীয় যুগের পরিপ্রেক্ষিতে

সন্তোষকুমার বসু

সিন্ধু-সভ্যতা অথবা হরপ্পীয় যুগে ভারতীয় উপমহাদেশের পশ্চিম, উত্তর-পশ্চিম এলাকা এবং তৎসন্নিহিত প্রত্যন্ত অঞ্চলের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দের মধ্যভাগে বা তার কিছু পূর্ব থেকেই এই নগরমুখী সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল এখনকার বালুচিস্তানের উত্তর ও দক্ষিণদিকে এবং মাকরান উপকূলে, দক্ষিণ-পূর্ব আফগানিস্তানে, সিন্ধুতে, পশ্চিম ও পূর্ব-পাঞ্জাবে, রাজস্থানে, গুজরাটে এবং তার আশেপাশে। এযাবৎ হরপ্পীয় সংস্কৃতির কথায় আত্মরক্ষা, নগরশাসন এবং বহিরাক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রাকারাদির বা প্রতিরক্ষা স্থাপত্যের কথা হরপ্পীয় পরিপ্রেক্ষিতে পৃথক করে নিয়ে আলোচিত হয়নি যথার্থভাবে। সেই কারণে এখানে হরপ্পীয় প্রত্নকেন্দ্রসমূহের দুর্গ-বিবরণে ভৌগোলিক ব্যাপ্তি ও বিভাজনকে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হল। এর সঙ্গে হরপ্পীয় প্রতিরক্ষা স্থাপত্যকে অপেক্ষাকৃত সহজে এবং সুস্পষ্টভাবে বোঝা যাবে।

বালুচিস্তান : বালুচিস্তানের মধ্যে 'সোহরদাম' (নাল ঢিবি), 'কুল্লি', 'মেহি', 'শাহী টুম্প' (রাজার ঢিবি), 'দাবারকোট', 'সুরজাঙ্গাল', 'রাণা ঘুণ্ডাই' (রাণীর ঢিবি), 'সুত্‌কাগেন্‌ দোর', 'সোত্‌কা কোহ' (পোড়া পাহাড়) প্রভৃতি প্রাচীন কেন্দ্রে প্রাথমিক দুর্গ-স্থাপত্যমূলক শিল্পাদির পরিচয় পাওয়া যায়।

সিন্ধু বা সিন্ধ : এখানকার দুর্গ-পরিচায়ক প্রত্নকেন্দ্রের মধ্যে 'কোহতাস, বুথি', 'আলি মুরাদ', 'থারুরো', 'মহেঞ্জোদারো', 'আমরি', 'কোট দিজি', 'থিরানিজো কোট' উল্লেখ্য।

পাঞ্জাব : পূর্বোক্ত দুর্গের জন্য বিখ্যাত হরপ্পা এই এলাকায় সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নক্ষেত্র।

দক্ষিণ-পূর্ব আফগানিস্তান : কান্দাহার শহরের উত্তর-পূর্বে থাকা 'মুন্ডিগাক' এই এলাকায় সর্বাধিক পরিচিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাযুক্ত প্রত্নকেন্দ্র।

রাজস্থান : এখানকার একাধিক হরপ্পীয় ধারার প্রত্নাবশেষের মধ্যে গঙ্গানগর জিলার কালিবঙ্গান' অন্যতম ও বর্তমান আলোচনায় প্রয়োজনীয়।

গুজরাট : এখানকার হরপ্পীয় কৃষ্টির কেন্দ্র সমূহের মধ্যে 'সুরকোটাডা' ও 'লোথাল' উল্লেখ্য এছাড়াও কোটাডা, 'কেটাডা', 'দসলপার' প্রভৃতি কেন্দ্রও আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত তথ্যাদি পাওয়া যায়।

সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হরপ্পীয় প্রত্নকেন্দ্র সমূহে অতি উন্নত নগর ব্যবস্থা দুর্গ এবং নগর প্রাকারাদি দেখা যায়। বিশিষ্ট আকার বর্ণনযুক্ত মৃৎপাত্র লিপি উৎকীর্ণ মুদ্রা ও মুদ্রাঙ্ক প্রভৃতি এই স্তরের। হরপ্পীয় প্রত্নাঞ্চলের একাধিক ক্ষেত্রে যেমন কালিবঙ্গানে স্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট প্রাক্‌ হরপ্পীয় স্তরের অবস্থিতি লক্ষণীয়। আবার লোথাল চানহুদড়ো প্রভৃতিতে হরপ্পীয় সংস্কৃতির শেষাংশের ও অন্তিমকাল পর্যন্ত বিস্তৃত প্রত্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। অন্যদিকে বালুচ পাহাড়-অঞ্চলের কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাক্-হরপ্পীয় প্রাচ্যপ্রত্নকেন্দ্রের পরিচয় পাওয়া যায়।

দুর্গ ও দুর্গস্থাপত্যের আলোচনায় নগর প্রাকারও নাগরিক প্রতিরক্ষার কথা বাদ দেওয়া যায় না। কারণ নগরকে সুরক্ষিত করার জন্যই সুরক্ষিত দুর্গের উদ্ভব হয়েছিল। আবার প্রাকারের ক্রমবিকাশকে পাহাড়ী খাদে প্রাচীর তুলে বৃষ্টিপাতের জলকে আটকানোর প্রথা বা সমতলের নদী প্লাবনের বাঁধ নির্মাণে প্রকৃতির কথা থেকে পৃথক করা যায় না কারণ এই দুই প্রকারের বাঁধই সময়ে সময়ে প্রাকারের রূপ নিয়েছিল। আমরা এখানে একে একে একটি প্রত্নকেন্দ্র নিয়ে প্রতিরক্ষার স্থাপত্য, এবং দুর্গ-প্রকরণে তার গুরুত্ব নির্দেশক আলোচনায় অবতীর্ণ হবো।

সোহর দাম্ব : এই প্রত্নকেন্দ্রটিতে প্রাচীর নির্মাণের একটি পদ্ধতির প্রতি দৃষ্টি পড়ে যা' পরবর্তীকালের অনেক দুর্গ-প্রাকারের গঠনে ও কাজে লাগানো হয়েছে। এই ধরণের একপ্রকার প্রাচীর এখানে আছে। পাহাড়ী নালাকে আড়াআড়ি বাঁধ দিয়ে বৃষ্টির জল জমানোর জন্যে এগুলি নির্মিত। অনুমান করা হয় বহুলোকের যৌথ প্রচেষ্টায় অতি প্রাচীনকালে এই রকম প্রাচীর দেওয়া হয়েছিল, এখনও এই রীতির প্রাচীরকে এখানে 'গাবারবান্দ' বলে। স্পষ্টতঃই এটি কারো একার কাজ নয় বহুলোকের বা স্থানীয় অধিবাসীদের যৌথ কার্যক্রমের প্রয়োজন হয়েছিল এই জন্যে। পরবর্তীকালে পাহাড়ী খাদ বা নালা দিয়ে যাতে আক্রমণকারীরা উপরের দুর্গভূমিতে উঠে আসতে না পারে সেইজন্য এইরকম প্রাচীর দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। দুর্গ-নির্মাণ করতে গেলে যে বহুলোকের দরকার হয় সেটা এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট আর বোঝাযায় যে সুসংগঠিত শ্রমিকবাহিনী ও শাসক গোষ্ঠি ছাড়া রাষ্ট্র-ব্যবস্থা পরিচায়ক পরবর্তীকালের অধিকাংশ দুর্গ-প্রাকার বা নগর-প্রাকার নির্মিত হয়নি।

কুল্লি এবং মেহি : বালুচ এলাকার এই প্রত্নকেন্দ্রদ্বয় অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এখানের প্রত্নকেন্দ্রের একটি স্তর পূর্ণ বিকশিত হরপ্পীয় কৃষ্টির অনুরূপ। এখানে ঐ নাগরিক কৃষ্টির প্রথা অনুসারে উচ্চভূমিতে একটি শাসনকেন্দ্র বা সম্ভাব্য দুর্গাঞ্চল এবং নিম্নভূমির নগরাঞ্চলকে পাশাপাশি দেখা যায়। 'কুল্লিতে' একটি সুরক্ষিত প্রস্তরনির্মিত প্রাকার জনবসতিকে ঘিরে রয়েছে। এই ঘটনাটি আরও অর্থবহ হয়ে উঠবে যখন আমরা দেখবো যে এই প্রত্নকেন্দ্রের নিকটে পাথর স্বাভাবিকভাবে সহজলভ্য নয়। অর্থাৎ বেশ কিছু দূর থেকে। পাথর কেটে এনে পূর্ব-পরিকল্পিতভাবেই এখানের প্রাকার নির্মাণ করা হয়েছিল। ঘরবাড়ি প্রাচীরের তলার দিকটায় পাথরের গাঁথনি দেবার প্রথা পূর্ব-বর্ণিত কেন্দ্রগুলিতে দেখা যায়।

শাহী টুম্প : দক্ষিণ বালুচ এলাকার এই প্রত্নকেন্দ্রে বৃহদাকার, প্রায় হাত চারেক প্রস্থের প্রাচীর উৎখনিত খাদের একাংশথেকে পাওয়া গেছে।

দাবার কোট : এটি বালুচ এলাকার একটি সুপ্রাচীন বসতি। সম্ভবতঃ একটি গুরুত্বপূর্ণ সীমান্তস্থিত প্রত্ন-প্রতিরক্ষা কেন্দ্র। এখানে বসতি বিকশিত হরপ্পীয় যুগের প্রতিরক্ষা-প্রাকারে সজ্জিত ছিল। অনুমান করা হয় এখানকার নগরদুর্গ ধ্বংসাবশেষের উত্তরদিকে। দুর্গভূমিতে কাদামাটির ইটের চত্বর এবং ইটে তৈরী পয়ঃ প্রণালী এবং মাতৃমূর্তির নিদর্শন থেকে অনুমান করা হয় যে এখানকার দুর্গ তৎকালীন ধর্মানুষ্ঠানের কেন্দ্র রূপেও হয়ত ব্যবহার করা হতে পারতো।

সুর জঙ্গল এবং রাণা ঘুণ্ডাই : এর প্রথমটি ক্ষুদ্র গ্রামকেন্দ্র যার ঘরবাড়ি নুড়ি বা বড় প্রস্তরখণ্ডের ভিত্তির উপরে কাদামাটির রৌদ্রতপ্ত ইট দিয়ে নির্মিত। দ্বিতীয়টিতেও অনুরূপ প্রথা অনুসৃত।

শিন্না দার : বৃহৎ প্রাচীর নির্মাণের প্রথা পূর্বের ন্যায়। এখানে একটা মজবুত চত্বর গড়া হয়েছিল বসতির বিবর্তনের মাঝামাঝি পর্যায়ে। এটির একটি প্রতিরক্ষামূলক কারণ থাকতেও পারে।

সুত্‌কাগেন্ দোর ও সোত্‌কা কোহ্ : দুটি ক্ষেত্রই হরপ্পীয় যুগের সমুদ্র তীরস্থ বন্দর ও বাণিজ্য কেন্দ্র রূপে যে ব্যবহৃত হত সে কথা অনুমান করার একাধিক কারণ আছে। দস্ত্ নদীর তীরবর্তী সুত্‌কাগেন্ দোর এর গিরিদুর্গ দেখবার মত। এখানকার দুর্গের প্রাকারের পাথরের খণ্ডকে স্বল্প পরিমাণে একটা গৃহ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় আকার দেবার পর দুর্গ-প্রাকারে ব্যবহারের প্রচেষ্টার লক্ষণ আছে। পাথরগুলি এখানে বড় ছিল। এখানে দুর্গ প্রাকারের ভিতরে দিকটা অল্প হেলানো। বাহিরের দিকে প্রাকারের ঢাল বেশী। প্রাকারের মধ্যে মাঝে মাঝে কাদামাটির ইটে তৈরী বেদী, বুরুজ ও পর্যবেক্ষণ শিখর প্রভৃতির অবশিষ্টাংশ পড়ে আছে। দুর্গের প্রবেশ তোরণ আছে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে। তোরণের নিকট একটি প্রাকার শিখর এমন ভাবে নির্মাণ করা হয়েছে যাতে দুর্গের এগিয়ে যাওয়া পথের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা যায়। চারিদিকে খাড়াই থাকা একটি প্রস্তরময় উচ্চতার তলার দিকটায় প্রাকার তুলে এই প্রত্ন-দুর্গ নির্মিত। প্রাকার এখানে প্রায় চব্বিশ ফুট চওড়া নীচের দিকটায়, কাদামাটির ইটের বেদীগুলি প্রায় সাড়ে চারহাত উচ্চ। এখানে দুর্গ-তোরণ-পথ প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুট চওড়া এবং চব্বিশ ফুট দীর্ঘ। নিম্নের নগরাঞ্চল প্রত্ন-উচ্চভূমির পূর্বদিকে অবস্থিত ছিল বলে মনে হয়। হরপ্পীয় সংস্কৃতির সাধারণ রূপরেখা এখানে উপস্থিত। সুত্‌কাগেন দোর ও সোত্‌কাকোহ দুটিই প্রাচীন গিরিদুর্গের অন্যতম নিদর্শন।

কোহ্‌তারাসবুথি : সিন্ধু নদীর পশ্চিমের তীর থেকে বালুচ সীমানার মধ্যবর্তী অঞ্চলের প্রত্নকেন্দ্র। এখানে দুর্গ-নির্মাণ করা হয়েছে উত্তরদিকে উপরে উঠে যাওয়া এবং দক্ষিণের দিকে ক্রমশঃ নেমে আসা পাহাড়ী ভূমিবিন্যাসকে আশ্রয় করে। উচ্চভূমির পূর্ব পশ্চিম ও উত্তর দিক বেশ খাড়াই। দক্ষিণদিক থেকে পাহাড়ে উঠতে গেলে এখানে আড়াআড়ি করে রাখা প্রাকার চোখে পড়বে। এখানে পাথরকে এবড়ো-খেবড়ো করে খানিকটা কেটে নিয়ে কোনরকম গাঁথনির মাধ্যমে ব্যবহার না করে পর পর সাজিয়ে প্রাকার গঠিত হয়েছিল। উপরের দিকে উঠে আসতে গেলে দেখা যাবে যে প্রথম প্রাচীরটির উচ্চতা অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু এর পরে থাকা প্রাকারটি যথোপযুক্ত উচ্চতাবিশিষ্ট এবং এতে মাঝে মাঝে একাধিক বুরুজ দিয়ে সুরক্ষিত। প্রত্নকেন্দ্রটিতে স্বাভাবিক ভূ-প্রকৃতিতে দুর্গনির্মাণে কাজে লাগানোর রীতি এবং 'ভিতর দুর্গের' প্রাকার-ব্যবস্থার সুন্দর উদাহরণ রূপে গ্রহণ করা যায়। দ্বিতীয় প্রাকারের দক্ষিণ-পূর্বে প্রবেশপথ ভিতরের দুর্গের মধ্যে অনেক ঘর-বাড়ির ভিত্তি প্রাচীর দেখা যায়। **আলি মুরাদ এবং থারুরো (থারুরি ডুরো) :** আলি মুরাদে প্রাথমিক উৎখননে একটি দীর্ঘ প্রাকারের চিহ্ন দেখা গেছে। এই অসংস্কৃত দুই ফুটদীর্ঘ এক ফুট উচ্চ প্রায় এক ফুট প্রস্থের পাথরের খণ্ড দিয়ে গড়া। থারুরো বা থারুডিরো একটি প্রতিরক্ষা সমন্বিত অতি প্রাচীন জনবসতি। এটি একটি চাতালে থাকা শিখরদেশ সমন্বিত বিচ্ছিন্ন পাহাড়ে অবস্থিত এবং এখন খানিকটা অভ্যন্তরের দিকে অবস্থিত হলেও হয়ত প্রাচীনকালের সমুদ্রোপকূলের নিকটেই ছিল চারিদিকের জলভূমির একদিকে বেরিয়ে থাকা একটা দ্বীপ-সদৃশ উচ্চভূমিতে। এখানেও কোহ্‌তারাসের দুই দেয়ালের অস্তিত্ব আছে। প্রায় দুইশত পঞ্চাশ ফুট ব্যবধানে এই দুটি প্রাকার বড় পাথরের খণ্ড দিয়ে তৈরী এবং হেলানো।

মিরাম্বিজো কোট : এটি সিন্ধ বা সিন্ধুদেশের আর একটি ক্ষুদ্র প্রত্নকেন্দ্র। এই বসতির চারিদিকে একটা রক্ষণ-প্রাকারের ভগ্নাবশেষের চিহ্ন পাওয়া যায়।

আমরি এবং কোট দিজি : প্রথমটি একটি সুপরিচিত হরপ্পা-পূর্ব প্রত্ন কেন্দ্র। এর প্রাচীনতম প্রত্নস্তরে বসতির পশ্চিমদিকে একটি খাল বা পরিখা আছে। সম্ভবতঃ এটি দিয়ে বসতির সীমানা সুরক্ষিত করা ছিল। এর অব্যবহিত পরের প্রত্নস্তরে এই পরিখার পিছনে একটি পাথরের প্রাকার স্থাপন করা হইয়াছিল। আমরি-র দ্বিতীয় প্রত্ন-পর্যায়ে অর্থাৎ হরপ্পীয় যুগে বসতির মধ্যে একটি কর্দম-প্রাকার দেখা যায়। কোট দিজি পাকিস্তানের খয়েরপুর শহরের পনেরো মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে হরপ্পীয় ধারার উচ্চ দুর্গ ও বাহিরে নগরবাসস্থান দেখা যায়। হরপ্পা-পূর্ব যুগে এখানে বসতি চারিপাশে পাথরের ভিত্তিস্তরের উপর গড়া প্রতিরক্ষা প্রাকার ছিল। তবে এখানে কাদামাটির ইটের ব্যবহারই ছিল অধিক। এখানে প্রতিরক্ষা প্রাকারের প্রায় দশ ফুটের পাথরে গড়া ভিত্তির ইটের গঠন দেখা যায়। প্রাকারের অবশিষ্টাংশ বর্তমানে বারো থেকে চৌদ্দ ফুট উচ্চ। উৎখননের ফলে একশত আট ফুট দীর্ঘ প্রাকারাংশ দেখা গেছে। প্রাকারে বড় আকারের আয়তাকার বুরুজ এবং বাইরের দিকের কাদামাটির ইটে তৈরী রক্ষণ প্রাচীর আছে। কোট দিজির হরপ্পীয় যুগের কীর্তির পূর্ণাঙ্গ উৎখনন এখনও হয়নি। তবে অতি প্রাচীন কাল থেকেই এটি যে একটি সুরক্ষিত নাগরিক কৃষ্টির কেন্দ্র ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মহেঞ্জো-দারো : এই সুবিখ্যাত প্রত্ন-কেন্দ্র পূর্ণ-বিকশিত হরপ্পীয় সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বর্তমান। এখানে বসতির মধ্যে দুইটি স্পষ্ট বিভাগ আছে। দুর্গটি বসতির পশ্চিমে উচ্চভূমির উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। নগর বসতি ছিল নিম্ন সমতলে। এই স্থানের দুর্গের মধ্যে শস্যাগার, কারখানাঘর, স্নান করার উপযুক্ত পয়ঃপ্রনালী যুক্ত কুণ্ড ও বৃহদাকার গৃহের ধ্বংসাবশেষ আছে। এক্ষেত্রে আমাদের মনে করে নিতে বাধা নেই যে এখান কার দুর্গকেন্দ্র নগরশাসনের শস্যাগার সুরক্ষিত করার ও তখনকার কালের প্রচলিত অনুষ্ঠানের স্থাপত্য বিন্যাসকে অনুসরণ করে রচিত। অনুমান করা হয় যে দুর্গভূমির চারি পাশে ছিল কৃত্রিম ভাবে তৈরী করা ইটে গঠিত রক্ষণ প্রাচীর। পোড়ানো ইটের ব্যবহারও এখনে একটা উল্লেখ্য অগ্রগতিকে সূচিত করে। দুর্গ প্রাকার ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গভাবে অনুধাবন করতে না পারা গেলেও দুর্গ-ঢিবির দক্ষিণ-পূর্ব কোণে উৎখননের ফলে একটি বৃহদাকার প্রাকার শিখর আবিষ্কৃত হয়েছে। এই প্রাকারাংশের প্রাচীনতর স্তরে প্রাকারের মধ্যে কাঠের কড়ি দিয়ে প্রাকারকে শক্ত এবং সুরক্ষিত করার প্রচেষ্টা চোখে পড়বার যোগ্য। এই প্রাকার শিখরের নিকটে অপেক্ষাকৃত পরবর্তী পর্যায়ে দূরথেকে ছুঁড়ে মারবার উপযুক্ত এক প্রকার প্রাগৈতিহাসিক ক্ষেপণাস্ত্রের সংগ্রহ পাওয়া গেছে।

হরপ্পা : এটি হরপ্পীয় সংস্কৃতির প্রধানতম প্রত্নকেন্দ্র যাতে হরপ্পীয় কৃষ্টির বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এখানেও মহেঞ্জো-দারো'র ন্যায় দুর্গ ভূমি নগর-বসতির পশ্চিমদিকের উচ্চভূমিতে অবস্থিত। এখানে দুর্গ প্রাকারকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে অনুধাবন ও উৎখনন করে তার প্রকৃতি নির্ণয় করতে পারা গেছে। হরপ্পার দুর্গ প্রাকারে যের পশ্চিমে ঈষৎ হেলে থাকা একটা সমান্তরিকের মত। প্রাকার ভিত্তির দিকে প্রায় চল্লিশ ফুট চওড়া এবং উপরের দিকে সরু হয়ে উঠে

এসেছে এবং ভিতরে কাদামাটির ইটের ব্যবহার থাকলেও বাহিরের দিকে পোড়ামাটির ইট দিয়ে শক্ত করে বাঁধানো। দুর্গপ্রাকারের কোণগুলিতে ও অন্যান্য অংশে অনেক আয়তাকার বা চতুষ্কোণ বুরুজ প্রাকার থেকে বাইরের দিকে বেরিয়ে এসেছে। হরপ্পার দুর্গের উত্তরদিক ও এবং পশ্চিমদিক যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। অনেককাল আগে প্রায় একশত বৎসর পূর্বে কানিংহাম উত্তর পশ্চিম দিক থেকে দুর্গ ঢিবিতে ওঠবার উপযুক্ত একটি সোপানপথ লক্ষ্য করেছিলেন। তার পরে দুর্গ ঢিবি অনেকটাই নষ্ট হয়ে গেছে। হরপ্পায় দুর্গ প্রাকারের উত্তর দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে যে কাদামাটির ইটে তৈরী দুর্গ প্রাকার এখানে দুইপাশ থেকে ঘুরে ভিতরে চলে এসেছে। দুই প্রাকারের মাঝের পথটিও অস্পষ্ট— হয়ত এখানে গড়ানে ঢাল বা সোপান শ্রেণীর ব্যবস্থা ছিল। হরপ্পার পশ্চিমদিকের প্রাকারে দুর্গ তোরণ ব্যবস্থা লক্ষ্য করার যোগ্য। প্রথমদিকে সরাসরি দুর্গতোরণের ভিতর দিয়ে দুর্গের মধ্যে ঢোকা যেত। পরে প্রাকারের ধারে ধারে দুটি চত্বর তৈরী করা হয়। চত্বরে দেওয়া হয় পোড়ান ও কাদামাটির ইটের রক্ষণ প্রাচীর। দুর্গ প্রাকার এখানে খানিকটা বৃত্তাংশের মত ভিতরে (পূর্ব দিকে) ঢুকে এসেছে। এখানে চত্বরের পাশে দুটি স্থানে সাস্ত্রীঘরের ব্যবস্থা দেখা যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ের সাক্ষ্য থেকে মনে হয় দুর্গ-তোরণ চত্বর এসময়ে সারানো হয়েছিল। এখানেও সান্ত্রীঘরের প্রথা অব্যাহত রাখা হয়। কিন্তু হরপ্পীয় যুগের অন্তিম পর্যায়ে দুর্গের প্রাকারকে বাড়িয়ে এনে একটি প্রবেশ পথের প্রশস্ততাকে ছোট করে নিয়ে আসা হয়। অন্য আর একটি প্রবেশ পথ বন্ধ করে দেওয়া হয় সর্বাংশে। হরপ্পায় অনেককাল থেকেই দুর্গ-ঢিবি ও নগর কেন্দ্র থেকে পোড়ামাটির ইট সরিয়ে ফেলা হয়েছে এইজন্য হরপ্পার দুর্গ-ঢিবির অভ্যন্তরভাগ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত এবং ভিতরের গৃহ সংস্থান এখানে মহেনজো-দাড়োর মত সুস্পষ্ট নয়। হরপ্পার পশ্চিমদিকের প্রবেশ চত্বর সমন্বিত তোরণকে কোন এক মতে আনুষ্ঠানিক শোভাযাত্রার পথ রূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

মহেনজো-দাড়ো ও হরপ্পা এই দুটি মহানগরী ভারতীয় নাগরিক জীবনের প্রধানতম প্রাগৈতিহাসিক কেন্দ্র। এই বিশিষ্ট কারণের জন্যে শুধুমাত্র হরপ্পা ও মহেনজো-দাড়ো নিয়ে একটি পৃথক ও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা যেতে পারে। এই দুটি প্রত্ন-ক্ষেত্রেরই একটি স্বাভাবিক সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয় ক্ষেত্রেই দুর্গ ভূমি বা দুর্গ স্তূপটি রয়েছে মিশ্র শহর এলাকার পশ্চিমদিকে। অতীতে দুটি প্রত্নস্থলেরই অদূরে একটি নদীর প্রবাহ দেখা যায়। দুটি স্থানেই দুর্গের আকার সমান্তরিক যদিও হরপ্পার ক্ষেত্রে এটি সুস্পষ্ট। এই দুটি অঞ্চলেই দুর্গ ভূমিতে আয়তাকার বা চতুষ্কোণ বুরুজের ব্যবহার দেখা যায়। দুটি ক্ষেত্রেই শস্যাগার ছিল হয় দুর্গের মধ্যে (যেমন মহেনজো-দাড়োতে) অথবা দুর্গের অতি নিকটে শাসকশ্রেণীর সদাসতর্ক প্রহরার সম্মুখে (হরপ্পার দুর্গের উত্তর পশ্চিমকোণের একাধিক এগিয়ে যাওয়া বাঁকে তৈরী উত্তর পশ্চিমের বুরুজের আওতার মধ্যে) অভিজ্ঞ উৎখননকারীর মতে মহেনজো-দাড়ো'র দুর্গ ঢিবির একাধিক অংশে মাটি চেঁছে ফেলে কাদামাটির ইটের প্রাকারাংশের চিহ্ন পাওয়া গেছে। যদিও এক্ষেত্রে পোড়ামাটির ইটের রক্ষণ প্রাকার পাওয়া যায়নি তাহলেও দুর্গের চারিদিকে সীমানা নির্দেশক প্রাকার ছিল সেকথা বুঝতে অসুবিধা হয়নি। অনুমান করা হয় যে এখানেও হরপ্পার মত দুর্গের উত্তরদিকে থাকা একটি প্রাকারের ভিতরে ঢুকে আসা অংশে তোরণের ব্যবস্থা ছিল। আবার মহেনজো-দাড়োর পশ্চিমাংশের দক্ষিণ ভাগে একটা ভিতরে ঢুকে আসা কাজের

প্রকোণে সরে যাওয়া অংশ আছে যেটা হরপ্পার পশ্চিমপ্রাকারের ভিতরে ঢুকে আসা ঘোরানো অংশটির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

মুন্দিগাক্ : দক্ষিণ-পূর্ব আফগানিস্তানের কান্দাহার শহরের উত্তরে এই প্রত্নকেন্দ্রটি অবস্থিত। এখানে ভারতীয় উপমহাদেশজ কৃষ্টির সঙ্গে ইরানের তাম্র-প্রস্তরীয় কৃষ্টির একটা মিশ্রণ ও সহাবস্থান লক্ষণীয়। অর্গন্দাব্ নদীর দক্ষিণদিকে বা পাড়ে গিয়া সাফ বা কাল পাথরের গিরিপথের নিকটে এটি প্রথমে একটি গ্রামীণ কৃষির কেন্দ্র ছিল। পরে একটি বর্মপ্রাকার দিয়ে বসতিস্থাপনকে ঘিরে একটা ছোট শহর এখানে গড়ে তোলা হয়। বাহিরদিক থেকে এই প্রাকারকে ঠেস্-দেওয়াল দিয়ে শক্ত করে দেওয়ার চিহ্ন বর্তমান, এখানে সামান্য দূরত্বে পর পর দুটি দেওয়াল ছিল। এই সমান্তরাল দেওয়ালদ্বয়ের মাঝখানে পরে পাশাপাশি থাকা বাসযোগ্য ঘরের সাহায্যে খানিকটা ভরিয়ে দেওয়া হয়। এই প্রাকারের ভগ্নাবশেষ দিকটা প্রায় চৌকা করে কাটা পাথর কাদামাটির সাহায্যে ভগ্নের দিক থেকে খানিকটা উঁচিয়ে নিয়ে তারপর না-পোড়ানো কাদামাটির ইট দিয়ে গড়ে দেওয়া হয়েছিল। ভিতরের দিকে মাটির ভূমিতল বাহিরের দিকে প্রাকারে পাথরের স্তর পর্যন্ত উচ্চ ছিল। এখানে প্রাকারের একটি কোণায় চারটি খত দেওয়া চৌকা বুরুজ আছে। খানিকটা করে তফাতে ছোট ছোট বুরুজ প্রাকার থেকে বেরিয়েছিল। প্রাকারের বাহিরের দিকে কোণে কোণে আরও ঠেস দেওয়া বড় আকারের রক্ষী এবং চৌকা স্তম্ভের গড়নের স্থাপত্যকর্ম এখানে দেখবার মত। একস্থানে প্রাকারের একাংশ উপরে ওঠবার সিঁড়ি দেখা যায়। অনুমান করা যেতে পারে যে পূর্ব প্রাকারের উপরে আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য এবং প্রতি আক্রমণের পরিচালন করা আচ্ছাদিত চলাচলের পথের ব্যবস্থা করা ছিল। পরের দিকে মুন্দিগাকের প্রাকারব্যবস্থা দক্ষিণ-পশ্চিমে আরও বিস্তৃত করা হয় এবং একটি সুরক্ষিত প্রাসাদ তৈরী করা হয়। হরপ্পীয় যুগের সূচনায় মুন্দিগাক যথেষ্ট উন্নতি পর্যায়ের সভ্যতার পরিচয় দেয়। মুন্দিগাকের অতিরিক্ত উন্নতিই তার পতনের কারণ হয়। অতিরিক্ত জনবসতির চাপে প্রাকারের আক্রমণ প্রতিহত করার যোগ্যতা বিনষ্ট হয়ে যায়। প্রাকারের ভিতরে ও বাহিরে নানান ঘরবাড়ি তুলে প্রাকারকে অকর্মণ্য করে ফেলার এটা একটা বিশেষ উদাহরণরূপে বিবেচিত হতে পারে। এই আক্রমণের পরে মুন্দিগাকের বসতি ক্রম অবনতির দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। এই সময়ের মুন্দিগাকে পুনর্নির্মিত প্রাকার-ব্যবস্থার অবসান হলেও একটা বড় দেওয়ালের অস্তিত্ব কয়েক স্থানে বেরিয়ে পড়েছে।

কালিবঙ্গান : রাজস্থানের উত্তর-পশ্চিমে গঙ্গানগর জিলায় এই প্রত্নকেন্দ্র হরপ্পার এই দুই যুগেরই বসতির ধ্বংসাবশেষ প্রকাশিত হয়েছে। উৎখননের ফলে এখানে দেখা যায় যে এখানকার দুর্গ-ঢিবি নগরাঞ্চলের উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। দুর্গ-প্রাকার এখানেও সমান্তরিক ভাবে উত্তরদিকে ঘেঁষা বা হেলে থাকা। এখানে একটা বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করে দুর্গকে মাঝখানে আর একটি বিভাজক প্রাচীর দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে দুটি ভাগে বিভক্ত করে ফেলা হয়েছে। এখানেও প্রধান প্রবেশ-পথ দুর্গের উত্তর-পশ্চিম কোণে। উত্তর ও পশ্চিম দিকের প্রাকারকে দুটি ভিতরের দিকে (দক্ষিণ-পূর্ব দিকে) ঢুকে আসা বাহুর সাহায্যে একটি কোণের মাঝামাঝি স্থানে এখানে প্রধান প্রবেশপথের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রাকারের বাঁক দুটিতে প্রতিরক্ষার জন্য বুরুজও করে দেওয়া আছে। দুর্গের

ভিতরে প্রবেশ করার জন্য পূর্বদিকে মাঝখানের বিভাজক প্রাচীরের সামান্য উত্তরে একটি বুরুজের নিকটে একটি প্রবেশপথ এবং দক্ষিণ প্রাকারের মাঝামাঝি অংশে একটি ও উত্তর-পশ্চিমে যেখানে পশ্চিম প্রাকার বেঁকে গিয়ে ভিতরে ঢুকতে শুরু সেখানে একটি এই তিনটি প্রবেশ পথের ব্যবস্থা করা আছে। প্রত্যেকটি প্রবেশ পথই একপাশে বা দুইপাশে বুরুজ দিয়ে সুরক্ষিত। দুর্গের ভিতরের উত্তরাংশ থেকে দক্ষিণাংশে প্রবেশ করার জন্য একটা সোপানপথ ছিল মধ্যস্থিত বিভাজক প্রাকারের মধ্যে। কালিবঙ্গানের দুর্গ-ভূমির মধ্যে (দক্ষিণার্ধে) একটি প্রাচীন যজ্ঞাগারের জন্য নির্মিত বেদীর চিহ্ন পাওয়া গেছে। আবার দুর্গ-ভূমির উত্তরার্ধে আছে নানাপ্রকারের গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ।

কালিবঙ্গানের দুর্গ-ক্ষেত্র একদিনে বা একটি যুগে হঠাৎ গড়ে ওঠেনি। রীতিমত দুর্গ গড়ে ওঠার আগে এখানকার প্রাক্ হরপ্পীয় বসতির চিহ্ন পাওয়া যায় যার চারিদিকে ছিল একটা কাঁচা প্রাকারের ব্যবস্থা করা ছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেছে পরের যুগে দুর্গের রূপ বিবর্তনের ফলে স্পষ্ট।

সুরকোটাডা : কচ্ছ-কাথিয়াবাড়ের সমুদ্র সৈকত সংলগ্ন সমতলভূমির কোটাদা, কোয়াল, দেশলপার প্রভৃতি হরপ্পীয় রীতির উচ্চ ভূমিস্থিত দুর্গ ও নগরবসতির চিহ্ন আছে। এর মধ্যে সুরকোটাডা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। এই হরপ্পীয় বসতির পত্তনায় কাদামাটির ইট ও কাদার খণ্ডাংশ দিয়ে প্রাকার তৈরীর প্রচেষ্টা হয়। এরপরে আসে প্রাকারে পাথরের খণ্ড দিয়ে ভিতরের দিকটায় তলা থেকে পাঁচ থেকে আটটি স্তর দিয়ে তৈরী করার যুগ। এখানের প্রাকার সাত মিটার চওড়া হলদে রঙের মাটিকে চাপ দিয়ে ঠেসে শক্ত করা উঁচু বেদী ও আছে এই প্রত্ন-ক্ষেত্রে। এখানকার হরপ্পীয় ক্ষেত্রটির কেবলমাত্র দক্ষিণ ও পশ্চিম প্রাকার উৎখননের ফলে পূর্ণাঙ্গ ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। দুর্গভূমির উত্তরে একস্থানে উৎখনন পরিচালনা করে প্রাকারের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে। সাধারণভাবে এখানকার প্রাকার একটি আয়তক্ষেত্রকে ঘিরে রেখেছে। এই আয়তক্ষেত্রের ক্ষুদ্রতর দিকটি উত্তরে দক্ষিণে এবং দীর্ঘতর দিকটি পূর্বে পশ্চিমে বিস্তৃত। আয়তক্ষেত্রের মাঝখানে একটি প্রাচীর দেওয়া। প্রাচীরের পশ্চিমের চৌকা স্থানে নগরবসতির অবস্থান ছিল বলে অনুমান করার কারণ আছে। প্রাকারের প্রত্যেকটি কোণে এবং মাঝখানের বিভাজক প্রাচীরের উত্তরে ও দক্ষিণে চতুষ্কোণ বা সামান্য আয়তাকার বুরুজ দেওয়া আছে। দুর্গতোরণের অবস্থান এখানে ছিল দক্ষিণ দিকটিতে। ঢাল-দেওয়া প্রবেশ পথ, সোপান শ্রেণীর ব্যবস্থা ও রক্ষীঘর ও প্রাকার থেকে বেরিয়ে আসা প্রাচীর দিয়ে এটি সুরক্ষিত করা ছিল। পূর্বদিকের বসতি-এলাকার দক্ষিণেও একটি প্রধান প্রবেশ পথ এখানে দেখা যায়।

লোথাল : আহমদাবাদ জিলার মধ্যে 'ভাল্' নামক জলাভূমির সমতলে 'ভোগাবো' ও 'সবরমতী' নদী দুটির সঙ্গমের স্থান থেকে অদূরে এই প্রত্নক্ষেত্র অবস্থিত। এটির দুর্গভূমি সদৃশ উচ্চ স্থানটি নাগরিক বসতির দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। অনুমান করা যেতে পারে যে এখানেই ছিল নগর-শাসনের মূলকেন্দ্র। এখানে বসতির চারিদিকে ছিল সুউচ্চ প্রাচীর। হয়ত সমতলের বন্যার জলকে আটকানোর কাজেই এটি ব্যবহৃত হত। এটা বিশেষ ভাবে স্মরণে রাখবার যোগ্য যে লোথালের উচ্চ-ভূমিও ছিল প্রাকারে ঘেরা আর প্রাকার থেকে নগর-বসতির দিকে গমনাগমনের জন্য এই প্রাকারের দক্ষিণে একটি পথ করা ছিল। লোথালের বিখ্যাত জাহাজঘাটা ও তার নিকটে থাকা গুদামঘর

উচ্চস্থানের সুরক্ষিত শহরাংশের কাছাকাছি ছিল। এখানে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থাসহ অস্ত্রাগার বা শস্যাগার দুর্গ বা শাসককেন্দ্রের গুরুত্বকে বৃদ্ধি করে দিয়েছে। একেবারে আনুষ্ঠানিকভাবে দুর্গ-নির্মাণ সুস্পষ্টভাবে না থাকলেও লোথালের হরপ্পীয় জনবসতি বা জনপদ ছিল সমুদ্রপ্রসারী বাণিজ্যের একটা গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র সেটা অস্বীকার করার উপায় নেই।

হরপ্পীয় বা তথাকথিত 'সিন্ধু-সভ্যতার' কৃষ্টিতে নগর-স্থাপত্য ও নগর-পরিকল্পনার যে সমস্ত পরিচয় আমরা এযাবৎ পেয়েছি সেগুলিকে আরও খুঁটিয়ে মাপজোকসহ বুঝে দেখা দরকার। ভারতীয় উপমহাদেশের পরবর্তী কালের কৃষ্টিতে হরপ্পীয় যুগের উত্তরাধিকার ও প্রভাবকে ছোট করে দেখার কোন কারণ থাকা উচিৎ নয়। কারণ আপাতঃদৃষ্টিতে সবকিছুকেই উপ-মহাদেশের বাহির থেকে আগমন করা প্রভাব বলে মতামতের প্রচলন করার প্রচেষ্টা উৎখননের ফলে বহু ক্ষেত্রেই আজ পরিবর্তন করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। উৎখননের ফলে লব্ধ প্রত্নতত্ত্বের সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় যে পরিণত ও পূর্ণ বিকাশিত হরপ্পীয় কৃষ্টির পূর্বের প্রাক্-হরপ্পীয় যুগের গ্রামস্থানের কালিবঙ্গানের অধিবাসীরা প্রতিরক্ষা প্রাকার নির্মাণে পারদর্শী ছিল। 'কোট-দিজি'তেও প্রাক্-হরপ্পীয় প্রতিরক্ষার চিহ্ন দেখা যায়।

খ্রীষ্টপূর্ব দেড় সহস্র থেকে আড়াই সহস্র বৎসরের অতীতের দিকটাতে আরও সহস্র বৎসর এবং পরের দিকে আনুমানিক আরও অর্দ্ধ সহস্র বৎসর যোগ করলে আমরা হরপ্পীয় যুগের বিস্তৃততর কালানুক্রমের পরিচয় পাব বলে আশা করা অন্যায় হবে না।

হরপ্পীয় কৃষ্টির দুর্গ-নগর পরিকল্পনা একটি শ্রেণী ভিত্তিক নাগরিক সমাজ ব্যবস্থাকে নিঃসন্দেহে প্রকাশিত করেছে। হরপ্পীয় এলাকায় তথাকথিত 'আর্য'দের আগমন, হরপ্পীয়দের কৃষিভূমির উপর অধিকার বজায় রাখার অক্ষমতা ও সুদীর্ঘ অবরোধের নিকট তাদের সভ্যতা নতিস্বীকার, রাণাঘুণ্ডাই, দাবারকোট, শাহীটুম্প, চান্হুদারো প্রভৃতির বলপ্রয়োগে ধ্বংসসাধনের কথা এবং মহেঞ্জোদারোর বিক্ষিপ্ত নরকঙ্কালাদিতে পূর্ণ প্রত্ন-বিশেষের মধ্যে পাওয়া তথাকথিত 'গণহত্যা'র প্রকৃত বিচার-বিশ্লেষণ একটি পৃথক ও সুবৃহৎ আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

চৌমাথার কথা

রাস্তার কথায় চৌমাথার অস্তিত্বকে কোনক্রমেই অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু কোন রাস্তা যখন অন্য রাস্তার সঙ্গে মিলিত হয়ে চৌমাথার সৃষ্টি করে তখন তার একটা বিশেষ রূপ ফুটে ওঠে।

শহরের বাজার এলাকার চৌমাথা আর শহরথেকে শহরের ভিতরে বাইরে যাওয়ার আসবার পথের দ্বারা সৃষ্ট চৌমাথার প্রকৃতি একরকমের নয়। চৌমাথায় এসে একদিকের যাত্রী অন্যদিকে যাওয়ার পথ ধরে। একদিক থেকে এসে অন্যদিকে যাবার জন্য অপেক্ষা করে এবং চৌমাথাকে ঠিক করে নিয়ে কোন একটি বিশেষ নাগরিক এলাকার ভিতরে প্রবেশ করে। অতএব চৌরাস্তা বা চৌমাথার সঙ্গে সংবাদপত্রাদির দোকান থাকে। পান সিগারেট প্রভৃতির দোকান থাকে নানাদিকের পথচলা মানুষের সুবিধার জন্য। চৌমাথা যদি মধ্যশ্রেণীর যাত্রীর দ্বারা ব্যবহৃত হয় তবে সেখানে টুকি-টাকি ও গৃহস্থবাড়িতে ব্যবহৃত একাধিক জিনিষের দোকান পসার জমে ওঠে। বই পাড়ায় বইয়ের দোকান, ফলের আমদানী কেন্দ্রের কাছে ফলের দোকান ইত্যাদি গড়ে ওঠে। চৌরাস্তা অনেকসময়ে বড় বড় বাড়ী দিয়ে ঘেরা। সাধারণতঃ এই বাড়ীগুলি পুরাতন। কারণ জনবহুল চৌমাথাকে সহসা পরিবর্তন করা সহজ নয়, এমনকি অর্থ-বিনিয়োগের সীমিত ক্ষমতার জন্য শহরের প্রাচীনতম চৌমাথার উন্নতি করা সম্ভব হয় না। চৌমাথাতেই কোন একটি শহরের বিশিষ্ট মেজাজটি বোঝা যায়। কারণ চৌমাথায় সকলদিকের লোক আসে ও মত বিনিময় হয়। যাবতীয় ভাল মন্দরকম গুজব ছড়ায় চৌমাথা থেকেই। শহরের চৌমাথার রূপ প্রতিক্ষণে এমনকি অনেক ক্ষেত্রে ঋতু বিশেষেও পাল্টে যায়।

পথ সংযোগের সুবিধার জন্য সকল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও বিপনন কেন্দ্র চৌমাথার কাছাকাছি থাকতে চায়। চৌমাথাতেই আধুনিক বিজ্ঞাপনের আধিক্য দেখা যায়। চৌমাথাতেই শোভাপায় দেশ-বরেণ্যদের মূর্তি ও উল্লেখযোগ্য স্মারক ফলকের অবস্থিতি।

একই দিনে একই চৌমাথায় সকাল-দুপুর-বিকাল বিভিন্ন বয়সের বা সামাজিক অবস্থার লোক ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। সকালে যে চৌমাথায় থাকে বাজারকারীদের ভিড়, দুপুরে সেখানেই থাকে ছাত্র-ছাত্রীর দল, বিকালে আর বিশেষ করে সন্ধ্যায় সেখানেই দেখা দেয় আলাপে আলোচনায় নিয়োজিত যুবকদের আধিক্য। আবার কোন কোন চৌমাথা রাত্রে গৃহহীনদের আবাসে পরিণত হয়।

উপরে যে সমস্ত কথা বলা হল তার সবকটিই কলকাতা, দিল্লী, মাদ্রাজ, বোম্বাই এবং আরও ছোট বড় শহর সম্পর্কে প্রযোজ্য। যদি এসকল শহরের প্রধান প্রধান চৌমাথাগুলির সামাজিক সমীক্ষা চালনা করা যায় তাহলে অনেক অজানা বা সাধারণভাবে অবহেলিত তথ্য আমাদের চোখ ফুটিয়ে দেবে। চৌমাথা থেকেই যানবাহনের আকারগত প্রকৃতি তাদের গতি এবং পরিসংখ্যান গ্রহণ করা সম্ভব। এখান থেকেই জানা সম্ভব একটি বিশেষ শহরে ক্ষুদ্র উদ্যোগে এবং বড় ব্যবসায়ে

স্থানীয়দের ও বহিরাগতদের সংখ্যা ও প্রকৃতি কিরকম। মোড়ের বা চৌমাথার বিজ্ঞাপন থেকেও শহরের অধিবাসীদের পছন্দ অপছন্দের একটা পরিমাপ করা চলে। এর অন্যতর কারণ এই যে পণ্য বিক্রয় না হলে ক্রমাগত এবং অহেতুক বিজ্ঞাপনে অর্থব্যয় করা হয়না। আবার অন্যদিকে চৌমাথা বা চৌরাস্তার নিকটস্থ ঘরবাড়ীর মালিকানা নাগরিক সম্পত্তির বণ্টনের প্রকৃতি বুঝতে সাহায্য করে দেয়।

অপরাধ ও অপরাধীর দিক থেকেও জনবহুল চৌমাথা দ্রুত দিক পরিবর্তনের সহজতম কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হয়ে থাকে। বিপথগামী তরুণদের ভিড় দেখা যায় চা-পান-সিগারেটের দোকানগুলিকে অবলম্বন করে। চৌমাথার এ-প্রকারের ক্ষুদ্রাকার দোকান থেকেই মাদকদ্রব্য ও নিষিদ্ধ নেশার জিনিষ সরবরাহ করা হয়। চৌমাথার আশেপাশেই ব্যবস্থা করা হয় সকল রকমের মত বা মতবাদ প্রচারের ব্যবস্থা ও আয়োজন।

যথার্থভাবে বলতে গেলে একথা অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে সব চৌমাথারই এক একটা সামগ্রিক এবং সর্বব্যাপী ও সাধারণ ব্যক্তিত্ব আছে। কোন চৌমাথা সহানুভূতিতে পূর্ণ। কোথাও একটা চাপা অসহিষ্ণুতা ও কৃত্রিমভাবে সাজানো উন্নাসিকতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে পড়েছে। লোভী ও ছুঁকছুঁকে মধ্যবিত্তের মনোভাব গড়িয়ে চলেছে কোথাও। কোথাও সাদামাটা পল্লীর সহজ ভাবটাই বজায় রয়েছে। বলাবাহুল্য এ সমস্তই শহর কলকাতার উত্তর-দক্ষিণে, পূবে-পশ্চিমে দেখা দেখা। মনে মনে একটু মিলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে। হতশ্রী ও খড়িওঠাগায়ের ভিড়ে কলকারখানা দিয়ে ঘেরা জাজাচোরা চৌমাথাও আছে অনেক। এখানে আছে এমন চৌমাথা যেখানে দিনমজুর, ছুতোর, কারিগর, রাজমিস্ত্রী, রংরাজ সকালবেলায় শীতে বর্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে দল বেঁধে। জটবাঁধা চুল, ছেঁড়া চটের থলে, একপাল উলঙ্গ শিশু আর অকালে বুড়িয়ে যাওয়া মানুষের সারা ছড়িয়ে থাকা চৌরাস্তা বা জমজমাট চৌমাথার বোধ হয় অভাব নেই।

চৌমাথা বা চৌরাস্তার যথার্থ চেহারা একটি অনুসন্ধানী সামাজিক সমীক্ষার দ্বারা স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে। এ প্রকারের সমীক্ষায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অধ্যয়নের বিষয় হতে পারে:

(ক) চৌমাথায় যে দুই বা ততোধিক রাস্তা মিলিত হয়েছে তার পরিবহণ প্রবাহের প্রকৃতি। (খ) চৌমাথার যথার্থ চৌহদ্দীর মধ্যে থাকা ঘরবাড়ির প্রকৃতি তথা ঘরবাড়ি বা জমির মালিকানা, ইমারতের গঠন ও বয়স (গ) চৌরাস্তার চারকোণে কিছুদূর পর্যন্ত দোকানঘরের পণ্যের প্রকৃতি ও মালিকানা স্থানীয় ও বহিরাগত দোকানীদের পরিচয়। (ঘ) চৌমাথার 'ফুটপাথ', রাস্তার আলোর ব্যবস্থা ও 'ফুটপাথে'র অস্থায়ী দোকানীর পণ্য ও আগমনের উৎস। (ঙ) চৌমাথার চারদিকের আলোর খুঁটিতে, দেয়ালে, বিজ্ঞপ্তির 'সাইন বোর্ডে' বিজ্ঞাপনের পরিমাণ ও পণ্যের প্রকৃতি। (চ) বিভিন্ন সময়ে পথচারীদের পরিমাণ ও প্রকৃতি। (ছ) চৌমাথার পরিবহণের পরিমাণ ও সময়ভিত্তিক প্রকৃতি।

আমাদের অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে আংশিকভাবে এ ধরণের প্রয়াস বিশেষ করে উপরে বর্ণিত (চ) ও (ছ) পর্যায়ে খানিকটা হলেও অন্যান্য দিক থেকে চৌমাথার সমাজতত্ত্ব আমাদের কাছে বহুলাংশে অজানা থেকে গেছে।

শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

স মা লো চ না

ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারস। কে. ডি. মেনন সম্পাদিত। ১৯৭৫, মূল্য ৩৩'৫০।

দীর্ঘদিন বাংলা ও বাঙালীর মনোজগতে আত্মীয়তা বন্ধনে আবদ্ধ ত্রিপুরা রাজ্য। অথচ কোথায় যেন অপরিচয়ের একটা সূক্ষ্ম পর্দা ফেলে রাখা আছে। অতি সাম্প্রতিককালে কতকগুলি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ প্রকাশ, প্রদর্শনী প্রভৃতি মারফৎ ত্রিপুরার পুরা ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং কারুকলার শিল্পনমুনা আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরা হয়েছে এবং বলাই বাহুল্য, পরস্পরকে কাছাকাছি আনার পক্ষে এগুলি অমোঘ অস্ত্র। রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ সত্ত্বেও ত্রিপুরার অবস্থান আমাদের মনোরাজ্য থেকে বেশ কিছু দূরেই ছিল। সম্ভবত সে যোগাযোগ নেহাৎই উপরতলার ব্যাপার, সাধারণ মানুষের তাতে তেমন আগ্রহ বা অনাগ্রহ কিছু ছিলনা। রাজ্যটির নামকরণ প্রসঙ্গেও দীর্ঘদিন একটি অবাস্তব ধারণা কাজ করছিল যে, দেবী ত্রিপুরসুন্দরীর নামানুসারে স্থানের নাম ত্রিপুরা। বর্তমান গ্রন্থের সূত্রপাতে সেই ভ্রম সংশোধন করে দেখানো হয়েছে, ত্রিপুরসুন্দরীর অনেক আগে থেকে ত্রিপুরা নাম প্রচলিত। আঞ্চলিক শব্দ 'তুই' 'প্রা' থেকে ত্রিপুরার জন্ম। 'তুই' অর্থ জল এবং 'প্রা' অর্থে নিকট, অর্থাৎ জলের কাছাকাছি অবস্থিত ভূমি হল ত্রিপুরা। অন্যান্য রাজ্যে যেমন গেজেটিয়ার ছিল, এতাবৎকাল ত্রিপুরার তা ছিলনা। এ রাজ্য সম্পর্কে নাতি বিস্তৃত সমাচার পাওয়া যেত রাজমালা, হান্টারের স্ট্যাটিসটিক্যাল এ্যাকাউন্ট অফ বেঙ্গল ভল. ৬ (১৮৭৬), ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার অফ বেঙ্গল (১৯০৮), ওয়েবস্টারের পূর্ব বাংলার জেলা গেজেটিয়ারের ত্রিপুরা অধ্যায় (১৯১০), জনগণনা দপ্তরের পেপার ১ (১৯৬২) এবং দীনেশচন্দ্র সেনের বৃহৎ বঙ্গ (২য় খণ্ড) প্রভৃতি গ্রন্থে। সেদিক থেকে বিচার করলে বর্তমান গ্রন্থটিকে ত্রিপুরার প্রথম পূর্ণাঙ্গ গেজেটিয়ার আখ্যা দেওয়া যায়। ভূমিকা, ইতিকথা, ভূমিসংস্থান, কৃষি ও সেচ, শিল্প-বাণিজ্য, সংযোগ ব্যবস্থা, বিবিধ জীবিকা, অর্থনৈতিক গতি-প্রকৃতি, আইন ও শাসন ব্যবস্থা, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-সংস্কৃতি, সমাজ সেবা, আকর্ষণীয় স্থান প্রসঙ্গ প্রভৃতি বিষয়ে তথ্যসন্নিবেশ ও আলোচনা আছে ৪০৪ পৃষ্ঠা এবং আরো ১০০ পৃষ্ঠায় আছে প্রাসঙ্গিক তথ্য ও বেশকিছু মূল্যবান্ আলোকচিত্র। এক কথায় ত্রিপুরা সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য শৃঙ্খলার সঙ্গে এখানে পরিবেশিত হয়েছে।

প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে আধুনিককাল পর্যন্ত ত্রিপুরার ধারাবাহিক ইতিহাস গড়ে তোলা একরকম দুঃসাধ্য কাজ। বর্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিশেষজ্ঞদের ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে প্রাগৈতিহাসিক ও প্রাক-ইতিহাস কালের ত্রিপুরার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া 'রাজমালা'র সাহায্যে যতটুকু তথ্য সংগ্রহ নিরাপদ ও সম্ভব তা যথোচিত দক্ষতা, সতর্কতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে করা হয়েছে। এই অধ্যায়টি সাম্প্রতিককালের পুরাতাত্ত্বিক গবেষণার সফল ফসল হিসাবে দীর্ঘকাল সমাদৃত হবে। অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক তথ্য যা এই গ্রন্থে বিধৃত তার কিছু কিছু অংশ বিভিন্ন সূত্রে ইতিপূর্বে

পরিবেশিত হলেও সমগ্র রাজ্যের পরিচয় উদ্ঘাটনে সেগুলির তাৎপর্য সম্যক উপলব্ধ হয় এই গ্রথিত তথ্যমালা হাতে নিলে।

জলবায়ু ও প্রাকৃতিক শোভায় অনুপম এই পার্বত্য অঞ্চলের আকর্ষণ যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও এখানে রেলপথের অস্তিত্ব নেই। বিচ্ছিন্নতা এখানকার প্রকৃতির ধর্ম। ত্রিপুরার প্রায় সিকি ভাগ অংশ বনভূমি। কিন্তু বনভূমি থেকে দীর্ঘদিন ভূমিসন্তানদের বৈষয়িক কল্যাণ বিশেষ কিছু ঘটে নি। সাম্প্রতিককালে বন শিক্ষণ কেন্দ্র মাধ্যমে বিবিধ প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। এখানকার সংরক্ষিত বনে রয়েছে হাতি, শুয়োর, বাঘ, ভালুক এবং অতিকায় সাপ।

প্রাচীনকালে ত্রিপুরা থেকে নিকৃষ্ট মানের যে সোনা চীনে রপ্তানী হত আজ আর তার চিহ্ন নেই। এখন খনিজ সম্পদ বলতে কয়লা এবং চুনা পাথর। আসলে এ রাজ্যের বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামোটি দাঁড়িয়ে আছে কৃষি সম্পদের উপর। কৃষির সঙ্গে আছে ঐতিহ্যমণ্ডিত কারুশিল্প। তাঁত, বাঁশের কাজ এবং চামড়ার কাজে ত্রিপুরার কারুকৃৎ আন্তর্জাতিক খ্যাতি পেয়েছেন।

এ রাজ্যের ভূমিসন্তানদের তালিকায় দৃষ্টিক্ষেপ করলে বিস্ময়ের অন্ত থাকেনা। রিয়াং, ত্রিপুরী, চাক্‌মা, কুকি, গারো, জামাতিয়া, লাওয়াতিয়া, লুসাই এবং মণিপুরী উপজাতীয়রা ত্রিপুরার মূল জনসংখ্যার সিংহভাগ অধিকার করে আছে। আনন্দ সমাচার, সরকারী প্রকাশনা বিভাগ এই উপজাতি সমীক্ষাতে কিছু কিছু তথ্য সাধারণের অবগতির জন্য ইতোমধ্যে পরিবেশন করছেন।

ত্রিপুরার ইতিকথা প্রসঙ্গের আকর গ্রন্থ 'রাজমালা' ভূমিসন্তান সংক্রান্ত বিষয়ে তেমন কোন সূত্র আমাদের উপহার দেয়না যা থেকে বর্তমান পরিস্থিতি আলোকিত হয়। অবশ্য ইতিহাসপর্বের মধ্যযুগের কিছু কিছু তথ্য এ থেকে স্পষ্ট হয়। জানা যায় তুঘরিল খাঁ এবং ইলিয়াস শাহ ত্রিপুরা লুঠ করেছিল। এর পর শুরু হয় তাঙ্গরফার রাজত্ব। তাঁর ছোট ছেলে রত্নফা গৌড়ের সুলতানের সাহায্যে রাজ্য লাভ করেন। এবং সুলতান খুশি হয়ে রত্নফাকে 'মাণিক্য' উপাধিতে ভূষিত করেন। তারপর থেকে ত্রিপুরার রাজারা 'মাণিক্য' উপাধি ব্যবহার করে আসছেন। রাজা ধন্য মাণিক্যের সঙ্গে হুসেন শাহের বিরোধ, ধন্যমাণিক্যের আগ্রাসী ভূমিকা, বিজয়মাণিক্য ও সোলেমান কররানীর যুদ্ধ, অমরমাণিক্যের প্রয়াণ, যশোধর মাণিক্যের দুরবস্থা, ত্রিপুরার শাসন নিয়ন্ত্রণে মুর্শিদাবাদের নবাবের ভূমিকা, এমনকি ত্রিপুরার নাম বদল হয়ে রোশেনাবাদ হওয়ার কথাও বলা হয়েছে কিন্তু সাধারণ লোকসমাজ সম্পর্কে কোন তথ্য পরিবেশিত হয়নি। তাই ত্রিপুরার ভূমিসন্তান সম্পর্কে সাম্প্রতিক সমীক্ষাগুলির ভূমিকা সমস্ত দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যথাযথ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কাজগুলি সমাধা হলে হয়ত সাম্প্রতিক সমীক্ষার ভেতর থেকে হঠাৎ কোন সময়ে অতীত ত্রিপুরা সরব হয়ে উঠবে। বর্তমান গেজেটিয়ার ও আনুষঙ্গিক প্রকাশনা থেকে তেমন আশা নেহাৎ কিছু আকাশকুসুম কল্পনা নয়।

হাল আমলে প্রকাশিত গেজেটিয়ার হাতে নিলে যখন দেখা যায় তথ্যাদি, পিটারসনের বয়ান কখনো উদ্ধৃতি চিহ্নে কখনো বা বিনা চিহ্নে গ্রন্থের শতকরা ৭০।৮০ ভাগ অংশ নিয়ে বিরাজিত সেই সময়ে ত্রিপুরার প্রথম সরকারী গেজেটিয়ারটি সাম্প্রতিককালের শ্রম, নিষ্ঠা ও চিন্তার উদাহরণ হিসাবে উল্লেখযোগ্য হয়ে থাকবে।

শঙ্কর ভট্টাচার্য

প্রগতির নতুন প্রেরণায়
ভারত 1975-76

যুবগোষ্ঠীর কল্যাণে

- 10,490 হোস্টেলের 950,000-রও বেশি ছাত্রছাত্রী নিয়ন্ত্রিত দরে দৈনন্দিন প্রয়োজনের জিনিস পাচ্ছেন।

- রেহাই-মূল্যে সাদা ছাপাবার কাগজ সরবরাহের ফলে পাঠ্যপুস্তক এবং খাতাপত্রের দাম কমেছে। কলেজ ও স্কুলগুলিতে 88,600 বই-ব্যাঙ্ক চালু হয়েছে।

- 103টি পেশা এবং 216টি শিল্প এখন শিক্ষানবিসি প্রকল্পের আওতায় এসেছে।

- আরও 18,800 আসন যোগ করার ফলে শিক্ষানবিসি প্রকল্পের অধীন আসনের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 133,900-র ওপর — এর মধ্যে 128,900 পদে শিক্ষার্থী আছে যার মধ্যে 28,000 (শতকরা কুড়ি জনেরও বেশি) আসন দেওয়া হয়েছে তফসিলী জাতি তফসিলী উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের।

প্রগতির নতুন প্রেরণায়
ভারত 1975-76

কালো টাকার বিরুদ্ধে অভিযান

- চোরাকারবারীদের উৎখাত করা হয়েছে…… দলের চাঁইরা জেলে…… বেয়াল্লিশ জন চোরাকারবারীকে ফেরার বলে ঘোষিত এবং তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত।
- শহর এলাকায় খালি জমির সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে…… সর্বোচ্চ সীমার মধ্যে জমি হাত-বদল নিষিদ্ধ।
- আবাস গৃহের ভিতের সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে…… কর-ফাঁকি ধরার জন্যে জমকালো বড় বড় বাড়ীর দাম নতুন করে হিসেব করা হচ্ছে…… কর-ফাঁকি ধরার জন্যে তল্লাসী চালিয়ে, 1775 সালের জুলাই মাস থেকে, প্রত্যক্ষ কর সংগ্রহের পরিমাণ 27·4% বেড়েছে।
- স্বেচ্ছা ঘোষণা প্রকল্প অনুসারে আড়াই লক্ষ জনেরও বেশি ব্যক্তি 15,870 মিলিয়ন টাকার ওপর আয় ও সম্পদ ঘোষণা করেছেন……কর বাবদ রাজস্বের পরিমাণ 2,490 মিলিয়ন টাকা।

76/90 (Bengali)

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

চতুর্বিংশ বর্ষ । মাঘ ১৩৮৩

রীনার প্রথম শাড়ি!
মা বলেছেন এবার শাড়ি পরতে
তাই বাবা দিয়েছেন শাড়ি।....
কিন্তু রীনা বলেছে এবার থেকে
তার জন্য চাই মায়ের মত
এক শিশি
লক্ষ্মীবিলাস
এম, এল, বসু এণ্ড
কোম্পানী
প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-১৬

চতুর্বিংশ বর্ষ ১০ম সংখ্যা

মাঘ তেরশ' তিরাশী

সমকালীন ॥ প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক ঃ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক নবীন প্রিন্টার্স ২ ঈশ্বর মিল বাই লেন,
কলি-৬ হইতে মুদ্রিত ও ২৫ চৌরঙ্গী রোড কলি-১৩ হইতে প্রকাশিত

রামায়ণ মহাকাব্য

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর

প্রায় দুশো বৎসর ইংরাজী-ভাষা চর্চা করেও ভারতের জনসাধারণ বিংশ শতাব্দীতে এসে শতকরা দশজনও ভাল করে ইংরাজী আয়ত্তে আনতে পারেনি, কিন্তু এটা খুবই প্রত্যক্ষ হয়, শতকরা আশিজন ভারতীয় সংস্কৃতির মৌল ভাণ্ডারে প্রবেশের জন্য যে সংস্কৃত ভাষার প্রয়োজন তা বহুদেশে ভুলতে পেরেছে; তার ফলে, প্রতিটি প্রদেশের লোকসংস্কৃতির সহজিয়াপন্থী বহু ব্যক্তি আচার্য, মহাপুরুষ, এবং অবতার রূপে পরিচিত হয়ে ষোড়শ শতাব্দীর আগের চেয়েও ভারতীয় সংস্কৃতিতে নানান্ সম্প্রদায়ের চিহ্ন অঙ্কিত করেছেন।

ফলে এই হয়েছে যে, ভারতের দুটি মহাকাব্যের প্রধান নায়ক শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র এবং উক্তিগুলির বক্তব্যই শতধা হয়ে গিয়েছে। লোক প্রবাদই হয়ে গিয়েছে মূল গ্রন্থেরই বক্তব্য। এ বিষয়ে আলোচনা করা যাক্ রামায়ণ মহাকাব্যের বক্তব্য নিয়ে।

মহাকাব্যের জন্ম

কোনও এক সময় বাল্মীকি নামে কোনও এক তপস্বী, মনে প্রেরণা পেলেও লেখার প্লট খুঁজে পান নি কি নিয়ে লিখবেন, অথচ বাসনা ছিল এমন এক নায়ককে অবলম্বন করে একখানি মহাকাব্য লিখবেন, যে নায়কের চরিত্রটি সবদিক থেকেই হবে মহান্ আদর্শ। অর্থাৎ তখনকার বিদ্বান্ বিদ্বজ্জন সমাজের বিশিষ্ট পুরুষের মনে যা হয়ে থাকে।

তেমনি সময় তাঁর আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন আর এক ভারত পর্যটনকারী পুরুষ, যাঁর নাম নারদ। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন বলুন তো; বর্তমানে পৃথিবীতে এমন একজন পুরুষের নাম এবং তাঁর গুণ, যিনি আমার একান্ত বাসনার প্রতিমূর্তি।

কো ন্বস্মিন্ সাম্প্রতং লোকে গুণবান্ কশ্চ বীর্যবান্।

যিনি গুণী, ধার্মিক, সত্যবাদী, সচ্চরিত্র, সবার হিতৈষী, বিদ্বান। সর্ববিষয়ে দক্ষ, প্রিয়দর্শন ইত্যাদি। আমার খুবই কৌতূহল রয়েছে এমনি একজন পুরুষের চরিত্র কথা শোনার। আপনি তো বহুবিষয়ে অভিজ্ঞ, এবং নানান্ চরিত্রের লোকের সঙ্গে মেলামেশা করেন, বলুন না তেমন একজন পুরুষের নাম এবং তাঁর চরিত্রের কথা!

এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং পরং কৌতূহলং মম।

মহাকাব্যের সমকালীন সমাজচিত্র খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এই কৌতূহলী প্রশ্নে। নারদ প্রথমটায় চিন্তিতই হলেন, কারণ একাধারে এতগুলি গুণের সমবায় খুবই দুর্লভ তখন, তাই তিনি বহুক্ষণ চিন্তা করে একটি রাজবংশের একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষের নাম মনে করতে পারলেন, যাঁর জন্ম হয়েছে এবং এরই মধ্যে তাঁর গুণাবলীও সকলে শুনেছেন—

শ্রুত্বা চৈতৎ ত্রিলোকজ্ঞঃ বাল্মীকে নারদো বচঃ।

চিন্তয়িত্বা বিশেষজ্ঞঃ শ্রূয়তামিতি চাব্রবীৎ॥

তারপর নারদ সেই প্রখ্যাত ইক্ষাকু বংশ জাত দশরথ এবং তাঁর পুত্র রাম সম্পর্কে তাঁদের একটা সংক্ষেপিত জীবনবৃত্তান্ত বললেন। সেই বৃত্তান্তটিই সমগ্র রাম চরিত্রের চরিত্রসূচী।

বাল্মীকি সব শুনলেন, নারদও আশ্রম ত্যাগ করে চলে গেলেন। একটু পরেই বাল্মীকি গেলেন তমসা নদীর তীরে। আশ্রম ও ওই নদীর তীরেই। নিকটেই গঙ্গা নদীও।

অগাম তমসা তীরং জাহ্নব্যা ত্ববিদূরতঃ।

বর্তমান ভারতের ভূখণ্ডের ম্যাপ ধরে খুঁজতে গেলে গঙ্গার অতি নিকটে তমসা নদীর অস্তিত্ব পাওয়া যায়না; কারণ তমসা নদীটির প্রবাহ এখন যেভাবে রয়েছে, তার দিক্ নির্ণয় করতে গেলে দেখা যায়, ঐ নদী তিন জায়গায়, (১) মধ্যপ্রদেশের মাইহার পার্বত্য অঞ্চলেরই একটি ঝরণা বয়ে গিয়ে রেওয়ার মধ্য দিয়ে এসে এলাহাবাদের ১৮ মাইল দক্ষিণে গঙ্গায় পড়েছে।

(২) আর একটি তমসা নদী উত্তর প্রদেশের ফৈজাবাদ জেলার পশ্চিম দিক্ থেকে বেরিয়ে একদিকে ঘর্ঘরা, অন্যদিকে গোমতী নদীর মাঝামাঝি অঞ্চল দিয়ে বয়ে একেবারে বিহারের বালিয়া জেলায় গঙ্গায় এসে মিশেছে।

(৩) তৃতীয় তমসাটি উত্তর প্রদেশের যে অঞ্চলে 'বন্দর পুঞ্চ' শৃঙ্গ, তারই কাছে তমসা নদী, সেটি এসে মিশেছে যমুনার সঙ্গে।

এখন স্বতই মনে আসছে রামায়ণে বর্ণিত জাহ্নবীর অদূরে যে তমসা নদী বলে উল্লেখ তারই কাছে ছিল বাল্মীকির আশ্রম, সে স্থানটি কোথায়? আমাদের ভারতে পবিত্র স্থানগুলিকে তো প্রায় চিহ্নিতই করা হয়েছে নানা ভাবে, যেমন চিত্রকূট অঞ্চল, ভরদ্বাজ আশ্রম (এলাহাবাদ শহরে কোর্টের পাশে এবং বাবাগঞ্জের কাছে) জনকপুরী ইত্যাদি, তেমনি অদ্যাবধি কোন নিদর্শনের দ্বারাই চিহ্নিত করা যায়নি বাল্মীকির আশ্রমটি কোথায় ছিল।

তা যাক্, সেই আশ্রমেই যখন একখানি মহাকাব্য লেখার সংকল্প করেছিলেন মহাকবি, তখন প্রখ্যাত প্রবাদের সঙ্গে মহাকাব্য লেখার উপাদান, উদ্দীপনা, আলম্বন বিভাবনার যোগ

কেমন করে ঘটে? একবারটি হলো, স্নান করতে যাওয়ার পথেই বাল্মীকি গেলেন তমসার তীরে। তারপর, কাদা নাই এমন এক ঘাটে এসে সঙ্গে আসা শিষ্যকে বললেন ওহে ভরদ্বাজ! কলসী এখানেই রাখ, আর বল্কল দাও, এখানেই স্নান করবো—

অকর্দমমিদং তীর্থং ভরদ্বাজ নিশাময় ।
রমণীয়ং প্রসন্নাম্বু সজ্জনমনো যথা ।
ন্যস্যতাং কলশস্তাত দীয়তাং বল্কলং মম ।

এই বলেই শিষ্যের হাত থেকে বল্কল নিয়ে বিশাল ও বড় বনরাজি দেখেছেন আর কিছুটা পদচারণাও করেছেন। নজরে পড়লো—জোড়া কোঁচ বক, তারা তখন খুবই মত্ত হয়েছিল, বিশেষ করে ক্রৌঞ্চ ছিল বেশী প্রমত্ত। (ক্রৌঞ্চ ক্রৌঞ্চী অর্থাৎ বক বকী) ক্রৌঞ্চ ও ক্রৌঞ্চী দুটি, খুবই মত্তভাবে সঙ্গে বেশ সুস্বর ও প্রলাপ করছিল।

দদর্শ ভগবাংস্তত্র ক্রৌঞ্চয়োশ্চারুনিঃস্বনম্

এমনি সময়ে এক নিষাদ (শিকারী বা ব্যাধ) সেই ক্রৌঞ্চ মিথুনের প্রতি তীর নিক্ষেপ করে পুরুষ ক্রৌঞ্চটিকে নিহত করলো।

পক্ষীক্রৌঞ্চী পতির বিয়োগ কাতর হয়ে কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে পড়ে করুণ স্বরে যেন বিলাপ করতে লাগলো। সামনে পড়েছিল নিহত রক্তাক্ত ও তাম্রশীর্ষ ক্রৌঞ্চের দেহ।

তস্মাত্তু মিথুনাদেকং পুমাংসং পাপনিশ্চয়ঃ ।
জঘান বৈরনিলয়ো নিষাদস্তস্য পশ্যতঃ ।
ভার্যা তু নিহতং দৃষ্ট্বা রুরাব করুণাং গিরম্ ।
তং শোণিতপরীতাঙ্গং চেষ্টমানং মহীতলে ।
বিযুক্তা পতিনা তেন দ্বিজেন সহচারিণা ।
তাম্রশীর্ষেণ মত্তেন পত্রিণা সহিতেন বৈ ।

মহাকাব্যের জন্ম লগ্নের আগে এই উপস্থিত শ্লোকগুলি মহাকবির লেখা হতে পারে না। কারণটা বলি—

সাধারণ ব্যক্তিও জানেন ক্রৌঞ্চ যাকে কোঁচ বক ও বকী এরা বর্ষাকাল ছাড়া মৈথুনাসক্ত হয় না, এবং বিহারাগেও নয়। যে কোন পক্ষীতত্ত্ববিদ্ তা জানেন। আর কথা, ক্রৌঞ্চের বিশেষণটি দেখছি তাম্রশীর্ষ অর্থাৎ পুরুষ পাখীটির মাথার চূড়াটি ছিল লাল। তাই তার নাম তাম্রশীর্ষ। বড় বিচিত্র কথা, ভারতীয় সংস্কৃত অভিধানের যে কোনটির পৃষ্ঠা খুললেই দেখা যাবে 'তাম্রশীর্ষ' শব্দটি ক্রৌঞ্চ পক্ষীর পরিভাষা নয়। তাম্রচূড় ও তাম্রশীর্ষ এদুটি পরিভাষা কুক্কুটের বা মোরগ শব্দটি ফারসি শব্দ। পুরুষ কুক্কুটেরই পরিভাষা তাম্রশীর্ষ, কারণ স্ত্রী কুক্কুটীর মাথার তেমন চূড়াও হয় না, তার খুব মাথায় লোম ওখানে থাকলেও তা লাল হয় না। কোন কোন অভিধানে 'ক্রৌঞ্চ' যাকে ভিন্ন পাখী। কিন্তু সেও তাম্রশীর্ষ হয় না, তবে বিবাহে মৈথুনাসক্ত হয়। কিন্তু জীববিদ্ধ করে তার মাংস আহার্য করে না। তাকে কীসে বধে।

এমনি এক উদ্ভট বর্ণনা দিয়ে যে কবি ক্রৌঞ্চ পাখীকে তাম্রশীর্ষ বলে বর্ণনা করেছেন তাঁর মনে

কোথায় সে বেঁধেছিল, কাকে ক্রৌঞ্চ বলার ইচ্ছা তা দুর্বোধ্য। বক কুঁকুঁই বা কুর কুঁক্ ডাই যে কোন ঋতুতে এবং দিবা এবং নিশায় যে কোন সময়েই রবতামত্ত হয়, এবং কুঁকুঁই মানুষের আহার্য মাংস।

এরপর লেখাই আরও বিচিত্র ভাবে একটি বিশেষ রসের অর্থাৎ রসে কৌশিক করুণ ছন্দের উজ্জীবন করার জন্য নিহত ক্রৌঞ্চের শোকে শোকাতুরা ক্রৌঞ্চীর বেদনা আলাপ ও ক্রোধ দেখে ব্যাধের প্রতি অভিশাপ বাণীর নিক্ষেপণ।

তস্যৈবাস্য নরস্ত কারুণ্যং সমপদ্যত।
নিশাম্য রুদতীং ক্রৌঞ্চীং ইদং বচনমব্রবীৎ।

নজরে পড়লো সেই ব্যাধ। বাল্মীকি তাকে দেখেই বলে ফেললেন—ওরে নিষাদ! এই যে কামাসক্ত ক্রৌঞ্চ মিথুনের মধ্যে (ক্রৌঞ্চ না ভারুই?) পুরুষটিকে হত্যা করলি, কোন কালেই আর প্রতিষ্ঠা লাভ করবি না"।

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ, ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কাম মোহিতম্।

এই কটি কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বাল্মীকির হৃদয়ে জাগলো, এই পাখীর শোকে আমার মুখ দিয়ে একি বেরুলো!

সামনে ছিলেন শিষ্য ভরদ্বাজ (ইনি কিন্তু বৈদিক ঋষিগোষ্ঠীর ভরদ্বাজ নন, কারণ তিনি ছিলেন বৃহস্পতির ভাই উতথ্যের পত্নীর গর্ভের এবং উক্ত ঋষির ঔরস জাত।) তাঁকেই বললেন, ভাল এই হোক শ্লোক। এই শ্লোক সংজ্ঞার পঙ্‌ক্তিতে থাকবে চারটি সমান চরণ (৩২টি অক্ষর)।

এও ধাঁধা, অনুষ্টুপ ছন্দ রামায়ণের বহু আগেই ভারতে প্রচারিত। যাঁরা নিরুক্ত (বেদের শাব্দিক অভিধান এবং যাস্কের ও দুর্গাচার্যের ভাষ্য আছে) পড়েছেন তাঁরাই জানেন দেবতা কাণ্ডের ৩ ১২ ৯ সূক্তে অনুষ্টুপ ছন্দের উল্লেখ রয়েছে।

তাহলে কেমন করে বলি রামায়ণেই প্রথম অনুষ্টুপ্ ছন্দের বিকাশ। অর্বাচীন কোন কবি ঢুকেছেন এই ভেজাল যেমনি নিশ্চয়। নিরুক্তে অনুষ্টুপ মানে বাণী। যাস্ক বলেছেন অনুষ্টোভনাৎ গীতানাপাৎ স্তোভৎ, ভক্তং অনু। এই ব্যাখ্যাটি মূল ঋক ঋক্‌বেদের ১।৮৮।৩ অর্থাৎ গানের বাণী হবে অনুষ্টুপ ছন্দে।

অতএব সেই অর্বাচীন কবিটি এই মহাকাব্যের ভাবনা রস এবং কাব্যছন্দের আবিষ্কার করতে গিয়ে খুবই হাস্যকর কর্ম করে বসেছেন। অর্বাচীন কবিটির ঝোঁক কিন্তু এইখানেই থামেনি, তিনি আরও এগিয়ে এসে লিখেছেন যে, তারপর বাল্মীকি আশ্রমে ফিরে এসেছেন এবং যথাকালে আসনে বসে ঐ বিষয়ে চিন্তা করেছেন, এমনি সময়ে তাঁর আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন পুরাণ এর কল্পিত ব্রহ্মা নামক কোন দেবতা। যাঁকে পুরাণে বলা হয়েছে তিনি সর্বলোক স্রষ্টা এবং তাঁরই লোকগণের দ্বারা সমস্ত সৃষ্টি হয়েছে বলে তিনি পিতামহ অর্থাৎ সর্বলোকের ঠাকুর্দা।

সেই ব্রহ্মার কাছে বাল্মীকি আবার বললেন সেই ক্রৌঞ্চ হত্যার কথা এবং ব্যাধকে অভিশাপ দেওয়ার সময় অনুষ্টুপ ছন্দের বাণী।

যস্তাদৃশং চারুরবং ক্রৌঞ্চং হন্যাদকারণাৎ।
শোচন্নেব পুনঃ ক্রৌঞ্চীং উপশ্লোকমিমং জগৌ॥

বাল্মীকির মুখে শ্লোকটি শুনেই ব্রহ্মাও বললেন, ভাল, ভাল। এইটিই হবে শ্লোক, আর কোন বিচার করো না। আমার ইচ্ছাতেই তোমার মুখে এই শ্লোক। এই ছন্দের দ্বারাই তুমি লেখ, নারদের মুখে রামের চরিত যা শুনেছ—

তমুবাচ ততো ব্রহ্মা প্রহসন্ মুনিপুঙ্গবম্।
শ্লোক এবাস্ত্বয়ং বদ্ধো নাত্র কার্যা বিচারণা॥
মচ্ছন্দাদেব তে ব্রহ্মন্ প্রবৃত্তেয়ং সরস্বতী।
রামস্য চরিতং কৃৎস্নং কুরু ত্বমৃষিসত্তম

অতএব নারদের মুখে রামচরিত শোনার পরে ক্রৌঞ্চ হত্যায় নিষাদের প্রতি অভিশাপের কাহিনীটি কোন অর্বাচীন কবির জুড়ে দেওয়াটা নাই। এছাড়া ব্রহ্মার আগমনও এবং অনুষ্টুপ ছন্দকে সমর্থন এবং প্রতিষ্ঠিত করাটা তো যুক্তিসঙ্গত হয় নাই।

আরও ভ্রান্তকর করেছেন মহাকাব্যের আদি রহস্য জানাতে মহাকবি বাল্মীকিকে ছাড়িয়ে ক্রৌঞ্চ-হত্যার কাহিনীর মাধ্যমে করুণ-রসের বীজ খুঁজতে যাওয়া।

নিশ্চয় তিনি জানতেন না বুদ্ধির কাব্য আর হৃদয়ের কোন বৃত্তির দিক দিয়ে কাব্য রচনা এক নয়। বাল্মীকির রচনাটি যে বুদ্ধির কাব্য তাতো পরিষ্কার, কারণ, ঐ দ্বিতীয় সর্গের ৪১ শ্লোকে বলা হয়েছে মহর্ষি বাল্মীকির বুদ্ধিটি এই ভাবে জেগে উঠলো যে সমগ্র কাব্যটি আমি এই অনুষ্টুপ ছন্দেই রচনা করবো (যদিও সমগ্র রামায়ণে ২০।৩০ প্রকার ছন্দ রয়েছে)।

তস্য বুদ্ধিরিয়ং জাতা মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ।
কৃৎস্নং রামায়ণং কাব্যমীদৃশৈঃ করবাণ্যহম্।

বুদ্ধির কাব্যে থাকে অতীত ঘটনা আর হৃদয়বৃত্তির কাব্যে অর্থাৎ ঈর্ষা, ঘৃণা, অবজ্ঞা, অনুরাগ, প্রণয়, প্রেম প্রভৃতি অন্তঃকরণের বা মনের বিষয়গত পরিণামের ব্যাখ্যা। তাহলে ক্রৌঞ্চ হত্যায় মনের কারুণ্যবৃত্তির ব্যাখ্যার জন্যই কি রাম চরিত্রটা অবলম্বন মাত্র করে লেখা কবিতা? বুদ্ধির কাব্যে কিন্তু অতীতের ঘটনাই থাকে, সেটার পরিধিতে থাকে সংগ্রাম, হত্যা, রক্তপাত, অথবা রাষ্ট্রবিপ্লবের বৃহৎ কথা তীব্র গতিতে যাতায়াত, অসির ঝনঝনা ইত্যাদি এক কথায় বললে বলা যায় বুদ্ধির কাব্য মানেই বীরত্বের গাথা। আধুনিক ভাষায় একেই বলে রোমান্স, আর হৃদয়বৃত্তির ব্যাখ্যা দিয়ে যে রচনা তাকে আধুনিক ভাষায় বলা যায় নভেল।

আরও পরিষ্কার করে বললে বলতে হয়, বুদ্ধির কাব্যে, মহাকাব্যে অথবা রোমান্সের কাব্যে তাই থাকবে যা প্রতিদিনের ঘটনা থেকে বহু দূরে, সেই দূরত্বই হবে বুদ্ধি কাব্যের মুখ্য উপাদান, তথায় ব্যক্তির বর্তমান জীবনের কোন ঘটনার অস্তিত্বই থাকবে না, তবে অতীত ইতিহাসের কাহিনীগুলিকে জীবনের চিরন্তনী বুদ্ধির পরিবেশের সঙ্গে তুলনা অথবা উপমা, উৎপ্রেক্ষা ইত্যাদি অলংকারে ভূষিত বা চুম্বিত করা চলবে, তখন বুদ্ধি কাব্যটি এমন ভাবে প্রসারিত হবে, যা মানব জীবনের দূরই কাছাকাছি, এই জন্য মহাকবি কালিদাসের মহাকাব্যগুলি আমাদের কাছে এত

আছেন। আমরা সর্বদাই বুঝি একার্থগুলি বৃত্তির কাব্য, জীবনের ঘটনা থেকে বহু বহু দূরে। এমন কিছু পৌরাণিক কিছু ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বন করেই তিনি লিখেছেন, তবুও মনে হয় এগুলি নভেলের বিষয় অর্থাৎ হৃদয়বৃত্তির বিষয়।

হৃদয়-বৃত্তির কাব্যের প্রধান বক্তব্য থাকবে যা ঘটে চলেছে এবং সত্যের রূপ বর্ণনা, এবং প্রেম প্রণয় ঈর্ষা ও চিত্তবৈকল্যের যথাযথ অবস্থা। এখানে নীতি, উপদেশ, শাস্ত্রাশাস্ত্র বিচার, সদাচার, ব্যভিচার, ইত্যাদির কোন পরামর্শ-ই থাকবে না। বিষয় ভেদে, অবস্থা ভেদে পরিবেশের ঘটনা ভেদে মনের কি পরিবর্তন ঘটে তার যথাযথ বর্ণনা থাকবে, কিন্তু কোন প্রকারেই থাকবে না, অতীতের জের টেনে কাহিনী বৃত্তান্ত।

এ সিদ্ধান্ত তো ভারতের অন্যতম আলংকারিক রাজশেখর (নয় থেকে দশম শতকের মধ্যে) তাঁর কাব্যমীমাংসায় স্পষ্টই বলেছেন বৃত্তির প্রতিভা সর্বোত্তম না হলেও মহাকাব্যের জন্ম হয় না বা কেউ রচনা করতে পারে না, মহাকাব্যেই থাকবে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সম্পর্ক উপদেশ, এ উপদেশগুলি অতীতের রাজবংশের কোন নায়কের জীবন-ইতিহাসকে অবলম্বন করেই মানব-চরিত্র, সমাজ-জীবন, রাজনীতি ও ধর্ম প্রভৃতি সর্ববিষয়ে কৌতূহল জাগ্রত করতে হবে এবং উপদেশের দ্বারা তা নিবৃত্ত করতে হবে।

মহাকবি বাল্মীকির নামের মাধ্যমে আমরা যে মহাকাব্য রামায়ণটি পাই, এটি সেই মহাকাব্য। যে মহাকবিই লিখুন, এটি হৃদয়ের বৃত্তি কাব্য নয়, অর্থাৎ নভেল নয়, এটি রোমান্স।

সেখানে ক্রৌঞ্চ-হত্যা ব্যাধের প্রতি অভিশাপ এ ঘটনাটি নভেলের পর্যায়েই পড়ে, কারণ, কারুণ্য-বৃত্তি বর্ণনা করতে গেলে যে পরিবেশের প্রয়োজন থাকবে, তা এ কাব্যে বা মহাকাব্যে কোথায়?

রাম পনের থেকে ষোল বৎসর বয়সেই তাড়কা নামে নারীকে হত্যা করেই হাতে খড়ি নিয়েছিলেন বিশ্বামিত্রের কাছে, তারপর তাঁর সমগ্র নির্বাসিত জীবনটাই অতিবাহিত হয় সংগ্রাম বা হত্যাকাণ্ডের দ্বারা, করুণার প্রসঙ্গই আসে না। এক প্রার্থনারী, আকৃষ্টাই বা হয়েছিল রাম লক্ষ্মণের রূপসৌন্দর্যে, কিন্তু তার যৌবনোচিত আকর্ষণের এই কি সমুচিত শিক্ষা? নাক কান কেটে দিলে তার সমগ্র জীবনটা যে কি দুর্বিষহ হতে পারে, সেটা কি হৃদয়-বৃত্তির ধারে কাছে গিয়েছিল?

মহাকবির হৃদয়ে করুণা বৃত্তির জাগরণ থেকেই যদি রোমান্স বা মহাকাব্যের বীজ বপনের অঙ্কুরোদ্গমের চিহ্ন রাখা সেই অর্বাচীন কবির উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাতেও প্রশ্ন ওঠে রক্ত-স্রোতস্বিনীর স্রোত করুণার প্রতিক্রিয়া কি নিষাদের প্রতি অভিশাপে পর্যবসিত? করুণা এবং ক্রোধের সহস্থিতি ও সহাবস্থান অলংকার শাস্ত্র সম্মত?

করুণ রস সম্পর্কে আদি রসিক ভরত বলেছেন—

ইষ্টবধ দর্শনাদ্ বা বিপ্রিয় বচনস্য সংশ্রবণাদ্বাপি।

এভির্ভাব বিশেষৈ করুণরসো নাম সম্ভবতি।

রামায়ণ মহাকাব্যে এসবের কিছুই ঘটেনি ক্রৌঞ্চ হত্যায়। তাছাড়া আলংকারিকরা পরিষ্কার বলেছেন পুত্র, বিত্ত, প্রিয়জনাদির বিয়োগ ঘটলে অথবা তাদের অনিষ্ট ঘটলে হৃদয়ে শোকের বৃত্তির

আনন্দ হল সেইটিই করুণ রস। শোকই স্থায়িভাব, এটির বর্ণ মলিন বা কৃষ্ণ। এবং সেটি শাপগ্রস্ত সেখানে শাপের আশিষায় যে, সেই হবে স্থায়ীভাবের আশ্রয়। আর শোচনীয় যারা তারাই ঐ রসের অবলম্বন। এর জন্য যে ক্রন্দন, দীর্ঘশ্বাস প্রভৃতি সেগুলি অনুভাব। আর তারই জন্য যে নির্বেদ, মূর্ছা এগুলি সঞ্চারিভাব।

ক্রৌঞ্চ হত্যায় জন্য বাল্মীকির ক্রোধটিই হয়নি, সেক্ষেত্রে দৈবনিন্দা না করে নিষাদের প্রতি অভিশাপ এই বিরুদ্ধ সংযোগে অনুভাবের সৃষ্টি, এটা কোন সুকবির রচনা হতে পারে না। রামায়ণ কাব্যের লেখক কিন্তু তেমন কু-কবি নন। মহাকাব্যের লক্ষণ এতে সুস্পষ্ট। তবুও এই কাব্যটির বর্তমান যে রূপ, তাতে অনৈসর্গিক অতীন্দ্রিয়বাদের প্রতীক দেবদেবীদের সমাগমের দ্বারা মহাকাব্যটি প্যাঁটরার মধ্যে আরও-প্যাঁটরা তার ভিতরে রেশমী কাপড়ের বোচকার ভিতরে লুকিয়ে আছে।

নারদের মুখে ইক্ষ্বাকু বংশের একজন প্রখ্যাত পুরুষ রাম ও তাঁর পরিবার পরিজনের কথা শুনেই বাল্মীকি রচনা করেছিলেন। রঘুবংশ। এই জন্যই তিনি লিখলেন—

"রসৈঃ শৃঙ্গার করুণ-হাস্য-রৌদ্র-ভয়ানকৈঃ
বীরাদিভী রসৈর্যুক্তং কাব্যমেতৎ চকার হ।
কোনও পাঠ "কাব্যমেতৎ অকারয়ৎ।
কোনও পাঠ কাব্যমেতৎ অগায়তাম্;
কোনওপাঠ কাব্যমেতৎ বাবাচয়ৎ।
(রামায়ণ/আদি কাণ্ড/৪র্থ /৯ম শ্লোক

অতএব সেই রামের পূর্বপুরুষদের জন্ম, খ্যাতি, পৌরুষ ও তাঁদের অধস্তন বংশীয়দের ইতিকথা সংক্ষেপে বলার পর, সেই বংশে যে আর একজন প্রখ্যাত রাজপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং যাঁর চরিত্র বাল্মীকির অভিবাঞ্ছিত নায়কের অনুরূপ, তেমনি এক বীর, সুদক্ষ, চরিত্রবান, দয়ালু পুরুষের জীবনাখ্যান নিয়েই তিনি মহাকাব্য রচনা করলেন।

সেই বক্তব্যগুলিকেই তিনি মহাকাব্যের মাধ্যমে প্রধানভাবে ৩টি রসের দ্বারা চিত্রায়িত করলেন। এতে ঐশ্বরীয় অংশ, কলা, অবতার, ইত্যাদি প্রসঙ্গের কোন যোগই থাকার কথা নয়। কারণ বস্তুত জগতে রসের অনুভূতিটি আনন্দের দ্বারাই হয়, এবং তা প্রাকৃত। কিন্তু আমাদের বর্তমান প্রাপ্তব্য রামায়ণ মহাকাব্যটি এমন ভাবে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে যে, ও কাব্যের নায়ক নায়িকারা মানব সমাজের সব কিছুই অভিনয় করে গিয়েছেন, কোন আচরণই তাঁদের নিজস্ব নয়; ঐ সব আচরণকে ঈশ্বরের লীলা বলেই আখ্যাত করা হয়।

অর্থাৎ দশরথ যে ব্যক্তির রাজতন্ত্রের নিয়ম অনুসারে তাঁর পুত্র রাজা হবে এটা গোপন রেখে বড় রাণীর কোলের আড়ালে কৈকেয়ীর পিতার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে বলেছিলেন, "আপনার কন্যার পুত্রকে রাজা ক'রবো, তারপর কৈকেয়ীর পুত্রকে মাতুলালয়ে পাঠিয়ে রামকে রাজা করছিলেন, সেটা জানাজানি হতেই দশরথের রাজত্বে জীবন বিপর্যয় ঘটেছিল, সেটাও ঐশ্বরীয় লীলা, দাশরথি রামের বর্ণিত বড় কৌশল্যা যে সমগ্র-জীবনটাকে তুষের আগুনে পুড়িয়ে পুড়িয়ে পোড়াচ্ছিলেন সেটাও ঐশ্বরীয়

সীতা, বশিষ্ঠকে ফাঁকি দিয়ে বিশ্বামিত্র যে রাম লক্ষ্মণকে যুদ্ধের নাম করে নিয়ে গিয়ে জনকের বাড়িতেই তাদের বিবাহ দিয়ে বশিষ্ঠের উপর টেক্কা দিয়েছিলেন, সেটাও ঐশ্বরীয় লীলা। আবার বশিষ্ঠ যে কৈকেয়ীর মাধ্যমে সমগ্র রাজপরিবারটিকে অব্যাহত করার জন্য ঠিক যেন বর্তমান বিংশ শতাব্দীর ১৪ বৎসরের নির্বাসন দণ্ডের বিধান বেঁধে দিয়েছিলেন যৌন-সম্মতি দিয়ে সেটাও ঐশ্বরীয় লীলা।

এই ভাবে সমগ্র রামায়ণটিকে লীলাবাদের অবতারণা করতে গিয়ে আজকের সত্যজিজ্ঞাসীদের কাছে রামায়ণ মহাকাব্যটি ক্রমেই সন্দেহের পর্যায়ে এসে পড়েছে, এমনটি কিন্তু খ্রীষ্টপূর্বাব্দের বুদ্ধের জীবনকে নিয়ে ঘটেনি, তাই মহাকবি অশ্বঘোষের প্রখ্যাত দুটি মহাকাব্যের (বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরানন্দ) বিবরণ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাছে জীবন্ত, আর ত্রিপিটক ও ধম্মপদ এবং রামায়ণের অপেক্ষা অগ্রগামী।

রামায়ণবাদীদের ঐতিহ্যলেখটি বৌদ্ধদের চেয়ে বাস্তবরূপ নয়, এবং মহাকাব্য রামায়ণ প্রাচীন ভারতবাসির কাছে ধর্মসম্পৃক্ত হলেও সত্যজিজ্ঞাসী, প্রত্নতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিকদের কাছে খুবই সন্দিগ্ধ গ্রন্থ। কারণ রামায়ণবর্ণিত সমাজের চিত্রটি খ্রীষ্টীয় ২য় থেকে চতুর্থ শতকের আগে নয় এবং মহাভারতে বর্ণিত তীর্থগুলির নামোল্লেখের মধ্যে অযোধ্যার নাম নেই, সাকেত দেশ ছাড়া অযোধ্যা নামে কোন দেশের উল্লেখ নাই, পাঠান ইতিহাসের পর থেকেই অযোধ্যা নাম। তারপর প্রত্নতাত্ত্বিকদেরও সন্দেহ এত বড় এক মহাকাব্যের অযোধ্যা নগরীর এত পাকা বাড়ির উল্লেখ, পথঘাটের মনোহর রূপ সবই কি কল্পনা? একটুও নমুনা ধরিত্রী ধরে রাখেনি? না জনকের, না দশরথের না রাবণের? কি ব্যাপার? তাই প্রত্নতাত্ত্বিককুল খোঁড়াখুঁড়ি করে ভূমিখনন শুরু করেছেন।

শৈবতীর্থ রাখড়েশ্বর

সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়

সম্প্রতিকালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগের উদ্যোগে "বীরভূম-জেলার পুরাকীর্তি" নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটি রচনা করেছেন দেবকুমার চক্রবর্তী মহাশয়। দুঃখের বিষয় এই গ্রন্থে সমগ্র বীরভূমের সকল পুরাকীর্তির বিষয় আলোচিত হয় নাই। যে-কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি এই গ্রন্থের আলোচনার বাইরে রয়ে গেছে তাদের মধ্যে সর্বাগ্রে রাখড়েশ্বর নামক শৈবতীর্থের উল্লেখ করতে হয়।

রাঁখড়েশ্বর তীর্থ বীরভূমের অন্যতম প্রাচীন শিবক্ষেত্র। এই তীর্থ অধুনা বীরভূম জেলার লাভপুর থানার মধ্যে এবং কোপাই নদীর পশ্চিম তীরে রাখড়েশ্বর নামক পল্লীর পূর্বসীমান্তে নির্জন ভূখণ্ডে প্রায় বিধ্বস্ত অবস্থায় অবস্থিত। অত্র কোপাই নদী উত্তর বাহিনী ও তৎপরে ঈশান-কোণাভিমুখে প্রবাহিত হয়ে মিলনপুর নামক স্থানে বক্রেশ্বর নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

রাখড়েশ্বরের পূর্বনাম ছিল বারাণসীপুর। ঠিক কবে থেকে বারাণসীপুর রাখড়েশ্বর নামে অভিহিত হতে থাকে তা আজও অনির্ণীত। অত্রস্থ শিব অনাদি লিঙ্গ। এই শিব নাথযোগীগণ কর্তৃক প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে স্থাপিত হয়েছিল অথবা নাথযোগীদের আসার পূর্ব থেকেই এইস্থানের গভীর জঙ্গল মধ্যে লিঙ্গমূর্তি পঞ্চানন লুক্কায়িত ছিলেন তা ঠিক করে বলা যায় না। ১৩১১ বঙ্গাব্দে বোলপুর থানার সিয়ানগ্রামে অবস্থিত মখদুমশাহ্‌ জালালের নামাঙ্কিত দরগাহ্‌ থেকে দুটি সংস্কৃত শিলালেখ পাওয়া যায়। ঐ সামন্ত নৃপতি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিবালয়গুলি হল ভাগলপুরের বটেশ্বর, দেওঘরস্থিত বৈদ্যনাথ, আসাম প্রদেশে তেজুকেশ্বর এবং খরাকেশ্বর। সর্বশেষ শিবালয়টি ঠিক কোথায় তা নির্ণীত না হওয়াতে ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় জানান অতীতের খরাকেশ্বর অধুনা রাখড়েশ্বর নামে পরিচিত হতে পারে। সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের কথা সত্য হলে রাখড়েশ্বর শিবস্থান প্রায় হাজার বৎসরের প্রাচীনতা দাবী করতে পারে। এই বিষয়ে ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার মহাশয় অবশ্য ভিন্নমত পোষণ করেছেন।

এই তীর্থে নাথ ও দশনামী সম্প্রদায়গত সন্ন্যাসীগণের সংগ্রামহীন সম্মেলন হয়েছিল। নাথযোগীগণের এক শাখা বিশেষ প্রক্রিয়ায় পারদ ও অভ্রকে মিশ্রিত করে আয়ু বর্ধনের নিমিত্ত ভক্ষণ করতেন। শ্বেতবর্ণহেতু পারদ 'হর' নামে এবং অভ্রকে পীত বর্ণহেতু 'গৌরী' নামে চিহ্নিত করত। তাই এই সম্প্রদায়ের নাথসাধকগণ হরগৌরীনাথ নামে অভিহিত হতেন। এইরূপ এক হরগৌরীনাথ নাথসাধনতত্ত্বের পরিমল বহন করে সর্বপ্রথম এইস্থলে এসেছিলেন। তিনি এখানে সংসারধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তদীয় বংশধরগণ বর্তমানে সমাজবিবর্তনের ধাক্কা এড়াইবার মানসে 'ভারতী' উপাধি গ্রহণ করিয়া আপনাদেরকে শংকরীয় দশনামীর অন্তর্ভুক্ত করতে প্রয়াসী।

দশনামী সম্প্রদায়গত সন্ন্যাসীদের মধ্যে মুর্শিদাবাদ হতে জয়গিরি প্রথম এই স্থানে এসেছিলেন। তৎশিষ্য কর্তৃক ঠাকুরপুকুরের ঈশানকোণে শিবমন্দির স্থাপিত হয়েছিল। মন্দিরটি টেরাকোটা অলংকরণে

শোভিত। এটি একটি তন্ত্র বা পীড়া দেউল। বহির্দেশে রাম রাবণের যুদ্ধ কাহিনী চিত্রিত আছে। মন্দিরটি প্রাথমিকযুগের বাথকেশ্বর মন্দিরের সমসাময়িক এবং বীরভূমের পোড়ামাটির অলংকরণ শোভিত যাবতীয় মন্দিরগুলির মধ্যে প্রাচীনতম বলে অনুমিত হয়। এই মন্দিরের পূর্বগাত্রে নিম্নভাগে মন্দিরটির প্রতিষ্ঠালিপি সংস্কৃত ভাষায় বাংলালিপিতে পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ ছিল। বর্তমানে এই লিপি ভগ্ন ও পাঠযোগ্যহীন। যে অংশটুকু উদ্ধারে সমর্থ হয়েছিলাম তা নিম্নরূপ:

ত্রিংশাং০কত্রিং শকাব্দে উপশিবরবি
দিনে মাকরী সপ্তমী০০৭শ্রীনন্ত্রী
স্থায়াগির্যা০০০শোপধ০০

প্রতিষ্ঠা-লিপি থেকে এই মন্দির যে স্থায়গিরির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একথা প্রমাণিত হয়। মূল বাথকেশ্বর মন্দির রাঢ়াধিপতি কর্তৃক (যদি সত্য হয়) স্থাপিত হলেও কালে তা কোপাইএর বারংবার বন্যাঘাতে জীর্ণ হয়ে ভূশায়ী হয়েছিল। এই সময় রাউতারা গ্রামনিবাসী বিশ্বনাথ মণ্ডলের দেওয়া মৃণ্ময় গৃহমধ্যে শিবলিঙ্গ রক্ষিত ছিল, পরে এক স্বপ্ন দৈবাদিষ্ট হয়ে বীরভূমের অন্তর্গত রামপুর গ্রামের কায়স্থকুলোদ্ভব জমিদার জগমোহন সিংহ মহাশয় ১৭০৪ শকাব্দে বর্তমান মন্দির তৈরী করে দিয়েছিলেন। মন্দিরটির প্রতিষ্ঠালিপি নিম্নরূপ—

শ্রীশ্রীবাথকেশ্বরস্য
শ্রীশ্রীমন্দিরং
জগমোহন সিংহেন
কারিং শকাব্দ ১৭০৪

ডঃ বিমলকুমার দত্ত মহাশয়কে এই মন্দিরের ছবি দেখালে তিনি বলেছিলেন, রচনাশৈলীতে এই মন্দির বিশিষ্ট নাগররীতির উদাহরণ। জগমোহন সিংহ কর্তৃক বাথকেশ্বর শিব সর্বপ্রথম মহেশ্বর নামে চিহ্নিত হয়েছিল বলে স্থানীয় লোকশ্রুতি বর্তমান। এই শিব নাকি নিঃসন্তান জগমোহনের বংশরক্ষা করেছিলেন। শিব আশীর্বাদে জগমোহন যে পুত্র লাভ করেছিলেন তাঁরই নাম ছিল শিবচন্দ্র রায়। ইনি বর্ধমানরাজ তেজশ্চন্দ্র কর্তৃক রায় উপাধিতে ভূষিত হওয়ায় তাঁর বাসভূমি আনন্দপুর কালে রায়পুর নামে চিহ্নিত হয়েছিল।

জগমোহন সিংহ কর্তৃক মন্দির নির্মাণের প্রাক্কালে ঘাঘড় নামক এক ধর্মপ্রাণ গোপের গল্প তৈরী হয়েছিল। শিব কৃষির দেবতা, তাই গোঁপ পাতার ভূতরাজ হয়ে জনকাতার ভেদ করে লিঙ্গরূপী পঞ্চাননের অভ্যুদয় কাহিনী একান্ত স্বাভাবিক বলেই মনে হয়। এই ঘটনা পলাশী যুদ্ধের পর রাঢ় বাংলার নাথসাধনকেন্দ্রগুলিতে সংঘটিত হয়েছিল বিনয় ঘোষ মহাশয় তারকেশ্বর প্রসঙ্গে এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন।

যুগপরম্পরায় বক্রেশ্বর কৌল ও তান্ত্রিকগণের সাধনকেন্দ্র ছিল। এই স্থানের পবিত্রতা বিষয়ে অবহিত হয়ে রাজশাহী জেলার নাটোরের রাণী ভবানী এইখানে বকালালী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রাণীর দেওয়া কালী মন্দিরের ভিত্তিমূল ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। এ সবই কীর্তিনাশিনী কোপবতীর বন্যার ফল।

বক্রেশ্বরে গাজন উৎসবে বাণেশ্বর ব্যবহৃত হওয়ায় শিব পূজার মধ্যে নিরঞ্জন ধর্মঠাকুরের প্রভাব প্রকট হয়ে উঠে। মন্দির সম্মুখস্থ প্রাচীন বটবৃক্ষমূলে বটুক ভৈরবের অধিষ্ঠান। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে অনাদিনাথ নাথযোগীগণ একপাদভৈরব এবং বটুকভৈরবকে আবাহন করেছিলেন। ঠাকুরপুকুরের ঈশান কোণাংশে আর এক দেবতার অবস্থিতির খবর পাওয়া যায়। এঁর স্থানীয় নাম "ধামাসকন্তা"। পণ্ডিতগণ বলেন 'ধর্মাধিকরণিক' শব্দ থেকে ধামাসকন্তার উদ্ভব। সুতরাং রাখড়েশ্বরে মূলতঃ বৌদ্ধ ও নাথপন্থের স্থাপিত শিবশক্তি সাধনার কেন্দ্র ছিল। এই শিবক্ষেত্রেই ষষ্ঠীদেবীর অধিষ্ঠান আছে। ইনিও বৌদ্ধদেবী হারিতির সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে মা-শীতলার রূপ পরিগ্রহ করেছেন।

রাখড়েশ্বরে উত্তরাংশে আর একটি একরত্ন দেউল বর্তমান। মনে হয় এটি কারও ব্রত উদযাপনের সার্থকতার সাক্ষী। স্থানীয় বিপ্রটিকুরী গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ কৌল ভট্টবংশীয় পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য মহাশয় বক্রেশ্বর মন্দির থেকে সিদ্ধবলির শ্রীক্ষেত্রে শক্তিমন্ত্র লাভ করেছিলেন এবং স্বগৃহে পঞ্চমুণ্ডী আসন স্থাপন করে আরাধনায় সিদ্ধ হয়েছিলেন। বর্তমানে সেই আসন পরিত্যক্ত—টিকুরী গিয়ে দেখে এসেছি। অদ্যাপি রাখড়েশ্বরে টিকুরীর ভট্টবংশীয়দের স্বত্বপ্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এই গৃহ থেকে প্রতি বৎসর কোজাগরী পূর্ণিমা তিথিতে বক্রেশ্বরে বিশেষ কোপাদি অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

রাখড়েশ্বরে নরনাথ সম্প্রদায়ের বসতি নিষিদ্ধ ছিল। এটি ঠিক কি ধরণের সংস্কার তা বলতে পারি না তবে এই রীতি অনুশীলনের ধারায় নাথযোগীগণ যুগী বা জোলা নামে সমাজবহির্গত হওয়ার পূর্বেই 'ভারতী' উপাধি গ্রহণ করে আত্মরক্ষার শেষ চেষ্টা করেছেন সেই দৃষ্টান্ত এখানে চোখে পড়ে। মুর্শিদাবাদের এড়োয়ালীর রাজা রামজীবন রায়ের বংশধর কীর্তিচন্দ্র রায় বক্রেশ্বর শিবের পূজা পরিচালনার জন্য তিনশত বাট বিঘা শিবোত্তর দান করেছিলেন।

এখনও সাধ্যমত যত্নে বক্রেশ্বরের পূজানুষ্ঠান হয়ে থাকে। জোড়াশকষী, কোজাগরী পূর্ণিমা, বারুণীসপ্তমী, শিবচতুর্দশী ও নীলসংক্রান্তি তিথি বক্রেশ্বরে বিশেষ উৎসবের দিন বলে আজও গণ্য। শিবচতুর্দশীতে এই শিবক্ষেত্রে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম্যমেলার আয়োজন হয়ে থাকে। সরকারী পুরাতত্ত্ব বিভাগের সুপারিশে শীঘ্রই এই প্রাচীন শৈবতীর্থ সংস্কারপ্রাপ্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করুক এই কামনা করি।

রঙ্গলাল সরণী

এম আবদুর রহমান

অতীত কালের রাঢ় অঞ্চলের একটি রাস্তা। লোকে বলে 'বেড়োর সরাণ'। আদিতে তার নাম ছিল "রঙ্গলাল সরণী"। প্রায় পাঁচ শো বছর আগে তৈরী হয়েছিল এই পথ রঙ্গলালের প্রচেষ্টায়, প্রযত্নে এবং তত্ত্বাবধানে। এই সরণীর সমগ্র ব্যয়ভার বহন করেছিলেন রাজা—"বিক্রম-কেশরী।"

"বিক্রম কেশরী" নাম নয়, উপাধি। রাজার আসল নাম কি ছিল তা সঠিক ভাবে জানা যায় না। তাঁর উপাধিই তাঁর নামের স্থান দখল করেছে। কেউ কেউ বলেন সেন বা পাল বংশের কোন রাজ বংশ রাজত্ব করতেন রাঢ়ের এই অঞ্চলে। রাজধানী ছিল তাঁর অধুনা যেখানে 'মঙ্গল কোট' গ্রাম অবস্থিত সেই স্থানে। অনেকখানি স্থান জুড়ে। তখন নাকি তাঁর রাজধানীর নাম ছিল 'উজ্জয়িনী'। মঙ্গল কোটের লাগাও একটি পল্লী আজও উজানী নামে আখ্যাত। উজানী কো-গ্রাম নামেও পরিচিত। কুনুর নদের তীরে অবস্থিত এই প্রাচীন স্মৃতি মণ্ডিত পল্লীতে বাস করতেন বাংলার খ্যাতনামা কবি স্বর্গীয় কুমুদরঞ্জন মল্লিক মহাশয়।

হিন্দু শাসন আমলের যশস্বীনামা সম্রাট বিক্রমাদিত্যের বিশাল সাম্রাজ্যের ক্ষুদ্র সংস্করণ ছিল রাঢ়ের এই উজ্জয়িনী রাজ্য। ছিল তাঁর নবরত্ন সভা। কবি, শিল্পী, গুণী এবং জ্ঞানী পণ্ডিত সমবায়ে গঠিত ছিল এই নবরত্ন সভা। এই সভার একজন সদস্য ছিলেন রঙ্গলাল। রঙ্গলাল কবি বা পণ্ডিত ছিলেন না। ছিলেন একজন গুণীব্যক্তি। রাজার বয়স্য এবং সহচর রূপে থাকতেন তিনি রাজার কাছে কাছে। রাজা তাঁকে অত্যন্ত ভালবাসতেন এবং বিশ্বাস করতেন। 'ডাকতেন বেড়া, 'তুই' বলে করতেন সম্বোধন। অপর কেউ এমনকি মন্ত্রী পর্যন্ত যখন রাজার কাছে পৌঁছতে সাহস করতেন না, বেড়া তখন অসংকোচে রাজার কাছে গিয়ে হাজির হতেন। রাজ-মহলের সর্বত্র ছিল বেড়োর অবাধ যাতায়াত। রাজা বিক্রম কেশরী, রঙ্গলাল এবং রঙ্গলাল সরণী নিয়ে যে কাহিনী রাঢ় এলাকার এতদঞ্চলে প্রচলিত আছে, সংক্ষেপে সেটি হলো :

একদিন সকালে রাজা বিক্রম কেশরী রাজ প্রাসাদের বহির্ভাগের অলিন্দে দাঁড়িয়ে ছিলেন। রঙ্গলাল রাজাকে দেখে অভিবাদন করলেন, রাজা বললেন : যা বেড়া তুই 'ঘোর-গাঁ'।

রঙ্গলাল বাড়ী গিয়ে সাজসজ্জা করে একটা ঘোড়ায় চড়ে 'ঘোর গাঁয়ের দিকে রওনা হলেন। ঘোর গ্রাম, মঙ্গল কোটের উত্তরে প্রায় বারো মাইল দূরে অবস্থিত। ঘোর গ্রামের কাছাকাছি এসে রঙ্গলালের মনে পড়ল রাজা তাঁকে কেন ঘোরগ্রাম আসতে বললেন, কি জন্য বললেন সেকথা তো পরিষ্কার ভাবে জিজ্ঞাসা করা হয়নি।

চিন্তিত হয়ে পড়লেন রঙ্গলাল। এতদূর এসে আর এক্ষুনি ফিরে যাওয়া যায় না। কাজেই গ্রাম প্রান্তে এসে একটি পুকুর পাড়ের গাছে ঘোড়া বেঁধে পুকুরে মুখ হাত ধুয়ে, পুকুরের বাঁধাঘাটের পাশে বসে ভাবতে লাগলেন। মুখে তাঁর চিন্তার রেখা।

ঘাটের কাছাকাছি আস্তানায় (আশ্রমে) থাকতেন এক মুসলমান দরবেশ। রঙ্গলালকে অনেকক্ষণ

পর্যন্ত বর্তমান আছে ; বর্তমান আছে 'বেতার সরণ' নাম বুকে ধরে। তৎপরবর্তী দক্ষিণের অংশ যা মঙ্গল কোট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল—শাহী সরণীর সহিত একীভূত হয়ে গিয়েছে।

এই প্রসঙ্গে মঙ্গল কোটের বেতার (মঙ্গলাগ)—কাহিনীর সঙ্গে মালদহ অঞ্চলের "হিঙা" কাহিনীর হুবহু মিল রয়েছে। সে কাহিনীতে—রয়েছে সুলতান সৈফুদ্দিন ফিরোজশাহ বললেন—"যা হিঙা তুই মোর গাঁ।"

তিনি যে রাজ মিস্ত্রিকে 'মিনার' তৈরীর আদেশ দিয়েছিলেন সে মিস্ত্রি, সুলতানের আদেশ মত কাজ করেন নি। অধিকন্তু সুলতানের সঙ্গে তর্কবিতর্ক করায় সুলতান তাকে মিনার হতে ফেলে দেবার আদেশ দেন। ফলে মিস্ত্রির মৃত্যু হয়। Memoirs of Gour and Pandua (by Khansahib M. Abid Ali Khan) গ্রন্থের ৫৪ ৫৫ পাতায় লিখিত বিবরণ "Sultan ordered his peon Hinga to go instantly to Morgaon. The peon dared not to ask the object of his Command to Morgaon so furious was the royal face. হিঙা মোর গাঁ-গিয়ে চিন্তায় পড়লো পরে "সনাতন" নামে এক ব্রাহ্মণ যুবকের সাক্ষাৎ পেয়ে সব কথা বললো, সনাতন ঠাকুর তাকে ভালো রাজমিস্ত্রি নিয়ে যাবার পরামর্শ দিলো। সুলতান খুশী হলেন পরে সুলতান এই ব্রাহ্মণ যুবককে গৌর নিয়ে গিয়ে রাজ দরবারে উচ্চপদে নিযুক্ত করেছিলেন।

এখন প্রশ্ন হল কে এই সনাতন? ইনি কি রূপের অগ্রজ সনাতন। শ্রীরজনীকান্ত চক্রব তাঁর গৌড়ের ইতিহাসের ২য় খণ্ডে এবং শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় তাঁর বাংলা ইতিহাসের দুশো বছর গ্রে এই উক্তি সমর্থন করেছেন। ফিরোজ শাহের রাজত্বের চার বৎসর পূর্বে হোসেন শাহের রাজত্ব শুরু। আমাদের কাঁকড় মোরগাঁয়ে রূপ সনাতনের ভিটেত "ভোগার" কথা আমরা শুনেছি। কিন্তু এ বিষয়ে বিস্তারিত অনুসন্ধানের প্রয়োজন।

সুলতান হুসেন শাহের আমলে মঙ্গলকোটে মুসলিম শাসন যে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। পরবর্তী যুগে মঙ্গলকোট হয়েছিল বাঙালী মুসলমানদের অন্যতম তীর্থভূমি। পাঁচজন পীর শহিদান (পাক-পাঞ্জতন) এবং তেরো জন প্রখ্যাতনামা দরবেশের মাজার আছে। আর সেই সঙ্গে আছে একাধিক হিন্দু দেবতার মন্দির ও পূজাস্থল। মুসলিম পীর-দরবেশ এবং হিন্দুদেব-দেবীর এমন চমৎকার সহাবস্থানের দৃষ্টান্ত বিরল।

দেব-দেবী বিবর্তনে গণপতি

দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী

মানুষের অস্তিত্বের উপর দেব-দেবীর অস্তিত্ব নির্ভরশীল। প্রতিটি সভ্যতা ও সংস্কৃতি আপন আপন বৈশিষ্ট্য অনুসারে ইহাদের সৃষ্টি করে। সভ্যতা ও সংস্কৃতির তারতম্যে দেব-দেবীগণও ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়। আদিমযুগে মানুষের ধারণা কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ বস্তুনিচয়ে সীমাবদ্ধ ছিল। তখন মানুষের দেব-দেবীর ধারণাও সেইহেতু সূর্য, চন্দ্র, ঝড়-ঝঞ্ঝা এবং প্লাবন প্রভৃতিতে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। তাহারা মূর্তিমান এই সকল বস্তু বা প্রাকৃতিক শক্তিকে দেব-দেবীজ্ঞানে পূজা করিত। পূজা করিত পশু-পক্ষী, মৎস্য বা এইরূপ কোন প্রাণীকে। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে আদিমযুগের মানুষের কাছে যাহারা পূজা পাইত হয় তাহারা তাহাদের নিকট ভীতিপ্রদ ছিল, নতুবা তাহারা তাহাদের কোন বিশেষ উপকারে লাগিত। সেই যুগের মানুষের নিকট যাহাই বাধাস্বরূপ হইয়া উঠিত তাহার পশ্চাতেই কোন না কোন দেব-দেবীর ভূমিকা রহিয়াছে বলিয়া তাহারা মনে করিত এবং সেই বাধা অপসারণের জন্য বিঘ্নকারী দেবতার উদ্দেশ্যে পূজা করিত।

পরবর্তীকালে মানুষের বুদ্ধি ও চিন্তার ক্রমবিকাশের সহিত তাহার দেব দেবীর ধারণাও ক্রমে আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত হয়। প্রতিটি সমাজে একেবারে গোড়ার দিকে অশিক্ষিত জনসাধারণ আপন অভিরুচি অনুযায়ী অগণিত দেব দেবী সৃষ্টি করিয়াছিল। আপন আধিপত্য লইয়া এই সকল দেব দেবীর মধ্যে বিরোধ লাগিয়াই থাকিত। অবশেষে সমাজের সুধীদের চিন্তাশীল ব্যক্তি এই বিরোধপরায়ণ দেব-দেবীর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেন। ধর্মীয় ব্যাপারে তাহাদের সুচিন্তিত অভিমতগুলি ধরিয়া রাখিবার জন্য ধর্মগ্রন্থের প্রয়োজন হয়। মানুষের ধর্মবিশ্বাসে নানারূপ পালাবদলের ইতিহাস জানিতে হইলে আমাদের এই ধর্মশাস্ত্রগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুধাবন করিতে হইবে। ইহার সহিত প্রত্নতাত্ত্বিক পরীক্ষার লব্ধ জ্ঞানকে অবশ্যই কাজে লাগাইতে হইবে।

ভারতীয় ধর্মগ্রন্থগুলির মধ্যে বেদই হইল প্রাচীনতম (ম্যাকডোনাল্ড সাহেবের মতে খৃষ্টপূর্ব ১৩০০ অব্দ, রমেশচন্দ্র দত্তের মতে খৃষ্টপূর্ব ২০০০ হইতে ১৪০০ অব্দ)। ভারতীয় হিন্দুধর্মের প্রথমাবস্থা জানিতে হইলে বেদ-সংহিতা গ্রন্থগুলিকেই সহায়ক বলিয়া মনে করিতে হইবে। দ্বিতীয় পর্যায় ব্যক্ত হইয়াছে ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকে, তৃতীয় পর্যায় সূত্র ও স্মৃতিসংহিতা গ্রন্থে এবং চতুর্থ বা শেষ পর্যায় প্রকাশ পাইয়াছে পুরাণ ও তন্ত্রগ্রন্থগুলিতে।

বেদগুলির মধ্যে ঋগ্বেদ হইল প্রাচীনতম এবং অথর্ববেদ হইল সর্বাপেক্ষা অর্বাচীন। ঋগ্বেদ রচিত হইবার পরও মানুষের মনে যে নব-নব ভাব-ভাবনা উদিত হইল তাহার বিকাশের জন্যই পরবর্তীকালে অন্যান্য বেদগুলির জন্ম হয়। ইহারা ঋগ্বেদেরই পরবর্তী পর্যায় মাত্র। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে সামবেদের সকল মন্ত্র, যজুর্বেদের বাজসনেয় সংহিতার প্রায় অর্ধাংশ এবং অথর্ববেদ সংহিতার এক বৃহদংশ ঋগ্বেদ সংহিতার অনুবর্তন ব্যতীত আর কিছুই নহে। সায়ণাচার্যের অভিমতও ইহাই।

তাহার পূজা করিলে তাহারা শ্রেণীচ্যুতি ঘটিবে।

বিপ্রাণাং দৈবতং শম্ভুঃ ক্ষত্রিয়াণাং তু মাধবঃ।
বৈশ্যানাং তু ভবেদ্ ব্রহ্মা, শূদ্রাণাং গণনায়কঃ॥

যে ব্রাহ্মণ গণেশ পূজা করে (গণনাদৈব যাজকাঃ) মনুর মতে তাহারা নিকৃষ্টতম ব্রাহ্মণ। বিগর্হিত আচারসম্পন্ন ঐ ব্রাহ্মণগণ অন্য সৎব্রাহ্মণের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করিতে পারিবে না— সৎ ব্রাহ্মণ এবং পণ্ডিতগণ তাহাদের সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া চলিবে।

এতান্ বিগর্হিতাচারান্ অপাঙ্‌ক্তেয়ান্‌দ্বিজাধমান্।
দ্বিজাতি প্রবরো বিদ্বান্ উভয়ত্র বিবর্জয়েৎ॥ (অধ্যায় ৩ শ্লোক ১৬৭)

ম্যাকডোনাল সাহেবের মতে মনুর কাল হইল খৃষ্টীয় ২০০ অব্দ কিন্তু ভিনসেন্ট স্মিথের মতে খৃষ্টীয় ৫ম শতকে।

মূল রামায়ণ এবং মহাভারতের রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব ৫ম শতক। অবশ্য খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতক হইতে দশম শতক অবধি এই দুই মহাকাব্যে বহুতর সংযোজনা ঘটিয়াছে। লক্ষণীয় যে মূল রামায়ণের কোনখানেই গণেশের কোন উল্লেখ নাই। রামায়ণের চতুর্থ খণ্ড পরবর্তীকালে সংযোজিত বলিয়াই পণ্ডিতগণ মনে করেন। ইহাতে 'গণেশ' 'শব্দটির' উল্লেখ দৃষ্ট হয়। অবশ্য 'গণেশ' বলিতে সেখানে শিবকেই বুঝানো হইয়াছে। শিবের উদ্দেশ্যে প্রার্থনারত রাবণ সেখানে বলিতেছেন—

গণেশো লোকশম্ভুশ্চ লোকপালো মহাভুজঃ।
মহাভাগো মহাশূলী মহাদংষ্ট্রী মহেশ্বরঃ॥

মহাভারতের প্রস্তাবনায় দেখা যায় যে গণেশের জ্ঞানবত্তার স্বীকৃতিস্বরূপ ব্যাসদেব তাঁহাকে লিপিকররূপে নিয়োজিত করিলেন—

ততঃ সস্মার হেরম্বং ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ।
স্মৃতমাত্রো গণেশানো ভক্তচিন্তিত পূরকঃ
তত্রাজগাম বিঘ্নেশো বেদব্যাসঃ যতঃ স্থিতঃ।
পূজিতশ্চো বিষ্টশ্চ ব্যাসেনোক্তস্তদা
লেখকো ভারতস্যাস্য ভব ত্বং গণনায়ক॥ ৭৪-৭৭

উপরিউল্লিখিত শ্লোক যে মূল মহাভারতের অন্তর্গত নহে বা ঐ সময়েও রচিত হয় নাই তাহা মহাভারতপাঠেই বুঝা যায় (আদি পর্ব অধ্যায় ১ শ্লোক ৫২)। ইহা ন্যূনাধিক খ্রীষ্টীয় ৫ম শতকে রচিত (ম্যাকডোনাল)।

গণেশ এবং বিনায়কের উল্লেখ মহাভারতে দৃষ্ট হয়:

এতে দেবা ত্রয়স্ত্রিংশৎ সর্বভূতগণেশ্বরাঃ।
ঈশ্বরাঃ সর্বলোকানাং গণেশ্বর বিনায়কাঃ॥

(অনুশাসন পর্ব ১৫০, ২৫-২৭)।

বেদে ঈশ্বরের ত্রিমূর্তি কল্পিত হইয়াছিল। ত্রিমূর্তির জন্য তিনটি পৃথক রাজ্য ছিল। এই তিনটি রাজ্যই ঈশ্বর সর্বশক্তি লইয়া শাসন করিতেন। কিন্তু সমগ্র ভূমণ্ডল পরিচালিত হইত একাদশ ইন্দ্রিয়ের

যায়। পরবর্তীকালে তাঁহার ত্রিমূর্তি তেত্রিশটি দেবতার মূর্তি পরিগ্রহ করিল। কালক্রমে এই তেত্রিশ দেবতা তেত্রিশ কোটি দেবতায় রূপান্তরিত হইল। দেবতা-সৃষ্টির এই ক্রম-পরিবর্তনের ধারা হইতে ইহা বুঝা যায় যে মূল সেই এক দেবতাই তেত্রিশরূপে বিরাজিত। মহাভারতে এই তেত্রিশটি দেবতারই সাধারণ নাম হইল 'গণেশ'। অর্থাৎ 'গণেশ' অতএব কোন নির্দিষ্ট দেবতার নাম নহে। মহাভারতোক্ত এই গণেশ বা গণপতিগণ কিন্তু কেহই বৈদিক নহে, গ্রাম্যদেবতা। 'ঘোরভূতগণাশ্রয়া' উক্তি হইতেই এই সিদ্ধান্তে আসা যায়।

এই গ্রাম্যদেবতা বা ভূতগণকে 'ক্ষেত্রপাল' এই অভিধাও দেওয়া হইত। 'ক্ষেত্রপাল' শব্দটির অর্থ কৃষিকর্মের দেবতা। বৈবর্ত পুরাণে বলা হইয়াছে যে শিব, গৌরী, গণেশ, কার্তিকেয়, অম্বিকা এবং মাতৃকা ইত্যাদি দেব-দেবীগণ সকলেই মূলতঃ কৃষিদেবতা বা ক্ষেত্রপাল 'তা ক্ষেত্রদেবতাঃ সর্বাঃ' (১৭।৩৪)। গণেশ যে গজানন তাহার একটি তাৎপর্য এই যে প্রাণীকুলের মধ্যে গজ বা হস্তীই সর্বাপেক্ষা অধিক শস্যহানি ঘটাইয়া থাকে। লক্ষণীয় যে গণেশের বাহন মূষিকও শস্যের পক্ষে অতীব ক্ষতিকর। পক্ষান্তরে মা লক্ষ্মী যাহার কল্যাণে বসুমতী শস্যপূর্ণা, তাহার বাহন পেচক। পেচক মূষিক বিনাশ করিয়া থাকে। স্কন্দপুরাণের বর্ণনায় গণেশকে কৃষিকর্মের লাঙ্গলধারণরত দেখিতে পাওয়া যায়। উহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে উনি আসলে কৃষি দেবতাই।

শুধু গণেশই নহে, শিবদুর্গাও মূলতঃ কৃষিদেবতাই। শিব দীর্ঘকেশী, বাস করে গিরিগহ্বরে বা শ্মশানে-মশানে। সে কৃষকও বটে। দুর্গার অধিষ্ঠান পর্বতদেশে (পার্বতী)। পুরাণকে তাঁহারা উভয়েই অস্ত্যজশ্রেণীর মানুষের পোশাক-আশাক পরিধান করিয়া তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া যাইত। এই অস্ত্যজশ্রেণী বলিতে বুঝায় কিরাত, ভীল, শবর—যাহারা পাহাড়ে পর্বতে বনে-জঙ্গলে বাস করে এবং পশুশিকারদ্বারা জীবনধারণ করিয়া থাকে।

দুর্গাপূজার সময়েই আর একটি উৎসব হয়, উহার নাম শবরোৎসব। কালিকাপুরাণে ঐ উৎসবের নানাবিধ অশ্লীল ক্রিয়াকাণ্ডের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। দুর্গাপূজার নবপত্রিকা তো আসলে শস্যেরই প্রতীক। বাঙালী কবিগণের কাব্যে এইসকল কারণেই শিবদুর্গা কৃষকরূপে অঙ্কিত হয়। কখনও বা দেখা যায় তাহাদের চাষীরূপে, কখনও বা কোচিনীপাড়ার বেশে (শিবায়ন)।

পরবর্তীকালে শিবদুর্গা পরিণত হয় গণেশের পিতামাতারূপে। উহার সম্পর্কে যে তত্ত্ব নিহিত আছে তাহা সম্ভবতঃ এই যে, শিবদুর্গা যখন ক্ষেত্রপাল হইতে দেব-দেবীতে রূপান্তরিত হইল তখন অপর ক্ষেত্রপাল গণেশের ভক্তগণ ভাবিল গণেশই বা দেব হইবে না কেন?

গণেশের জন্ম লইয়া বহু পৌরাণিক কাহিনী পাওয়া যায়, তন্মধ্যে স্কন্দ পুরাণে প্রাপ্ত কাহিনীটি নিম্নরূপ—গোড়ায় গণেশ নিজেই জানিত না যে শিব তাহার জনক। শিবও গণেশকে তাহার পুত্র বলিয়া জানিত না। সুতরাং উভয়েই আপন আধিপত্য স্থাপনে বদ্ধপরিকর ছিল। একদা উভয়ের আধিপত্য লইয়া তুমুল যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে শিব গণেশের মুণ্ডপাত করে। শিবজায়া পার্বতী সেইদৃশ্য দেখিয়া হতবাক্ হইয়া জানায় যে বিজয়ী ও বিজিত হইল পরস্পর পিতাপুত্র। পার্বতী শিবকে অনুরোধ করিল যেভাবেই হউক গণেশের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য। শিব অনুতপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ গজানন কাটিয়া আনিয়া গণেশের মস্তকে বসাইয়া দিল। গণেশ পুনরায় জীবন ফিরিয়া পাইল।

তখন ইহাই স্থিরীকৃত হইল যে গণেশ ও শিব পৃথক কেহ নহে। সুতরাং উঁহাদের পৃথক্ ভাবে আরাধনা করিবারও কোন প্রয়োজন নাই। স্বয়ং গণেশ ও সেইদিন হইতে বুঝিতে পারিল যে নিখিল ভূমণ্ডলের যাবতীয় বস্তুনিচয় শিবশক্তির বিভূতি বই কিছু নহে। ইহার পর পার্বতীকে তুষ্ট করিবার জন্য এবং গণেশকে উচ্চাসন দিবার জন্য শিব স্বয়ং ব্যবস্থা করিল যে সকল দেব-দেবীর পূজার পূর্বে গণেশকে পূজা করিতে হইবে।

শিবপুরাণে উক্ত কাহিনীর কিছু রূপভেদ লক্ষ্য করা যায়। উক্ত পুরাণের মতে শিব প্রায়শই পার্বতীকে অসংরক্ষিত অবস্থায় একা ফেলিয়া রাখিয়া অনুগামী সহ বহির্গত হইত। একদিন ঐরূপ অবস্থায় পার্বতী ভয় পাইয়া মৃত্তিকাদ্বারা একটি পুতুল গড়িয়া লইল। তাহাতে প্রাণ সঞ্চার করাইয়া তাহাকে সে দ্বারদেশে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া বলিল, 'কাহাকেও ভিতরে ঢুকিতে দিবে না।'

পার্বতীর আদেশে সেই পুতুলটি দ্বারপ্রান্তে বসিয়া রহিল। শিব আসিল। কিন্তু পুতুলটি তাহাকেও প্রবেশ করিতে দিল না। ফলে শিবের সহিত তাহার ভীষণ যুদ্ধ হইল। শিবের অস্ত্রাঘাতে পুতুলটির শিরশ্ছেদ হইল।

কিন্তু পার্বতী ঐ দৃশ্য দেখিয়া এতই ক্রুদ্ধ হইল যে সৃষ্টি বুঝি ধ্বংস হইয়া যায়। তখন শিব পার্বতীর তুষ্টির জন্য তাহার অনুচর নন্দীকে তৎক্ষণাৎ আদেশ দিল, 'যাহার হউক মুণ্ড আনিয়া পুতুলটির মস্তকে স্থাপন করিয়া দাও।'

নন্দী প্রেতগণের মধ্যে নির্বোধ ও নিকৃষ্ট ছিল। সে কাহল কি, পথিপার্শ্বে নিদ্রামগ্ন হস্তীর মস্তক কাটিয়া আনিয়া পুতুলটির মস্তকে স্থাপন করিল। পুতুলটি প্রাণ ফিরিয়া পাইল বটে, কিন্তু তাহার মস্তক রহিয়া গেল হস্তীসদৃশ। পার্বতী ইহার জন্য অতীব ক্ষুব্ধ। তাহার ক্রোধ প্রশমনের জন্য শিব ব্যবস্থা করিল পার্বতীর পুত্র গণেশকে সর্বপূজারম্ভে পূজা করিতে হইবে।

উল্লিখিত পুরাণকাহিনীদ্বয় হইতে আমরা এই অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুধাবন করিতে পারি যে শিব ও গণেশ আদিতে ছিল দুইটি ভিন্ন সমাজের দুই দেবতা—যাহারা পরস্পরকে জানিত না চিনিত না। তাহাদের একে অন্যের দ্বারা স্বীকৃতি পাইতে ঘোরতর যুদ্ধের প্রয়োজন হইল। প্রাথমিক দ্বন্দ্ব মৈত্রীতে পরিণত হইল যখন উভয় প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে স্থাপিত হইল আত্মীয়তার সম্পর্ক।

লিঙ্গ-পুরাণের মতে শঙ্কর (শিব) উমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল রাক্ষসগণকে বিনাশ করিবার জন্য। অন্য দেবতারা যখন এই সংবাদ অবগত হইল তখন মহেশ্বর শিবের ন্যায় গণেশকেও পূজা করিতে লাগিল। তাহারা ভাবিল এই ভাবে আরাধনা করিয়াই তাহারা আরাধ্য ফল লাভ করিবে (লিঙ্গ-পুরাণ, অধ্যায় ১০৪-১০)। এই পুরাণে অবশ্য গণেশের পৃথক্ অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না—গণেশ সেখানে শিবের সহিত একীভূত। তাহার গজাননে শিবের ন্যায় জটা। গণেশের পঞ্চাশৎ নামের মধ্যে 'জটী মুণ্ডী তথা দণ্ডী বরেণ্য কৃষ্ণকেশঃ' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। স্কন্দ পুরাণে গণেশকে ত্রিনেত্র, পঞ্চমুখ এবং নীলকণ্ঠরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। বলাবাহুল্য, এইগুলি শিবের প্রতিরূপ।

যখন এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত হইল যে গণেশ এবং মহেশ বস্তুত একই পৃথক দেবতা নহে, তখন শৈব ও বৈষ্ণব সাধকগণের মধ্যে পারস্পরিক বিভেদও ঘুচিয়া গেল। হরিহর, হরগৌরী এবং কৃষ্ণ-

গণেশকে লইয়া পুরাণোপাখ্যান বরাহ, মৎস্য, অগ্নি, শিব, ভবিষ্যৎ, বামন এবং গরুড় পুরাণেও পাওয়া যায়। অবশ্য উহাদের মধ্য ঐক্য অপেক্ষা অনৈক্যই প্রকট হইয়া উঠে।

তন্ত্রমতে গজাননের ব্যাখ্যা এইরূপ: একদা শিব ও পার্বতী হিমালয়ের পাদদেশে একটি গিরিগুহায় গমন করিল। সেখানে তাহারা দেখিল মৈথুনের পূর্বে হস্তী ও হস্তিনী পরম সোহাগে পরস্পর আলিঙ্গন করিতেছে। সেই দৃশ্য দেখিয়া শিব ও পার্বতী মনে মনে ভাবিল, আহা আমরা যদি এইরূপ হইতাম। তাহাদের ভাবনা সাময়িকভাবে পূর্ণ হইল—তাহারা কিছু সময়ের জন্য হস্তী ও হস্তিনীতে পরিণত হইল এবং তাহার পরিণামে গজাননের জন্ম হইল।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে উক্ত আছে যে কার্তিকেয় এবং গণেশ—দুই ভ্রাতা। উহাদের মধ্য কার্তিকেয়ই বয়সে জ্যেষ্ঠ। কিন্তু কাহার বিবাহ আগে হইবে ইহা লইয়া উভয়েই সমভাবে ব্যস্ত। এই সমস্যা সমাধানের জন্য শিব বলিল, 'তোমাদের মধ্য যে আগে পৃথিবীর পবিত্র তীর্থগুলি পরিক্রমা করিয়া আসিবে তাহারই বিবাহ আগে হইবে।'

শিবের কথা শ্রবণ করিয়াই কার্তিকেয় দ্রুতগামী ময়ূরকে বাহন করিয়া পৃথিবী পরিক্রমায় বাহির হইল। গণেশের বাহন মূষিক। সে বুঝিতে পারিল এই প্রতিযোগিতায় সে পারিবে না। সে তখন বুদ্ধি খাটাইয়া একটি সংক্ষিপ্ত ও সহজ পথ বাহির করিল। সে করিল কি, সাতবার তাহার পিতামাতাকে পরিক্রমা করিয়াই তাহাদের নিকট বিবাহের প্রস্তাব জানাইল। শিব এই অদ্ভুত প্রস্তাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, 'পিতামাতাই হইল পৃথিবীর সকল তীর্থের সমতুল্য—আমি সেই পিতামাতাকে সাতবার পরিক্রমা করিয়াছি।' শিব আর 'না' করিতে পারিল না। এইভাবে বুদ্ধি খাটাইয়া গণেশ কনিষ্ঠ হইয়াও আগে বিবাহ করিল। জ্যেষ্ঠ কার্তিকেয় ময়ূর বাহনে পৃথিবী পরিক্রমা অন্তে দেখিল গণেশের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। অভিমানে সে চিরকুমার থাকিয়া গেল। আগে বিবাহ হইবার জন্য অতঃপর গণেশই সমাজে জ্যেষ্ঠের মর্যাদা পাইল।

কার্তিকেয়ের আর এক নাম স্কন্দ। স্কন্দও পূর্বে বিঘ্নকর গণদেবতা ছিল (মহাভারতের বনপর্ব)। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে একাধিকবার উল্লিখিত আছে যে শিব ও কার্তিকেয় বস্তুত অভিন্ন। স্কন্দপুরাণে দেখা যায় যে কুমারনাথ (কার্তিকেয়) হইল চোরগণের দেবতা। সে চৌরবিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থের প্রণেতাও। এক সময় দেবী কালিকাও চোর, ডাকাত ও দুর্বৃত্ত দ্বারা পূজিত হইত নানা ম্লেচ্ছগণৈঃ পূজিতা সর্বজাতিভিঃ। এমনকি, চৈতন্যভাগবতের কালেও দেখা যায় কালী, দুর্গা এবং চণ্ডী ছিল দস্যু ডাকাতের দেবী।

গজানন গণেশের গজের ন্যায় দুইটি দন্ত ছিল। একদা পরশুরাম হর-পার্বতী সন্দর্শনে কৈলাসে গমন করিল। হর-পার্বতী তখন গণেশকে দ্বারপ্রান্তে বসাইয়া রাখিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। গণেশের উপর আদেশ ছিল, কাহাকেও যেন ভিতরে না ঢুকিতে দেওয়া হয়। পরশুরাম ঢুকিবেই কিন্তু গণেশ ঢুকিতে দিবে না। ফলে উভয়েই প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হইল। পরশুরামের প্রচণ্ড কুঠারঘাতে গণেশের একটি দন্ত চূর্ণ হইয়া গেল। চূর্ণদন্ত গণেশ রক্তাক্ত কলেবর, তথাপি পিতামাতার আদেশ পালনে কৃতসংকল্প।

ওদিকে দুই বীরের রণহুঙ্কার, বাক্‌বিতণ্ডায় হর-পার্বতীর বিশ্রামে ব্যাঘাত হইল। তাহারা

দুয়ারে আসিয়া দেখিল একদিকে শিব-শিষ্য পরশুরাম, অন্যদিকে চূর্ণদন্ত গজানন। গজানন নিরপরাধ। কারণ সে আহত হইয়াও কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু পরশুরাম শিষ্য হইয়াও শিষ্যোচিত আচরণ করে নাই। অসময়ে গুরুর নিদ্রাভঙ্গের কারণ হওয়া আদৌ শিষ্যোচিত কার্য নহে। শিষ্য বলিয়া শিব তাহাকে ক্ষমা করিতে পারে, কিন্তু নিরপরাধ পুত্রের এই দশা দেখিয়া কোন্ মাতা চুপ করিয়া থাকিবে? পার্বতী দেখিতে দেখিতে ভয়ঙ্কর রণচণ্ডীর মূর্তি ধারণ করিল। তাহার হস্তে অসি ঝলমল করিয়া উঠিল। পরশুরাম বুঝিল আর রক্ষা নাই। এখন বিপদ হইতে কিরূপে পরিত্রাণ পাওয়া যায়?

উপায় একটি বাহির হইল। সে একাগ্র মনে বিষ্ণুর ধ্যান করিল। বৈকুণ্ঠপতি ভক্তকুল রক্ষা করিতে তখন স্বয়ং কৈলাসধামে অবতীর্ণ হইল। পার্বতী ব্রাহ্মণগণকে সর্বদা সম্মান ও সমীহ করিত। বিষ্ণু ও ব্রাহ্মণের বেশে আসিয়া পার্বতীকে নানা প্রবোধবাক্যে ক্রোধশূন্য করিল।

গজাননের এক দন্ত সম্পর্কে অন্যের মতও ছিল। উহাতে এই বিষয়ে নিম্নরূপ উপাখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়: একদা গণেশের জন্মদিন উৎসবে দেবদেবীরা সকলে আসিয়া প্রচুর মণ্ডা (লড্ডু) প্রদান করিল। অতঃপর উদর পূর্ণ করিয়া গণেশ তাহার বাহন মূষিকে আরোহণ করিয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। মূষিকটি গণেশের বিপুলভার বহন করিতে না পারিয়া চিঁ চিঁ করিতেছিল। কিছুদূর অবধি গমন করিয়া সে পথিপার্শ্বে একটি সাপকে ফণা তুলিয়া থাকিতে দেখিল এবং ভয়ে থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে থামিয়া গেল। আকস্মিক এই থামিয়া যাওয়ায় প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লাগিল। উহার ফলে গণেশ ভূপতিত হইল। তাহার মুখ হইতে একে একে মণ্ডা বাহির হইতে লাগিল। গণেশ অতিশয় লোভী ছিল। সে এই অবস্থা সহ্য করিতে পারিল না। সে করিল কি, সম্মুখে ঐ যে সাপটি ছিল তাহাকেই আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিল যাহাতে মণ্ডা আর পেট হইতে বাহির না হইয়া আসে। অতঃপর পুনরায় সে গৃহাভিমুখে গমন করিল। পথে যেতে চন্দ্রদেবতা তাহার ঐ অবস্থা দেখিয়া উপহাস করিতে লাগিল। কিন্তু গণেশ কোন উপহাস সহ্য করিতে প্রস্তুত নহে। অনিবার্য পরিণাম যুদ্ধ। কিন্তু গণেশ যে নিরস্ত্র। তখন সে দন্ত দুইটিকেই আমূল করিয়া চন্দ্রদেবের বক্ষদেশে প্রচণ্ড আঘাত করিল। উহার ফলে তাহার একটি দন্ত চূর্ণ হইল। চূর্ণ দন্তটি ফেলিয়া না দিয়া সে উহা অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিল। সেই অবধি তাহার হস্তে চূর্ণ দন্ত অস্ত্রের ন্যায় শোভা পাইল এবং সর্পই হইল তাহার পবিত্র উপবীত।

গণেশের জন্মদিনে অনেক দেব-দেবীই তাহাকে অনেক কিছু উপহার দিল। পৃথিবী তাহাকে দিল মূষিক।

সরস্বতী দদৌ তস্মৈ লেখনীং বর্ণলোচনা
জপমালাং দদৌ ব্রহ্মা, ইন্দ্র গজবরং দদৌ।
পঙ্কং পদ্মাবতী প্রদাৎ, ব্যাঘ্রচর্ম
দদৌ শিবঃ।
বসুন্ধরা বজ্রদন্তপুত্রী মূষিকবাহনং। (বরাহ পুরাণ)

শারদাতিলকম্-এর ভাষ্যে রাঘব ভট্ট ধ্যানকল্পে একপঞ্চাশটি গণেশের উল্লেখ করিয়াছেন। বিবিধ

পুরাণ এবং তন্ত্রে মোট চতুঃপঞ্চাশৎটি গণেশের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। আকৃতি, প্রকৃতি স্বভাব ইত্যাদিতে উহারা একে অন্য হইতে পৃথক ছিল। সম্ভবতঃ এই বহুসংখ্যক গণেশ কালক্রমে একটিমাত্র গণেশেই আত্মস্থ হইল। বৃহস্পতির সহিত নামসাদৃশ্য থাকায় বৃহস্পতির ন্যায় গণপতিও ধীরে ধীরে প্রজ্ঞার দেবতারূপে স্বীকৃতি পাইতে শুরু করিল, দেবগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠত্বের মর্যাদা পাইতে থাকিল। একদা যে দেবের কার্য ছিল মঙ্গলকার্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করা, কালান্তরে সে দেখা দিল বিঘ্নবিনাশকরূপে। গণেশের ক্রমোন্নতির সহিত মানুষের দেবধারণার উন্নতির সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গীভাবেই দৃষ্ট হয়।

ধর্মগ্রন্থ ও সাহিত্যগ্রন্থে গণেশ-চিন্তায় মানুষের ক্রমবিবর্তনের ধারা স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে রচিত পঞ্চতন্ত্রের প্রস্তাবনাপর্বে অগণিত দেবদেবীর নামোল্লেখ দেখা যায়, কিন্তু সেই নাম-তালিকায় গণেশের কোন উল্লেখ নাই। শূদ্রক, কালিদাস এবং ভারবি ইঁহারা সকলেই খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের কবি ছিলেন। ইঁহাদের কাব্যাবলীতেও কোথাও গণেশের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয় না। ঐ সময়ের কোন শিলালেখেও গণেশের উল্লেখ দেখা যায় না। ভরতের নাট্যশাস্ত্র এমন একটি গ্রন্থ যেখানে প্রায় সকল দেবদেবীর নামই স্থান পাইয়াছে, কিন্তু গণেশের নাম একটিবারের জন্যও উচ্চারিত হয় নাই। সপ্তম শতকের কবি বাণভট্টের কাদম্বরীতেই প্রথম গণেশের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এখানেও তাহাকে উপদেবতা কিম্বা গণদেবতাদের সঙ্গীরূপেই অঙ্কিত হইয়াছে। ভবভূতির (সপ্তম শতক) মালতী-মাধবেই প্রথম গণেশকে দেবতারূপে পূজিত হইতে দেখা যায়।

যে সকল পুরাণকাহিনীতে গণেশের মহত্ত্ব কীর্তিত হইয়াছে লক্ষণীয় যে সেই পুরাণকারগণ সকলেই দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী ছিলেন। আকৃতির জন্য না কার্যের জন্য, লক্ষ্য করিবার বিষয় যে আর্যাবর্ত উত্তর ভারত অপেক্ষা দাক্ষিণাত্যেই গণেশপূজার প্রচলন অধিক। গণেশের মহত্ত্ব প্রচার করিবার জন্য দ্রাবিড় বৈদিকগণ 'গণেশাথর্বশীর্ষ' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। উহা বেদের অনুসরণেই খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের পরবর্তীকালে রচিত হয়। এই সকল তথ্য হইতে অনুমান করা যায় যে গণেশ সর্বাগ্রে দাক্ষিণাত্যেই পূজিত হইত।

গণেশের মূর্তিপূজার প্রচলন কোন সময় হইতে শুরু হইয়াছিল তাহা আর বলা সম্ভব নহে। বেদ-সংহিতায় কোন দেবমূর্তি বা দেবালয়ের নাম বা মন্দির প্রভৃতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। সাহিত্যের কোথাও এমন যে গণেশ পূজিত হইত তাহার সন্ধানও পাওয়া যায় না।

ভারতে মূর্তি-পূজার প্রচলন সম্ভবতঃ মনুসংহিতার রচনার (খ্রীষ্টীয় ২০০ থেকে ৪০০ অব্দ) পূর্বে। কেন না, এই গ্রন্থের বহুস্থানে ব্রাহ্মণগণ মূর্তিপূজা করিতেছে এইরূপ চিত্র রহিয়াছে।

পৌরাণিক যুগেই গণেশপূজার প্রচলন হয়। কিন্তু তখনও অন্য দেবগণের পূজার তুলনায় গণেশপূজা নিম্নস্তর।

> সৌরশ্চ গাণপত্যশ্চ শৈবাদেঃ ভূরিমানিনঃ
> শাক্তশ্চ বৈষ্ণবো বাপি হরেশ্চৈব পরিত্যজেৎ।
> সর্ববিবর্জয়েৎ শৈবশাক্তনীনাঞ্চ বৈষ্ণবঃ
> ন কার্যা প্রার্থনা তেভ্যঃ তেষাং ভুবাং অবেক্ষ্যবৎ।
>
> (পদ্মপুরাণ ২য় খণ্ড, অধ্যায় ১০০)

বাহে গণেশ মূষিকোপরি, কার্তিকেয় ময়ূরের উপর, শিব বৃষভের উপর এবং ইন্দ্র হস্তীর উপর বসিয়া উহা দেখিতেছে।

নেপালের মন্দির হিন্দু কিংবা বৌদ্ধগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। সেখানেও গণেশের পূজা হয় অন্য দেবতার মন্দিরে। গণেশের স্বতন্ত্র মন্দির বিরল। গণেশপূজার প্রচলন সুদূর চীন, জাপান, মঙ্গোলিয়া ইত্যাদি দেশেও দৃষ্ট হয়। বৌদ্ধ পুঁথিতে গণেশের নাম বিনায়ক, উহাই আবার বিনায়কেশ্বরূপে জাপানে পরিচিত। চীনে, জাপানে বা অন্য কোথাও গণেশের স্বতন্ত্র মন্দিরের অস্তিত্ব নাই।

বুদ্ধ-জন্মের পূর্বে গৌড়দেশে শৈবগণ, কৌমারগণ প্রভৃতি বিভিন্ন মতাবলম্বী মানুষ বাস করিত, কিন্তু গাণপত্যগণের অস্তিত্বের কথা কখনও শোনা যায় নাই।

যদিও গণেশের আধিপত্য লইয়া গাণপত্যগণের সহিত ব্রাহ্মণগণের বিরোধের একটি সন্তোষজনক মীমাংসা হইয়া গিয়াছিল—সকল দেবতার পূজার পূর্বে তাহার পূজা স্বীকৃতও হইয়াছিল, তথাপি হিন্দু ব্রাহ্মণগণের উপর তাহার প্রভাব কখনও তেমন দৃঢ়মূল হইতে পারে নাই। প্রধান হিন্দুসমাজে গাণপত্য-ধর্মের প্রসার ও প্রচার চিরদিনই সীমাবদ্ধ থাকিয়া গিয়াছে।

হুদুম-পূজার গান

পবিত্রকুমার গুপ্ত

উত্তর বাংলায় লোকসংস্কৃতির বিকাশে রাজবংশী রমণীগণ একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। সাধারণ মানুষের আবেগের গতিশীল অভিব্যক্তি ঘটে লোকসংস্কৃতির মাধ্যমে। সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপনে অভ্যস্ত গাঁয়ের মানুষ উদয়াস্ত পরিশ্রম করে উদরান্নের জন্য। সবাই ভগবানে বিশ্বাস করে। ভূত-প্রেতকে বিশ্বাস করে। তাদের খুশী করতে নানাবিধ প্রক্রিয়া অবলম্বন করে। সাধারণ মানুষ তাদের চিরাচরিত প্রথায় বিশ্বাসী। পুরাতনের ধারাকে কিছুতেই অস্বীকার করতে চায় না; অসত্য বলে বর্জন করতে চায় না। পুরাতন প্রথার প্রতি, পুরাতন আচার-আচরণ ও বিশ্বাসের প্রতি তাদের অগাধ বিশ্বাস।

লোকসংস্কৃতি যে কটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে তার মধ্যে অন্যতম স্তম্ভ হল লোকসাহিত্য। লোক-সাহিত্য মূলতঃ মৌখিক। তথাকথিত লেখাপড়া না-জানা চাষাভূষা দিন-মজুর, জেলে, কামার, কুমোর প্রভৃতি সাধারণ মানুষেরা নিজেদের কর্মব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে অচেতনভাবে রচনা করে ফেলে লোক-সাহিত্যের বিপুল সম্ভার। এইভাবে গড়ে উঠেছে নানা দেশে নানাবিধ লোককথা, লোককাহিনী, লোকগীতি, প্রবাদ, ছড়া, ধাঁধা ইত্যাদি। লোক-সাহিত্যের ভিত্তিভূমি মাটি ও মানুষ।

উত্তর বাংলার রাজবংশী রমণীগণ প্রত্যক্ষভাবে কৃষিকর্মে অংশ গ্রহণ করেন। বর্ষার দিনে কোমরে খলুই বেঁধে ঝাঁকই, টোপা, থুড় হাতে নিয়ে মাছ ধরতে বেরিয়ে পড়েন। আবার এরাই সাইটলপূজা, সুবচনী, হুদুম দেওর ও তিস্তাবুড়ির পূজায় মেতে ওঠেন। পূজার আনুষ্ঠানিক পর্বের পর শুরু হয় রাজবংশী রমণীগণের নাচ ও গান।

বর্তমান প্রবন্ধে রাজবংশী রমণীগণ কর্তৃক বরুণ দেবতার আবাহনকে কেন্দ্র করে যে লোক-সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে সে সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে।

বরুণ দেবতাকে রাজবংশীগণ হুদুমদেও বলে থাকেন। হুদুমদেওয়ের পূজা একটি পুরাতন প্রথা। এ প্রথার মধ্যে ধর্ম ও যাদুবিদ্যার সংমিশ্রণ দেখতে পাওয়া যায়।

হুদুমপূজা প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে ডাল্টন, ডাঃ হান্টারের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। হান্টার বলেন যে হুদুমদেও পূজা পুরাতন কুসংস্কারের একমাত্র চিহ্ন। গ্রামের মেয়েরা দূরে কোন নির্জন স্থানে সমবেত হয়। এই অনুষ্ঠানে পুরুষের প্রবেশের অনুমতি নেই। অনুষ্ঠানটি রাত্রিতে অনুষ্ঠিত হয়। একটি কলাগাছ কিংবা কাঁচা বাঁশ মাটিতে পোঁতা হয়। মেয়েরা তাদের জামাকাপড় খুলে ফেলে এবং গাছটার চারদিকে নাচে এবং গান গায়।

বিশেষ করে যখন একেবারে বৃষ্টি নেই এবং শস্যহানি খরায় কবলিত তখন মূলতঃ অনুরূপ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বিভিন্ন অঞ্চলে হুদুমপূজার প্রকারভেদ লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান প্রবন্ধলেখক

কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমা, জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুরদুয়ার মহকুমা এবং গোয়ালপাড়া জেলার ধুবড়ী মহকুমায় ব্যাপকভাবে ক্ষেত্র সমীক্ষা করেছেন। কোচবিহার জেলার শালবাড়ী, বড়-শালবাড়ী, চেংটিমারী, শোলাপা, ছেপাকোণা, বারকোদালী, বলরামপুর, ভাণ্ডিজেলাল এবং চৌকুশী বলরামপুর গ্রামে, জলপাইগুড়ি জেলার কামাখ্যাগুড়ি, নাকাখনি, চিকলীগুড়ি ও ভাটিবাড়ী গ্রামে এবং গোয়ালপাড়া জেলার গৌরীপুর ও পোকাশালি গ্রামে রাজবংশী রমণীদের কাছ থেকে বেশ কয়েকটি গান সংগ্রহ করতে পেরেছেন।

হুদুমপূজার উপকরণ :

১। একটি কলাগাছ; ২। কলাগাছে মালা পড়ানোর জন্য মৌসুমী ফুল; ৩। মাটির ঘট ৪। আম্রপল্লব; ৫। ষোলটি কাঁচা অথবা পাকা কলা, ৬। চিঁড়া, দই, গুড়, ৭। কুলা; ৮। দুটি প্রদীপ কিংবা মোম বাতি, ৯। সিঁদুর ধুপধুনা; ১০। চিল, ফিতে ও ঘুঘুর বাসা।

ছাম ও গাইন দিয়ে কোটা তুষ জল দিয়ে মাখা হয়। সাতবাড়ী থেকে জল সংগ্রহ করা হয়। তুষের এই পিঠা হুদুম দেওয়ের প্রতীক হিসেবে কলাগাছকে উৎসর্গ করা হয়। এই পিঠা তৈরী করতে পারবে মাত্র কুমারী মেয়েরা। এক মায়ের যে এক সন্তান সেই পারবে কলাগাছটি রোপণ করতে।

সাধারণতঃ সাত জন ব্যক্তি পূজায় অংশগ্রহণ করেন। নাচগানের সময় উপযুক্ত বাজনা পাওয়া না গেলে টিন বাজানো হয়। মেয়েরাই নাচে। পশ্চিম দুয়ারে সাধারণতঃ পরপর তিন রাত ধরে হুদুমদেওর পূজা হয়। তৃতীয় রাতের শেষে কলাগাছ, মাটির ঘট ইত্যাদি নিকটস্থ নদীতে কিংবা পুকুরে ফেলে দেওয়া হয়।

কয়েকটা গান :

ছিল ছিলাছে কমরটা মোর
শির শিরাছে মোর গাও
কোনঠে কোনে গেলে এলা
হুদুমার দেখা পাও।
পাটানিখান পড়েছে খসিয়া
আওলা হইছে খোপাটি মোর
হুদুম দেখা দাওগো আসিয়া
আইলেকরে হুদুম দেওয়া
বসিয়া বসিয়া
তোর পারেই মুই আছোরে বসিয়া
ঝিংঝিং ঝিংঝিং কমরটা
ভাতেও নাই মোর ভাতারটা
কয়কি মুই কাহিয়া কয়
কোনঠে গেলে দেখা হয়
দেখা হলে দেহটা জুড়ায়

(২)

ভেকুয়া তুই বর্ষেক রে
গাও ধুইয়া যুই
বাড়ি লাগি যাও
হরিয়া কোলেতে
যেমন ভেকুয়া ডুবডুবায়
ওই ষোড়শ কেংটী জলা
কেন কাটায়।
আষাঢ় মাস শাব মাস
ভেকুয়াত না হয় পানি
ভেকুয়া তুই বর্ষেক রে
বাড়ি লাগি যাও।

(৩)

হরিয়া হরিয়া মেঘ
কি সাজন সাজিয়া
গাছের অলে পা ধুইল
… …কি দিয়া—
কালা মেঘ ধলা মেঘ
মেঘ মেঘ ভাই
এক ছিলকা পানি দেও
গাও ধুইয়া যাই।
সাজন হনুমের ভাই
কারো ঘরে পানি নাই
আইল নগায় নাচন নাচি।

(৪)

এইস মা মোর সরেশসতী
নখে করিয়া ভর
বই জোগাতে আইসেন মা
মোর সভার ভিতর
মোর সভা ছাড়িয়া যদি মা
অন্য সভায় যান
আর কিছু দিবা দেব
ধর্মের মাথা খান।

যোক যেমন লজ্জা দিলেন মা
তুরা সভায় মাঝ
তোমারা তেমন লজ্জা পাইবেন মা
দেবতা সমাজে।
মালি যেমন কাটেরে পুষ্প
মধ্যে দিয়া দোষ
এই মতন করিয়া যে মা
সভায় আপন দোষ।

(৫)

চাইয়া দেখ চাইয়া দেখ
তুই সে মোদের ভাই
এক চিমকা পানি দেও
টিকা পাও ধুইয়া যাই
টিকা ধুইয়া ফেলালাম পানি
তা হইয়া যায় হাটু পানি
হাটু পানি টাটু হইল
নাও হইয়া যায় কাইত
কানের সোনা বান্ধা থুইয়া
থাকেন সাধা রাইত।
দেওয়া কাবিয়া রে
ফাওড়া তাড়া দিয়া
ঐ কতক পিদালীয়া
টিকা নিয়া যায়
বাকসা বাড়ী দিয়া। (উলুধ্বনি)

(৬)

পশ্চিমে বাঁধি আছ পূবে ভুলায় বাও
দূরে ডুবিয়া রইল কত সাধুর নাও
যাদুর মা-ও ডাকে রে
তখন দিঘীর পারে
তখন দিঘী জ্বলছে আগুন
ফাড়ির বাঁকে বাঁকে
দেওয়া ফাড়িয়া আই রে।

Mahabharata—Myth And Reality : Differing views Edited by **K. S. Ramobandran. Agam Prakashan,** Delhi. Rs. 80/-

'ভারত অধ্যয়নে পুণ্য জন্মে। অধিক কি কহিব, শ্রদ্ধাপূর্বক শ্লোকের এক চরণ মাত্র পাঠ করিলেও সকল পাপ নষ্ট হয়। এই গ্রন্থে দেব, দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, যক্ষ, উরগ প্রভৃতির ও সনাতন ভগবান্ বাসুদেবের কীর্তন আছে। তিনি সত্য, পবিত্র, মঙ্গলপ্রদ, পরিচ্ছেদাতীত, কালত্রয় অবিকৃত, জ্যোতির্ময় ও সনাতন; পণ্ডিতেরা তাঁহার অলৌকিক কর্ম সকল কীর্তন করিয়া থাকেন, তিনি এই চরাচরস্বরূপ বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, তিনি ব্রহ্মাদি দেবতার ও যক্ষাদি ভূতের সৃষ্টি করেন, তিনি জন্ম মৃত্যু ও পুনর্জন্মের কারণ, তিনি পাঞ্চভৌতিক দেহের অধিষ্ঠাতা জীব ও নির্বিশেষ পরব্রহ্ম স্বরূপ। যতিগণ সমাহিত হইয়া ধ্যান ও যোগবলে দর্পণতলগত প্রতিবিম্বের ন্যায় তাঁহাকে হৃদয়ে দর্শন করেন।

........যেমন দধির মধ্যে নবনীত, দ্বিপদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, বেদের মধ্যে আরণ্যক, ওষধির মধ্যে অমৃত, জলাশয়ের মধ্যে সমুদ্র, চতুষ্পদের মধ্যে ধেনু, সেইরূপ মহাভারত সমস্ত ইতিহাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ'।—আজ থেকে ১১৬ বছর আগে বিদ্যাসাগর মহাশয় যে মহাভারত অনুবাদ করেছিলেন তার কয়েকটি ছত্রের নমুনা এখানে উদ্ধার করা হয়েছে। ঐ সময়কালে মহাভারত প্রসঙ্গে বিতর্কের তেমন কোন সূত্রপাত ঘটেনি। এর ঠিক অব্যবহিত পর থেকে বিদেশী ভারততত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা ভারতের প্রাচীন সাহিত্য মূল্যায়ন প্রসঙ্গে নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চর্চিত হতে শুরু করলেন। এই বিশ্লেষণাত্মক ভঙ্গীকে ভারতীয় পণ্ডিতসমাজ যথাযোগ্য সমাদর ও স্বাগত জানালেন। মহাভারত প্রসঙ্গে বিতর্কের সূত্র হিসাবে একাধিককাল কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ামক কাজ করেছে। (১) মহাভারতের মূল কাহিনীগুলি কি বৈদিক যুগের? (২) ভারতকথার আনুষঙ্গিক উপাখ্যানের গুরুত্ব কি মূলের চাইতে বেশী? (৩) পাশ্চাত্যে এপিক বলতে যা বোঝায় মহাভারত কি ঠিক তাই? (৪) খিল হরিবংশ সমেত এই শতসাহস্রীর (লক্ষ শ্লোক) প্রধানতম লক্ষ্য কি শৈব, শাক্ত এবং বৈষ্ণবের সমন্বয় সাধন? (৫) উইন্টারনিজ অনুমিত অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতক থেকে খ্রীঃ চতুর্থ শতক পর্যন্ত এর রচনা ও সংকলনকাল কি যথাযথ অনুমান? (৬) প্রাচীন ভারতের সমাজজীবন ও মানুষের কীর্তির যথার্থ স্মারক কি এই গ্রন্থ? (৭) ভীষ্মপর্ব থেকে সৌপ্তিক পর্ব পর্যন্ত বর্ণিত কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধ কি অলীক কল্পনা? (৮) মৌষলপর্বে যদুবংশ ধ্বংসের ভিত্তিভূমি আছে কি?

প্রায় একশো বছর ধরে ভারতের ও বহির্ভারতের সারস্বতসমাজে এবম্বিধ প্রশ্নগুলি আলোচিত হয়ে আসছে। সম্প্রতি দিল্লীর আগম প্রকাশন ৪১ জন আধুনিক পণ্ডিতের মহাভারত সম্পর্কিত পরস্পর ভিন্ন মত একত্রিত করে আলোচ্য গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন। সম্পাদনায় আছেন এস পি গুপ্ত এবং কে এস রামচন্দ্রন। [illegible] পুরাচর্চার ক্ষেত্রে একটি প্রতিষ্ঠিত নাম হওয়া সত্ত্বেও

আক্ষেপের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, বর্তমান সম্পাদনায় তাঁর পূর্বখ্যাতি অক্ষুণ্ণ থাকেনি। এই ধরণের সংকলনগ্রন্থে সম্পাদকের দায়িত্ব যে বিস্তৃত পটভূমি জুড়ে থাকা উচিত তাতো নেই-ই, বরং দায়িত্ব সংকোচনের প্রবণতা নজরে পড়ে। অবশ্য অসংখ্য মুদ্রণপ্রমাদ প্রভৃতি বেদনাদায়ক ব্যাপারকে চাপা দিতে পেরেছে বহিরঙ্গ সাজসজ্জা। বিতর্কের সূত্রপাতে ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার সরাসরি বলেছেন, মহাভারতে ইতিহাস খোঁজা নেহাৎই পণ্ডশ্রম। এটি সাহিত্য এবং কল্পনার ফসল। কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ সত্যি হয়ে থাকলে পুরাতাত্ত্বিক খননে তার সুনিশ্চিত সমর্থন এতদিনে পাওয়া যেত। ডঃ সাঙ্কালিয়া প্রায় একই সুর শুনিয়েছেন। কিন্তু ডঃ বি এন পুরী সোচ্চার হয়েছেন, কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা। শুধু তাই নয়, এই যুদ্ধ সেই সময়কালের সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা এবং সর্বতোভাবে অতি উন্নতমানের যুদ্ধ বলে অনুমান করার ভিত্তিভূমি রয়েছে। গ্রন্থটির অন্যতম আকর্ষণ ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের সুস্পষ্ট এবং স্বচ্ছপাঠ্য ভূমিকা। কিন্তু কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধের প্রশ্নে তিনি তেমন স্বস্তি বোধ করেননি। গ্রন্থের সম্পাদকের ভূমিকা নিয়ে ডঃ রমীলা থাপার যেন বেশ খানিকটা বিব্রত বোধ করেছেন। বাছাবাছা শব্দ দিয়ে তিনি অতি সতর্ক পায়ে এগিয়েছেন এবং সকলের বক্তব্যের মূল সুর তুলে ধরার ব্যাপারে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম নিয়ে কথা বলেছেন। কিন্তু হঠাৎ সমাপ্তি পর্বে এসে এক হাস্যকর উক্তির কোন সারবস্তু খুঁজে পাওয়া গেল না। তিনি বললেন, এখন দেশশুদ্ধ লোকের উচিত এই মহাকাব্য সম্পর্কিত বিতর্কে যোগদান করা।

পঞ্চানন ভট্টাচার্য

Regd. No. W.B./C. C.-207 Phone : 23-5155 February '77 (0·50) R.N. 2602/57 SAMAKALIN

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

একবিংশ বর্ষ : বৈশাখ ১৩৮৪

পঁচিশ বর্ষ ১২শ সংখ্যা

বৈশাখ তেরশ' ছয়াশী

সমকালীন ঃ প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক ঃ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক সুবীন প্রিন্টার্স ২ ঈশ্বর মিল বাই লেন,
কলি-৬ হইতে মুদ্রিত ও ২০ চৌরঙ্গী রোড কলি-১৩ হইতে প্রকাশিত

যাঁরা চায়ের সমঝদার
তাঁদের চাই
তা পাচ্ছেন ।
কোন চায়ে নেই ।
LIPTON
GREEN
LABEL
TEA
লিপটন

বৈশাখ
তেরশ' ছিয়াত্তর

১ম সংখ্যা
[illegible] বর্ষ

পাতাল কোথায়?

অজিত দত্ত

পাতালের সংখ্যা শুনি, সাতটা। মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে যদি নেমে যেতে থাকি, পুরাণের মতে তাহলে পর পর দেখতে পাবো, অতল, বিতল, নিতল, গভস্তিমৎ, মহাতল, সুতল এবং সব শেষে পাতাল। এই সপ্ত পাতাল নাকি স্বর্গের চেয়েও সুখপ্রদ স্থান। সে সব স্থানে নাকি ময়দানব তৈরী করেছিলেন, 'নানাবিধ পুরী, মণিরত্ন সুশোভিত বিচিত্র প্রাসাদ'।

যাই হোক, সর্বনিম্ন স্তরটি পাতাল। ধরে নেবো কি সেইটেই পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল? আপনি বলবেন, 'তা কেমন করে হবে, বাড়িঘর শহর বাজার থাকবে কেমন করে? পৃথিবীর ভেতরটা তো গলা ধাতু দিয়ে ভরা?' কথাটা এই রকমই জানতুম বটে, কিন্তু জানেন তো বিজ্ঞানীদের কথার সব ঠিক থাকে না! আজ যা বলেন, কাল তাকে নাকচ করে বসে থাকেন! সম্প্রতি তাঁরা নতুন কথা শুনিয়েছেন, বলেছেন, পৃথিবীর কেন্দ্রটি তরল নয়, কঠিন। একথা বলেছেন যেদো-মেধো-রামা-শ্যামাদের কেউ নয়। লণ্ডনের স্বয়ং 'দি ইনস্টিটিউট অব জিওলজিক্যাল সায়েন্সেস' এ কথা জানিয়েছেন। আচ্ছা, কেন্দ্র যদি তরল না হয়ে কঠিন হয়, তাহলে তা ফাঁপাও তো হতে পারে! মানে, বলতে চাইছি, তরল জায়গায় যে গর্ত করা যায় না, কঠিন হলেই সেটা সম্ভব হতে পারবে!

কিছুদিন আগে পৃথিবীর দুটো ছবি দেখলুম। ছবি দুটো তুলেছিল মার্কিন কৃত্রিম উপগ্রহ এসা-৭ (ESSA-7), ১৯৬৮ সালের ২৩শে নভেম্বর। (আরো দুটো তুলেছিল এসা-৩। না, মোটে দুটো করে ওরা তোলেনি, তুলেছিল হাজার হাজার ছবি, আমরা দেখেছি মোটে দুটো।) সে ছবিতে দেখেছি, পৃথিবীর উত্তর আর দক্ষিণমেরুতে প্রকাণ্ড দুটো ফুটো, যাদের ব্যাস প্রায় দেড় হাজার মাইল! পৃথিবীটা যেন ফুটো করা একটা প্রকাণ্ড পুঁতি! এত বড় একটা গ্রহ, তাতে অমন

ফুটো? হয়তো সম্ভব! ধরাকৃতির (Geode) মধ্যিখানেও গর্ত থাকে। পৃথিবীটা তো ধরাকৃতিরই একটা বিরাট সংস্করণ। যে নিয়মে ধরাকৃতি ফাঁপা হয়েছে, সেই একই নিয়মে পৃথিবীও ফাঁপা হবে। তাছাড়া, প্রকৃতির ব্যাপারটাই বোধ হয় ওই রকম। মার্শাল বি. গার্ডনার বলেছেন, সব গ্রহই ফাঁপা পৃথিবীর ক্ষেত্রে তাহলে ব্যাতিক্রম কেন হবে? তাই, সেও ফাঁপা। তারপর উত্তর-দক্ষিণে একটা সুড়ঙ্গ কেটেও যাতায়াতের পথ করে নেওয়া যেতে পারে, আবার প্রকৃতির ইচ্ছাতেও অমন ফুটো হতে পারে। আর হাঁ, সেই মধ্যিখানে একটা 'সূর্যও' আছে! বলছিলুম, প্রকৃতির ব্যাপারটাই বোধহয় ওইরকম। নীহারিকাকে দেখুন, তারও কেন্দ্র এফোঁড়-ওফোঁড় ফুটো, ডোনাটির ধূমকেতুর ছবি তুলে দেখা গেছে, তারও মাঝখানে ফুটো। সবই ফাঁপা, গাছের কাণ্ড, জীবজন্তুর হাড়, তাও ফাঁপা।

পৃথিবীকে ঘিরে যে ভ্যান্ অ্যালেন বলয়ের তেজস্ক্রিয় বেড়া হয়েছে, তাও উত্তর-দক্ষিণে খোলা। ও বলয়জোড়া দেখলে মনে হবে যেন দুজোড়া চীনের পাঁচিল কেউ তৈরী করে রেখেছে বহিঃশত্রুর হাত থেকে বাঁচার জন্যে। সত্যিই কি তাই নাকি? মানুষের তৈরী? অবশ্য বিশ্বের তাবৎ গ্রহেরই যদি অমন তেজস্ক্রিয় বেষ্টনী থাকে, তাহলে আর তাকে মানুষের তৈরী বলা যাবে না। তবে একটা ব্যাপার সত্যি ভাববার মত, যে পৃথিবীরও যেমন উত্তর-দক্ষিণ খোলা, ভ্যান অ্যালেন বলয়ের তেমনি ঠিক উত্তর-দক্ষিণটাই খোলা। কেন? আরো আশ্চর্যের কথা, উত্তর-দক্ষিণের এই জায়গা দুটো এমনি চুম্বকিত যে ওখান দিয়ে কোন বিমান উড়ে যেতে পারে না!

গ্রহের অন্তরকার 'সূর্যটা'ও আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার। গার্ডনার বলেছেন, যাকে আমরা মেরুজ্যোতি বা মেরুপ্রভা বলি, সে ওই কেন্দ্রীয় সূর্যেরই আলোর প্রতিফলন। তিনি বলেছেন, মঙ্গল এবং শুক্রের মেরুপ্রভাও ওই একই ব্যাপার—কেন্দ্রীয় সূর্যের আলোর প্রতিফলন। শুধু বরফের আবরণে অমন ঔজ্জ্বল্য সম্ভব নয়।

উত্তর মেরু (বোধহয় দক্ষিণ মেরুও) বলে কোন একটি বিন্দুরও অস্তিত্ব নেই, তার জায়গায় আছে একটা প্রকাণ্ড উষ্ণ সাগর। কথাটা শুনতে অদ্ভুত লাগছে? ভাবছেন, যারা মেরু আবিষ্কারে গিয়েছিল, তারা কি সত্যিই আবিষ্কার করেনি, আমাদের ধাপ্পা দিয়েছিল?

একটা কথা মনে রাখতে হবে, মেরুবৃত্তে কম্পাসের কাঁটা সম্পূর্ণ বেএক্তার হয়ে পড়ে। ১৮৯৩ সালে ফ্রিতোফ নানসেন্ গিয়েছিলেন উত্তর মেরু আবিষ্কারে। সেখানে গিয়ে তিনি 'হারিয়ে গিয়েছিলেন' বলেছেন, কোথায় যে তিনি এতদিন ছিলেন, তা তিনি একেবারেই জানেন না।

১৮৯৫ সালের ফেব্রুয়ারীতে জাহাজ থেকে নেমে নানসেন জানলেন স্লেজ গাড়ি করে মেরু-বিন্দুতে পৌঁছবেন। তারপর সেখান থেকে চলে যাবেন স্পিৎসবের্গেন। কিন্তু পঁচানব্বইয়ের ২৩শে মার্চ থেকে ছিয়ানব্বইয়ের মে পর্যন্ত তিনি একদম বেপাত্তা। কী হল, কোথায় গেলেন, কোথায় থাকলেন, কেউ জানে না, নানসেন নিজেও জানেন না! তিনি বলেছেন, বরফের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একসময় মনে হল, আবহাওয়া গরম হয়ে উঠছে। যখনই দেখেছেন, উত্তরে হাওয়া বইছে, তখনই গরম বোধ করেছেন। এক সময় মনে হল সূর্যের উত্তাপ অসহ্য। মেরু প্রদেশে অসহ্য গরম, ব্যাপারটা বুঝুন!

ব্রতিমবিনি মাপতে গিয়ে দেখেছেন, মেরু সাগরকে যত কম গভীর বলে জানা ছিল, তত কম গভীর তো নয়ই, বরং তার চেয়ে অনেক বেশি। দেখেছেন, তলার দিকে জল বেশ গরম। সে জল যে কোথা থেকে আসছে, তা তিনি বুঝতে পারেন নি। তাছাড়া গরম দেশের জন্তু-জানোয়ারও দেখতে পেয়েছেন সেখানে।

পঁচানব্বই সালের ২৮শে এপ্রিল তিনি লিখেছেন, 'কাল সকালে বরফের ওপরে একটা জন্তুর পায়ের ছাপ দেখে চমকে গেছি। ছাপটা পশ্চিম ঘেঁষা নৈঋ৴ত থেকে পূবে চলে গেছে। পরিষ্কার দেখলুম, শেয়ালের পায়ের ছাপ আর তখনো বেশ তাজা সে ছাপ। শেয়াল এখানে কী করছে, এলোই বা কেমন করে? ছাপ দেখে মনে হল, না-খেতে-পাওয়ার মতন নয়। অর্থাৎ তার খাবারের কোন অভাব এখানে হচ্ছে না বলেই মনে হল। তাহলে কি কাছাকাছি মাটি আছে? চারদিক চেয়ে দেখলুম, কিন্তু সারাদিন ধরে এমন কুয়াশা যে কিছুই দেখা গেল না। সে যাই হোক এই ৮৫তম অক্ষবৃত্তে (85th parallal) উষ্ণ রক্তের প্রাণী যে রয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আবার কিছু দূরে দেখি ঠিক ওই রকমই আর একটা শেয়াল চলা পথ। আমরা সেইখানেই তাঁবু খাটালুম। শেয়ালগুলো যে বিপথে এসে পড়েছে, এমন কথা মনে করবার কোন কারণ নেই। ওরা এখানকারই বাসিন্দা।

২৩শে নভেম্বর লিখেছেন, 'যোহানসেন (নানসেনের সহকারী) খেতে এলো ছটা নাগাদ। দেখে মনে হল, সে যেমন ভীত, তেমনি উত্তেজিত। বললে 'একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখে অবাক লাগছে, কম্পাসের কাঁটা চল্লিশ ডিগ্রী হেলে রয়েছে তার ওপর আবার কাঁটার মুখটা রয়েছে পূবদিকে বেঁকে। এমন আজব কাণ্ড 'আমি কখনো শুনিনি।'

নানসেন যদি পৃথিবী পৃষ্ঠেই থাকতেন, তাহলে তাঁর কম্পাসের কাঁটা বোধহয় পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী কোণ করতো, বরং তার চেয়ে একটু বেশি তো কম নয়। যদি ধরে নিই যে মেরু প্রদেশের প্রবেশ পথ সেইখানে তাহলে পৃথিবীর ঠিক কানায় অর্থাৎ ভেতরে নাববার মুখে কম্পাসের কাঁটার একমুখ খাড়া নিচে নেবে যাবে, অর্থাৎ প্রায় লম্বাভাবে দাঁড়াবে। তারপর যখন ভেতরে নাবছেন, মানে সমতলে আর হাঁটছেন না, তখন কাঁটার মুখ উঠে যাবে ওপর পানে, উত্তর চৌম্বক-মেরুর দিকে (অর্থাৎ ঠিক উত্তরে নয়)। সমতলে যখন হেঁটেছেন, তখন কিন্তু কাঁটার মুখ উত্তর দিকেই হেলেছে। নানসেনের ক্ষেত্রে কাঁটার অমন ব্যবহার দেখে মনে হয়, নানসেন মেরুপথে পৃথিবীর ভেতর দিকেই ঢুকছিলেন।

ডাঃ অর্জ ডিটম্যানের একটা কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ডিটম্যান ছিলেন ওয়াশিংটনের উপকূল এবং ধরাকৃতি সংক্রান্ত সমীক্ষার প্রধান। তিনি বলেছিলেন, 'মেরুর আশপাশ সম্পর্কে সত্যিই কোন বৈজ্ঞানিক তথ্য নেই। কেউ বলেন ওখানে একটা সমুদ্র আছে, কেউ বা বলেন, একটা ঊষর দেশ আছে; তবে বৈজ্ঞানিকদের ধারণা মেরুর আশপাশের থেকে তার কিছু তফাতের অঞ্চলের কিছু একটা পার্থক্য আছেই'। এই সঙ্গে নানসেনের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। মনে হয় খোলা সমুদ্র ওখানে আছে। যাঁরাই মেরু অভিযানে গেছেন—নানসেন সমেত,—তাঁরাই দেখেছেন, উত্তর-দক্ষিণ দিগন্তরেখা ছোট হয়ে আসে, কিন্তু পূব-পশ্চিমে তা হয় না। এই থেকেই মনে হয়, ওই উন্মুক্ত উষ্ণ সাগর ধীরে ধীরে পৃথিবীর ভেতর পানে নেবে গেছে।

রুশীয়দেরও পুরোনো নথিতে দেখা যায়, মেরু কোন একটি বিশেষ বিন্দু নয়, সেটা একটা দেড় হাজার মাইল লম্বা রেখা। বোধহয় তাদের নিরীক্ষায় একটা ভুল আছে। আসলে সেটা রেখা না হয়ে বৃত্তই হবে। গোলকের ওপরে ওই বৃত্তকে ঠিক ভাবে স্থাপন করা যায় না বলেই তা দ্বিমাত্রিক রেখায় পরিণত হয়েছে। রুশীদের বক্তব্য, উচ্চতর অক্ষাংশে নাবিকেরা তাদের চৌম্বক কম্পাসের অদ্ভুত ব্যবহারে তারা সব সময়েই মুস্কিলে পড়েছে। পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের আপাত অপ্রতিসাম্য এবং তার অস্বাভাবিক ব্যবহার তাদের বিচলিত করেছে। আগের দিনের চৌম্বক মানচিত্র অনুমাননির্ভর। সেখানে ধরে নেওয়া হয়েছে, উত্তর চৌম্বকমেরু একটি বিন্দু। তাই মেরু অভিযাত্রীরা আশা করতেন, মেরু-বিন্দুর যত কাছে যাবেন, কম্পাসের কাঁটার মুখ তত নিচু হবে এবং ঠিক বিন্দুটিতে পৌঁছলে সে কাঁটা সোজা নেমে যাবে নিচে বিন্দুর ওপর। কিন্তু দেখা গেছে কাঁটা নিম্নমুখ হয় মেরুসাগরের অনেক দূর পর্যন্ত, প্রায় তাইমির উপদ্বীপের উত্তর-পশ্চিমের একটি বিন্দু থেকে মেরু-দ্বীপপুঞ্জের আর একটি বিন্দু পর্যন্ত। তাছাড়া, আরো অনেক অজানা জায়গা আছে, বুদ্ধির অগম্যও কিছু আছে ওদিকে, যাদের হদিস হয়তো পাওয়া যাবে গবেষণার পথে, কিছুকাল পরে। পৃথিবীর দুটি মেরুতেই অবস্থা একরকম।

একটা বিমান সংস্থা বলে, তারা নাকি উত্তরমেরুর ওপর দিয়ে যাতায়াত করে। বাজে কথা। ভৌগোলিক মেরুর দেড় হাজার মাইলের ভেতরে তারা ঢোকে না। চৌম্বক-মেরুর আড়াইশো মাইলের ভেতরেও নাক ঢোকায় না। আসলে সে এলাকায় তাদের কম্পাস কাজ করে না, তাই তার ধারে-কাছে তারা ঘেঁষতে সাহস পায় না। এতৎসত্ত্বেও মনে হয় নানসেন এবং আরো কেউ কেউ পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগে কিছুদূর গিয়েছিলেন। সে অভিযাত্রীদের একজন বোধহয় অ্যাডমিরাল রিচার্ড.ই.বার্ড।

মেরু প্রদেশের আর একটা বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, সেখানকার ধুলো। অত ধুলো কেন ওখানে? কোথা থেকে আসে অত ধুলো? নানসেন বলেছেন, চল ফিরে যাই। কী জন্যে থাকবো এখানে? ধুলো ছাড়া তো দেখছি আর কিছু নেই এখানে। মেরুর আকাশের ধুলোর মেঘ জাহাজের ওপরে ধুলো বর্ষায়। বরফের ওপরে পড়ে সাদা বরফকে কালো করে দেয়। কোথায় অত ধুলোর উৎস? কোন 'অ্যাক্টিভ' আগ্নেয়গিরি নেই তো ওখানে। সে ধুলোকে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে, দেখা গেছে তাতে আছে লোহা আর কার্বন। আরো মজা, ওখানকার ধুলো বরফে শুধু কালির পোঁচই দেয় না, রঙে রঙে রাঙিয়েও দেয়।—লাল, গোলাপী, সবুজ, নীল, হলুদ রঙে রাঙা হয়ে উঠে ওখানকার তুষার ক্ষেত্র বিভিন্ন ঋতুতে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, তাতে রয়েছে উদ্ভিদ রঙ। ফুলের রেণু পড়েই অমন রঙীন হয়ে ওঠে ওখানকার তুষার। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে রঙও বদলায়। উইলিয়াম রীড্ বলেছেন, 'এ রহস্যের সমাধান মিলতে পারে একমাত্র "পাতাল" থেকে। ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন রঙের অমন বর্ষণ দেখে মনে হয় বিভিন্ন সময়ে ওইরকম নানা রঙের ফুল ফোটে সেখানে।...' কিন্তু অত রেণু? তার জন্যে যে বহু হাজার বিঘের ফুলের চাষ দরকার! পৃথিবীর ওপরে তো অমন চাষ কোথাও হয় না। তাহলে ধরে নিতেই হয়, পাতালের ওই প্রবেশ পথ বেয়েই আসে ওই রেণুর মেঘ!

আরো একটা প্রশ্ন। দূরতম উত্তরে অত গরম কেন? অমনটা হওয়া সম্ভব, যদি পৃথিবীর

ভেতর থেকে, তথা পাতাল থেকে উত্তুরে বাতাস বয়। ক্যাপ্টেন পি এফ হলের কথা উদ্ধৃত করেছেন উইলিয়ম রীড। ক্যাপটেন্ হল বলেছেন, 'যা ভেবেছিলাম, তা নয়, এ দেশটা বেশ গরম। জায়গাটা প্রচুর প্রাণময়ও বটে, কত যে প্রাণীর বাস এখানে তার আর গোণাগুণতি নেই—কত রকমের যে পশু-পক্ষী আছে, তা বলে শেষ করা যায় না………' যে পাতালে এত ফুল, এত পশু-পক্ষী, এত মিঠি আবহাওয়া সে তো স্বর্গ। কারা বাস করে সেথা? দানিকেনের দেবতারা, সেই যারা যুদ্ধে হেরে গিয়ে পালিয়ে এসেছিল?

এ নিবন্ধের গোড়ায় পৃথিবীর দুটো ছবির কথা বলেছিলুম। বলেছিলুম, ছবির উত্তরে আর দক্ষিণে দুটো প্রকাণ্ড গর্ত আছে। ওই গর্তই আসলে পাতালের প্রবেশ পথ। সম্ভবতঃ ১৯৪৭ সালে অ্যাডমিরাল বার্ড উত্তর মেরুর প্রবেশ পথ ধরে কিছু দূর গিয়েছিলেন পাতালের ভেতরে। তাঁর সব কথা মার্কিন সরকার প্রকাশ করেননি। মৃত্যুর পূর্বে তিনি বলেছিলেন, 'সে দেশ আছে মেরুর ওপারে।—অপূর্ব সুন্দর, চিররহস্যময় মহাদেশ'।

মার্কিন সরকার অনেক কথাই চেপে রেখেছেন। সে সব কথা চেপে রাখার আর একটি কারণ, অউব (U. F. O. = অজানা উড্ডীন বস্তু)। যত অউবের আনাগোনা দেখা যায়, উত্তর আর দক্ষিণ মেরুতেই। হয়তো পাতাল থেকেই তাদের আসা যাওয়া ওই পথে। না হলে, রুশী-মার্কিন, দুটো সরকারেরই বা এত গোপনতার কারণ কী?

মেরু অভিযাত্রীদের প্রতিবেদনের ছিটকে আসা ছিটেফোঁটা থেকে বুঝতে পারি, পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে দেশ আছে, সে দেশ অসহ্য গরমও নয়, প্রচণ্ড ঠাণ্ডাও নয় আর অপূর্ব সুন্দর দেশ। প্রাণেরও কমতি নেই সেখানে। শীল, মরাল থেকে হাতি (ম্যামথ) পর্যন্ত দেখা গেছে সেদেশে। বাড়ি-ঘর-প্রাসাদ-মন্দির দেখা গেছে কিনা, জানি না। তবে 'সূর্য' যে সেখানে একটা আছে, তাতে সন্দেহ নেই। আমাদের পৌরাণিক অভিধানেও তো দেখি, একটা পাতালের নাম 'গভস্তিমৎ'। 'গভস্তি' কথাটার মানে জ্ঞানেন্দ্রমোহনের অভিধানে দেখলুম, 'সূর্য-চন্দ্রের তেজ'। তাহলে, পাতালের মাঝটা অর্থাৎ ঠিক মধ্যখানের তলটিতে 'সূর্য-চন্দ্রের তেজের' মতন কিছু একটা আছে ধরে নিতে হয়। রহস্যময় সে মহাদেশের আলোক এবং উত্তাপের উৎস হয়তো ওইখানেই। (এ বিষয়ে বিশদ জানাতে পারেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর মহাশয়।)

যদি ধরে নিই, সে পাতাল জনহীন নয়, কেউ না কেউ থাকে সেখানে, তাহলে যারা থাকে তারাই অউবের মত উচ্চ পর্যায়ের বিমানে চেপে হাওয়া খায়, ভ্যান্ আলেন তেজস্ক্রিয় প্রাচীর গড়ে পৃথিবীকে সুরক্ষিত করেছে তারাই। তারা যে আমাদের চেয়ে অনেক উচ্চ পর্যায়ের জীব, তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

পাতাল দেশটাও বোধহয় আমাদের বাসোপযোগী পৃথিবীর চেয়ে অনেক অনেক বড়। 'আমাদের' পৃথিবীর তিন ভাগই তো জলে ভরা। এ গোলকের অভ্যন্তর ভাগে জল-স্থলের অনুপাত ঠিক উল্টো না হলেও, প্রায় উল্টো দিকেই যাবে। আর সেখানে যদি মহামানবের বংশধরেরাই বাস হয়, কিংবা দানিকেনের (বীজ ও মহাবিশ্ব) সেই পালিয়ে আসা দেবতারাই সেখানে অত্যুন্নত প্রাযুক্তিক সভ্যতার জাল বিছিয়ে থাকে, তাহলে সে যে কত বড়, কতখানি উন্নত সভ্যতা, তাকে ঠাওরাতে

আমাদের কল্পনা থৈ পাবে না। ভেবে দেখুন না, যারা ভ্যান্ অ্যালেন্ বলয়ের মত ভীষণ তেজস্ক্রিয় বেড়া দিয়ে পৃথিবীকে ঘিরতে পারে, দুটোমাত্র পথ খোলা রেখে, তারা কেমন ধরণের বৈজ্ঞানিক। তাদের সমকক্ষ কোথায় ?

আমাদের এই বিংশ শতাব্দী সম্পর্কে যত ভবিষ্যবাণী আছে, তার প্রায় সব কটাতেই বলে, ১৯৮০--১৯৮৫ সাল থেকে নাকি নানা দুর্ঘটনা ঘটবে আমাদের পৃথিবীতে যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে শুরু করে ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক বিপর্যয় পর্যন্ত। পারমাণবিক অস্ত্রের বহুল ব্যবহার এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ (সেই সঙ্গে হ্যালির ধূমকেতু) অর্ধেক পৃথিবী ধ্বংস করে ফেলবে। হয়তো তখনি আমাদের দুর্ভাগ্যের রাজনীতিকদের গলা টিপে ধরতে উঠে আসবে পাতালের সেই দুর্জ্ঞেয় দেবতারা, তারপর কায়েম করবে সত্যযুগ। ভবিষ্যৎবক্তাদের মতে ১৯৯৯ সালে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে সত্যযুগ, যেদিন মানুষে মানুষে ভেদ থাকবে না, থাকবে না জাতি ভেদ, শ্রেণীভেদ। থাকবে শুধু একটি মাত্র শ্রেণী, একটি মাত্র জাত, সে সবার উপরে সত্য মানুষ জাত। এত ধর্মও সেদিন থাকবে না। একটি মাত্র পরম ধর্ম সমস্ত মানুষকে ধরে থাকবে শান্তির নিবিড়তম বন্ধনে। ক্ষুদ্র মানব-স্বার্থ ভুলে মানুষ সেদিন গ্রহে-গ্রহান্তরে পাড়ি জমাবে বন্ধুত্বের, ভ্রাতৃত্বের বাণী বহন করে।

উল্লেখপঞ্জী—

বীজ ও মহাবিশ্ব—Dr. Erich Von Daniken.

A Journey to the Earth's Interior—Marchall B. Gardner.

Worlds Beyond the Poles—F. A, Giannini.

Farthest North, এবং In NorthernMist—Dr Fridjot Nansen.

The Secret of the Ages—B. L. P. Trench.

The Phantom of the Poles—W. Reed

শ্রী ও লক্ষ্মী

দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী

বৈদিক দেব-দেবীর নাম-তালিকায় শ্রী এবং লক্ষ্মীদেবীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় পৃথক পৃথক ভাবে। উভয় দেবীর কোনটিই তখনও মূর্তিমতী নহে, বরং নিরাকারা।

ঋগ্বেদে 'শ্রী' শব্দটির প্রয়োগ সর্বসাকুল্যে ৮১ বার। ইহা কখনও বিশেষ্য, কখনও বা বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত। ক্রিয়ারূপেও অন্ততঃ ২১ বার ইহার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। সর্বত্রই ইহার অর্থ 'শোভা' বা 'শোভাময়'—সৌভাগ্যের সহিত ইহার কখনও কোন সম্পর্ক নাই।

ক্রিয়ারূপে 'শ্রীণন্তি' 'শ্রীণীহি' প্রভৃতি প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়, শ্রী-ধাতুজ 'শ্রীতঃ' 'শ্রীতাঃ' ইত্যাদিরও উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই সকল স্থানে শ্রী-ধাতুর অর্থ সোমের সহিত দুগ্ধের সংমিশ্রণ।

ঋগ্বেদে 'লক্ষ্মী' শব্দটির প্রয়োগ একবার মাত্র (ভদ্রৈষাং লক্ষ্মীর্নিহিতাধি বাচি—তাহাদের বাক্য রচনায় অতি চমৎকার লক্ষ্মী নিহিত আছে) এবং সেখানেও লক্ষ্মী সৌভাগ্য দেবী নহে।

শুক্লযজুর্বেদের কাল-অবধি শ্রী ও লক্ষ্মী পৃথক দেবী ছিল। তৈত্তিরীয় সংহিতায় শ্রী ও লক্ষ্মী হইল আদিত্যের দুই ভার্যা। শতপথ ব্রাহ্মণে দেখা যায় শ্রী র উৎপত্তি প্রজাপতি হইতে। মহাভারতে শ্রী হইল ধর্মের স্ত্রী। [illegible]। শুক্ল পক্ষের পঞ্চমী তিথিতে উভয়ের বিবাহ হয় এবং সেই কারণে ঐদিনেই শ্রীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রী র নামানুসারে ঐ তিথির নামকরণ হয় শ্রীপঞ্চমী। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় যে এখন ঐ তিথিতে আমরা যাহার পূজা করি সে লক্ষ্মী নয়—সরস্বতী।

মনু সংহিতার নির্দেশ অনুযায়ী শ্রীপূজার পদ্ধতি নির্দিষ্ট ছিল (উচ্ছীর্ষকে শ্রিয়ৈ কুর্যাদ্ভদ্রকাল্যৈ চ পাদতঃ। ব্রহ্মবাস্তোষ্পতিভ্যাং তু বাস্তুমধ্যে বলিং হরেৎ ॥) কিন্তু এখন সেই বিধান ও প্রতিপালিত হয় না।

বস্তুতঃ মনুর সময় পর্যন্ত শ্রীদেবী ছিল নিরাকারা—যাহাতে তাহার কোনও মূর্তিচিন্তা করা হইত না, সুতরাং মূর্তি-নির্মাণের ও কোনও প্রশ্ন উঠিত না।

পৌরাণিক যুগের প্রথম পর্বেও শ্রী ছিল নিরাকারা—সৌন্দর্য ও ভাগ্যের বিমূর্ত দেবী। কেবল একস্থলে দেখা যায় (বিষ্ণু পুরাণ ১।৯) ইন্দ্র ত্রিলোকের ভাগ্যদেবীকে সম্ভোগ করিয়াছে (দুর্বাসার অভিশাপে ইহা হইতেও তাহাকে বঞ্চিত হইতে হইয়াছিল)। সেই প্রথম ভাগ্যদেবী তথা শ্রীদেবী নারীমূর্তি পরিগ্রহ করিল।

ক্রমে, উপরি-উল্লিখিত কাহিনীর প্রভাবেই সম্ভবতঃ শ্রী সাকারা হইয়া উঠিল। ঐ ভাগ্যদেবীর (শ্রী) পুনর্লাভের প্রচেষ্টায় সুরাসুরের সমুদ্র মন্থনে উত্থিত হইল লক্ষ্মী (রামায়ণে দেখা যায় সমুদ্র মন্থন জনিত ফেনপুঞ্জের মধ্য লক্ষ্মীর আবির্ভাব)। সে লক্ষ্মী দেখিতে কেমন? জ্যোতির্ময়ী পদ্মাসীনা, পদ্ম-হস্তা। গলে সদ্যঃ বিকশিত পদ্মমালা। সে কোথাও হরিবক্ষলগ্না—হরিপ্রিয়া। অতএব হরির সকল অবতার-মূর্তিতেই তাহাকে পত্নীরূপে দেখিতে পাওয়া যায়।

অন্যত্র দেখা যায় লক্ষ্মীর জন্ম ভৃগু-পত্নী খ্যাতির গর্ভে। নারদীয় পুরাণ, ধর্মপুরাণে এবং

কূর্মপুরাণে লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে হর-পার্বতীর দুই কন্যারূপে চিহ্নিত করা হইয়াছে।

ব্রহ্ম বৈবর্তপুরাণের মতে প্রকৃতির পাঁচটি রূপের মধ্যে একটি হইল লক্ষ্মীরূপ। লক্ষ্মী শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাকন্যা এবং বিষ্ণুর পত্নী। অন্য একটি পুরাণের মতে লক্ষ্মী পার্বতীরই অংশমাত্র।

গরুড় পুরাণ, স্কন্দ পুরাণ এবং আরও কয়েকটি পুরাণে লক্ষ্মীর প্রিয় এবং অপ্রিয় কর্মের তালিকা লক্ষ্য করা যায়।

মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে মহালক্ষ্মীকে মূলে রাখিয়া একটি দেব-দেবীর তালিকা দেওয়া আছে তাহাতে দেখা যায় মহালক্ষ্মীর তিন অংশ—সত্ত্বগুণাত্মিকা সরস্বতী, রজগুণাত্মিকা লক্ষ্মী এবং তমগুণাত্মিকা মহাকালী। সত্ত্বগুণাত্মিকা সরস্বতীর দুইভাগ—গৌরী এবং বিষ্ণু। রজগুণাত্মিকা লক্ষ্মীর দুইভাগ—লক্ষ্মী এবং হয়গ্রীবা। তমগুণাত্মিকা মহাকালীর দুইভাগ—সরস্বতী এবং রুদ্র।

গৃহই লক্ষ্মীর মন্দির—লক্ষ্মীর পৃথক মন্দির দৃষ্ট হয় না। অবশ্য অন্য দেবতার সহিত তাহার সহাবস্থানে কোনও বাধা নাই। এইভাবে দুর্গা-দুহিতারূপে বা বিষ্ণুজায়া রূপে বহু মন্দিরেই লক্ষ্মীমূর্তি দেখা যায়। এলোরার কৈলাশ মন্দিরে অনন্ত শয্যাসীনা লক্ষ্মীর একটি মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ফার্গুসান এবং বার্জেসের মতে এই মন্দিরটির নির্মাণকাল খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষার্ধে।

গুপ্তযুগের অনেক মুদ্রায় কমলা (লক্ষ্মী) মূর্তি খোদিত দেখা যায়। সাঁচীর স্থাপত্য নিদর্শনের মধ্যে এ কমলা মূর্তি দেখা যায়। ইহাকে গজলক্ষ্মীও বলা হয়। ইনি পদ্মপীঠাসনে পদ্মনালের উপর সংস্থিতা। ইহার মস্তকে শুঁড় দিয়া জল ঢালিতেছে দুইটি হাতি। প্রত্যেক হাতির চারটি পদ পদ্মের উপর স্থাপিত। সাঁচীস্তূপের মূর্তিটি এলোরার গজলক্ষ্মী অপেক্ষাও প্রাচীন। গৃহলক্ষ্মীর পূজা হিন্দুরমণীর অবশ্য কর্তব্য। সম্পদ, ঐশ্বর্য ও সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইল লক্ষ্মী—গৃহস্থের পক্ষে এসকলই অত্যাবশ্যক।

বৈষ্ণবেরা লক্ষ্মীকে জগন্মাতারূপে পূজা করে। জৈনেরা শ্রী এবং লক্ষ্মীকে জগন্মাতারূপে পূজা করে। তাহাদের মতে জীবজগতের দক্ষিণাংশের দেবী, শ্রী ও ধৃতি। উত্তরাংশের দেবী হইল কীর্তি, বুদ্ধি ও লক্ষ্মী। দীপালির দিন জৈনগণ লক্ষ্মী পূজা করে।

ভিলগণের আদিদেবতা হইল লক্ষ্মী। বিপদে-আপদে ভিলরমণীগণ লক্ষ্মীর পূজা করিয়া থাকে।

গুজরাটের লক্ষ্মী বীণাপাণি। 'শুক্রনীতিসার' গ্রন্থে বীণাপাণি লক্ষ্মীর একটি ধ্যান আছে।

রোমানদের নিকট সিরিস যেমন শস্যোৎপাদনের দেবী লক্ষ্মীও তেমনি মহারাষ্ট্রে কৃষিদেবী বলিয়া পূজিতা। কৃষিকর্মের সহায়ক হইল লাঙল বা সীতা—লক্ষ্মীর অপর নাম 'সীতা' প্রসঙ্গত তাই তাৎপর্য পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। কৃষিকার্যে কর্ষণের জন্য যেমন লাঙল চাই তদ্রূপ বর্ষণ ও প্রয়োজনীয়। বর্ষণ-দেবতা ইন্দ্রের অঙ্কুশ দেখা যায় লক্ষ্মীর হস্তে। ইহা ও লক্ষ্য করিবার বিষয়। লক্ষ্মীপূজার সময়টিও শরৎকাল—ধানোৎপাদনের প্রধানকাল। এইসব দেখিয়া কৃষির সহিত লক্ষ্মীর নিবিড় সংযোগ সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

মাধ্যমিক অনির্বচনীয়বাদ ও নাগার্জুন

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর

সম্রাট অশোকের মৃত্যুর পর কিছুদিনের মধ্যেই চতুরার্য সত্যতার মাধ্যমে যে মৈত্রী ও করুণার বাণী প্রচারিত হয়েছিল, সেই বৌদ্ধ ধর্মে নেমে এসেছিল ঘোর দুর্দিন। আজ আমরা কল্পনাও করতে পারি না, দেশে কি দুর্দিন এসেছিল। রাষ্ট্রবিপ্লবের যতগুলি কারণ থাকতে পারে, সবার উপরে থাকে রাষ্ট্রের জনসাধারণের চিন্তায় বিপ্লব, যার পরিণামে আসে বিদ্রোহ এবং গৃহযুদ্ধ। তেমন দুর্দিন আরও ভীষণ হয় যদি রাষ্ট্রশক্তিতে কোনও শক্তহাতের আশ্রয় না থাকেন, তাই দেখতে পাই তেমনি দুর্দিনে ভারতের এক মহান-পুরুষ শক্তহাতে ধর্মবিপ্লবকে সংযত করেছিলেন যাঁর নাম নাগার্জুন। ইনি একাধারে ধার্মিক, রাষ্ট্রচিন্তক, বৈজ্ঞানিক, রাসায়নিক, চিকিৎসক, এবং দার্শনিক ও গ্রন্থকার বলেই প্রচার।

কিন্তু বিস্ময় জাগে, এমন এক মহান্ ভারতীয় পুরুষের জীবন আখ্যান জানতে বিংশ শতকের জাগ্রত ভারতের ইতিহাসের পৃষ্ঠাতেও তাঁকে সুচারুরূপে চিহ্নিত করে তেমন কিছু আলোচনা করার সুযোগ দিতে পারছেন না, কারণ অতীত ভারতের কোন মহান ব্যক্তিকে জানাবার আগ্রহ করেছেন তেমন নমুনা পাই না। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, প্রফুল্লচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র, মেঘনাদ, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্রের মত পুরুষও যদি সেকালে জন্ম নিতেন তাঁদেরও এই দশা হত। বিশ্বকল্যাণে সকল হিতৈষী এবং দেশসমর্পিত জীবন এই সব পুরুষ কিন্তু কোনকালেই অবতার, ভগবান, পরমহংস বলে ঘোষিত হবেন না, কারণ এঁরা কেউ মিষ্টি কথার সন্ত, আর অতীন্দ্রিয়বাদের মুখরোচক-প্যাথ চিকিৎসার কথা বলেন নাই।

তবুও সে ভারতে নাগার্জুনের মত পুরুষ প্রবরের জীবন-কাহিনী না লিখলেও শুধু নামটুকুর উল্লেখ করে গিয়েছেন, 'সংস্কৃত ভাষায় লেখা ইতিহাস গ্রন্থ রাজতরঙ্গিণীতেও, আর বাণভট্ট তাঁর হর্ষচরিতে'। রাজতরঙ্গিণীতে কহলন লিখেছেন 'কণিষ্কের পরবর্তী পুরুষ এবং কাশ্মীরে পূজিত হতেন নাগার্জুন ঈশ্বর ও বোধিসত্ত্বরূপে'।

আর বাণভট্ট লিখেছেন, 'নাগার্জুন কোন এক নাগরাজের নিকট একটি বহুমূল্য মুক্তা-হার লাভ করেছিলেন, সেই হারের প্রভাবে নাগার্জুন কণিষ্কের মধ্যে সর্পবিষ দূর করতে পারতেন'।

তৃতীয়তঃ, আর একটু ক্ষীণ রেখাপাত করে গিয়েছেন বাংলার মহামতি চিকিৎসক চক্রপাণি দত্ত মহাশয়। ইনি ছিলেন একাদশ শতাব্দীর বৈদ্যগুরু, তাঁর প্রখ্যাত চিকিৎসা গ্রন্থ 'চক্রদত্তে' লিখেছেন, 'পাটলীপুত্রের স্তম্ভগাত্রে নাগার্জুন প্রবর্তিত রসচিকিৎসার কয়েকটি ঔষধ আমার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করলাম'।

বাস্ এই পর্যন্ত ভারতের মাননীয় বৃদ্ধের ইতিহাস ইঙ্গিত।

তারপর, যাঁরা বহির্ভারতের বিশ্বইতিহাস জানার একান্ত সহায়ক, তাঁদের মধ্যে (১) ৭ম শতাব্দীর হিউয়েন সাঙ, তিনি বলেছেন, নাগার্জুন ছিলেন পৃথিবীর চতুষ্প্রদীপের অন্যতম প্রদীপ। ১ম অশ্বঘোষ,

(২) নাগার্জুন, (৩) কার্ণদেব আর (৪) কুমারলব্ধ বা কুমারলাভ। এ ইতিহাসটুকুও আমরা সোজাসুজি পাইনি, পেয়েছি এস. বেলীর বুদ্ধিষ্ট রেকর্ড অফ্ ওয়েষ্টার্ন ওয়ার্ল্ড (১১২ পৃঃ) তারপরে জানা যায় কেথ-এর বুদ্ধিষ্ট ফিলজফির ২২৯ পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন নাগার্জুনের আবির্ভাব ২য় শতাব্দীর পর।

এরপর এলিয়ট বলেছেন, তাঁর 'হিন্দুয়িজম্ এ্যাণ্ড বুদ্ধিইজম পুস্তকের (১ম খণ্ড ৩২ পৃষ্ঠায়) নাগার্জুনের আবির্ভাব অশ্বঘোষের পর, অর্থাৎ ১২৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ২০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। এঁর এই অভিমত উইন্টারনিজ এবং ধ্যাস; এস বেলী ও সুজাকি প্রায় তুল্য ভাবেই গ্রহণ করেছেন, কেবল সুজাকি একটু বিশেষ কথা বলেছেন যে নাগার্জুন ছিলেন অশ্বঘোষের শিষ্য এবং তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'অষ্টোপাদশায়ন'র টীকাকার।

এই সব বিভিন্ন অভিমত পেয়ে ভারতীয় ঐতিহাসিকদের অনেকেই অনুমান করেছেন নাগার্জুন খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করে দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং তাঁর 'বৌদ্ধ মাধ্যমিক' মতবাদ প্রচার করেছিলেন।

এরপর উনবিংশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীর বাঙালী মনীষীবৃন্দের ইতিহাস গবেষণায় দেখা যায়—

(১) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ১৩২৩ সালের সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় ২য় সংখ্যায় লিখেছেন, 'নাগার্জুন দ্বিতীয় শতাব্দীর পুরুষ। তাঁর দার্শনিক অভিমত শূন্যবাদ। নাগার্জুন বলেছেন, ভাব ও অভাব যেমন শূন্য, নির্বাণও তেমনি শূন্য। এর জন্য যুক্তি দিয়েছেন যে কোন বস্তু অথবা যে কোন ভাব বিনা কারণে উৎপন্ন হয় না, এবং যাকে আকস্মিক বা দৈব বলা হয় অথবা অভাবিত ঘটনার সমাগম বলা হয়, তাও বিনা কারণে হয় না, প্রতিটি-কারণও অপর একটি কারণের দ্বারা জন্ম নেয়। সবই অনিত্য।'

তাছাড়া শাস্ত্রী মহাশয় আরও বলেছেন, নাগার্জুনই বৌদ্ধ মহাযান সম্প্রদায়ের প্রবর্তক, এবং শূন্যবাদের প্রধান আচার্য। এই নাগার্জুন খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের আদিতেও বর্তমান ছিলেন। অপর একজন পদকর্তাও নাগার্জুন নামে খ্যাত ছিলেন, তাঁর রচিত 'নাগার্জুন গীতিকা' গ্রন্থটির প্রায় সব পদ তাঁরই রচিত। নেপালে চন্দ্রগড়ি পাহাড়ের দুর্গম অংশের একটি গুহার নাম যে নাগার্জুন গুহা, সেটি পদকর্তা নাগার্জুনের নামেই চিহ্নিত করা উচিত।

শাস্ত্রী মহাশয় আরও বলেছেন যে, একাদশ শতকের আলবেরুণী-কথিত নাগার্জুন নামের ব্যক্তিটি পদকর্তা নাগার্জুনেরই নাম, মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের প্রথম আচার্য নন। প্রথম নাগার্জুন দ্বিতীয় শতকের এবং তাঁরই রচিত প্রখ্যাত গ্রন্থ 'প্রজ্ঞাপারমিতা'। এ গ্রন্থে এককালে দশহাজার শ্লোক ছিল, এবং যার জন্য তখন এর নাম ছিল 'দশ সাহস্রিকা প্রজ্ঞা পারমিতা'। এর রচনা পটুতা এমন যে, যেন বুদ্ধদেবই তাঁর শিষ্যদের কাছে নাগার্জুনেরই সিদ্ধান্তগুলি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। এই জন্য বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে ঐ গ্রন্থটির রচনাবলিকে 'বুদ্ধ' বচন' বলে চালাতে গিয়ে এমন একটি উপাখ্যানের সৃষ্টি করা আছে যে, ঐ গ্রন্থ তিনি (নাগার্জুন) নাগলোক থেকে উদ্ধার করে এনেছেন। পরবর্তীকালে ঐ দশসহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থটি 'অষ্টসাহস্রিকায়' পরিণত হয়েছে।

এর পর আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁর হিষ্ট্রী অফ্ হিন্দু কেমিষ্ট্রি গ্রন্থের ১১৮ পৃষ্ঠায়

লিখেছেন; 'নাগার্জুন নামটি অনেকগুলি গ্রন্থের নামের রচয়িতাদের নামের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে, প্রকৃতপক্ষে দার্শনিক, রাসায়নিক ও তান্ত্রিক হিসাবে একই ব্যক্তি নন। হয়তো তান্ত্রিক নাগার্জুন এবং রাসায়নিক নাগার্জুন একই ব্যক্তি, কিন্তু তিনি ছিলেন ৭ম থেকে ৮ম শতাব্দীর ব্যক্তি। যিনি আয়ুর্বেদের চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে তান্ত্রিক পদ্ধতির সংযোজন ঘটিয়েছেন তাঁর রচিত গ্রন্থ 'রস রত্নাকর'। এ গ্রন্থের রচয়িতা নাগার্জুনের অস্তিত্ব শালিবাহন রাজার সময়ে। ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ বলেন প্রকৃতপক্ষে শালিবাহন নামে কোন রাজাই ছিলেন না। 'সাতবাহন' শব্দের বিবর্তনেই শালিবাহন নামের জন্ম।

কারণ, দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্রদেশে খুব প্রাচীনকাল থেকেই সাতবাহন বংশের অস্তিত্ব ছিল। তবে সে বংশটির অভ্যুদয় ঘটে মৌর্য বংশের পতনের পর থেকেই। এবং এই বংশের রাজাদের মধ্যে অন্ততঃ ৩০ জন রাজা হন। প্রায় ৪৫৬ বৎসর পর্যন্ত এই বংশের রাজাদের সাতবাহন এবং বিকল্পে শালিবাহন বলা হয়। এই বংশের এমনি প্রকৃতি ছিল যে জাতিগত চরিত্রে ব্রাহ্মণ্য আচারই সর্বাধিক আদরণীয় ছিল কিন্তু বৌদ্ধধর্মেও তাঁদের শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল। হয়তো এমনি এক সাতবাহন বা শালিবাহন রাজার সঙ্গে কথোপকথনের নজির তুলে বলা হয় নাগার্জুনের রসতান্ত্রিক চিকিৎসা-বিদ্যার প্রচারণাটি সর্বপ্রথম আবির্ভূত নাগার্জুনের সঙ্গে অভিন্ন। ঐ রস রত্নাকর গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে 'স্বপ্নে দেখা দেন দেবী 'প্রজ্ঞা পারমিতা' এবং তিনিই নাগার্জুনকে বিভিন্ন রোগের ঔষধ ও চিকিৎসা বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যান।

আচার্য রায় ভারতীয় রসশাস্ত্রের ঔষধ ও চিকিৎসা সম্পর্কে প্রচুর অনুসন্ধান ও গবেষণা করে নিঃসন্দিগ্ধ হয়েছিলেন যে 'রসরত্নাকর' গ্রন্থটি যে নাগার্জুন রচিত এবং তিনি যে ৭ম ৮ম শতাব্দীর ব্যক্তি তাই ঠিক।

তৃতীয় অভিমত প্রকাশ করেছেন ডঃ সুকুমার দত্ত মহাশয়। তাঁর বিখ্যাত Buddhist monks and monasteries of India ২৬৭ পৃষ্ঠা থেকে শুরু করে ২৮০ পর্যন্ত যে সব তথ্য দিয়েছেন তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য হল 'নাগার্জুন সম্বন্ধে বহু অনুসন্ধান করে একটি তিব্বতীয় কাহিনীকে অবলম্বন করেই অগ্রসর হওয়া যায়, কাহিনীটি এই তিব্বতীয় গ্রন্থমালায় লিপিবদ্ধ করা আছে।

নাগার্জুনের বাল্যনাম ছিল শ্রীমান্। (তিব্বতীয় ভাষায় পলদেন্) তাঁর জন্মের পরে জ্যোতিষী তাঁর কোষ্ঠী গণনা করে বলেছিলেন এই শিশুর আয়ু মাত্র সাতদিন। তবে আয়ু আরও ৭ বৎসর বাড়বে, যদি শিশুর মাতাপিতা প্রত্যহ ১০০ শত ব্রাহ্মণকে ভোজন করান অথবা সেবা করে, নিজগৃহে। মাতাপিতা তাই করতে লাগলেন, এবং সাত বৎসর পূর্ণ হবার আগেই তাঁরা শ্রীমান্‌কে নালন্দায় পাঠিয়ে দিলেন।

সেই বিহারে থাকতেন এক সিদ্ধপুরুষ। তাঁর নাম সরহ বা রাহুলভদ্র। তিনিই তাঁকে আশ্রয় দিলেন এবং পলদেন্‌কে বললেন ভগবান অমিতাভের ধ্যান্ করতে। শিশু সেই ধ্যান করতে করতে আরও এক বৎসর পার করলেন। এই সময় নালন্দার প্রধান আচার্য ও অধ্যক্ষ রাহুল তাঁকে প্রব্রজ্যা দান করলেন এবং সর্বাস্তিবাদ সম্বন্ধে বিস্তৃত জ্ঞাতব্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করাতে লাগলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই বৌদ্ধধর্মের সার তত্ত্বগুলি হৃদয়ঙ্গম করলেন। এর পর আচার্য তাঁকে 'কালচক্র'

শাস্ত্র ও তন্ত্রগুলির বক্তব্যও যথাযথ অধ্যয়ন করাতে করাতে প্রায় ১৯ বৎসর অতিক্রম করালেন। তারপরই আচার্য রাহুল বৌদ্ধদের উপসম্পদ বা ভিক্ষুত্ব দান করলেন। এই সময় তাঁর নামকরণ করলেন 'গে লোং পল্‌দেন্ বা ভিক্ষু শ্রীমান।'

এরপর তিনি 'মহামায়ূরী বিদ্যা', 'কুরুকুল্লা বিদ্যা' এবং অন্যান্য ইন্দ্রজাল বিদ্যাও আয়ত্ত করলেন। তাছাড়া তিনি রসায়ন তন্ত্রবিদ্যাও শিক্ষা করলেন।

তিব্বতীয় গ্রন্থে বলা আছে এই সময় নালন্দায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, তাতে জনসাধারণের অবর্ণনীয় কষ্ট দেখে তাদিকে বাঁচাবার জন্য তিনি সমুদ্র মধ্যস্থিত এক দ্বীপে গিয়ে 'ভলত' বা ব্রজত নামে কোন ব্রাহ্মণের নিকট একটি 'স্পর্শমণি' সংগ্রহ করে ফিরে আসেন। সেই মণির স্পর্শে বহু লৌহখণ্ডকে স্বর্ণে পরিণত করে সেই স্বর্ণের দ্বারা দূর দেশ থেকে প্রচুর খাদ্যশস্য সংগ্রহ বা ক্রয় করে নালন্দার অধিবাসিদের জীবন রক্ষা করেন। তাছাড়া সেই স্বর্ণের দ্বারা প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করে বজ্রকণ্টক, গয়া, শ্রাবস্তী, পুণ্ড্রবর্ধন প্রভৃতি স্থানে অনেক মন্দিরও নির্মাণ করেছিলেন।

ডঃ দত্ত মহাশয় বলেছেন তিব্বতীয় কিংবদন্তী মূলক কাহিনীর দ্বারা বোঝা যায় না শ্রীমান্ ও নাগার্জুন একই ব্যক্তি কিনা। একমাত্র প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থের পাঠ থেকে অনুমান মাত্র করা যায় যে, অর্জুনের অকুতোভয় চরিত্র স্মরণ করে নাগভূমির (তিব্বতীয়) অধিবাসীবৃন্দ তাঁকে নাগ দেশেরই স্মরণীয় বীর পুরুষের (অর্জুনের) (মহাভারতের নাগবংশীয় অর্জুন) সঙ্গে অভিন্ন করে চিরস্মরণীয় নামকরণ করেন 'নাগার্জুন' আর প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থটির সিদ্ধান্ত যে তিব্বতীয় বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত তাও ঠিক।

এই জন্য নাগার্জুন এবং প্রজ্ঞা পারমিতা নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে গ্রন্থকার ও বৌদ্ধসিদ্ধান্ত গ্রন্থ রূপে কিন্তু এ গ্রন্থের সিদ্ধান্তবাদটি প্রচার করা নাগার্জুনের পক্ষে প্রথম দিকটায় বেশ সহজ হয় নাই। কারণ বুদ্ধের মতবাদ তাঁর পূর্বেই বহুধা বিভক্ত হয়েও কোথাও কোথাও শক্ত ঘাঁটি হয়ে বহু মানুষকে এক একটা গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল, তাই নাগার্জুনকে প্রথম দিকটায় ঐ সব শক্ত ঘাঁটির মানুষদের সম্মুখীন হতে বেশ বিপদের ঝুঁকি নিতে হয়েছিল।

তাছাড়া আরও একটা প্রধান বাধাকেও অতিক্রম করতে বেশ যুক্তি তর্কবাদের আসরে নামতে হয়েছিল, সেটা হল ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির কর্মকাণ্ডীয় আচারবাদ। যে বাদটিকে অবলম্বন করে 'পুরোহিততন্ত্র' বাদ ভারতে গড়ে উঠেছে। এই পুরোহিত তন্ত্রবাদ এমনি জিনিষ, যেটি বৈদিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে ক্ষীণ করে, দেশীয় আচার আচরণকে গ্রাস করে স্বতন্ত্র একটি প্রভুত্বমূলক সামন্ততন্ত্রবাদ। এ বাদে দেশ অপেক্ষা 'জাতিতাত্ত্বিক' একটি স্বতন্ত্রবাদের অভ্যুদয় ঘটেছে, অর্থাৎ দেশ জাহান্নামে যাক্ আমার বা আমাদের জাতিবাদের শাখাগুলি যেন অক্ষুণ্ণ থাকে; যার জের আজও চলেছে।

সেদিন নাগার্জুন তেমনি এক ব্রাহ্মণ্য-পুরোহিত তন্ত্রবাদের সম্মুখীন হয়েছিল। কিন্তু তাঁর বৌদ্ধ মাধ্যমিক মতবাদে গভীর পাণ্ডিত্য এবং তর্কযুক্তির সঙ্গে সরল প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করার শক্তিতে বিরোধী পক্ষ মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং তাঁদের বহু মান্যগণ্য ব্যক্তি নাগার্জুনের মাধ্যমিক মতবাদ শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন।

নাগার্জুনের তিব্বতীয় জীবন-গ্রন্থে আরও বলা হয়েছে যে, তৎকালীন ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির একজন

প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা যাঁর নাম 'ভোজতন্ত্র', তিনি নাগার্জুনের নিকট বৌদ্ধ মাধ্যমিক মত গ্রহণ করে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হয়েছিলেন, সেই রাজার বহু পরিষদও তাঁকে অনুসরণ করেছিলেন। সেই নাগার্জুন ১৭১ বৎসর জীবিত থেকে 'শ্রীপর্বতে' দেহ রক্ষা করেন।

এর পরে আর একটি তথ্যও পণ্ডিতদিগকে আকৃষ্ট করে, সেটি হলো উইন্টার নিৎসের হিষ্ট্রী অব্ ইণ্ডিয়ান লিটারেচার গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের ২৫২ থেকে ২৫৩ পৃষ্ঠার বক্তব্য। এই সংগৃহীত হয়েছে চীনা ভাষায় লিখিত নাগার্জুনের জীবন-কাহিনী থেকে। কাহিনীটি ৪০৫ লিখিত এবং তার লেখক কুমারজীব।

কুমারজীব ছিলেন চীনদেশের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ভারতীয় গ্রন্থমালার বহু গ্রন্থ তিনি চীনাভাষায় অনুবাদ করে খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতেই চীন দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কুমারজীবের পিতা ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেও মধ্য এশিয়ার কুচাতে গিয়ে বাস করেন। কুমারজীবের জন্ম ঐখানেই। যৌবনে কাশ্মীরে আসেন এবং তৎকালীন কাশ্মীরের প্রাকৃতিক আকর্ষণ ছাড়াও জ্ঞানীগুণী সাধকদের আকর্ষণ কম ছিল না। এখানেও বৌদ্ধ সংস্কৃতির একটা মহাস্থান ছিল। কুমারজীব লিখেছেন, 'মহাযান' সম্প্রদায়ের চিন্তাধারা তাঁকে সর্বাধিক আকৃষ্ট করে।

এককালে (খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী) চীন সম্রাটের আক্রমণে কুচা নগরীটি চীনদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়, তার ফলে পরবর্তীকালের কুমারজীবও চীনের অধিবাসী বলতে বাধ্য হন। কিন্তু কুমারজীবের শিক্ষা ও প্রতিভা এমনি ছিল যে, তিনি অল্প বয়সেই চীনের শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা রূপে সেই পদ গ্রহণ করেন। কথিত আছে তাঁর ছাত্রের সংখ্যা ছিল তিন হাজারের উপর। কুমারজীবই শ্রেষ্ঠ অনুবাদক বলে পরিচিত হন। তিনি ভারতের বৌদ্ধধর্মের 'বিনয় পিটক', 'ব্রহ্মজাল সূত্র', 'বজ্রচ্ছেদিকা', 'প্রজ্ঞাপারমিতা', 'শতশাস্ত্রের' মত প্রখ্যাত গ্রন্থগুলি চীনাভাষায় অনুবাদ করে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। কুমারজীবের সংক্ষেপিত জীবন কাহিনীটি ভারতীয় পণ্ডিতদের কোন লেখা থেকে পাওয়া যায় না; এটি পাওয়া যায় C. Eliot-এর হিন্দুইজম অ্যাণ্ড বুদ্ধিজম গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড থেকে।

সেই কুমারজীব নাগার্জুনের জীবনীটি লিখেছেন এই ভাবে—

নাগার্জুন জন্মগ্রহণ করেছিলেন দক্ষিণ ভারতের অন্তর্গত বিদর্ভের কোন এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঔরসে। (বিদর্ভ বর্তমান বেরার) নাগার্জুন অল্প বয়সেই বেদ ও অন্যান্য সংস্কৃত ভাষায় লেখা গ্রন্থগুলি আয়ত্ত করেও এক বিশেষ শক্তি অর্জন করেছিলেন। সে শক্তিটি নিজেকে অদৃশ্য করা। প্রচলিত কথা ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা।

ঐ বিদ্যার দ্বারা এক সময় রাজার প্রাসাদে প্রবেশ করেন। সঙ্গে ছিল আরও তিনজন বন্ধু। তাঁরা কিন্তু নাগার্জুনের মত সংযত চরিত্র ছিলেন না, তাই রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করে মহিলাদের সম্ভ্রম রক্ষা করেন নাই, অচিরেই তাঁরা ধরা পড়ে যান, কিন্তু নাগার্জুন সে চরিত্রের ছিলেন না, তবুও তিনি অদৃশ্যকরণ শক্তির দ্বারা অচিরে অন্তঃপুর থেকে বাইরে নিরাপদে ফিরে আসেন। বন্ধুদের এই আচরণে আঘাত পান এবং অযোগ্য ব্যক্তিকে অদৃশ্যকরণ বিদ্যা দেওয়া উচিত নয় মনে করেই তিনি সংসার আশ্রম ত্যাগ করার ব্রত নিয়ে জন্মভূমি ত্যাগ করে অতি অল্প দিনের মধ্যেই ওই শাস্ত্রের জ্ঞাতব্য তথ্যে প্রকৃত পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।

তবুও জ্ঞানপিপাসার নিবৃত্তি হয় নাই তাঁর, আরও জ্ঞানলাভ করার জন্য দেশ কিছুদিন ভারত পরিক্রমা করতে করতে শেষ পর্যন্ত হিমালয়ের অধিত্যকায় এসে এক প্রাচীন বৌদ্ধ ভিক্ষুর নিকটে যে জ্ঞান লাভ করলেন, সেইটিই পরে মহাযান সম্প্রদায়ের মাধ্যমিক মতবাদ বলে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই মতবাদটিকে তিনি যুক্তিতর্কের দ্বারা সর্বতোভাবে পরীক্ষা করে দেখলেন, তুলনাহীন এই মতবাদ। তারপর থেকে তিনি আবার জন্মভূমি দক্ষিণ ভারতে এসে ঐ মতবাদ প্রচার করেন। এই মতবাদ কি জিনিষ তা আজ একমাত্র বিশেষ চিন্তায় প্রভাবিত পণ্ডিত ছাড়া সকলের আয়ত্ত করা খুব সোজা নয়।

আজকের যাঁরা উচ্চস্তরের পাণ্ডিত্য অর্জন করেন তাঁরাও ধাঁধায় পড়েন যে, ৮ম শতাব্দীর শঙ্করের 'মায়াবাদ' থেকে মাধ্যমিক মতবাদের সূক্ষ্মতঃ কতটুকু তফাৎ? তাই পণ্ডিতগণ অনেকটা অনুমান করে নেন, এই ভারতের অবিস্মরণীয় পুরুষরত্ন নাগার্জুন ব্যক্তিটি খৃষ্টাব্দীয়ের আগের অবশ্যই এবং তিনি দ্বিতীয় শতাব্দীর। ঐ নামের আরও নাগার্জুন ছিলেন এই ভারতে, তবে তাঁরা মাধ্যমিক মতবাদের প্রবর্তক নন।

নাগার্জুনের যে মাধ্যমিক মতবাদ তাকে অবিস্মরণীয় করেছে ঐতিহাসিক ও দার্শনিকবৃন্দ মনে করেন বুদ্ধদেবই যে তাঁর অনুবর্তিগণের জন্য তার মতবাদের বিভিন্নতা, দার্শনিক চিন্তাধারার বহুমুখিতা, কুটিল কল্পনা নৈয়ায়িক যুক্তির দ্বারা ভিন্ন ধরণের 'অস্তিত্ববাদ', 'নাস্তিক্যবাদ', 'মাধ্যমিকবাদ', 'প্রতীত্যসমুৎপত্তিবাদ', 'শূন্যবাদ' প্রভৃতি অন্ততঃ ৩০।৩৫টি মতবাদ প্রকাশ করেছিলেন, এটা কোন অংশেই সত্য নয়; বরং কোন অতীন্দ্রিয়বাদের কথায় অবতারণা করলে তিনি চুপ করে থাকতেন এটাই সত্য। কিন্তু মহান্ ব্যক্তির দেহান্ত হলে তাঁর শিষ্যবৃন্দ যে গুরুর চিন্তাধারাকে নিজের চিন্তাধারা, সংস্কারধারা এবং আরও গবেষণার ধারার পথ তৈরী করে এক একটি সম্প্রদায় গঠন করেন এটার নমুনা আজ আর নূতন করে অন্ততঃ ভারতবাসিকে শোনাতে হবে না। ভারতের যে কোন প্রদেশে গিয়ে এক এক সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত এবং উৎপত্তি প্রণালী আলোচনা করলেই তা উপলব্ধি হবে।

এমনি ঘটেছিল বুদ্ধের অন্তর্ধানের পর। তাঁর শিষ্যরা নানান ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। দেশপ্রীতি, মানবপ্রীতি চুলোয় যাক 'মতবাদে'র সংকীর্ণতা বজায় থাক। যার জন্য বলা যায় বুদ্ধের শিষ্যদের মধ্যে অন্ততঃ ৩০টি শাখার উদ্ভব হয়। এর দ্বারা ভারতীয়গণের মস্তিষ্ক-বিচারও সুস্থির হয় নাই, বরং তার দ্বারা অশান্তিই বেড়েছিল। এমনি দুর্দিনে নাগার্জুনের আবির্ভাব। তিনি প্রচুর ধৈর্যের সঙ্গে বৌদ্ধবৃন্দকে সংযত করেও প্রধানভাবে চারটি শাখার অস্তিত্বকে সর্ববাদীসম্মত বলে ঘোষণা করাতে সমর্থ করেন। এর সঙ্গে নিজের মতবাদটিও সামিল করে নেন। তাঁর মতবাদ মাধ্যমিক। অপর তিনটি হল 'যোগাচার', 'সৌত্রান্তিক', ও 'বৈভাষিক'। তাদের মধ্যে মাধ্যমিক ও যোগাচার এই দুটির অপর নাম মহাযান। আর সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক এই দুটির নাম হীনযান।

মাধ্যমিক দর্শন বললে এই অর্থই প্রকাশ পায় 'একটি শূন্যবাদ'। যার প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন নাগার্জুন। এই শূন্যবাদ সংজ্ঞাটি প্রকৃতপক্ষে 'অনির্বচনীয়' বাদ। যার জন্য আচার্য শঙ্করের (৮ম শতাব্দী) মতটি যে অনির্বচনীয়বাদ থেকে বিশেষ তফাতে থাকে না এ প্রসিদ্ধি দার্শনিকরা মৌন হয়েই স্বীকার করেন।

অনির্বচনীয় ও শূন্যবাদের অর্থ দৃশ্যমান সব কিছু প্রতিভাসিক সত্তায় অবস্থিত, কিন্তু যা হোক কিছু একটা অনির্বচনীয় সত্ত আছে যা বলা যায় না। সেই অনির্বচনীয় সত্তাকে মাধ্যমিক মতবাদী নাগার্জুন বলেছেন 'শূন্য'। তাই তার আর এক সংজ্ঞা শূন্যবাদ। নাগার্জুন বলেছেন বস্তুর কারণসাপেক্ষ অস্তিত্বই শূন্য। অর্থাৎ কারণ নিরপেক্ষ সৎ নয়, আবার আকাশ-কুসুমের মত সম্পূর্ণ অসৎও নয়। এই ভাবে মাঝামাঝি চিন্তায় ঘাঁটি থাকার জন্য ওর নাম 'মধ্যম পন্থা'। এতে তিনি পরিষ্কার বলেছেন বস্তুর অস্তিত্ব ও গুণ হল কারণ জনিত, অতএব আপেক্ষিক। কারণ সত্তা বলে যেটি ধারণা, সেটির মূলে আছে অত্যন্ত দ্রুত ক্ষণশীল হয়েও নিজেকে সেই মনে হওয়ার জন্য এক ধরণে থাকে এটির ব্যবহারিক সত্যতা আছে কিন্তু নির্বাণ লাভের আগে তার কিছুতেই পরমার্থিক সত্যতা উপলব্ধি হয় না, হবে না, হতে পারে না।

আর নির্বাণ যে কেমন তা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, বাক্যের দ্বারা, মনের দ্বারা বর্ণনাই করা যায় না। তবে শ্রুতির নেতি নেতি অর্থাৎ উৎপত্তি নাই, বিনাশ নাই এই নেতিবাদের দ্বারা নির্বাণের একটা আভাস পাওয়া যায়। যাঁরা আচার্য শঙ্করের মতবাদ যত্নের সঙ্গে অধ্যয়ন করেন তাঁদের কাছে মাধ্যমিক শূন্যবাদ কঠিন ঠেকবে না। সহজেই তারা বুঝবেন কেন আচার্য শঙ্করের প্রতি প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদের কলঙ্ক আরোপ করা হয়। মাধ্যমিক মত, অনির্বচনীয় এবং শূন্যবাদ একই।

সীমান্ত বাংলার পুতুল উৎসব ও লোকসাহিত্য

কনককান্তি বসু

ভাদর মাসে ভাদু পূজা
সবাই পরে নীল শাড়ি
আমার টুসু অবুঝারি
বুঝাও হে বংশীধারী ॥

এক সময়ের বিশুদ্ধ পুতুল উৎসব পরবর্তীকালে কেমন অনায়াসে ধর্মীয় পূজোৎসবে পরিণত হয় তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ সীমান্ত বাংলা ও পার্শ্ববর্তী কয়েকটি জেলার টুসু ও ভাদু পূজা। বাংলাদেশের উৎসব-বারমাস্যা মূলত ধর্মকেন্দ্রিক। ধর্মনিরপেক্ষ কোন উৎসবও তাই অস্তিত্ব বজায় রাখতে ধর্মীয় বর্ম এঁটে এখানে আবির্ভূত হয়। আমরা ইতিপূর্বে (সমকালীন, পৌষ' ৮৩) টুসু প্রসঙ্গে এই রূপান্তরের আলোচনায় এসেছি। সীমান্ত বাংলার এই দুই পুতুল উৎসবকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্য জন্ম নেয় তার চরিত্র যেমন লৌকিক ও অভিজাত সাহিত্যের গুণগত পরিচয় মণ্ডিত থাকে তেমনি ধর্মনিরপেক্ষ উৎসবকে ধর্মীয় ছাপ দেওয়ার সময়ে দেখা যায় লোকধর্ম ও অভিজাতধর্ম দুই ছাপই তাতে পড়ে। টুসুর মত ভাদুকে একদল পণ্ডিত যেমন পৌরাণিক আবরণ দেবার চেষ্টা করেছেন তেমনি আরেকদল তাকে লৌকিকদেবী প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লেগেছেন।

এই সূত্রে ভাদু সংক্রান্ত লোককথায় একটু দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে। প্রথমে সেই দুটি লোককথা দেখা যাক যেখানে অভিজাত ধর্মে ভাদুকে মানবী থেকে দেবীতে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। ১, পঞ্চকোটের রাজা একটি কন্যাসন্তান লাভ করার জন্য সর্বত্র মানত করছেন। যে যা পরামর্শ দেয় রাজা ঠিক তাই করেছেন। মানসিক ভারসাম্য হারানো অবস্থায় একদিন শিকারে গিয়ে রাজা বনের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেন। শ্রান্ত অবস্থায় তিনি এদিক ওদিক ঘুরছেন এমন সময়ে হঠাৎ দেখতে পেলেন একটি ফুটফুটে মেয়ে একটা উঁচু জায়গায় বসে আছে। রাজা মেয়েটিকে নানা কথা জিজ্ঞেস করে নিজের পরিচয় দিলেন এবং রাজপ্রাসাদে মেয়েটিকে নিজের মেয়ের মত পালন করার কথা বললেন। মেয়েটি মৃদু হেসে রাজার কথায় সায় দিল। যথাযোগ্য মর্যাদার সংগে মেয়েটিকে রাজপ্রাসাদে আনা হল। রাজবাড়ীতে তখন আনন্দের বন্যা বইছে।

হঠাৎ একদিন স্বর্গ থেকে গায়ক-ভিখারীর বেশে নারদ এসে গানের মাধ্যমে জানালেন—পার্বতীর অনুপস্থিতে শিব অস্থির হয়ে পড়েছেন, পার্বতীর এখুনি যাওয়া প্রয়োজন। পরদিন সকালে রাজপ্রাসাদে তুমুল সোরগোল। রাজার সেই পালিতকন্যা উধাও। ভাদ্রসংক্রান্তির দিনে মেয়েটি চলেযাওয়ায় পঞ্চকোট ও সন্নিহিত অঞ্চলে ঐদিন ভাদ্রেশ্বরী বা ভাদু পূজার প্রচলন হয়। ২. পঞ্চকোটের রাজকন্যা ভাদু দুর্লভ সৌন্দর্যের অধিকারিণী। ঐহিক ব্যাপারের চাইতে পারত্রিক ব্যাপারে তার মনোযোগ বেশী। সে সবসময় দেবদেবী আরাধনায় ব্যস্ত থাকে। দেখতে দেখতে রাজকন্যার বিবাহের বয়স হয়ে যায় এবং নানা জায়গা থেকে এই অসাধারণ রাজকন্যার বিবাহের প্রস্তাব আসতে থাকে। কিন্তু

কন্যা সব কয়টি ক্ষেত্রে বিবাহে অসম্মতি জানায়। রাজা খুবই দুশ্চিন্তায় পড়লেন। একদিন রাত্রে চিন্তায় রাজা পায়চারি করছেন এমন সময় অন্ধকারে কাকে যেন প্রাসাদ ছেড়ে বাইরে যেতে দেখলেন। রাজা দ্রুত ভাদুর ঘরের দিকে গেলেন, দেখেন সে ঘর ফাঁকা। অস্থির অবস্থায় রাজা নিজেও প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পড়লেন। কাছে মন্দির থেকে মানুষের গলার আওয়াজ এবং ভাদুর গান যেন শোনা গেল। তিনি কালবিলম্ব না করে এদিকে ছুটে গেলেন। পঞ্চকোটবাসের অনুমান, মন্দিরের পূজারীর সংগে রাজকন্যা সম্ভবত প্রেমবদ্ধ। মন্দিরে হাজির হয়ে দেখেন দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করা আছে। ক্রুদ্ধ রাজাবাহাদুর ধৈর্যহারা হয়ে মন্দিরের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকলেন। প্রবেশমাত্র তিনি চমকিত হলেন, দেখেন দেবমূর্তির পদতলে ভাদু লুটিয়ে আছে। আস্তে আস্তে তিনি ভাদুকে স্পর্শ করলেন—ভাদুর দেহে তখন আর প্রাণ নেই। ভাদ্রসংক্রান্তির দিনে ঘটনাটি ঘটেছিল, আজও তাই সংক্রান্তিতে ভাদু পূজার অনুষ্ঠান হয়।

ভাদুকে লৌকিকদেবী প্রমাণেরপক্ষে লোককথগুলি হল: ১. পঞ্চকোটের রাজকন্যা ভাদু স্থানীয় দরিদ্রের প্রতি দয়াপরবশ, হয়ে তাদের জন্ম এমন কিছু করতে চেয়েছিল যাতে রাজাবাহাদুরের মোটেও সম্মতি ছিলনা। কল্যাণমূলক কোন কাজ অসম্ভব মনে হওয়ায় রাজকন্যা ভাদু শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করে। আজও তাই নিম্নশ্রেণীর দরিদ্র মানুষের মধ্যে ভাদুপূজার অনুষ্ঠান সীমাবদ্ধ। ২. আবার কেউ কেউ বলেন, ভাদু রাজকন্যা হয়ে একটি সাধারণ ঘরের ছেলেকে ভাল বেসেছিল। কিন্তু বিবাহ অসম্ভব বুঝে সে আত্মহত্যা করে। ৩. আরেকটি লোককথায় জানা যায়, ভাদু এক অতি সাধারণ ঘরের ছেলেকে ভালবাসত। প্রকাশ্যে ঐ বিবাহ অসম্ভব জেনে ভাদু এবং ঐ ছেলেটি দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়। তাদের আর কেউ কোথাও খুঁজে পায়নি। এই লোককথাগুলি সমেত ভাদু পূজার অনুষ্ঠান-অঙ্গ লক্ষ্য করলে বোঝা যায় দেবী মূর্ত মহিমার অভিজাত বা লৌকিক কোন ব্যাপার সেখানে নেই। ভাদুকে পার্বতীর সংগে একাত্ম করে তার পৌরাণিকীকরণের যে চেষ্টা তা যেমন যথাযথ নয় তেমনি লৌকিক দেবীত্ব আরোপ ও কষ্টকল্পনার ফসল।

লৌকিক দেবী হিসাবে ভাদুকে বর্ণনা করতে গিয়ে কোন কোন লোকবিদ্যা বিশারদ যে ধরণের আলোচনা করেছেন তাতে ঐ আরোপণ স্ববিরোধ এবং যুক্তি শৈথিল্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন (বাংলার লোকসাহিত্য), 'ভাদ্রমাসের সমস্ত রাত্রি জাগিয়া এই অঞ্চলের সকল শ্রেণীরই প্রাধানতঃ কুমারী মেয়েরা ভাদু নামক দেবীর প্রতিমা সমুখে রাখিয়া এই লোকসংগীত গাহিয়া থাকে।' পরের বাক্যে তিনি বলেছেন—'এই সঙ্গীতের ভিতর দিয়া তাদের জন্য প্রকৃতির পরিভূমিকায় কুমারী হৃদয়ের বিচিত্র সুখদুঃখের অনুভূতি ব্যক্ত হয়।' আশুতোষবাবুর ঐ 'দেবীর প্রতিমা' কথাটি 'বাংলার লৌকিক দেবতার' লেখককে আরেক ধাপ এগিয়ে দিল। তিনি বললেন, এইসব দেবীরা শস্য দেবীই ছিলেন লক্ষ্মীর মত।' (বা. লৌ. দে পৃঃ ১১২ ২য় সং)। কিন্তু ঐ লেখার পূর্ববর্তী পৃষ্ঠায় তিনি বলেছিলেন, 'ভাদু পূজা বলতে, নৃত্যগীতের উৎসব, মন্ত্র অর্চনা বিশেষ নেই। মূর্তি সাধারণত দু'ফুটের বেশী হয় না।' (ঐ, পৃঃ ১১১)। গোপেন্দ্রবাবু কথিত 'শস্যদেবী' কথাটি পরবর্তী 'ভারতকোষ' সংকলনের লেখককে উৎসাহিত করল। তিনি আরো একটু এগিয়ে বললেন, 'উৎসবের কাল ও উর্বরতা সম্বন্ধক কৃষি-সম্পর্কিত লৌকিক উৎসব।' (ভারতকোষ,

৫ম খণ্ড পৃঃ ২১৩)। অবশ্য কোষগ্রন্থের ঐ লেখকও বলে ফেলেছেন, 'পুরোহিতবিহীন ও শাস্ত্রহীন ভাদু অনুষ্ঠান সমস্ত ভাদ্রমাস ধরিয়া মূলতঃ লোকসংগীত ও লোকনৃত্যের মাধ্যমে প্রতিপালিত হয়।' উদাহরণ আরো অনেক বাড়ানো যায় কিন্তু বাহুল্যভয়ে ঐ কাজে বিরত হওয়া গেল।

এশিয়া ভূখণ্ডের কয়েকটি দেশে পুতুল উৎসবের খুঁটিনাটি লক্ষ্য করলে এবং সেইসব দেশে ঐ উৎসবের ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সীমান্ত বাংলার টুসু ভাদু নির্ভেজাল পুতুল উৎসব। ভাদু পুতুলকে সামনে রেখে গ্রাম বাংলার কুমারী মেয়েরা তাদের অন্তরের যাবতীয় কিছু উজাড় করে দিতে চায়। গ্রাম্যললনার আত্ম-অভিব্যক্তি, গৃহস্থালীর প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ; যথা বন্দনার মূর্ত প্রতীকী সাক্ষ্য হল ভাদু। দেবীত্ব ইত্যাদি মহিমা ভাদু অর্জন করেছে অনেক পরে। বস্তুত, লোককথাগুলির জন্মের অনেক আগে থেকে ভাদু-টুসুর পুতুল উৎসব প্রচলিত। কারণ, পঞ্চকোটের যে রাজা ও তার কন্যার কথা নিয়ে লোককথা প্রচলিত তার অনেক আগে ভাদু-টুসুর প্রচলন ঐতিহাসিক সত্য। এই উৎসবকে উন্নীত করার নামে লোক ও অভিজাত ধর্মের কৃত্যের কিছু ছোঁয়া তাতে দেওয়া হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। লোককথাগুলিও কালের গতির সংগে তাল রেখে একটু একটু করে বাঁক নিচ্ছে।

ভাদু বা টুসুকে আমরা কখনো বড় আকারে দেখতে পাই না। এই আকৃতিগত ব্যাপারটিতে অনেকেই তেমন স্বস্তি বোধ করেন না। প্রাথমিক সত্যের মধ্যে রয়েছে তার এই আকারগত ব্যাপারটি। 'ক্ষুদ্রায়তন মূর্তিকে সাধারণতঃ বলা হয় পুতুল।' (বাংলার লোকশিল্প, কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় পৃঃ ৮৪) 'শিশুতোষ শিল্পসম্ভারে যা মুখ্য ভূমিকা নিয়ে আছে সেই পুতুল বলতে আমাদের দেশে ছোট-মূর্তিমাত্রকে ধরা হয়েছে।' (শিল্প ভাবনা, ভোলানাথ ভট্টাচার্য পৃঃ ১১৯)

বছর বছর ভাদু উৎসবকে কেন্দ্র করে যে মৌখিক সাহিত্য জন্ম নেয় বৈচিত্র্য, স্বচ্ছতার এবং সরলতার গুণে তা নিঃসন্দেহে আমাদের লোকসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে চলেছে। এখানে কয়েকটি ভাদুগান উপহার দিয়ে আমরা বর্তমান আলোচনা শেষ করছি।

১। ভাদু চাপল নতুন লাইন চলল বাঁশি বাজিয়ে
কি কব কি কব ভাদু কদমতলায় দাঁড়িয়ে।
ভাদু নামল দেশে
মুছাইব তার রাঙা চরণ
আমার কালো কেশে।
ভাদুমণি মা জননী সলতে ধুয়ো আলাতে
জলতে জলতে নিভে গেল
ভাদুরানীর বাংলাতে।

২। তিনটি ভাদু জলকে গেল
কন ভাদুটি কাল গ
মায়ের ভাদু হলকধারী

ইশারাতে ডাল গ।

৩। লইতন পুখুরের আড়ায়
তিনটি সনার বগ চরে
ভাদু আমার বগড় নিল
রেওগ সনার বগ ধরে।

৪। ভাদুর আমার বিয়ে হুব ইষ্টিশনের বাবুতে
আসতে যেতে ভাদুরাণী চড়বে রেলের গাড়ীতে।
বর্ধমানের বত্তিশ সুতো শানেটানায় লাগাব
রাইপুরের ঐ ছোকরাদিকে তানেবানে নাচাব।

৫। রাণীগঞ্জের লোকে বলে এটি তোমার কে বটে?
লাজ সরমে বলতে হল এটি আমার ভাই বটে।
ভাদ্র মাসে আনলাম ভাদু চন্নন কাঠের চৌদলে
বাগ্দীপাড়ার মেয়েবেটায় ইহাকেই ত বৌ বলে।

৬। বাড়ী নাম হয়   তমাল বনে
কোকিল ডাকে বনে বন
আর ডাকো না   প্রাণের কোকিল
ভাদু আমার অচেতন।

৭। ছোট বনের লতাপাতা
বড় বনের শালপাতা
কন বনে হারাই ভাদু
গলায় বাঁধা লাল ছাতা।

৮। কে গড়ে ল এই ভাদুটি
কানে দেখনা কানবালা
ক্যাচট ধরি পয়সা দিল
বাউড়িপাড়ার চোর শালা।

ভারত সঙ্গীতে 'জাতি' প্রয়োগ ও নির্গীতের স্থান

নরেন্দ্রকুমার মিত্র

ভারতীয় সঙ্গীত মানেই রাগ সঙ্গীত একথা ভারতীয় মাত্রেই জানেন কিন্তু রাগসঙ্গীত জিনিষটা যে কি সেকথা হয়ত সকলে জানেন না। কণ্ঠ-সঙ্গীতে ভাষাতে সুরারোপ করে পরিবেশন করা হয় এবং ভাষার মাধ্যমে বক্তব্যটা শ্রোতারা সহজেই বুঝতে পারেন। সুতরাং কণ্ঠসঙ্গীতে সুরের আবেদন সাধারণ শ্রোতার কাছে ভাষার আবেদন থেকে পিছিয়ে পড়ে থাকে। সঙ্গীত বলতে যদি আমরা কণ্ঠসঙ্গীত বুঝি তাহলে ভাষা থেকে সুরকে আমরা আলাদা করে দেখতে পারব না। সুতরাং ভাষা বা কথাকে বাদ দিয়ে আপাততঃ আমরা সুরটুকুকেই বিশুদ্ধ সঙ্গীত বলে মনে করব এবং যন্ত্রসঙ্গীতের মাধ্যমে রাগসঙ্গীতকেই আমরা আপাততঃ ভারতীয় রাগ সঙ্গীত বলে উল্লেখ করব।

ভারতীয় রাগ সঙ্গীত বলতে ঠিক কি বোঝায় সেটা না জানলে তার সৌন্দর্য বোঝা মুশকিল। তর্ক উঠতে পারে যে ভাল লাগাটা তুচ্ছ বোঝাবুঝির ঊর্ধে রাখলে হয় না? কেন না সেইতো আবার সঙ্গীত ব্যাকরণের কচকচি শুনতে হবে। কিন্তু একথা মনে রাখা দরকার যে শিল্পবস্তুর কোন জিনিষটা সমঝদারীর জন্য শিল্পী তুলে ধরেছেন সেটা আগে থেকে না জানলে ভাল লাগাটা কোনদিনই সম্পূর্ণ হবে না। তাছাড়া বোঝাবুঝি ব্যাপারটা ততটা ব্যাকরণগত নয় যতটা বৌদ্ধিক।

ধরা যাক কোনও রাগ সঙ্গীতের আসরে সেতার বা সরোদ শিল্পী 'মালকোষ' বলে রাগটি বাজাতে শুরু করলেন। একথা সকলেই মানবেন যে রাগের নাম মালকোষই হোক বা ভৈরবীই হোক সাধারণ শ্রোতাকে ভাল লাগার দাবীটারই অগ্রাধিকার দিতে হবে। মালকোষ নামটা থাকবে পিছিয়ে পড়ে। শ্রোতার স্মৃতির তারতম্য অনুসারে পরে কোনও দিন এই রাগটি শুনে কোনও শ্রোতা হয়ত বলবেন যে ঠিক এই রকম একটা বাজনা তিনি অমুক দিন অমুক শিল্পীর কাছে শুনেছিলেন আবার কেউবা সেকথা বলতে পারবেন না কেন না স্মৃতির মালকোষের বৌদ্ধিক সমঝদারী তাঁর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ হয়নি। একজন রূপ দেখে চিনলেন অপরজন চিনলেন না। রূপ দেখে চিনতে পারলেই বুঝতে হবে যে, রাগ একটা বস্তু বিশেষ যদিও আপাততঃ সেটা বিমূর্ত বলে মনে হচ্ছে। বিমূর্ত থেকে মূর্তিকে খুঁজে পাওয়ার প্রক্রিয়াটাই হল বৌদ্ধিক। কথাটা ছবির ক্ষেত্রে যতটা সত্য সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও ততটাই।

যে কোনও সঙ্গীতের বই খুললেই দেখা যাবে যে ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী তার ছেলেমেয়ে ও নাতিনাতনীদের নিয়ে এক বিরাট গোষ্ঠী বেঁধে বসে আছে। রূপভেদে অসংখ্য নামে এই গোষ্ঠীর ব্যক্তি বিশেষকে চিহ্নিত করাই ভারতীয় সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য তবু একথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে সম্ভাব্য যত সুর হতে পারে তার সবগুলোর নামকরণ করে চিহ্নিত করা হয়নি। একটা মোটামুটি আন্দাজ দিতে গেলে বলতে হয় যে শুধু পাঁচ স্বরের গড়া সম্ভাব্য রাগ রাগিণীর সংখ্যা পাঁচশতর ওপর। এছাড়া ছয় বা সাত স্বরের রাগতো অনেক বেশী। যাই হোক রাগসঙ্গীত বলতে ভারতীয় সঙ্গীতবিদরা কি বোঝাতে চাইছেন তা বিচার করে দেখা যাক।

ইউরোপীয় যন্ত্রসঙ্গীতের রাগরাগিণীর একটা ব্যাপক এবং সুনির্দিষ্ট ব্যবহার না দেখা গেলেও 'মেলডি' জিনিষটা রাগরাগিণীর ধারণা থেকে একেবারে ভিন্ন নয়। আর বিভিন্ন রাগ রূপটিকে চিহ্নিত করার যে ব্যবস্থা ভারতীয় পদ্ধতিতে আছে ইউরোপীয় সঙ্গীতে তা নেই। রাগ সঙ্গীতকে আমরা চিহ্নিত করেছি নির্দিষ্ট স্বরগুচ্ছের ব্যবহার দিয়ে এবং সেই সঙ্গে তাদের নামকরণও করা হয়েছে। আমরা ভারতীয় সঙ্গীতে রাগরাগিণীর অসংখ্য সম্ভাবনার কথা বলেছি। এই সম্ভাব্য সংখ্যার অনুপাতে নামকরণ করা নির্দিষ্ট রাগরাগিণীর সংখ্যা আসলের নিতান্তই একটি ক্ষুদ্রাংশ সেকথা বলাই বাহুল্য।

এই নামকরণ নিয়েই যত গোল। বহু প্রাচীনকাল থেকে রাগরাগিণীর নামকরণ প্রক্রিয়া চলে আসছে। এই নামগুলোর এক একটা বিশেষ ধাঁচাধ থাকার জন্যেই হোক বা নামের সঙ্গে একটা কিংবদন্তী জড়িয়ে থাকার জন্যেই হোক প্রায় প্রত্যেকটি নাম এক একটি ভাবানুষঙ্গ বহন করে চলেছে। অনেক দেশের নামের সঙ্গে রাগরাগিণীর নামের মিল আছে যেমন মুলতানী, গান্ধারী, ভোট্ট (তিব্বত) মালবী, গুর্জরী, জৌনপুরী। অনেকেরই মত এই যে এইসব দেশেই এই সব রাগরাগিণীর প্রথম চলন হয়েছিল! কিংবদন্তী হল এই যে দীপক রাগ আগুন জ্বালায় আর মেঘমল্লার বৃষ্টি নামায়। রাগ-রাগিণীর ব্যবহারের সময় নির্ধারণ করে দিয়ে সঙ্গীতশাস্ত্র একটি ভাবানুষঙ্গ আরোপ করে দিয়েছে প্রত্যেক রাগ বা রাগিণীতে। ঠিক কবে বা কোন সময় এই প্রহর বিচার শুরু হয়েছিল তার কোনও সঠিক ইতিহাস না জানা থাকলেও ওস্তাদরা সঙ্গীতের আসরে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট গোঁড়ামী করে থাকেন। এই সমস্ত বিবেচনা করে প্রথমেই রাগসঙ্গীতের ইতিহাস পর্যালোচনা করা দরকার।

রাগসঙ্গীত সম্বন্ধে প্রচলিত মতামতগুলি জড়ো করলে এরকম একটা সিদ্ধান্তে হয়ত উপনীত হওয়া যায় যে বাস্তব জগতের অনেক অভিজ্ঞতার প্রতিফলন পড়ে রাগসঙ্গীতের মাধ্যমে। এবং জনসাধারণের কাছে এই ধরণের মতামতকে নাট্যশাস্ত্রের উক্তি তুলে ধরে পণ্ডিতমহলেও সমর্থন জানানো হয়। সেই দুটির মধ্যে প্রথমটির বক্তব্য হল এই যে হাস্য ও শৃঙ্গার-রসে যথাক্রমে মধ্যম ও পঞ্চম স্বর প্রযোজ্য আর বীর, রৌদ্র, করুণ এবং বীভৎস রসে যথাক্রমে ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার ও নিষাদ এবং ধৈবত স্বরগুলির প্রয়োগ করা উচিত। দ্বিতীয় শ্লোকে কোন ক্ষেত্রে এগুলি প্রয়োগ করা হবে তাই বলতে গিয়ে ভরত বলছেন যে, যে গানের যে রকম রস সেই গানে সেই রসদ্যোতক স্বরের বলবান প্রয়োগ সম্বলিত যে 'জাতি' সেই 'জাতি'ই সেই গানে প্রয়োগ করতে হবে। গানে সুরারোপ করার সময় 'জাতি' নির্বাচন করতে হবে এই কথা মনে রেখে, যে গানের কাব্যের রস অনুযায়ী নির্দিষ্ট স্বরের বলবান প্রয়োগ যেন সেই জাতির সাহায্যে করা সম্ভব হয়। অর্থাৎ হাস্য বা শৃঙ্গার-রসের গানে যে জাতি প্রয়োগ হবে তার মধ্যে যেন মধ্যম বা পঞ্চম স্বরটি থাকে এবং তার বলবান প্রয়োগ করা হয়।

এই উক্তির প্রধান লক্ষণীয় হল এই যে ভরত মুনি এখানে 'জাতি'র কথা বলেছেন। 'রাগ' সম্বন্ধে কোনও কথা বলেননি। এছাড়া প্রসঙ্গটি জাতি গান বা ধ্রুবা গান প্রসঙ্গে জাতি প্রয়োগ প্রকরণ অর্থাৎ গানে সুর বসানোর প্রসঙ্গ। বাজনায় রসোদ্দীপনের ক্ষমতা প্রসঙ্গে কোথাও কোন কথা বলেননি সুতরাং 'জাতি' এবং 'রাগ' এই দুই-এর মধ্যে পার্থক্যই বা কোথায় এবং শুধু বাদ্যপ্রয়োগেই বা ভরতমুনির কি উপদেশ আছে তাও জানা দরকার।

আনুমানিক খৃঃ দ্বিতীয় শতকের সঙ্কলিত নাট্যশাস্ত্রে 'রাগ' শব্দটি মাত্র চার পাঁচবার উল্লিখিত হয়েছে কিন্তু 'জাতির' উল্লেখ করা হয়েছে প্রায় সবক্ষেত্রেই। বস্তুতঃ ভরতমুনির আগে (খৃঃ ১ম শতাব্দী) নারদী শিক্ষায় 'জাতি' ব্যবহার প্রসঙ্গে অনেক আলোচনা আছে যদিও 'রাগ' শব্দেরও অল্পস্বল্প ব্যবহার নারদী-শিক্ষায় করা হয়েছে। বোধকরি এই তথ্যের ভিত্তিতেই পণ্ডিতেরা সমগ্র ভারতীয় সঙ্গীতকে মোটামুটি তিন ভাগে চিহ্নিত করেছেন। প্রথম ভাগ হল 'জাতি' প্রয়োগের আগে। এটি হল বৈদিক যুগ। দ্বিতীয় যুগ হল 'জাতি' প্রয়োগের সময়। এটি হল খৃঃ পূঃ পাঁচশত বৎসর থেকে খৃষ্টীয় পঞ্চম বা সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে। এবং তার পর থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত হল তৃতীয় যুগ যখন 'রাগ' প্রয়োগ 'জাতি' প্রয়োগে স্থান অধিকার করেছে। এর মধ্যে নারদ বৈদিক ও লৌকিক এই দুই প্রকার সঙ্গীতের আলোচনা করেছেন এবং ভরত প্রধানতঃ লৌকিক সঙ্গীতের বিশদ পরিচয় দিয়েছেন। এই দুজনই দ্বিতীয় যুগের লোক।

এ সত্বেও ভারতীয় সঙ্গীত পণ্ডিতেরা প্রায় সকলেই একমত যে রাগ সম্বন্ধে এই দুজনেই যথেষ্ট অবহিত ছিলেন।

প্রথমে নারদীশিক্ষায় 'রাগ' শব্দের ব্যবহার পর্য্যালোচনা করা যাক। নারদ 'স্বরমণ্ডল' সম্পর্কে পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন যে, সাত স্বর, তিনগ্রাম, একুশটি মূর্চ্ছনা ও উনপঞ্চাশ তান, এই নিয়ে স্বরমণ্ডল। তারপর তান, স্বর, রাগ, গ্রাম ও মূর্চ্ছনার পরিচয় ও লক্ষণ আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন এগুলি পবিত্র এবং কল্যাণকর। এখানে রাগ শব্দটি আধুনিক 'রাগ' অর্থবহন করে কিনা এ সম্বন্ধে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করছেন। তাঁরা 'রাগ' শব্দটির ব্যবহার বিচ্ছিন্ন ভাবে না দেখে যুক্ত শব্দ 'স্বর-রাগ' হিসাবে, তার বিচার করে নারদী শিক্ষা থেকেই উদ্ধৃত দিয়েছেন যথা—'স্বর-রাগ বিশেষণ গ্রামরাগো ইতি স্মৃতঃ' অর্থাৎ রঞ্জন শক্তি সম্পন্ন স্বর যোগে গ্রামরাগের উৎপত্তি।

ভরতমুনির নাট্য শাস্ত্রে 'জাতি' এবং 'জাতি রাগ' এই দুটি শব্দই ব্যবহার করা হয়েছে। তিনি 'জাতি' শব্দটির বিশদ ব্যাখ্যা করে গ্রহ, ন্যাস, বর্ণ, অলঙ্কার ও মূর্চ্ছনাদি জাতির দশ লক্ষণের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি সবশুদ্ধ আঠারোটি জাতির নামকরণ করে তার বৈজ্ঞানিক আলোচনাও করে গেছেন। সাতটি সঙ্গীতস্বরের নামাঙ্কিত ষাড়জী, আর্ষভী, গান্ধারী ইত্যাদি সাতটি শুদ্ধ 'জাতি' এবং ষড়জ মধ্যমা, মধ্যমাদিচ্যোবা, ষড়জাদিচ্যোবা ইত্যাদি এগারোটি মিশ্রজাতির উল্লেখ করে ভরত পাঁচ, ছয় বা সাত স্বর বিশিষ্ট জাতির মধ্যে ঔড়ব, ষাড়ব বা সম্পূর্ণ জাতির উল্লেখ করেছেন। মিশ্র জাতিগুলির নামকরণ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে শুদ্ধ জাতির দুই বা ততোধিক সংমিশ্রণেই এদের পরিচয়। এছাড়া সমগ্র ভাবে জাতিগুলির নামকরণের মধ্যে দেখা যাবে যে সঙ্গীতস্বর বিশেষের ব্যবহারের ইঙ্গিত ছাড়া আর কোনও ভাব তাদের মধ্যেথেকে প্রকাশ পাচ্ছে না। ভারতীয় রাগ রাগিনীর নামকরণ পদ্ধতি কিন্তু এই পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপরীত। রাগরাগিনীর নামগুলি কোথাও বা কোনও দেশের নামে, কোথাও বা কোনও ঋতুর নামে রাখা হয়েছে। এছাড়া অনেক রাগ রাগিনীর ব্যঞ্জনামুখর নাম অনেক ভাবানুষঙ্গ বহন করে চলেছে। এধরণের আরও অনেক দৃষ্টান্ত দিয়ে জাতি ও রাগের পার্থক্য নিয়ে অনেক মতামত তৈরী হয়েছে। অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা 'জাতি' শব্দটিকে জাতিগত অর্থে নিয়ে বলছেন 'জাতি' ও রাগ (ইং মেলডী) কখনও এক হিসাবে

ভরত মনে করেননি। বাস্তবিক, একটু বিচার করে দেখলে এই 'জাতি' শব্দের ব্যবহার ঠিক 'রাগ' এই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছিল কিনা তাতে যথেষ্ট সন্দেহ জাগে।

ভরতমুনি দশবিধ 'জাতি' লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন যে গ্রহ, অংশ, তার, মন্দ্র, ন্যাস, অপন্যাস, অল্পত্ব, বহুত্ব, ষাড়ব, ঔড়ব এইগুলির সাহায্যে জাতি নির্ণয় করতে হবে। এর মধ্যে 'অংশ'কে জাতি লক্ষণের প্রধান বলে উল্লেখ করেছেন। এখানে অংশের প্রয়োগ বহুলত্বের কথা অবশ্যই বলা হয়নি অথচ অংশের মাধ্যমে রস ভাবাদির প্রকাশকে অংশের একটি লক্ষণ হিসাবে দেখার কথা। ভরতমুনি অংশের দশলক্ষণের মধ্যে একটি লক্ষণ বলে উল্লেখ করেছেন। গীতের রসভাবাদি অনুসারে 'জাতি' প্রয়োগ প্রসঙ্গে যেখানে বলবান স্বর প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে সেখানে কিন্তু এই বলবান স্বর যে 'অংশ' স্বর একথা ভরত বলেননি। তাহলে অংশ স্বর, যেটা জাতি লক্ষণ বিচারের সর্বপ্রধান বলে বিবেচিত হত তার বহুল প্রয়োগ নিশ্চয় আবশ্যক ছিল না এবং গীতের সঙ্গে জাতি প্রয়োগের সময় 'অংশ' স্বর তার লক্ষণ গুলোর পরিপ্রেক্ষিতে বিরাজিত থাকলেও অন্য কোনও স্বরের (রসভাবাদি অনুযায়ী) বলবান প্রয়োগ করা হত এই তত্ত্বই এই সব মতামত থেকে জানা যায়।

ভরতমুনি ষড়জ ও মধ্যম গ্রামের মধ্যে সবশুদ্ধ তেষট্টি অংশ স্বরের কথা বলেছেন। সুতরাং জাতিলক্ষণ পরিচয় হিসাবে অংশ স্বরটি যে কোনটি এবং তার প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য যে কি হবে সেইটাই ধোঁয়াটে থেকে যাচ্ছে। ভারতীয় সঙ্গীতের ওপর যাঁরা মাথাঘামিয়েছেন তাঁরাও খুব স্পষ্ট ভাবে বিষয়টিকে নিয়ে আলোচনা করেননি। তবে একথা প্রায় সকলেই স্বীকার করেছেন যে জাতি প্রয়োগ থেকে 'রাগ' প্রয়োগের বিবর্তনের কাল আনুমানিক খৃঃ পঞ্চম থেকে সপ্তম শতকের মধ্যে,—অর্থাৎ মতঙ্গ প্রণীত 'বৃহদ্দেশীর' কালে।

'জাতি' ও 'অংশ' স্বরকে ভরতের উত্তরসূরীরা যথাক্রমে 'রাগ' ও 'বাদী' বলতে শুরু করলেন ঐ পঞ্চম-সপ্তম শতক থেকে। অর্থাৎ 'রাগ' অর্থে 'জাতিরাগ' এই ব্যবহার প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীততত্ত্ব ও আধুনিক মতামতের একটা মিলন সেতু। 'রাগ' সঙ্গীতের ব্যবহার ও জাতিরাগের ব্যবহারকে যদি সমভিত্তিক বলে মনে করা যায় তাহলে রাগ সঙ্গীতকেও রসভাবাদির উদ্রেককারী বলে প্রাচীন মতামতের সমর্থন সংযোগ করার সুবিধে হয় এই ভেবেই বোধকরি যেটুকু ধোঁয়াটে ভাব আছে তা দূর করবার জন্যে মতঙ্গ মুনি অংশ স্বরকে বাদী স্বর বলে উল্লেখ করলেন এবং অংশ স্বরের লক্ষণ হিসাবে তার বহু প্রয়োগের কথাও দশ লক্ষণের মধ্যে জুড়ে দিলেন। সুতরাং বাদীস্বরের পরিচয় হিসাবে 'প্রয়োগ বহুলত্বাৎ বাদী' ও 'অংশ' স্বরের পরিচয়ের মধ্যে কোনও বিভেদ আর থাকল না। শার্ঙ্গদেবও এই মতের প্রতিধ্বনি করে বললেন যে অংশ স্বর হচ্ছে 'জীবস্বর' অর্থাৎ জাতির মধ্যে প্রাণস্বরূপ স্বর।

ভরতমুনি কিন্তু অন্যত্র বাদী, সংবাদী, অনুবাদী বিবাদী ইত্যাদি স্বরের কথা শুধু উল্লেখ করেন নি পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন এবং রাগ রাগিণীর পরিচয় প্রসঙ্গে এখনও এই শব্দগুলি সম্বন্ধে ভরতমুনির বক্তব্য ভারতীয় সঙ্গীততত্ত্বের আসরে সর্বপ্রধান ভূমিকা নিয়েই বিরাজমান। সুতরাং একথা বললে ভুল হবে না যে রাগ রাগিণীর ব্যবহার (জাতি প্রয়োগ ছাড়া) ভরতমুনির আমলেই ছিল এবং সেই ব্যবহার ও জাতিরাগের ব্যবহার কখনই এক অর্থে গ্রহণ করা যায় না। পণ্ডিতেরা বলেন,

যে ঠিক অর্থে গ্রহণ করা না গেলেও জাতিরাগের প্রয়োগ পদ্ধতির সঙ্গে রাগসঙ্গীতের যথেষ্ট মিল ছিল। এবং এই মিল ছিল বলেই 'রাগের' ব্যবহার নিয়ে ভরতমুনি আর আলাদা করে কিছু বলার প্রয়োজন মনে করেননি। এই যুক্তিকে মেনে নিলে বলতে হয় যে নাট্যসঙ্গীতে সাধারণ রাগরাগিণীর (অর্থাৎ এখনকার মতে) ব্যবহার না করে যেহেতু ভরতমুনি জাতিরাগের ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন সেই হেতু জাতিরাগের কথাই তিনি বলেছেন। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে যে ভরতমুনি গীতের মধ্যে রাগসঙ্গীতের প্রয়োগ নির্দেশ দেননি।

এ সম্বন্ধে মতঙ্গের উক্তি মেনে নিলে অবশ্য এত যুক্তি তর্কের অবতারণা করতে হয় না। মতঙ্গ মুনি বৃহদ্দেশীতে 'রাগ' সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার প্রারম্ভে বলেছেন, 'যে রাগ মার্গ সম্বন্ধে ভরতমুনি ইত্যাদি তাঁর পূর্বসূরীরা কিছু বলেননি তিনি এবার সেগুলি লক্ষণ সহ বলছেন।' যাই হোক, এই মতঙ্গ মুনি রাগমার্গ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য পেশ করলেন এবং তাঁর পর থেকেই গ্রামরাগগুলি নাট্য ব্যাপারে ক্রমশঃ 'জাতি'র স্থান অধিকার করতে শুরু করল। কাশ্যপতো পরিষ্কার নাটকে রাগসঙ্গীতের ব্যবহারের রীতি প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং রাগসঙ্গীত যে 'জাতি' স্থান অধিকার করেছে সেকথা তাঁর লেখায় স্পষ্টই ফুটে উঠেছে। কিন্তু এ সমস্ত উপদেশই হয়েছে গীতে সুর যোজনার উদ্দেশ্য নিয়ে। গানে সুর যোজনা এবং তার সৌন্দর্য বিচার আপাততঃ আমরা মুলতুবী রেখেছি যন্ত্রসঙ্গীতের বিচারকে প্রাধান্য দেবার জন্যে। সুতরাং নাট্যশাস্ত্রে গান বাদ দিয়ে কেবলমাত্র যন্ত্রসঙ্গীতের প্রয়োগ নিয়ে ভরত মুনির কি উপদেশ আছে তার পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

নাট্যশাস্ত্রে 'পূর্বরঙ্গ' নামে একটি অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে। এই অনুষ্ঠান একটি নাট্যপূর্ব ঘটনা এবং তার ভিন্নরকম প্রয়োগবিধি উপদিষ্ট হয়েছে। নাট্যশাস্ত্রের আলোচনায় অনেক বিশেষজ্ঞরা এই 'পূর্বরঙ্গ' ক্রিয়াটি মূল নাট্য প্রয়োগের দিনই প্রয়োজিত হত বলে মনে করেন। কিন্তু এই পূর্বরঙ্গের বিভিন্ন প্রয়োগের নামকরণ ও তার ব্যাখ্যা পর্যালোচনা করে দেখলে এই ধারণা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। যাই হোক, পূর্বরঙ্গ অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রাথমিক ও অবশ্য করণীয় একটি অংশকে বহির্গীতি আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অন্তর্যবনিকার অন্তরালে গীত-বাদ্য ও যবনিকা উদ্ঘাটনের পর নৃত্যকর্ম এই বহির্গীতি কর্মের মধ্যে উপদিষ্ট হয়েছে। এই বহির্গীতিকেই পূর্বে 'নির্গীত' এই আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। এবং এ সম্পর্কে ভরতমুনির উপদিষ্ট একটি কাহিনীর মাধ্যমে এই নামকরণের কাহিনীটি নাট্যসঙ্গীতে যন্ত্র-সঙ্গীতের প্রয়োগ বিষয়ে তাৎপর্যপূর্ণ।

স্বর্গে অনুষ্ঠান করেছেন নারদাদি গন্ধর্বগণ। শ্রোতা হলেন দেবতা ও দানবেরা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের কেউই সেখানে নেই। সেখানেই নৃত্য, গীত ও বাদ্যসম্বলিত 'নির্গীত' সপ্তরূপে প্রবর্তিত হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দেবস্তুতির প্রাধান্য ছিল। সপ্তরূপে 'নির্গীতের' অর্থ হল—একক গীত, একক বাদ্য, একক নৃত্য গীত-বাদ্য, গীত-নৃত্য, বাদ্য নৃত্য এবং গীত-বাদ্য নৃত্য। এর মধ্যে গীতাংশে ছিল দেবস্তুতি। তাই শুনে দানবরা ক্ষুব্ধ হলেন। তাঁরা নিজেদের মধ্যে অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, 'ঠিক আছে আমরা দানবস্তুতি সম্বলিত ও সপ্তরূপ প্রবর্তিত নির্গীত প্রয়োগ করব। সেইমত দানবরা ও দৈত্যগণ তোষণকারী গীত সহযোগে বারংবার নির্গীতি প্রয়োগ করতে লাগলেন। এবার দেবতাদের অসন্তুষ্ট পালা। তাঁরা নারদকে এই নির্গীত বন্ধ করে দেবার পরামর্শ দিলেন।

নারদ কিন্তু এই উৎকৃষ্ট বস্তুকে সম্পূর্ণ বর্জন করতে রাজি হলেন না। শুধু দেবস্তুতির অংশটুকু বাদ দিয়ে এই নির্গীতি চালু করা হল। শেষে বলা হয়েছে এই নির্গীত দৈত্যগণের স্পর্ধা ও দেবগণের অভিমানের কারণ হয়েছিল বলে এর নাম হল বহির্গীতি।

এখন প্রশ্ন হল যে এই 'নির্গীতি' শব্দের অর্থ কি গীত-বিবর্জিত শুদ্ধবাদ্য যন্ত্রসঙ্গীত যাকে শার্ঙ্গদেব 'শুষ্ক' আখ্যা দিয়েছিলেন। অবশ্যই তা নয় এবং এই কাহিনীর মধ্যে দিয়ে সেকথা পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। অথচ এই 'নির্গীত' শব্দটিকে নিয়ে অনেকেই ভিন্ন মত প্রকাশ করে থাকেন। এখন দেবস্তুতি-বর্জিত কণ্ঠ-সঙ্গীত সহযোগে নির্গীত বস্তুটি যে কি সেটা ভাল করে বোঝা দরকার।

নাট্যশাস্ত্রে পূর্বরঙ্গ সম্বন্ধে উপদেশ দেবার সময় ভরতমুনি সর্বপ্রথম বহির্গীতি সম্বন্ধে উপদেশ দেন। বহির্গীতি প্রধানতঃ অন্তর্যবনিকার অন্তরালে প্রয়োগ করা হত শুধু নৃত্যাংশ ছাড়া। প্রথমে তন্ত্রী যন্ত্র ও তালবাদ্য সহযোগে যন্ত্রসঙ্গীত শুরু হবে এবং সেই সময়ে আসন বিছিয়ে একে একে গায়ক গায়িকারা এবং অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র-শিল্পীরা আসন গ্রহণ করবেন এবং সেই সঙ্গে গীতও আরম্ভ হবে। তারপর যবনিকা উন্মোচন করে মদ্রকাদি গীত এবং নৃত্যপাঠাদির সঙ্গে নৃত্যকর্ম প্রয়োগ করা হবে। মোটামুটি ভাবে এই হল বহির্গীতির ক্রিয়াক্রম। এই বহির্গীতি আগে নির্গীত এই নামেই চলত এবং বহির্গীতির যে অংশ অন্তর্যবনিকার অন্তরালে সংঘটিত হত সেই অংশের মধ্যেই ছিল দেবস্তুতি, যখন বহির্গীতি নামে প্রচলিত হল তখন এই দেবস্তুতির অংশটুকু ছাঁটাই করে কেবল কণ্ঠ-ধ্বনির সাহায্যেই অনুষ্ঠান হত। সেই কণ্ঠ-ধ্বনি ছিল গেয় পদ বর্জিত আলাপ বা তেনেনা তিরট ধরণের বর্ণ উচ্চারণ। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে গেয় পদবর্জিত যে কণ্ঠ-সঙ্গীত সেটা হল সমগ্র নির্গীত অনুষ্ঠানের অংশ বিশেষ। নির্গীত মানে গীত বর্জিত সঙ্গীত নয় গীতের পরাকাষ্ঠা প্রাধান্য সঙ্গীত। বহির্গীতের সম্পূর্ণ প্রয়োজনা এবং নির্গীতকে বহির্গীতি হিসাবে নামকরণ করলে এই অর্থ-ই যথার্থ বলে মনে হয়।

এখানে একটা কথা অবশ্যই বলে রাখা দরকার যে সমগ্র 'পূর্বরঙ্গ' কর্মটিকে কেউ বা নাট্য-প্রয়োগের দিনই প্রযোজ্য হত বলে মনে করেন আবার কেউ বা পূর্বরঙ্গ কর্মকে রিহার্সাল বলে গণ্য করেন। আমরা এখন এই বাদানুবাদ প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে চাই না। তবে পূর্বরঙ্গকে রিহার্সাল হিসাবে গণ্য করলে যন্ত্রসঙ্গীত বাদনকেও গানের সঙ্গে বাজনার রিহার্সাল ধরে নেওয়া যেতে পারে।

যাই হোক মূল বক্তব্য হল এই যে এই সব বাজনার সুর সংযোজনায় জাতি প্রয়োগ করা হত বলেই ভরত মুনি উল্লেখ করে গিয়েছেন। এবং জাতি প্রয়োগের সময় গীত বস্তুর রস ভাবাদি নিঃসরণের নির্দেশ রক্ষা করবার নির্দেশ ভরতমুনি দিয়ে গিয়েছেন একথা অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হবে।

রূপকথাকার শরৎচন্দ্র

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

কিছুদিন আগে দত্তা চলচ্চিত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে এক বিখ্যাত ইংরেজী দৈনিক আলোচনার শিরোনামা দিয়েছিলেন, 'দ ম্যাজিক অব শরৎচন্দ্র'। লিখেছিলেন, 'ছবির সাফল্যের কারণ পরিচালক আদ্যোপান্ত গল্পটিই তুলেছেন। কিছুই বাদ দেননি, কিছুই বদলান নি। মাত্র দুতিন জায়গায় সামান্য কিছু যোগ করেছেন, সেটাই ত্রুটি। না করলেই ভাল করতেন।'

এ সমালোচনার সঙ্গে আমিও একমত। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এ ম্যাজিকটা কি?

আমি বলব—এ রূপকথার ম্যাজিক। সংসারে যা হয় না। হলে খুশী হতুম সেই অসম্ভব কল্পনাকে বিশ্বাস্য করে তুলে শরৎচন্দ্র আমাদের মানসজগতে এক রূপকথার রাজ্যের দ্বার খুলে দিয়েছেন। সাধারণত যাকে আমরা রূপ কথা বলি তা ছেলে-ভুলোবার জন্যে লেখা বা বলা—তাদের ভোলানো সহজ; শরৎচন্দ্র আরও শক্তিমান, তিনি সাবালকদের, কিশোর থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলকে ভুলিয়েছেন।

দত্তার কথাই ধরুন, অপদার্থ বন্ধুর ছেলেকে বিলেত পাঠিয়ে বড় ডাক্তার করে আনলেন, সেকালে—ধরুন আজ থেকে পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে—সে বিলেত থেকে খুব বড় ডাক্তার হয়ে ফিরেও উড়নি গায়ে দিয়ে ঘুরে বেড়ায়; বলে, যদি কোন ধনীলোক তাকে শুধু দুটি খাওয়া পরার ব্যবস্থা করে দিত—সে নিজের রিসার্চ নিয়ে থাকত, যে রিসার্চে পরের উপকার হয়, গরীবেরা দুশ্চিকিৎস্য রোগ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পায়; সে সব চরিত্র বলিষ্ঠ সুদর্শন ও মহাপ্রাণ। ঠিক তার কল্পনামতোই, ডাকসাইটে দুঁদে জমিদারের নাৎনী ও মেয়ে যে অনায়াসে কর্মচারীদের শাসনে রেখে জমিদারী চালাতে পারে—ওর প্রেমে পড়ে গেল, দুজনের বিবাহ হল— অর্থাৎ তাদের সেই 'দুটি অন্নবস্ত্রের' সংস্থান হয়ে গেল। চক্রান্তকারী লোভী রাসবিহারী আর তার ছেলে জব্দ হল—হিন্দী ছবির ছকে বাঁধা গল্পের মতোই। সংসারে এমন ঘটলে আমরা খুশী হই, কিন্তু ঘটে কি?

ধরুন 'পরিণীতা'। যে যুগে মাসিক কুড়ি-পঁচিশ টাকা আয়েও চার-পাঁচ জনের একটি সংসার চলে যেত, সচ্ছলে না হোক চলত কোনমতে—সে যুগে গরীব মামা বাড়ীতে বহু কন্যার সঙ্গে মানুষ হওয়া ললিতা গোটা একটাকা ভিক্ষে দেয়, পাশের বাড়ির শেখরদার আলমারীর চাবি থাকে তার কাছে—সেই ললিতার সঙ্গেই যার সামান্য ভুল বোঝাবুঝির পর মধুর মিলন ঘটল রূপকথার কাহিনী ছাড়া কি?

তেমনিই চিরদিন আমাদের সংসারে জায়ে জায়ে বিবাদ বিরোধ, 'মেইজো বাঁটা ঝগড়া' তো প্রবাদেই দাঁড়িয়ে গেছে। শরৎবাবুর গল্পে দেখি এক জা আর এক জায়ের ছেলের জন্য প্রাণ দিতে যায়, বৌদি দেবরের প্রতি মমতায় নিজের মা এমনকি স্বামীকেও পর করতে দ্বিধা করে না; কলহপরায়ণা নীচ বড় জায়ের ভাইয়ের জন্য ছোটজায়ের প্রাণ বেরিয়ে যায়; বিলেত ফেরৎ স্বামী তার পরিত্যক্ত পতিত ঘরের মেয়ে স্ত্রীর কাছে ফিরে আসে। এই একই ধারার মেয়েদের রসবতী কি সতী

লাঞ্ছিতা হয়, তাকে বাবু অভিভাবকের মতো ভয় করে—(সতীশের মদের গ্লাস উপুড় করে দিয়ে মুখে ছোট এলাচ ফেলা স্মরণ করুন) বৃদ্ধ কাশীবাসী ব্রাহ্মণ সব জেনেও কুলত্যাগিনীকে আশ্রয় দেয়, তার হাতে খায়, ভবঘুরে রুগ্‌ণ উৎসাহহীন উদ্যমহীন একটা মধ্যবয়সী লোকের জন্যে বিখ্যাত বাইজী সর্বত্যাগিনী হয়, তারও পরে ভাল ভাল মেয়ে তার প্রেমে পড়ে। চোর চরিত্রহীন অত্যাচারী প্রৌঢ় জমিদার একবার দেখাতেই এক অপরিচিতা পল্লীবাসিনী ভৈরবীর হাতে নিজের জীবন-মরণের ভার চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়।

এ সবই রূপকথার মতো অবাস্তব নয় কি?

একেবারে অসম্ভব হয়ত নয়—তবে অবিশ্বাস্য। শরৎচন্দ্রের জাদু এইখানেই। তিনি এই সব অবিশ্বাস্য রূপকথাকে বিশ্বাস করিয়ে ছেড়েছেন, অবাস্তবকে বাস্তব প্রতিপন্ন করেছেন।

আমার মনে আছে, বহুকাল আগে আমার ছোটবেলায় আমার মা একদিন দিদিমা সম্পর্কিত একজনকে নারান ভট্টাচার্যের একখানা বই পড়িয়ে শোনাচ্ছিলেন (নারায়ণ ভট্টাচার্য বলেই মনে হচ্ছে, এক কালে তিনি বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন—এখন সবাই ভুলে গেছে তাঁর কথা।) খুবই দুঃখ কষ্টের কাহিনী—অবিচার তো বটেই—খানিকটা শোনারপর দিদিমা মুখ ঘুরিয়ে বললেন, নে বাবা তোর ঐ নাকে-কান্না রাখ দিকি। জীবনে তো দুঃখ কষ্ট আছেই, তাই নিয়েই সারাজীবন কাটল বলতে গেলে—দুটো বই পড়ব একটু শান্তির জন্যে সেখানেও যদি এইসব দুঃখের কান্না শুনতে হয় তাহলে আর প্রাণ বাঁচে না।

কথাটা তখনই মনে লেগেছিল।

শরৎবাবু নিজেও বলেছিলেন, 'চাষী মজুরের দুঃখের অভাবের কাহিনী মধ্যবিত্তরাই পড়েন—দুঃখীরা পড়ে রামায়ণ মহাভারত, যাত্রা দেখে ধ্রুব উদ্ধার, বিদ্যাসুন্দর। যে জীবন তারা কখনও পাবে না, কল্পনায় সেইখানে বিচরণ করে।' তাঁর ভাষা ঠিক মনে নেই, তবে বক্তব্যটা এই। এই ধরণের কথা তাঁর লেখাতেও আছে। তিনি তাঁর দেশবাসীকে ঠিক চিনেছিলেন। বলেছিলেন, 'আইডিয়ার জন্যে প্রাণ দিতে পারে শিক্ষিত মধ্যবিত্তরাই।' অর্থাৎ সমাজের নিচের তলায় মানুষ যারা মার খাচ্ছে তারাও নয়, ওপরে যারা সুখে স্বচ্ছন্দে অভ্যস্ত, তারাও না।

পাঠকের মনের খবর,নিখুঁত জানতেন বলেই শরৎবাবু তাদের জন্যে বর্তমানকালের পৃষ্ঠপটে বর্তমান মানুষের সাজপোশাকে একধরণের রূপকথাই বলেছেন এবং তাঁর অসাধারণ শক্তিতে তাদের বিশ্বাস করিয়ে ছেড়েছেন। সম্প্রতি তাঁর 'মহেশ' গল্প নিয়ে—অনেক কথাই বলা হয়। তাঁর মানব দরদের নমুনা হিসেবে অনেকেই গল্পটি উল্লেখ করেন (এটা যেন ফ্যাশানে দাঁড়িয়ে গেছে।) প্রায় তাবৎ আলোচকই। মহেশ জাতীয় আরও কয়েকটি গল্পও আছে, কিন্তু শরৎবাবু যদি শুধু ঐ জাতীয় গল্পই লিখতেন তাহলে তাঁর অবস্থা জলধর সেন বা নারায়ণ ভট্টাচার্যের থেকে খুব ভাল থাকত বলে মনে হয় না। কারণ মানুষের ওপর মানুষের এই শ্রেণীর অত্যাচার অবিচার শোষণ নিয়ে অনেক গল্প বাংলাসাহিত্যে আছে, অনেক শক্তিমান লেখক একথা লিখেছেন—কথাটা খুব নতুন কিছু নয়।

মহাপ্রাণ কৃষ্ণরাম বসু

গোবিন্দগোপাল সেনগুপ্ত

বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি। যে সব মহাপুরুষের বিত্তাবত্তায়, ত্যাগে বদান্যতায় এ-দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে আমরা তাঁদের কথা খুব সহজেই ভুলে যাই। আমাদের কারবার বর্তমানকে নিয়ে। মহাপুরুষদের নিয়ে আমরা কিছুদিন ঢাক, ঢোল বাজাই, তাঁকে মানুষ থেকে দেবতার পর্যায়ে তুলে ধরে মাতামাতি করি এবং কিছুকাল পরে জলে মৃৎপ্রতিমা বিসর্জনের মত তাঁদের কথা ভুলে যাই।

কৃষ্ণরাম বসু বীরভূম জেলার সিউড়ী সহরে বাংলা ১২১৪ সালে শ্রীশ্রীরাধাবল্লভজী ও শ্রীশ্রীরাধারাণীর বিগ্রহ স্থাপন করে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই শ্রীবিগ্রহ ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করে তিনি সিউড়ীবাসীর ধর্মভাব জাগ্রত করেন। ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলার তড়া নামক গ্রামে কৃষ্ণরাম বসু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম দয়ারাম বসু।

নবাব সিরাজউদ্দৌলার সৈন্যরা কলকাতা লুঠ করলে সন্ধির পর ইংরেজরা ক্ষতিপূরণ পান। এই টাকা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরণ করার জন্য কমিশনারের উপর ভার দেওয়া হয়। দয়ারাম বসুকেও কমিশনাররূপে মনোনীত করা হয়। কৃষ্ণরাম বসু পাঠ সমাপ্ত করে পিতার কাছ থেকে কিছু অর্থ সাহায্য নিয়ে কলকাতায় নুনের ব্যবসায়ে নিযুক্ত হন। এই ব্যবসায়ে তাঁর বেশ নামডাক হয়। তাঁর কার্যদক্ষতা দেখে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মাধ্যক্ষগণ তাঁকে হুগলীর দেওয়ান পদে নিযুক্ত করেন। বেতন ছিল মাসিক ২০০০ টাকা। এই কার্যে নিযুক্ত থেকে তিনি প্রভূত অর্থের মালিক হন এবং একজন খ্যাতনামা জমিদারে পরিণত হন।

কৃষ্ণরাম বসু ছিলেন পরম ভক্ত এবং দানবীর। তিনি জনসাধারণের হিতার্থে এবং পুণ্য কার্যে প্রভূত অর্থ দান করতেন। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে (বাংলা ১১৭৬) দুর্ভিক্ষের সময় তিনি লক্ষ টাকা মূল্যের চাল কিনে দুঃস্থদের মধ্যে বিতরণ করেন। তিনি কলকাতার শ্যামবাজারে বাস করতেন।

কৃষ্ণরাম বসু যশোহরে মদনগোপাল জীউ এবং বীরভূমের সিউড়ি সহরে রাধাবল্লভ জীউ ও শ্রীশ্রীরাধারাণীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। বিগ্রহের সেবা পূজার জন্য তিনি উভয় স্থানেই যথোপযুক্ত জমি দান করেন। কাশীর বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মাহেশের বিখ্যাত রথ তাঁরই অর্থে তৈরী হয়। ভাগলপুরে জাহাঙ্গীরা নামক গ্রামের সন্নিকটে গঙ্গার মধ্যস্থলে অবস্থিত একটি রমণীয় পাহাড়ের উপর একটি শিব-মন্দির তৈরী করিয়ে দেন। মন্দির রক্ষা এবং বিগ্রহের সেবাপূজার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করেন। জনসাধারণের সুবিধার্থে নিজ জন্মভূমি হুগলী জেলার তড়া গ্রাম থেকে মথুরাবাটি পর্যন্ত একটি সুন্দর পাকা রাস্তা নির্মাণ করান। ঐ পথ তাঁর নামানুসারে 'কৃষ্ণ জাঙ্গাল' নামে পরিচিত হয়। গয়ার রামশীলা পাহাড়ে তীর্থযাত্রীগণের সহজে আরোহণের জন্য তিনি বহু অর্থ ব্যয়ে সিঁড়ি তৈরী করে দেন। এই রামশীলা পাহাড়ে পিণ্ডদান করতে হয়। যাত্রীদের অসুবিধা ও কষ্ট দেখে তিনি এই পুণ্যকর্মে ব্রতী হন।

কৃষ্ণরাম পুণ্য-কর্ম করতে সব সময়েই আগ্রহী ছিলেন। তখনকার দিনে হাঁটা-পথে তীর্থযাত্রা করতে হত। পুরীগামী যাত্রীদের অসুবিধা দূর করার জন্য তিনি কটক থেকে পুরী পর্যন্ত রাস্তার দু-ধারে আম্রবৃক্ষ রোপণের ব্যবস্থা করেন—যাতে যাত্রীরা গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করতে পারে এবং ক্ষুধার্ত হলে সুমিষ্ট আমের সদ্ব্যবহার করতে পারে তার জন্য এই ব্যবস্থা। পুরীধামের প্রবেশ পথে তিনি যাত্রীদের সুবিধার্থে একটি বড় পুষ্করিণী খনন করিয়ে দেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার রথগুলি নির্মিত হয়ে প্রতি বৎসর যাতে সুষ্ঠুভাবে চলে তার জন্য পুরীর রাজার হাতে প্রচুর অর্থ অর্পণ করেন।

কৃষ্ণরাম শেষ বয়সে কাশীতে বাস করতেন। কৃষ্ণরাম ছিলেন পরম বৈষ্ণব। শাস্ত্রালোচনা, ইষ্ট দেবতার ধ্যান ও পুণ্য কার্য সাধন নিয়ে তিনি জীবন-যাপন করতেন। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে এই দানবীর ভক্ত বৈষ্ণব পরলোকে গমন করেন। কলকাতার শ্যামবাজারে 'কৃষ্ণরাম বসু স্ট্রীট' তাঁর পুণ্য নাম বহন করছে।

মুর্শিদাবাদের পট ও পটুয়া

ভোলানাথ ভট্টাচার্য

সর্বভারতীয় চিত্রাদর্শ থেকে খানিকটা সরে এসে আঞ্চলিক ধারার যে অস্পষ্ট রূপ গুপ্তযুগের শেষপর্বে দেখা দিয়েছিল তার সংহতি ও পরিণতি দিনের আলোর মত স্পষ্ট হল পাল যুগে এসে। পাল যুগের বাঙালী চিত্রকর প্রাচীরচিত্রের আদর্শকে অনুসরণ করে পুঁথি অলঙ্করণের কাজ করেছিলেন, সৌভাগ্য আমাদের, সেই পুঁথিনমুনার যৎসামান্য মহাকালের কোপ থেকে আত্মরক্ষা করতে পেরেছে। ইতিহাসের বিবিধ উপাদান থেকে জানা যায় পাল আমলে মঠ, মন্দির, চৈত্য এবং বিহার প্রভৃতিতে চিত্রের প্রাধান্য ছিল। স্বাভাবিক কারণে অনুমিত হয়, ঐ চিত্রসম্ভারও পৌথচিত্রের সর্বভারতীয় আদর্শ থেকে অনেক দূরের সামগ্রী ছিল এবং প্রাচীর চিত্রের ধারার সঙ্গে তার আত্মীয়তা ছিল সবচাইতে বেশী। এমন কি পাষাণপট্টে ও ধাতুপট্টে তৎকালীন বাঙালী কলাকার যে তীক্ষ্ণ এবং কৌণিক রেখায় নিজেকে প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছেন সেখানেও তার মূলধর্ম থেকে বিচ্যুতি ঘটেনি।

দশম থেকে অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত পূর্বীধারার চিত্রাদর্শ বারে বারে প্রভাবিত হওয়া এবং প্রভাব বিস্তার করার একটা চক্রবৎ পদ্ধতিতে ঘুরপাক খেয়েছে। শেষপর্যন্ত প্রত্যয়শীল স্বচ্ছ টানের যে রৈখিক রূপায়ন পূর্বীধারার চিত্রে দেখা দিল বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলের শিল্পসাধনায় তার বিবর্তন ঘটল। এই বিবর্তিত চিত্রাদর্শকে বাঙলা কলম বা বাঙলা লেখা বলা হয়। বাঙলা কলম পট ছাড়া চাল, সরা, লিপিকাজ, নাচের পুতুল, তাস, গজদন্তের কাজ, দারু তক্ষণ, মৃন্ময় মূর্তি, এমনকি পাষাণ ও ধাতুপট্ট প্রভৃতির মাধ্যমে পর্যন্ত নিজেকে প্রকাশ করেছে। চারু ও কারুশিল্পের বিভিন্ন শাখায় আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের এই সগৌরব উপস্থিতি লোকায়ত ধারার ক্ষেত্রে যত সহজ ও সর্বাত্মক, দরবারী ও মঠ-মন্দিরী কলায় কখনো তত স্পষ্ট নয়।

বাঙলা কলমের সুচিহ্নিত লেখনিক বৈশিষ্ট্য আবার স্থানিক কর্ষণার ফলে কখনো অতি সীমিত অঞ্চল বিশেষের ছাপ অঙ্গে মেখে নেওয়ার প্রবণতা দেখিয়েছে। মৃতপ্রায় বাঙলা পটশিল্পের ক্ষেত্রে আজ ঐ বৈশিষ্ট্যের সন্ধান বিবিধ কারণে নিরর্থক হলেও এমন আভাস সুনিশ্চিত বর্তমান যে একসময়ে বাঙলা কলমের আঞ্চলিক ঘরানা এক লহমায় নজরে আসত। বাঙলা লেখার অন্যতম নমুনা-শাখা পটের ক্ষেত্রেও অঞ্চলগত এই লেখনিক বিভিন্নতা যে বর্তমান তা পুরনো পট সংগ্রহ দেখে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা যায়। বাঙলা পটের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের দিকে বছর তিরিশ আগে অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন। কিছুদিন আগে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ আয়োজিত পটপ্রদর্শনী ও সেই সংক্রান্ত সেমিনারে শ্রীপ্রণবরঞ্জন রায় পটের এই অঞ্চলগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেন। বর্তমানে যেহেতু পট নামের শিল্পমাধ্যমটির অবক্ষয়ের শেষ পালা চলছে তাই ঐ ধরনের সন্ধানকার্যে সাফল্য আশা করা অর্থহীন।

বাঙলা কলমের গৌরববৃদ্ধিতে মুর্শিদাবাদের পট ও পটুয়ার অবদান অবশ্য স্বীকার্য। দরবারী ও লোকায়ত উভয় ধারাতে একসময় এই বৈশিষ্ট্য বর্তমান ছিল। নবাবীধারার আঞ্চলিক ঘরানার

তিনে মুর্শিদাবাদ কখন যে বিশিষ্টতা নিয়ে দেখা দিয়েছিল তারই আরেক বিকাশ লক্ষ্য করা যায় ওখানকার অনেক গুলি কারুশিল্পে। সম্প্রতি মুর্শিদাবাদের পটুয়া সম্পর্কে এক ক্ষেত্রসমীক্ষা করা হয়। এই সমীক্ষায় একনজরে যা প্রকাশ পায় তাতে বলা যায়, বাংলাদেশের অন্যান্য অনেক অঞ্চলের মত মুর্শিদাবাদের পট ও পটুয়া নিঃশেষেরে অবক্ষয়ের শিকার। এইদিকে দৃষ্টি রেখে অতিসম্প্রতিকালে লোকশিল্পী সংঘ নামে এক প্রতিষ্ঠান মুর্শিদাবাদের যাবতীয় লোকশিল্প সংরক্ষণ ও পালনের পরিকল্পনা নিয়ে কাজে নেমেছেন। এই প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তা হিসাবে একজন পটুয়াকে নেওয়া হয়েছে।

সমীক্ষায় এই জেলায় পটুয়া বসতি বলতে কয়েকটি কেন্দ্র পাওয়া গেছে।

১। গোকর্ণ: পটুয়া বসবাস ১২ ঘর। বৃত্তিচ্যুতি প্রায় সব পরিবারে ঘটেছে। ব্যতিক্রম লালমোহন এবং অজিত পটুয়া। এঁরা এখনো একমাত্র পটকে সম্বল করে জীবিকা নির্বাহ করেন। বহরমপুর থেকে সরাসরি বাসে কিংবা চেরোটি স্টেশনে নেমে এখানে আসা যায়।

২। দীঘির পাড়: বহরমপুর বা সিউড়ি থেকে এসে কান্দী চার রাস্তার মোড়ে নেমে নারুকান্দী বা ছাতিনাকান্দীর পথ ধরে সামান্য হাঁটলে গুপী সিংহের দুর্গাবাড়ী। বিখ্যাত ভূম্যধিকারী এই সিংহদের একটি ৪২ বিঘের দীঘি রয়েছে একটু তফাতে। লোকে এই দীঘিকে রাজার দীঘি বলে। এই দীঘিকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু লোকশ্রুতিও চলিত আছে। বর্তমানে এই দীঘি আর সিংহদের অধিকারে নেই। দুর্গাবাড়ীতে বসবাসকারী রবিবাবু নামে এক ভদ্রলোক এখানে মাছের চাষ করেন। এই দীঘির ধারে ধারে কয়েকটি পরিচ্ছন্ন মাটির ঘর। পঞ্চাশ-একান্নটি লোক নিয়ে সেখানে নয় ঘর পটুয়ার বসবাস। লোকশিল্পী সংঘের কর্মকর্তা শেক পটুয়া এখানে বাস করেন। শীতের রাতে দুর্গাবাড়ীর শ্রীমান্ কমল সিংহের উৎসাহে শেককে ওখানে এনে কতকগুলি অন্তরঙ্গ কথার সুযোগ হয়েছিল। শেক তাঁর পটুয়াজীবনের গৌরব নিয়ে আর তেমন মাথা ঘামাতে চান না। 'জানেন এখন মানুষ হিসাবে অনুন্নত সম্প্রদায়ের সরকারী সুযোগ সুবিধা কিছু পাওয়া যায় কি না তা নিয়েই মাথা ঘামাচ্ছি। শিল্পী হয়ে কি ছেলেপুলে নিয়ে না খেয়ে মরব?' অথচ দু'পুরুষ আগে এই বাড়ীতে ছিলেন শশি, আশু, সুরেন এবং নব পটুয়া। আশুতোষের ছেলে যোগেশ এবং তার ছেলে হলেন শেক। বৃত্তিচ্যুতির ঘটনা প্রসঙ্গে শেক মুর্শিদাবাদের যে কয়েকটি পটুয়া বসতির কথা বললেন তাহল বেলন, গণকর, মির্জাপুর, কাতুরাট এবং খিরি।

৩। দক্ষিণখণ্ড: সালারে নেমে মাইল দুয়েক গেলে এক পটুয়া বসতির সন্ধান মেলে। এখানকার পটুয়াদের দক্ষিণখণ্ডী পটুয়া বলা হয়। আগে এখানে ৪০ ঘর পটুয়ার বসবাস ছিল। বর্তমানে ৪।৫ ঘর কমে ৩৫।৩৬ ঘরে দাঁড়িয়েছে। বৃত্তিচ্যুতি এখানেও ঘটেছে। ফটিক এই কেন্দ্রের একজন খ্যাতনামা পটুয়া।

৪। বেলডাঙা: উত্তর রাঢ়ের বাইরে এই কেন্দ্রটি অবস্থিত। এখানকার পটুয়ারা পট পুরোপুরি ত্যাগ করে ইসলাম ধর্মে মন দিয়েছেন। কিছুটা আর্থিক সচ্ছলতার সঙ্গে সঙ্গে এঁরা পবিত্র শাসনকে একমাত্র জ্ঞান করে থাকেন।

৫। আয়রা: খড়গ্রামে আয়রার পটুয়ারাও সকলেই মুসলমান হয়ে গেছেন। পট বাদ দিয়ে অন্য যে কোন উপায়ে জীবিকা অর্জন এঁরা শ্রেয় মনে করেন। তাঁদের পারতে কাজ এবং সাপুড়ের

কাজে অনেকেই দক্ষ। বাকি প্রায় সকলেই কৃষিকাজ নিয়ে থাকেন।

৬। পাঁচথুপি : পাঠাপাড়া থেকে সামান্য হাঁটা পথ গেলে পটুয়া বসতি। এখানে আগে এগারো ঘর পটুয়ার বসতি ছিল। বর্তমানে সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে পনেরো ঘর হয়েছে। এখানকার রমজান পটুয়া, হাবল পটুয়া, হাকিম পটুয়া এবং রশিদ পটুয়ার যথেষ্ট খ্যাতি আছে। অবশ্য পটলেখার ব্যাপারটি থেকে এঁরা বহুদিন সরে এসেছেন। এখন অনেকেরই প্রধান জীবিকা পাথার কাজ কিংবা সাপধরা এবং খেলানো। বর্তমান আলোচককে কৃষ্ণলীলা, শিবদুর্গা এবং ভগবতীমঙ্গল পট দেখিয়ে গেয়ে শোনান। ধীর স্থির মধুর কণ্ঠের অধিকারী রশিদ পটুয়া উনি রেডিওতে পটগান করার সুযোগ পেয়েছেন।

সমীক্ষায় প্রকাশ মুর্শিদাবাদের পটুয়ারা (বিশেষ করে উত্তর রাঢ়ের) বেশ কিছুদিন ধরে বীরভূমের পটুয়াদের দিয়ে লেখার কাজ করিয়ে নেন। এই জেলার অনেক পটুয়ার কাছে শিলগী-চাঁদপাড়ার অবনীশ, ফটিক, ভূষণপুর মুবারেশ, কানাচির কানা পাঁচকড়ি অত্যন্ত পরিচিত বীরভূমী পটুয়ার নাম। সম্প্রতি শিবগ্রামের শিবু পটুয়ার (ছুব্‌কি) নামও খুব শোনা যায়। দীঘির পাড়ের শেক পটুয়া বর্ধমান-কাটোয়ার মাধবীতলায় প্রথম বিয়ে করেন (দ্বিতীয়বার করেন খ্যাতনামা খুশি পটুয়ার (১০৩ বৎসর) মেয়ে)। এই সূত্রে কিছু কাটোয়ার লেখা পট ওখানে গিয়েছে। ইটেগুড়ের কেদার এবং উপেনের পট, শিবপাড়ার ভক্তি এবং পাথরে ভক্তির পট, আমাদের সতীশ ও মটরুর পট এঁদের আগের পুরুষে অত্যন্ত সমাদরের সামগ্রী ছিল।

প্রধানত অর্থ-নৈতিক কারণে পট লেখা থেকে মুর্শিদাবাদের অধিকাংশ পটুয়া সরে এসেছেন। সামান্য কয়েকটি ক্ষেত্রে এখনো পট লেখা হয়। বলাবাহুল্য, একমাত্র লাটাই পট লেখা হয়, চৌকশের নামগন্ধ নেই। পাঁচথুপির ভূম্যধিকারী ঘোষমৌলিকদের নিত্যপূজায় একটি চৌকশ কৃষ্ণপট ঐ পরিবারের শ্রীজীব ঘোষমৌলিক মহাশয় বর্তমান আলোচককে দেখিয়েছিলেন। অসাধারণ শিল্পনমুনা এই চৌকশ পট কোন পাহাড়ী কলম সংগ্রহ বলে জানা গেল। কাজেই অতীতেও এখানে চৌকশ পটের তেমন চলন ছিল না। ব্যবসাগত দিক থেকে লাভজনক এমন লেখাইকাজে মুর্শিদাবাদের পটুয়ারা এখানে উৎসাহী। কয়েকটি প্রশংসনীয় লেখা ও গড়ার কাজ রয়েছে কান্দী সিংহদের রাধাবল্লভ মন্দিরের রাসপুতুলে। এগুলি করেছেন দীঘির পাড়ের প্রল্হাদ পটুয়া। মুর্শিদাবাদের পটুয়ারা পদবী হিসাবে 'পটুয়া' ব্যবহারের পক্ষপাতী। পটিদার, পটিকার এবং চিত্রকর প্রভৃতি ব্যবহারে তাঁদের আপত্তি আছে। জেলার মধ্যে যাতায়াতে ওদের বাসের ভাড়া লাগে না।

নজরুল-চর্চা প্রসঙ্গ

জামিল আহমেদ

গত বৎসর ঢাকায় পি. জি. হাসপাতালে কাজী নজরুল ইসলাম শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমানের চুরুলিয়া গ্রামে। তাঁর বাবা ছিলেন গ্রামের মসজিদের একজন খাদেম অর্থাৎ অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মুসলমান পরিবারের রীতি অনুযায়ী নজরুল প্রথমে আরবী শিখেছিলেন এবং বাবার মৃত্যুর পর ঐ মসজিদে কিছুকাল আরবীতে শিক্ষকতা করেছিলেন। সেখান থেকে তিনি লেটুর দলে যান। কবিয়ালদের জন্য গান লিখে দেওয়া তাঁর মুখ্য কাজ ছিল। আসানসোলে কিছুদিন রুটির দোকানে কাজ করেন। তারপর ময়মনসিংহের এক গ্রামের স্কুলে তিনি লেখাপড়া আরম্ভ করেন। বৃটিশ সেনাবাহিনীতে নাম লিখিয়ে সুদূর করাচী গেলেন। ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তিনি করাচীর সেনানিবাসে ফারসী ভাষা শিখেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হল। নজরুল কলিকাতায় এসে সাহিত্যের জগতে নেমে পড়লেন। কবিতা ও গান লেখা এবং পত্রিকা সম্পাদনা করা তাঁর প্রধান কাজ হল। লেটুর দলে থাকতেই গানের হাতেখড়ি হয়েছিল। কলিকাতায় ওস্তাদের কাছে গান শিখে হাত পাকালেন। লৌকিক ধারা ও ধ্রুপদী ধারা দুই তাঁর আয়ত্ত হয়ে গেল। রাজনীতির ক্ষেত্রে স্বরাজ, বঙ্গভঙ্গ, অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও রুশবিপ্লব এ-কটি প্রধান ঘটনা। সাহিত্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পেলেন। ১৯২১ থেকে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দুই দশক নজরুলের সাহিত্যচর্চার কাল। তারপর থেকেই তিনি নীরব অর্থাৎ সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁর মৃত্যু ৩৫ বছর আগেই হয়েছিল।

নজরুল তাঁর জীবদ্দশায় নাকি অসম্ভব জনপ্রিয় কবি ছিলেন। প্রবীণ সূর্যের প্রখর রৌদ্র-কিরণের প্রভাব এড়িয়ে এটা কি ভাবে সম্ভব হল, তা ভাববার বিষয়। বাংলা সাহিত্যের মাথা যাঁরা (মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ) তাঁদের মত শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, পারিবারিক ঐতিহ্য কোথায় তাঁর? নজরুলের যা কিছু এচিভমেন্ট, অসাধারণ প্রতিভার যাদুস্পর্শেই তা সম্ভব হয়েছে। তিনি এক অমিতাভ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। বলতে গেলে, বাংলা সাহিত্যের মোড়টা ফিরিয়ে দিয়ে গেছেন তিনি। আমাদের সাহিত্যের আবেগসর্বস্ব, ভাবালুতা, রোমান্টিকতা, আদর্শবাদিতা, আধ্যাত্মিকতা ও অতীতবিলাসের স্থলে বস্তুনিষ্ঠা ও সমাজচেতনার বীজমন্ত্র তিনি রোপণ করেন। মুক্তবুদ্ধির চর্চা তিনি যে ভাবে করেছেন, অন্য কেউ সেভাবে করেননি। তিনি ছিলেন সকল সংস্কার-বন্ধনের ঊর্ধে। তিনি ব্যক্তি-আমিকে ঈশ্বর অপেক্ষা মূল্য দিয়েছেন। শ্রেণী-স্বার্থের সীমানা ছাড়িয়ে গেছেন এমন শিল্পী বাংলাসাহিত্যে দুর্লভ। মধ্যশ্রেণীর বাইরে প্রলেটারিয়েতের কথা নজরুলের কবিকণ্ঠে সর্বপ্রথম উচ্চারিত হয়েছে। হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতিকে একত্রে বাঁধবার ক্ষমতা তাঁর মত অন্যের মধ্যে দেখা যায়নি। এ ব্যাপারে এখন পর্যন্ত তিনিই অনন্য। গানের সংখ্যার ক্ষেত্রে বাংলা কেন সারা বিশ্বে নজরুলের নাকি তুলনা হয় না। তাঁর গানের মান ও বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। যেভাবেই

দেখি না কেন, নজরুল ইসলাম মোটেই সজাহদে বিকোবার নয়। কিন্তু বাংলার সমালোচনার দিকে তাকালে কি দেখি? নজরুল ইসলাম কি যথাযথ স্বীকৃতি পেয়েছেন? না, তাঁর কবিকর্মের যথাযথ মূল্যায়ন হয়েছে? পশ্চিম বাংলা ও বাংলাদেশ উভয় বাংলার দিকে তাকালে মনে হবে, নজরুল-চর্চা উপেক্ষিত। অথচ গত ৫০ বছরের ইতিহাসের দিকে নজর দিলে দেখা যাবে, নজরুল ইসলাম আমাদের অন্তর্জীবন ও বহির্জীবন, আমাদের ব্যবহারিক জীবন ও ভাবজীবনকে কত আন্তরিকভাবে স্পর্শ করে আছেন। অর্থাৎ নজরুল উপেক্ষিত হবার নয়।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের তুলনা দেওয়ার নয়; রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যে পরিমাণ আলোচনা ও গবেষণা হয়েছে—আজকে তাই নিয়ে গবেষণা করা যায়। সে-তুলনায় নজরুল-চর্চা কত সামান্য। এখানকার পুরো ইতিহাস আমার জানা নেই। খান কতক গ্রন্থ আমার চোখে পড়ে—আজাহারুদ্দিন খানের 'নজরুল সাহিত্য', ডক্টর সুশীলকুমার গুপ্তের 'নজরুল চরিতমানস', মুজাফফর আহমেদের 'কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা' প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের 'কাজী নজরুল', বজেন দাসের 'ঘরের বাইরে নজরুল', বিমল দত্তের 'নজরুল জীবন-চরিত', মধুসূদন বসুর 'নজরুল কাব্য পরিচয়' ইত্যাদি। সম্প্রতি সাহিত্য একাডেমী একটি অনুবাদ Rebel & other Poems প্রকাশ করেছে। গোপাল হালদারের Kazi Nazrul Islam। এছাড়া পত্র-পত্রিকায় নানা প্রবন্ধ আছে। কলিকাতায় নজরুল একাডেমী আছে শুনেছি কিন্তু এর কার্যক্রম সম্বন্ধে আমি পরিচিত হইনি। কিছু গানের স্বরলিপির বইও রেকর্ড আছে। যে ভাবেই হোক না কেন, নজরুল-স্বীকৃতির ক্ষেত্রে এগুলি খুবই অপ্রতুল।

বাংলাদেশেও নজরুলচর্চা বেশিদূরে অগ্রসর হয়নি। নজরুল সেখানে 'জাতীয় কবি' হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। ঢাকায় 'নজরুল একাডেমী' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কয়েক বছর আগে। তার প্রথম কাজ 'নজরুল একাডেমী পত্রিকা' বের করা। প্রথম দিকে নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছিল কিন্তু এখন খুবই অনিয়মিত হয়ে পড়েছে। সেখানে 'নজরুল মিউজিয়াম' করার কথা ছিল, কিন্তু কাজ বেশিদূর এগোয়নি। কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় 'নজরুল রচনাবলী' তিন খণ্ড পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। সেকালের 'বাংলা উন্নয়ন বোর্ড' এগুলি প্রকাশ করে; বর্তমান প্রতিষ্ঠানটি 'বাংলা একাডেমী'র অঙ্গীভূত হয়েছে। আলোচনা মূলক বইএর নিরূপ একটি তালিকা নির্ণয় করা যায় তবে তাতে উল্লেখযোগ্য বই কমই আছে।

সৈয়দ আলী আহসান—নজরুল ইসলাম (১৯৫৪)
খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন—যুগস্রষ্টা নজরুল (১৯৫৯)
মোহাম্মদ শাহদুল্লাহ—নজরুল ও আধুনিক বাংলা কবিতা (১৯৬৩)
আবদুল কাদির (সম্পাদিত)—নজরুল-পরিচিতি (১৯৬৫, ৩য় সং)
সুফী জুলফিকার হায়দার—নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায় (১৯৬৪)
মীর আবুল হোসেন (সম্পাদিত)—নজরুল সাহিত্য
সৈয়দ আলী আশরাফ—নজরুল জীবনে প্রেমের এক অধ্যায় (১৯৬৭)
মোস্তাফা নূর-উল ইসলাম (সম্পাদিত)—নজরুল (১৯৭০)
রাজিয়া সুলতানা—নজরুল ইসলামের কথা সাহিত্য (১৯৭৫)

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী—Poet Nazrul

কবির চৌধুরী (অনূদিত)—Lyre of the fire

এর সঙ্গে পত্র-পত্রিকায় কিছু ভাল প্রবন্ধ, স্বরলিপি খান কতক বই এবং গানের রেকর্ড যোগ করা যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদের পাশে নজরুলকে সমাহিত করা হয়েছে, সেখানে একটি উচ্চমানের 'স্মৃতিসৌধ' নির্মাণ করা হবে বলে শোনা যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নজরুলকে সম্মানসূচক 'ডক্টরেট ডিগ্রি' দিয়েছে গত ১৯৭৪ সালে। বাংলাদেশের রেডিও ও ঢাকার টেলিভিশনে নজরুলগীতি নিয়মিত প্রচারিত হয়। নজরুল-গানে সোহরাব হোসেন, খালেদ হোসেন, ফেরদৌসী রহমান, ফিরোজা বেগম, আঞ্জুমান আরা বেগম, শাহনাজ মুক্তাদি প্রমুখ নাম করেছেন। নজরুল 'জন্ম-জয়ন্তী' নিয়মিত পালিত হয় শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে। বাংলাদেশে নজরুল-চর্চার মোটামুটি এটাই সমীক্ষা। বলা বাহুল্য, গুণ, মান ও সংখ্যার দিক থেকে এসব প্রয়াস প্রত্যাশিত ফল লাভ করেনি।

গত ২২ জানুয়ারী, ১৯৭৭ রবীন্দ্র থৈতিয়াম হলে 'সাহিত্য একাডেমী'র উদ্যোগে নজরুলের জীবনী ও সাহিত্যকর্মের উপর এক আলোচনা সভা হয়। সভার উদ্বোধনী বক্তৃতায় একাডেমীর প্রধান সচিব ডক্টর শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় শ্লেষমিশ্রিত কণ্ঠে বলেন যে, বাংলার সমালোচনা সাহিত্যে নজরুল সম্পর্কে আলোচনা অসমাপ্ত, তার কারণ সমালোচক মহলের 'দ্বিধা'। তিনি আরও বলেন যে, সাহিত্য-সমাজে 'একেশ্বরবাদিতার নীতি' থাকা উচিত নয়। এই একেশ্বরবাদ-নীতি যে কি জিনিস তা আমরা সবাই জানি। রবীন্দ্রযুগে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কাউকে আমরা ভাবতে চাইনি। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মের পাশে নজরুলের সাহিত্যকর্মের গুণাগুণ সম্পর্কে প্রশ্নহীন 'দ্বিধা'র কথাই সম্ভবতঃ শুভেন্দুবাবু ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের অবদানের তুলনা হয় না; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ঐন্দ্রজালিক প্রভাব আমাদের অনেক ক্ষতির কারণ হয়েছে। 'রবীন্দ্রমোহ' কাটিয়ে উঠতে আমাদের অনেক সময় লেগেছে। পূজার নীতি সাহিত্য সমালোচনার নীতি হওয়া উচিত নয়, মননশীল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণই সমালোচনার নীতি হওয়া উচিত। তাছাড়া, ভাল সাহিত্যের সংজ্ঞা কি হবে সেটাও আমাদের ভেবে দেখতে হবে। নন্দনতত্ত্বের দৃষ্টিতে যে সাহিত্য উত্তম, কেবল সেই নিরিখে তা উত্তম নাও হতে পারে। 'শিল্পের জন্য শিল্প'-নীতি এখন বাতিল হতে চলেছে। এখনকার জড়বাদী মানুষ সাহিত্যকেও জীবনের সঙ্গী করে নিতে চায়। যে সাহিত্য সমাজের মানুষের প্রয়োজন মিটাবে, সে-সাহিত্য গৃহীত হবে। 'চাঁদের ফুল' অথবা 'কাগজের ফুল' ঘরের শোভা বাড়াতে পারে, বীজ ধারণের ও ফল ফলাবার ক্ষমতা সেগুলির নেই। আমাদের সমালোচকদের এটাই ভেবে দেখতে হবে। এবং তখন দ্বিধার ভাব কাটে কিনা বুঝা যাবে। কিছুদিন আগে এক অধ্যাপক বন্ধুর সঙ্গে আলাপ হচ্ছিল। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে নজরুলের স্থান কি, তিনি জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে আমি বলি, বাংলাদেশের সব সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা অনার্স ও এম-এর পাঠ্যসূচীতে নজরুল সাহিত্য পড়ান হয়। তিনি বলেন, আমরা অনার্স পর্যন্ত নজরুলকে নিয়েছি, কিন্তু এম-এতে এখনও নজরুলকে নিতে পারে নি। আমার মনে হয়, এখানেও ঐ একই 'দ্বিধা'।

নজরুল সম্পর্কে যদি কখনও আমাদের তথাকথিত 'দ্বিধা' দূর হয় এবং নজরুল-সাহিত্যে সাগরে

গ্রহণ করি তবে তার সঙ্গে আমাদের কিছু আনুষঙ্গিক কাজও করতে হবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'রবীন্দ্র-অধ্যাপক' পদ আছে। সাহিত্যের জগতে 'রবীন্দ্র-পুরস্কার' আছে। সাংস্কৃতিক জগতে 'রবীন্দ্রসদন' ও 'রবীন্দ্র-ষ্টেডিয়াম' আছে। আমরা উভয় বঙ্গে কোথাও নজরুলের জন্য অনুরূপ একটা কিছু করতে পারি কিনা তা সারস্বত সমাজকে ভেবে দেখতে অনুরোধ করি। দ্বিতীয়তঃ যে-দেশেই হোক নজরুলের একটি 'পূর্ণমূর্তি' ও প্রতিষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটহলে একদিন ঘটা করে আবদুল লতিফের 'আবক্ষমূর্তি' স্থাপন করা হয়েছিল। সুতরাং মূর্তি নির্মাণে মুসলমান সমাজের আপত্তি থাকার কথা নয়। তৃতীয়তঃ এখন আমাদের অজস্র রচনাবলী প্রকাশিত হচ্ছে। এখন পর্যন্ত নজরুল-রচনাবলী সম্পূর্ণ আকারে কোথাও প্রকাশিত হল না। শোনা যায় চার আনার বিনিময়ে নজরুল গ্রন্থের স্বত্ব বিক্রি করেছিলেন। স্বত্বাধিকারীদের কাছে আমাদের অনুরোধ, তাঁরা যেন রচনাবলী প্রকাশের কোন মহৎ উদ্যোগকে আর বাধা না দেন। 'গীতবিতানে'র মত নজরুল-গীতিরও একটি ভাল সংকলন হওয়া উচিৎ। চতুর্থতঃ পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সকল স্তরের বাংলা পাঠ্যসূচীতে নজরুলকে যথাযোগ্য স্থান দেওয়া উচিত। পঞ্চমতঃ ভাল শিল্পীর কণ্ঠে নজরুল-গান উঠে এলে তার জনপ্রিয়তা বাড়বে, আমাদের সাংস্কৃতিক জগতে বৈচিত্র্য আসবে। নজরুলের 'ভাবমূর্তি' চেপে রেখে লাভ কি? স্বনামধন্য সুসাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছিলেন, 'ভুল হয়ে গেছে বিলকুল, সারা বাংলা ভাগ হয়ে গেছে, ভাগ হয় নি কো নজরুল।' আমরা যদি নজরুলের শিল্পকর্মের যথার্থ মূল্যায়ন করতে না পারি, তবে তাঁর এ উক্তি ব্যর্থ পরিহাসে পরিণত হবে।

তাম্রলিপ্তের মৃৎশিল্প নিদর্শন

প্রশান্তকুমার মণ্ডল

মেদিনীপুর জেলার পূর্বসীমা রূপনারায়ণ নদের তীরবর্তী তমলুক একটি ছোট্ট মফস্বল শহর। ইতিহাসে 'তাম্রলিপ্তি' বা তাম্রলিপ্ত নামেই অধিক প্রসিদ্ধ। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকেই এখানে নানা প্রত্নবস্তুর সঙ্গে পোড়ামাটির অসংখ্য মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। দেশ-বিদেশের বহু সংগ্রহশালায় ও কয়েকজন প্রত্নবস্তুসংগ্রাহকদের সংগ্রহে তমলুকের বহু নিদর্শন সংরক্ষিত আছে।

স্টেলা ক্রামরিশ কথিত 'ageless' ও 'time-bound'—এই দুই শ্রেণীর মূর্তিই পাওয়া গেছে তমলুকে। নারী-পুরুষের মূর্তিগুলি তৈরী করার পদ্ধতি অনুসারে চার ভাগে ভাগ করা চলে। প্রথমতঃ, হাতে তৈরী মূর্তি, দ্বিতীয়তঃ, মুখটি ছাঁচে তৈরী ও বাকী অংশ হাতে তৈরী, তৃতীয়তঃ, ছাঁচে তৈরী মূর্তিফলক, চতুর্থতঃ, দুটি ছাঁচে তৈরী মূর্তি। পুরোপুরি হাতে তৈরী মূর্তিগুলি 'ageless' শ্রেণী ও বাকীগুলি 'time-bound'—শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

পরিসংখ্যানের দিক থেকে বিচার করলে প্রথম ও তৃতীয় শ্রেণীর মূর্তির সংখ্যাই অধিক। প্রথম শ্রেণীর মূর্তিগুলির সময় নির্ধারণ করা সত্যই দুরূহ। গ্রামগঞ্জের সাধারণ শিল্পীরা সুদূর অতীতকাল থেকে আজ পর্যন্ত একইভাবে এই মূর্তিগুলি তৈরী করে আসছে। এদের মধ্যে সৌন্দর্যসৃষ্টির প্রয়াস নাই। এই মূর্তিগুলির প্রায় সবগুলিই নারী। এদের দেহকাণ্ড সাধারণতঃ গোলাকার ও দীর্ঘ হয়ে কোমরের কাছে শেষ হয়েছে। উপরিষ্ট নারীমূর্তির পা-দুটি সম্মুখে প্রসারিত। প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই কোলে একটি ছেলে। এ ছাড়া এদের কনুই ও আঙুলের চিহ্নহীন হাতদুটি কাঁধ থেকে বেরিয়ে বুকে এসে লেগেছে। শিল্পীর দুটি আঙুলের চেপায় তৈরী হয়েছে নাক। নাকের উভয় পার্শ্বের অবনমিত অংশই চোখ। পৃথকভাবে মাটির ঢেলা বসিয়ে স্তনের আকার দেওয়া হয়েছে। এরূপ একটি নারীমূর্তিকে পাণ্ডুরাজার ঢিবির অনুরূপ অনুসারে, প্রাক্‌-ঐতিহাসিক কালের নিদর্শন হিসেবে অনুমান করা চলে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত মূর্তিগুলির মুখটি ছাঁচে তৈরী ও দেহের বাকী অংশ হাতে তৈরী। এরূপ একটি তরুমূর্তির মাথায় রয়েছে পাগড়ী আর হাতটি গোল হয়ে বুকের কাছে এসে লেগেছে। কনুই-এর চিহ্ন অনুপস্থিত। সম্ভবতঃ আঙুলও ছিল না। এইজাতীয় মূর্তিগুলি প্রধানতঃ মৌর্য ও কুষাণযুগেই বেশী তৈরী হয়েছে।

চতুর্থ শ্রেণীর মূর্তির সংখ্যা খুবই কম। রোমান প্রভাবে এদেশে দুটি ছাঁচে তৈরী মূর্তির প্রচলন শুরু হয়। তমলুকে এই শ্রেণীভুক্ত দুটি অপূর্বসুন্দর নারীমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। একটি মূর্তির পোষাকে সম্পূর্ণ অভারতীয় প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

তমলুকে আবিষ্কৃত পোড়ামাটির মূর্তির মধ্যে তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত মূর্তি সংখ্যায় অধিক। একছিদ্রায় ছাঁচে তৈরী এই জাতীয় মূর্তির ব্যাপক প্রচলন হয় শুঙ্গ যুগে এবং পরবর্তীকালে কুষাণ, গুপ্ত ও পাল-সেন আমলেও এগুলির জনপ্রিয়তা অব্যাহত ছিল। ফলক আকারে তৈরী এগুলির কোনটিতে একটি বা

দুটি আবার কোনটিতে বহু নারী-পুরুষ ও পশু-পক্ষী স্থান পেয়েছে। পোড়ামাটির এই শ্রেণীর ভাস্কর্যে নারীর সৌন্দর্য, পুরুষের শৌর্য, ধর্মীয় শোভাযাত্রার আড়ম্বর, জাতকের কাহিনী, পুরাণের কাহিনী, দেব-দেবী ও কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের বাহন সার্থক রূপ পেয়েছে। তৎকালীন সমাজে এই জাতীয় মূর্তির বহুল প্রচলন ও জনপ্রিয়তার কারণ অনুসন্ধানের পূর্বে এই জাতীয় মূর্তি তৈরীর ইতিহাস সম্পর্কে একটু আলোচনা প্রয়োজন।

মৌর্যযুগে ছাঁচে তৈরী মূর্তির প্রচলন ছিল; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মুখটিই ছাঁচে তৈরী হত। সমাজকে ও তার ভাল-মন্দ সবকিছুকে তখনও মৃৎশিল্পীরা তাঁদের সৃষ্টিতে ধরে রাখার কৌশল আয়ত্ত করতে পারেননি। খোদাই করা কাঠের কাজে এবং পটে পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনীর স্থান হলেও পোড়ামাটির ভাস্কর্যে তাদের অনুপস্থিতি ধরা পড়ে। সম্ভবতঃ শুঙ্গ ও তার পরবর্তী যুগের প্রস্তর ভাস্কর্যই তৎকালীন মৃৎশিল্পীদের প্রেরণা যুগিয়েছে। ফলে প্রায় একই ধরণের দেব-দেবী ও কাহিনীর রূপায়ণ ঘটেছে পোড়ামাটির ভাস্কর্যে। মৌর্য যুগে পারস্য ও মধ্য এশিয়ার শিল্পীদের কাছ থেকে এদেশীয় প্রস্তর খোদাই-এর কাজে প্রাথমিক শিক্ষা পেলেও বৌদ্ধধর্মের অনুগামী মৌর্যরাজাদের নিস্পৃহতায় ভাস্কর্যশিল্পে তার যথাযথ বিকাশ হয়নি। যাই হোক খৃঃ পূঃ ২য়-১ম শতকে ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী শুঙ্গ এবং অপরাপর রাজাদের সময়ে ভারহুত, সাঁচী, বোধগয়া, উদয়গিরি, খণ্ডগিরি প্রভৃতি স্থানে ভারতীয় শিল্পীদের শিল্পসাধনা যথাযথ রূপ পেল প্রস্তরভাস্কর্যে। এখন আর শুধুমাত্র ষাঁড়, হাতী, সিংহ, ধর্মচক্র বা লতাপাতাই নয়; পৌরাণিক দেব-দেবী ছাড়া ও নানা কাহিনী সেখানে অন্তর্ভুক্ত হল প্রথমে অগভীর ও পরে গভীর খোদাই-এর অলঙ্করণে। কুষাণ যুগে গ্রীস, রোম ও পারস্য প্রভৃতি দেশের শিল্পকলা ভারতীয় শিল্পের উৎকর্ষ বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। ফলে পশ্চিমী দৈহিক সৌন্দর্য-সাধনা ভারতীয় অধ্যাত্ম-সৌন্দর্য সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করে। তমলুকের পোড়ামাটির শিল্পেও ভাস্কর্য শিল্পবিকাশের এই ধারা চোখে পড়ে। এখানে পাওয়া পোড়ামাটির একটি মুদ্রাঙ্কে (sealing) সাঁচীস্তূপের তোরণ ও একটি মযূর মুদ্রিত আছে। পোড়ামাটির তৈরী একটি তোরণও আবিষ্কৃত হয়েছে এখানে। সুতরাং আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে এই অঞ্চলের মৃৎশিল্পীদের আদর্শ ছিল সাঁচী, ভারহুত প্রভৃতি স্থানের শিল্পকলা। অপর পক্ষে শিরস্ত্রাণ, গোলাকার টুপী, কেশবিন্যাস পদ্ধতি, উভয় পার্শ্বে মুখবিশিষ্ট মূর্তি (যানুষ? আশুতোষ সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত) ও চক্রের উপস্থিতি বৈদেশিক প্রভাবজাত বলে অনুমিত হয়।

পোড়ামাটির এই শিল্পসাধনার উদ্দেশ্য কি হতে পারে? কারণ এমন কোন ধ্যান বা শাস্ত্র অনুসারে মূর্তিগুলি তৈরী হয়নি যার মূলে আমরা এগুলিকে বিশেষ কোন দেব-দেবী বলে চিহ্নিত করতে পারি। অবশ্য লিখিত বিবরণে গৃহসজ্জার উপকরণ হিসাবে এগুলির বহুল ব্যবহারের উল্লেখ আছে। যেমন হর্ষবর্ধন প্রাসাদ সজ্জার জন্য অসংখ্য পোড়ামাটির মূর্তি নির্মাণের জন্য আদেশ দিয়েছিলেন মৃৎশিল্পীদের। তমলুকে আবিষ্কৃত মূর্তিসম্বলিত ফলকগুলিতে এক বা একাধিক ছিদ্র দেখা যায়। মনে হয় অবস্থাপন্ন ব্যক্তির গৃহের শোভাবর্ধনের জন্য অথবা কোন ধর্মীয় মন্দির বা সংঘারামের দেওয়াল সজ্জার জন্য এগুলি উঁচু কোন জায়গায় ঝুলিয়ে রাখা হত। তৎকালীন মৃৎশিল্পীদের অনলস সাধনায় মৃৎফলকে সার্থক রূপ পেয়েছে নৃত্যগীতপটীয়সী যুবতী, মদালসা যুবতী, দেহসৌন্দর্যে অনন্যা অলঙ্কার-

অস্ত্রধরা নারী, অশ্বারোহীর বাজনা ও দুষ্মন্ত-শকুন্তলার কাহিনী, ধর্মীয় শোভাযাত্রা, রাজকীয়ভাব বক্ষাধারণ, ষোড়শোপচার পূজা, যোদ্ধা ও গৃহ-বাসিন্দের অপেক্ষমান মূর্তি। দ্বিতীয়, চতুর্থ ও কিছু তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত কিছু মূর্তি কুলুঙ্গিতে সাজিয়ে রাখা হত। এছাড়া দুটি চাকাযুক্ত ভেড়া, মেষ, হাতী ও ঘোড়ার গাড়ীগুলি ছেলেদের খেলনা হিসেবে ব্যবহৃত হত বলে অনুমিত হয়। সমাজে অগ্নি, সূর্য, কুবের প্রভৃতি দেবতার পূজা প্রচলন থাকায় গাড়ীগুলির ব্যবহারে ধর্মীয় প্রভাব থাকা অস্বাভাবিক নয়। তমলুকে আবিষ্কৃত ভিতর ফাঁপা কিছু উপবিষ্ট স্থূলকায় পুরুষমূর্তি ছেলেদের ঝুমঝুমি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এগুলি তৈরী করবার সময় ছোট ছোট শক্ত নুড়ি মূর্তির ভিতরে পুরে দেওয়া হত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ছাঁচ ব্যবহার করায় এক মূর্তির বহুল উৎপাদন ও ব্যবসায়িক ভিত্তিতে হস্তান্তর মূর্তিগুলিকে জনপ্রিয় করে। সূক্ষ্মতম কারুকার্যশোভিত একটি মূর্তির ছাঁচ তৈরী করতে শিল্পীর বহুদিনের অক্লান্ত শ্রম ব্যয়িত হলেও উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকের আনুকূল্যে তা পুষিয়ে যেত।

• পরিশেষে বলা যায় তমলুকের প্রাচীন ইতিহাস রচনায় পোড়ামাটির এইসব নিদর্শনগুলি বিশেষ মূল্যবান। কারণ এই মূর্তিগুলি তৎকালীন সমাজজীবন, ধর্মজীবন এবং বিদেশের সঙ্গে এখানের যোগাযোগ সম্পর্কে বহু অজানা তথ্য ব্যক্ত করে। শুধু তাই নয়, গজলক্ষ্মী ও বুদ্ধের মূর্তি যেমন এখানে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্মের সাক্ষ্য বহন করে, তেমনি নারী ও পুরুষ মূর্তি এবং একটি মুদ্রাপূর্ণ কলস ঐশ্বর্যশালী সমৃদ্ধ সমাজজীবনের ইঙ্গিত করে। এই সকল প্রত্নবস্তুর নিরিখে পৌরাণিক কাহিনী এবং লৌকিক কিংবদন্তীর যাথার্থ্যও নিরূপণ করা যেতে পারে। যেমন লোকবিশ্বাসে বর্তমান তমলুকই পূর্বের তাম্রলিপ্ত এবং শিখীধ্বজ ও ময়ূরধ্বজ এখানেই রাজত্ব করতেন। শিখী ও ময়ূর সমার্থক। উল্লেখ্য তমলুকের ছাঁচে তৈরী এমন কিছু মুদ্রাঙ্ক পাওয়া গেছে যেগুলির উপর ময়ূর মুদ্রিত আছে। অবশ্য যদি এরূপ হয় পূর্বে এখানে যে রাজবংশ রাজত্ব করতেন তাঁদের প্রতীক চিহ্ন ছিল ময়ূর এবং সেই বংশ শিখীধ্বজ ময়ূরধ্বজেরই বংশ তবে লোকবিশ্বাসে অবিশ্বাসের কিছুই রইল না, তা ইতিহাসেরই অঙ্গীভূত হল। এরূপ বহু ঐতিহাসিক তথ্যেরই উদ্ঘাটন সম্ভব, যদি পোড়ামাটির নিদর্শনগুলির যথাযথ মূল্যায়ন হয়।

শব্দ ও রহস্য এবং অন্যান্য। অতীন্দ্রিয় পাঠক। অব্যয়। কলকাতা-৯। মূল্য: ছ টাকা।

সঠিক শব্দব্যবহারে পুরাতন বিষয়ও নতুন দ্যোতনা লাভ করে, অন্যথায় অভিনব বিষয়ও অপাংক্তেয় বোধ হয়। তাই যথার্থ কথাশিল্পীমাত্রেরই উচিত শব্দভাবনায় সজাগ ও সচেতন হওয়া।

'শব্দ ও রহস্য এবং অন্যান্য' প্রবন্ধটিতে এক শব্দসচেতন শিল্পীর পরিচয় পাওয়া গেল যিনি কথাশিল্পকে নিছক কথার কথা মনে করেন না, প্রকৃত শিল্পকর্ম বলেই মান্য করেন। আর যাবতীয় শিল্পশর্তকে শুধু মান্য করাই নয়, বিচার-বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করতে প্রয়াস পান। যদিও তাঁর কাছে শেষ পর্যন্ত এসবই অনুভবমাত্র গম্য: 'শব্দ কোথা থেকে, কেন সাহিত্যে'র উপসংহারে লেখক সুন্দরভাবে বলেছেন: শব্দ কোথা থেকে? অনন্ত থেকে। কেন সাহিত্যে? যেহেতু তা অনন্ত অনুভব প্রকাশ করতে উন্মুখ। এবং আমরা এ প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে উত্তর দিতে পারি না। মাত্র নিমগ্ন হতে পারি।

তলিয়ে দেখলে শুধু উপরি-উক্ত পঙক্তিগুলিই নয়, এ-প্রবন্ধের অনেক সিদ্ধান্তই পূর্বাচার্যদের প্রতিধ্বনি, কিন্তু উচ্চারণভঙ্গি অবশ্যই শ্রীপাঠকের নিজস্ব। কিছুটা মৃদু এবং নিরুত্তাপ তাঁর কণ্ঠস্বর। শব্দগুলোকে ভেঙে ভেঙে কেটে কেটে নির্মাণ করেন তিনি বাক্যবন্ধ। যতিচিহ্ন ব্যবহারে তিনি বিরোধী নন, তবে যথেচ্ছ প্রয়োগে তাঁর আপত্তি; পাঠকের কাছে শব্দের দুটি বিশেষ প্রক্রিয়া হল দৃশ্যগত এবং উচ্চারণগত। দৃশ্যগত ব্যাপারটা পাঠকের একতরফা কিন্তু উচ্চারণগত দিকটা ঠিক তা নয় এবং এখানেই শব্দের আভ্যন্তরীণ গতির ব্যাপার যা যতি ইত্যাদি চিহ্নের বন্ধনে নষ্ট হবার সামিল। পাঠক যতি চিহ্নের ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে সেই চিহ্ন দেখে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করতে থাকেন—শব্দের আভ্যন্তরীণ শক্তিসমূহ তখন বিশেষ কোন ভূমিকা রাখে না। শুধু শব্দ-প্রয়োগ দ্বারা এই গতি নিয়ন্ত্রণ করা যায় কিনা এমন চেষ্টা করে দেখা হয়নি।

শব্দের কাছে নিজেকে সমর্পিত না করে শব্দকে নিজের ইচ্ছেমত ব্যবহার করা হোক এই হল শ্রীপাঠকের অভিপ্রায়। বাংলা কবিতায় এ-কাজটি ইতিমধ্যেই গৃহীত হয়েছে, কিন্তু গল্প উপন্যাস কিংবা প্রবন্ধে তেমন হয়নি। অবশ্য শ্রীপাঠক নিজেই তাঁর পূর্ববর্তী একটি উপন্যাসে এবং আলোচ্য প্রবন্ধ গ্রন্থটিতে এই দুরূহ কর্মে প্রয়াস পেয়েছেন। এর সাফল্য-অসাফল্য নির্ণয়ের সময় এখনো আসে নি। তবু প্রথাগত পথ পরিহার করে এই পরীক্ষামূলক প্রয়াসের জন্য শ্রীপাঠক সৎ পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন।

বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
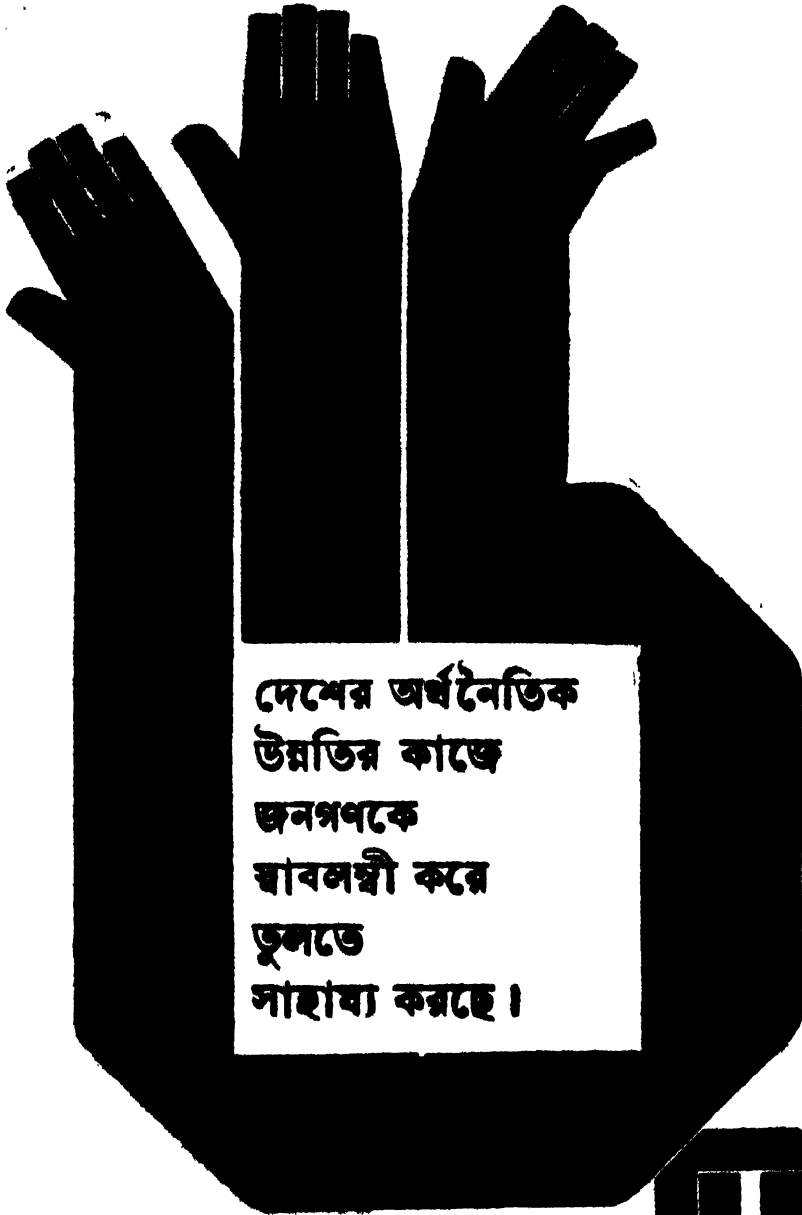
দেশের অর্থনৈতিক
উন্নতির কাজে
জনগণকে
স্বাবলম্বী করে
তুলতে
সাহায্য করছে।
ইউনাইটেড
কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

দুঃস্বপ্নের নগরী

কারো কারো আঠারো মাসে বছর হয়। যেমন সি. এম. ডি. এ-র।

নববর্ষ পেরিয়ে গেল একদিন পরে সি. এম. ডি. এ কলকাতা মহানগরীর লোকদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। তার একটা কারণ অবশ্য খবরের কাগজে যাত্রা থিয়েটারের আর হই-হিট-সংবাদের বিজ্ঞাপনের ধাক্কা। শুভেচ্ছা জানাবার জায়গাও তো চাই।

চিংড়ি খুঁজলে পাঁটকেলটি খেতে হয়। শুভেচ্ছা জানিয়ে অবশ্য সি এম. ডি এ-র কপালে বেশ কিছু গালমন্দ জোটে, আর এমনই কপাল যে গ্রীষ্মকালেও বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করেছে। কোথাও কোথাও একটু জলও জমেছিল। আর যায় কোথায়, সি. এম. ডি. এ-র ওপর বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে গালি বর্ষণও কম হচ্ছে না।

যদিও আসল বর্ষার এখনও দেরী, তাহলেও সাফাই গেয়ে রাখছি। বর্ষায় জল জমবে। আবার সঙ্গে সঙ্গে আশ্বাসও দিচ্ছি, জল জমা কম হবে এবং জমা জল তাড়াতাড়ি সরবে।

অবশ্য সব নির্ভর করছে বৃষ্টিপাতের পরিমাণের ওপর। ঘণ্টায় যদি এক ইঞ্চি বৃষ্টিও হয় তাহলে জল জমা কেউ ঠেকাতে পারবে না। অথচ যদি চার পাঁচ ঘণ্টায় ২।৩ ইঞ্চি বৃষ্টিও হয় তাহলে জলটা হয়তো দাঁড়াবে না। এটা কি ধাঁধা দিয়ে বিজ্ঞাপন? একটু ভেবে দেখুন, নাহলে স্কুলের ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করুন। একটা পাইপে সরু করে জল ঢাললে কি হয়, আর এক বালতি জল ঢাললে কি হয়......

বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, সি. এম. ডি. এ যে সব পাইপ বসিয়েছে সেগুলি নিরেট নিশ্ছিদ্র নয়, হুড়হুড় করে জল না ঢাললে (অর্থাৎ বৃষ্টি না হলে) সেই পাইপ দিয়ে জল বেরিয়ে যেতে বাধা। তবে ড্রেনের অবস্থাটা যে কি, তার ওপরও অনেকখানি নির্ভর করছে কত তাড়াতাড়ি জল সরবে। ডাবের খোলা, রাবিশ, খড়, কাঠ, ইট, পলিথিন, গোবর ইত্যাদি যদি নর্দমার মধ্যে জমে থাকে, তাহলে জল সরতে দেরী হবে। এটা বোঝাবার জন্য স্কুলের ছাত্রকে ডাকতে হবে না।

হঠাৎ আম কাঁঠালের মরশুমে এসে গেলাম। কলকাতাকে যাঁরা সবুজ করতে চান তাঁরা আর কিছু পারুন আর নাই পারুন, আমের আঁটি আর কাঁঠালের বীচি ছড়িয়ে বেশ কিছু গাছ লাগাবার চেষ্টা করতে পারেন। অসম্ভব মনে হচ্ছে? জানেন কলকাতার লোক কত লক্ষ আম খেয়ে থাকেন? সেই আমের আঁটি ড্রেনের মধ্যে না ফেলে যেকোন খোলা জায়গায় একটু যত্ন করে পুঁতে দিন না। এটা কি খুব মজার কথা হলো না কি লজ্জার কাজ? কৈ ড্রেনের ভিতর ফেলতে তো লজ্জা করে না।

দমদম থেকে কয়েকজন ছেলে চিঠি লিখেছে যে এবার বর্ষায় তারা একশো গাছ পুঁতবে এবং সেগুলি যাতে বাঁচে, তার ব্যবস্থা করবে।

যাদবপুর থেকে এক ভদ্রলোক জানিয়েছেন যে তিনি রাস্তার একটা কলে নিজের পয়সায় ট্যাপ লাগিয়ে দিয়েছেন।

আরো আনন্দের কথা যে বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, কোম্পানী এবং ব্যাংক এ পর্যন্ত কলকাতার উন্নয়নের কোন ব্যাপারেই কোন রকম উচ্চ-বাচ্য করেন নি।

তাঁরা কেবল সি. এম. ডি. এ-র বিজ্ঞাপন পড়েছেন এবং হয়তো বা কলকাতার উন্নয়নের অপচেষ্টা দেখে হেসেছেন। এখন প্রশ্ন হলো, দুঃস্বপ্নের নগরী কোনটা?

বড় বড় প্রতিষ্ঠান, যাদের সামর্থ্য আছে তাঁদের নিষ্ক্রিয়তাটাই কি দুঃস্বপ্ন নয়?

নাকি ঐ ছোট ছেলেদের গাছ লাগাবার প্রচেষ্টাটা দুঃস্বপ্ন?

Regd. No. W.B./C. C.-207 Phone : 23-5155 May '77 (0·50) R. N. 2602/57 SAMAKALIN

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্র সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

পঞ্চবিংশ বর্ষ । জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪

জ্যৈষ্ঠ
তেরোশ' চুরাশি

২য় সংখ্যা
পঞ্চবিংশতি বর্ষ

অপরা-ব্রহ্মাণ্ড

অজিত দত্ত

কোন রসায়নবিৎকে যদি শুধোই, 'আজ্ঞে, রসায়ন কী বস্তু?' তাহলে ভদ্রলোক নিশ্চয় একটু ফাঁপরে পড়ে যাবেন। আমার মতন গোলা লোকের উপযুক্ত, বোধগম্য, ব্যর্থহীন একটা সংজ্ঞা হঠাৎ যোগানো বড় সহজ কথা নয়। হাতের সাহায্য না নিয়ে ঘোরানো-সিঁড়ি কেমন দেখতে, বোঝানো যেমন কঠিন, এও প্রায় তেমনি কঠিন। ভালো করে বোঝাতে গেলে পরিষ্কার চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন।

সম্ভবতঃ আমার কথা ভেবেই অধ্যাপক ফ্রীড্‌রিখ রুঙে রসায়ন-বিজ্ঞার সহজবোধ্য একটি সংজ্ঞা দিয়েছিলেন, আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগে। না জানি কত চিন্তার পর তিনি তাঁর গ্রন্থের প্রথম বাক্যটি রচনা করেছিলেন।—লিখেছিলেন,

'আমাদের পৃথিবীর উপাদানের বিজ্ঞানের নাম রসায়ন। স্থির হোক, গতিশীল হোক, আমাদের চতুষ্পার্শ্বের সমগ্র বস্তু রাসায়নিক গবেষণার অন্তর্ভুক্ত। জল হাওয়া, ধাতু-খনিজ, প্রাণী-পাদপ,—সব রসায়নশাস্ত্রের অন্তর্গত।'

সংজ্ঞাটি নিঃসন্দেহে প্রাঞ্জল এবং সুখবোধ্য।

রুঙের কাল তো কবেই গেছে কেটে, তাঁর কাল থেকে আজ পর্যন্ত রসায়নশাস্ত্রের কত ওলটপালট হয়ে গেছে, কিন্তু তাঁর দেওয়া সংজ্ঞা—আমাদের পৃথিবীর উপাদানের বিজ্ঞান—আজো সিদ্ধ, আজো অব্যর্থ।

আমাদের পৃথিবীটা নাকি বিরেনব্বইটা মৌল পদার্থের সমন্বয়ে গড়া। পরমাণু-পদার্থবিৎ বলেন, বিরেনব্বই নয়, আরো আছে। পদার্থের তালিকায় তাঁরা আরো কিছু কৃত্রিম মৌল যোগ

করেছেন। আমাদের জীবনে তাদের প্রয়োজন নেই বললেই তো মনে হয়। তবে ধরুন ৯৪ নম্বর মৌল, প্লুটোনিয়াম দিয়ে যদি একটা বোমা বানিয়ে ফাটানো হয়! তাহলে? তাহলে যা বলছি তাই, প্রয়োজনের প্রশ্নটাই বাতিল,—জীবনটাই যে উবে যাবে কর্পূরের মতন।

ওই বিরেনব্বইটা মৌলকে রসায়নশাস্ত্রী কত না বিস্ময়কর যৌগে যুক্ত করেন। প্রায়ই দেখি, ওই সব যৌগের অস্তিত্ব প্রকৃতিতে আগে ছিল না। বস্তুর যে ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য কণা দিয়ে রসায়নবিৎ বস্তু গড়তেন, তার নাম পরমাণু। ওই অবিভাজ্য পরমাণু নিয়ে তাঁরা বেশ তুষ্টই ছিলেন, কিন্তু হায় কপাল, পরমাণু আর পরম অণু রইলো না, তাকেও আজ ভাঙা যায়, সেও বিভাজ্য। আজ পাঠশালের ছেলেটাও জানে, পরমাণুর বিভাজনেই বিকশিত হয় পারমাণবিক পরম শক্তি।

মাত্র বিরেনব্বইটা মৌল কেন? তাও তো সব কটা এক সঙ্গে পাওয়া যায়নি। এককালে বিজ্ঞানীর ধারণা ছিল, মৌল মাত্র পাঁচটি,—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। কিন্তু সোনা, রুপো, তাঁবা, লোহা, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন; গন্ধক এরা? ফরাসী রসায়নবিৎ লাভোয়াসিয়ে জানতেন কুড়িটা মৌলের পরিচয়। অষ্টাদশ শতাব্দী নাগাত জানা গিয়েছিল বত্রিশটা, তারো কুড়ি বছর পরে ছেচল্লিশটা। ১৮৭০ সাল নাগাত রসায়নশাস্ত্রী ভেবেছিলেন চৌষট্টিটার কথা। ১৯১৪ সালে বোঝা গেল, মৌলের সংখ্যা নিশ্চয় বিরেনব্বই; কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গোড়ায়, ১৯৩৯ সালে মনে হল, মোটে বিরানব্বইটা নয়, সম্ভবতঃ আরো আছে, তবে সেই 'আরো'দের অস্তিত্ব হয়তো স্বাভাবিক অবস্থায় নেই।

স্বাভাবিক অবস্থায় না-থাকার যুক্তিটা সোজা। অনেকগুলো মৌলের কথা যখন জানা গেল, তখন ইয়েনার অধ্যাপক ভল্‌ফ্‌গাং ডোবেরাইনের এবং কবি ভল্‌ফগাং ফনগ্যেটে চাইলেন মৌলগুলোকে একটা বড় রকম সূত্রে বিন্যস্ত করতে, কিন্তু ব্যাপারটা সুবিধের হল না। প্রায় একই সঙ্গে, ১৮৭০ সাল নাগাত রুশী পণ্ডিত মেন্ডেলিয়েফ এবং জার্মান পণ্ডিত লোথার মেয়ার বেশ একটা খুব সুন্দর বিন্যাস খাড়া করলেন, যার সুপ্রতিষ্ঠিত, সুব্যাখ্যাত নাম পর্যাবৃত্তিক বিন্যাস (periodic system) সাম্প্রতিক কালে আরো অনেক বিন্যাস খাড়া করা হয়েছে বটে, কিন্তু অমনটি আর হয়নি।

চোদ্দ সাল নাগাদ দেখা গেল মেন্ডেলিয়েফ মেয়ারের বিন্যাস পুরোপুরি অভ্রান্ত নয়। যদি এখানে ওখানে দু' পাঁচটা ফাঁক রেখে দেওয়া যায়, তাহলে অবশ্য তাকে অভ্রান্ত বলা যাবে। লোথার মেয়ার বুঝেছিলেন, সে ফাঁকের অর্থ, কিছু মৌল এখনো অজানা; এখনো অনাবিষ্কৃত। অজানা মৌলের আবিষ্কারে পর্যাবৃত্তিক বিন্যাস তাই ভালো পথ প্রদর্শকের কাজ করেছে। শুধু বিচার করার ছিল, পরবর্তী মৌলটির গুণাগুণ কি কি এবং কোন কোন খনিজের সঙ্গে তার থাকা সম্ভব। তারপর খুঁজে না পাওয়া মৌলটি কেমন হবে এবং কোথায় তাকে পাওয়া যাবে, তা অনুমান করা সহজ ব্যাপার। কাজ হয়েছে এ পন্থায়, অর্থাৎ পন্থাটি নির্ভুল। ধীরে ধীরে ইউরেনিয়াম পর্যন্ত পুরো বিরেনব্বইটা মৌলকেই পাওয়া গেছে। ৪৩ নং মৌলটি যাকে বলি, টেক্‌নিশিয়াম, তার অস্তিত্ব দেখানো হয়েছে পৃথিবীর বাইরে, সত্যিই তাকে পৃথিবীতে পাওয়া যায়নি। একবার মনে হয়েছিল, বুঝি বা পাওয়া গেল, নামও দেওয়া হল, 'মাজুরিয়ম', তারপর দেখা গেল ভুল। শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল যুক্তরাষ্ট্রে রূপোলি সাদা গুঁড়োর আকারে, পারমাণবিক শক্তি উৎপাদকের পরীক্ষা করতে গিয়ে।

আর একটি মৌল, নাম অ্যাস্টেটিনিয়াম, তাকেও পৃথিবীতে পাওয়া গেছে পারমাণবিক-রসায়নের ক্ষেত্রে। তার সম্পর্ক আয়োডিন, ব্রোমিন, ক্লোরিন, ফ্লুয়োরিনের সঙ্গে, পর্যাবৃত্তিক তালিকায় এদের স্থান তার ওপরে।

পর্যাবৃত্তিক তালিকার চেহারা দেখেই মনে হয়েছিল, মৌলের মোট সংখ্যা বিরেনব্বই ; শুরু হাইড্রোজেন দিয়ে আর শেষ ইউরেনিয়াম দিয়ে, তবে সেটাও খুব ঠিক নয়। মৌলনিচয়ের গঠন থেকে আরো কিছু জানা যায়। পর্যাবৃত্তিক তালিকার নিচের দিক থেকে দেখা যাক, যেখানে রয়েছে হাইড্রোজেন, হিলিয়াম আর লিথিয়াম,—

মৌল	হাইড্রোজেন	হিলিয়াম	লিথিয়াম
কেন্দ্রীণ পরাবিদ্যুৎ আধান	১	২	৩
ভর	১	৪	৭

হাইড্রোজেন পরমাণুর গঠনে ঘোর-প্যাঁচ নেই বললেই হয়। পরমাণু-জগতে হাইড্রোজেন পরমাণুই সরলতম। তার অতিসূক্ষ্ম কেন্দ্রবিন্দুতে পরাতড়িৎ আধান পুঞ্জীভূত আর সেই কেন্দ্রীণেই পরমাণুর প্রায় সমস্ত বস্তু-ভর নিবদ্ধ। পরাতড়িতাবিষ্ট সেই কেন্দ্রীণকে প্রদক্ষিণ করে ফেরে ইলেকট্রন কণিকা, তথা তড়িতের অপরা-আধান।

হিলিয়ামের কেন্দ্রীণে থাকে পরা-আধানযুক্ত দুটি কণা (প্রোটন) এবং দুটি অক্রিয় মৌল-কণা (নিউট্রন), তাছাড়া আরো দুটি কণা (ইলেকট্রন) তাদের প্রদক্ষিণ করে তারা পরা-অপরা আধানের সমতা রক্ষা করে। লিথিয়ামের কেন্দ্রীণে থাকে তিনটি প্রোটন এবং চারটি নিউট্রন আর তাদের প্রদক্ষিণ করে তিনটি ইলেকট্রন। এমনি করে চলতে থাকে বিরেনব্বইটা মৌল পর্যন্ত। এবং বিরেনব্বই নম্বর মৌলের কেন্দ্রীণে পরাবিদ্যুৎ-আধান যুক্ত কণার সংখ্যা বিরেনব্বইটা, তাদের প্রদক্ষিণ করে বিরেনব্বই ইলেকট্রন। মৌলের সংখ্যা আজ ৯২ নয়, ১০৩। এর পরেও পরা-আধান যুক্ত আরো বেশি কণা সমন্বিত মৌলের সন্ধান মেলাও বিচিত্র নয়।

পরা-আধান যুক্ত বেশি বেশি কণাবিশিষ্ট, অর্থাৎ বাড়তির দিকের মৌলের না হয় খোঁজ পাবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু কমতির দিকে ?

দেখা যাচ্ছে, সবকিছু নির্ভর করে পরমাণু কেন্দ্রীণের পরাবিদ্যুৎ আধানের ওপর। তাহলে যদি ভারী হাইড্রোজেনের একটি মাত্র পরাবিদ্যুৎ আধানকে সরিয়ে দিই, তাহলে পড়ে থাকবে শুধু একটা নিউট্রন। নিউট্রনের ভর ১ বলা যেতে পারে, বৈদ্যুতিক আধান বর্জিত সে একটা রাসায়নিক মৌল।

আচ্ছা, নিউট্রনের ওই ভর ১-কে যদি সরিয়ে নেওয়া হয়, বলুন তো কী থাকবে ? কিছুই না। কথাটা কানে অসম্ভব শোনালেও, ব্যাপারটা কিন্তু তেমন অসম্ভব নয়। পরমাণু-পদার্থবিৎ তাঁর নানা নিরীক্ষার ব্যাখ্যা দিতে তাঁদের হিসেবের ভেতর ওই একধরনের 'কিছু-না'কে ঢুকিয়ে দেন। সে 'কিছু-না'-এর নাম দেওয়া হয়েছে নিউট্রিনো। ব্যাপারটা নতুন নয়। মেন্দেলিয়েভ নিজেই হাইড্রোজেনের আগে আর একটি মৌল বসিয়ে, নাম দিয়েছিলেন কোরোনিয়াম। তাঁর বিশ্বাস ছিল, 'কোরোনিয়াম' আসে সূর্য থেকে। বিশ্বাস তাঁর ভুল নয়, সত্যিই কোরোনিয়াম সূর্য থেকে আসে। মেন্দেলিয়েভ

আরো একটি মৌলের নাম করে গেছেন, মহান ইংরাজ পদার্থবিৎ নিউটনের প্রতি পরম শ্রদ্ধায়। নামটি 'নিউটোনিয়াম'। এই নিউটোনিয়ামই বোধহয় হিসেবে নিউট্রিনোর প্রায় সমান।

বহুকাল পর্যন্ত ধারণা ছিল পর্যায়-সারণীর (periodic table) মৌলনিচয়ের আয়ত্বের বাইরে আর কিছু বুঝি নেই। কিন্তু চিন্তার নবপর্যায়ে জন্ম নিয়েছে অপবস্তুর (antimatter) কল্পনা।

অপরাপদার্থের জটিল গবেষণায় প্রধান পুরোহিত এমিলিও জে. সেগ্রে। ভদ্রলোক ১৯২৬ সালে রোমে যন্ত্রবিজ্ঞান পাঠ নিচ্ছিলেন। সেইখানেই তাঁর পরিচয় হয় এনরিকো ফার্মি এবং তাঁর গোষ্ঠীর অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে। সাতাশ সালের সেপ্টেম্বরে সবাই মিলে কোমোয় গেলেন, পরমাণু-পদার্থবিজ্ঞান সভার অধিবেশনে, বাঘা বাঘা পরমাণুবিৎদের দর্শন করতে।

সভায় এক ভদ্রলোককে দেখে সেগ্রে সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করলেন,

'ও ভদ্রলোক কে? ওই যে, খুব সাদাসিধে, অস্পষ্ট উচ্চারণ?'

'উনি বোর্।'

'বোর্? সে আবার কে?'

'সেকি, বোরের পরমাণু মডেলের কথা শোনো নি?'

'না তো, বল না, শুনি।'

সেই শুরু। সব শুনে সেগ্রের মন ঝুঁকলো পদার্থবিজ্ঞানের দিকে। অল্প দিনের ভেতরেই বাইশ বছরের ছাত্রটি ফার্মির দলের একজন হয়ে উঠলো। বছর ঘুরতেই রোম থেকে স্নাতক উপাধি নিয়ে শুরু করলো নানা বৈজ্ঞানিক পত্র-পত্রিকায় লিখতে। কিছুদিন যেতে না যেতেই, পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং পালের্মো বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা। তারপর পর্যায়-সারণীর একটি ফাঁক বোজালেন, কৃত্রিম মৌল টেকনিশিয়াম আবিষ্কার করে। ৩৮ সালে চলে গেলেন মার্কিন দেশের বাসিন্দা হতে। ওই আমেরিকায় গবেষণা করেই অপরাপদার্থের কল্পনা তাঁর মাথায় এসেছিল।

পরমাণুর স্তরকে যদি অপরিবর্তিত রাখা হয় তাহলে একটি মাত্র উপায় আছে তার প্রকৃতিকে পরিবর্তন করার, সে হল তার বৈদ্যুতিক আধানকে পরিবর্তিত করে। পদার্থের ক্ষেত্রে জানি, তার পরমাণুর কেন্দ্রীণ পরাবিদ্যুৎ-আহিত। কিন্তু সেখানে যদি অপরাবিদ্যুৎ থাকে, তাহলে প্রদক্ষিণরত কণানিচয়ের আধান পরাবিদ্যুৎ হতেই হবে। পজিট্রন এবং ইলেকট্রন, তথা পরা এবং অপরাবিদ্যুতের মাত্রার অস্তিত্বের কথা জানি বলে, তাদের স্থান পরিবর্তনের কথাটাও সহজেই অনুমান করতে পারি। বাস্তবিক পক্ষে পদার্থবিদেরা এমন পরমাণু গড়েছেন, যাদের ভেতর আধানকেন্দ্রিক এমনিভাবেই উল্টে দেওয়া হয়েছে।

মাঝে মাঝে এক-আধটা অপরাপদার্থের কণা আমরা সৃষ্টি করতে পারি বটে, তবে তার জন্যে সাইক্লোট্রন, চৌম্বক ক্ষেত্র, ইত্যাদির মত বিশাল এবং জটিল ব্যাপারের যোগান দরকার। সে ক্ষেত্রে ভর একই থাকে, কিন্তু কেন্দ্রীণের আধান হয় অপরাবৈদ্যুতিক।

আধান	+১	০	−১
কণা	হাইড্রোজেন	নিউট্রন	অপরা-হাইড্রোজেন.
ভর	১	১	১

এ পরীক্ষা এমন যৌগ-কণা দিয়ে, যার ইলেকট্রনের আবরণ নেই, অর্থাৎ যার পরমাণু কেন্দ্রীণ 'ন্যাড়া' তাই ঠিকমত বলতে হয় প্রোটন এবং অপরা-প্রোটন। তবে, বোঝবার পক্ষে পরা—অপরা হাইড্রোজেন নাম দুটো অনেক ভালো। এ থেকে দু'একটা প্রশ্ন মাথা-চাড়া দিচ্ছে, 'তাহলে কি অপরা যৌগনিচয়ের একটা গোটা আলাদা পর্যায়বৃত্তিক-বিন্যাস গড়ে তোলা সম্ভব? অপরাপদার্থের যৌগও কি পাওয়া সম্ভব? অপরা-যৌগে গড়া একটা অপরা-জগতেরও কি অস্তিত্ব সম্ভব?

অবিশ্বাস্যই মনে হোক, আর ভয়ে গায়ে কাঁটাই দিক, অপরা-জগতের আবিষ্কার বোধহয় বেশি দূরে নয়। সত্যিসত্যিই সম্প্রতি একটা অপরা-নিউট্রন দেখা গেছে। সেটা তৈরী হয়েছিল প্রচলিত নিয়মবিরুদ্ধ পথে, তা হোক তবে জিনিসটা যে খাঁটি সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সোজা কথায় বলতে গেলে সমীকরণটা দাঁড়ায় এইরকম,

প্রোটন + অপরাপ্রোটন = নিউট্রন + অপরানিউট্রন

অতএব, নিদেন পক্ষে আমরা যৌগের আর একটা জগতের দেহরেখার কল্পনা করতে পারি। অপরা-ডিউটেরিয়ামের (অপরা-ভারী হাইড্রোজেন) পরমাণুতে তাহলে থাকবে একটা অপরাপ্রোটন এবং একটা অপরানিউট্রন। আর ইলেকট্রনের বদলে তার কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করবে একটা পজিট্রন। তেমনি অপরা-হিলিয়ামের কেন্দ্রে থাকবে দুটো অপরাপ্রোটন আর দুটো অপরানিউট্রন, তাদের প্রদক্ষিণ করবে দুটো পজিট্রন। অপরা-যৌগের পর্যায়-সারণী গড়ে তোলা যাবে এমনি করেই।

অপরাপদার্থ সম্পর্কে আজ আর কী জানি? মূল পর্যায়সারণীর অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে এবং গঠনের প্রতিসমতা রেখে অপরাপদার্থের গুণাগুণও মোটামুটি সঠিক ভাবেই বলে দিতে পারি। পদার্থের মত অপরাপদার্থও সুস্থির, তবে পদার্থের সংস্পর্শে এলেই বিপদ, সঙ্গে সঙ্গে একে অপরকে নিঃশেষে ধ্বংস করে ফেলবে। ধরুন, যদি খানিকটা পদার্থ সমপরিমাণ অপরাপদার্থের সংস্পর্শে আসে, তাহলে তাদের পরস্পরের বিলুপ্তির মুহূর্তে যে পরিমাণ শক্তির সৃষ্টি হবে একটা পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণকে তার কাছে কালীপূজোর রাতের একটা তুবড়ীর চেয়ে বেশী কিছু বলে মনে হবে না। তাই, পৃথিবীতে কোন অপরাপদার্থ আসতেও পারে না এবং এখানে তার কোন খনিও থাকতে পারে না। এমন কি, তার উচ্চ পর্যায়ের কয়েকটা পরমাণুও যে থাকবে, তারও সম্ভাবনা নেই। অতএব, রসায়নশাস্ত্রের ছাত্রদের দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই,—অপরাপদার্থ-রসায়নশাস্ত্র তাঁদের পড়তে হবে না।

তাই বলে, মহাবিশ্বের কোথাও অপরাপদার্থের বড় রকম পরিমাণ পুঞ্জীভূত থাকবে না, এমন মনে করার কোন হেতু নেই। প্রতিসমতার প্রতি প্রকৃতিদেবীর এমনই প্রবণতা, যে অনায়াসে বলা যায়, অপরাপদার্থের অস্তিত্ব প্রায় তর্কাতীত। অবশ্য একথাও সত্যি যে কোন অপরাবিশ্ব অথবা অপরাজগতের অস্তিত্বের প্রমাণ আজো মেলেনি। এখানে আমরা হাইড্রোজেন এবং অপরা-হাইড্রোজেনের প্রভেদ বের করতে পারি বটে, কিন্তু বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে সে প্রভেদ বের করা যথেষ্ট কঠিন। আমাদের ছায়াপথে ধরি, প্রতি এক কোটি স্বাভাবিক পরমাণু-কেন্দ্রীণ আছে। এটা অনুমান। তবে, অন্য ছায়াপথে এ অনুপাত হয়তো অন্যরকম। সিগ্নাস-এ এবং মেসিয়ার-৮৭ আমাদের ছায়াপথের বাইরে, তাদের বিকিরণের বহর দেখে মনে হয়, সে বিকিরণের কারণ সম্ভবতঃ অপরাপদার্থের ধ্বংসজনিত শক্তি।

সমীকরণে যেমন ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক সংখ্যা এক অপরকে বাতিল করে দেয়, তেমনি গোটা বিশ্বটাই কি একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে পড়ে থাকবে শুধু—শূন্য? নতুনত্ব কিছু নেই এ চিন্তায়। এ কথায় আলোচনা প্রায়ই হয়েছে, তবে, তা থেকে কিছু প্রমাণও করা যায় না, অপ্রমাণও করা যায় না।

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী এমিলিও জি. সেগ্রে ব্যাপারটাকে ব্যক্ত করেছেন এইভাবে, বলেছেন, 'আপনারা তো বিশ্বাস করেন, ভগবান পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। ধরা যাক, তাই করেছেন, কিন্তু এমন কথা মনে করার কি কোন কারণ আছে যে অপরাপদার্থের চেয়ে পদার্থের ওপরেই তাঁর পক্ষপাত বেশী!'

চলুন সৃষ্টির গোড়ার কথায় যাই। দেখেছি, পদার্থ এবং অপরাপদার্থের মাঝে পূর্ণ প্রতিসাম্য বর্তমান। এখন যদি জিজ্ঞেস করি, পদার্থ এবং অপরাপদার্থের সৃষ্টি একই সঙ্গে হয়নি, একথা কে বললে? তাহলে সে প্রশ্ন নিশ্চয় অসঙ্গত হবে না। পদার্থবিদ্যার সব বইয়ে একটা ব্যাপার আছে, যাকে রূপক হিসাবে ব্যবহার করা যায়। শক্তির একটি রশ্মিকে তথা একটি বিদ্যুৎ-চুম্বক তরঙ্গকে বিপরীত বৈদ্যুতিক আধানযুক্ত দুটি পদার্থ কণায় রূপান্তরিত করা যায়। এই দুটি বিপরীত বৈদ্যুতিক আধানের একটি পরা এবং অপরটি অপরাবৈদ্যুতিক। সৃষ্টির শুরুও কি ওই পদ্ধতিতে?

সি. জে. ফিল্ডেন একটি সৃষ্টিতত্ত্ব গড়েছিলেন, তাতে অপরাপদার্থের কথা ছিল। তিনি বলেছিলেন, সৃষ্টির মুহূর্তে পদার্থ এবং অপরাপদার্থ যুক্ত ছিল, তারা 'ভিন্ন' হয়েছে পরে, অভিকর্ষ-'অপরাভিকর্ষের (gravity-antigravity) পারস্পরিক বিপ্রকর্ষের কারণে। 'অপরাভিকর্ষের' ধারণাটা এতই নতুন যে আমাদের জগৎ-চিন্তায় তাকে খাপ খাওয়ানো নিতান্তই কঠিন ব্যাপার। তবে এ শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাসী ফিল্ডেনই একমাত্র ব্যক্তি নন।

অর্ক গ্রামোভও ওই রকম ধারণা পোষণ করেন। তিনি বলেছেন, অভিকর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে অপরা-কণার ভর পরা-আধান সমন্বিত কি না, তা এখনো প্রমাণিত হয়নি। কিন্তু তার ভর যদি অপরা-আধান সমন্বিত হয়, তাহলে তো অপরা-আপেলটি মাটিতে না পড়ে আকাশে 'পড়বে'!

অপরাপদার্থ সমন্বিত মহাবিশ্বের একটা নতুন ধারণা যদি দানা বাঁধে এবং সাম্প্রতিক কিছু অনুপপত্তির অপসারণ ঘটে, তাহলে এক বিশালতর বিশ্বের সঙ্গে মানুষের সেই নতুন সম্পর্কের দরুণ তাকে নবতর সমস্যার মুখোমুখি দাঁড় করাবে।

প্রায়ই ভুলে যাই, আমাদের গোটা সৌরমণ্ডলটা একটি মাত্র ছায়াপথের একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ। ভুলে যাই, আমাদের ছায়াপথটি অনন্ত মহাবিশ্বের কোটি কোটি আরো ছায়াপথের মাঝে একটি মহাজাগতিক অস্তিত্ব মাত্র। যদি আবার এর ওপর একটি অপরা-ব্রহ্মাণ্ড থেকে থাকে, তাহলে আমাদের পৃথিবীর 'প্রাধান্য' তো আরো একধাপ নেমে যাবে। নিজেদের আমরা কত বেশি বড় ভাবি, কিন্তু সত্যি আমরা কতটুকু! একথা ভাবতেও যে লজ্জায়, ঘৃণায়, ভয়ে কুঁকড়ে যাই! তবে একটা বিষয়ে নিশ্চিন্ত, পরা এবং অপরা, দুটো ব্রহ্মাণ্ডের সংঘাতে যদি কোনদিন দুটোই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তাহলে আমাদের দেহ-মনে আর কতটুকু ব্যথা বাজবে!

এক এল বল্ডিন 'সৃষ্টি আজও বিরামহীন' অবলম্বনে।

প্রবাসীর বাংলা শিক্ষা : ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে

মহুলী ঘোষ

ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাভাষাটা শেখার কথা এই রচনার বিষয়বস্তু। সাহিত্য-পাঠককেও এইভাবে দেখার চেষ্টা করা যায় যেহেতু চরিত্রগতভাবে পৃথক হলেও ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে সাহিত্যও এক ধরণের ভাষাক্রিয়া সন্দেহ নেই। সুতরাং বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সাহিত্য বিশ্লেষণ, লেখক পাঠকের বিশেষ মানসিকতামাত্র বিশ্লেষণ করে সফল হবে না। একটি ভাষাক্রিয়া বলে রচনাকে গ্রহণ করে, তাতে ভাষার ব্যবহারগত বিশেষত্ব বিশ্লেষণ করার সঙ্গে সে রচনাবিশেষের গঠনরীতিকে বুঝে নেবার চেষ্টা করবে।

অর্থাৎ অকারণে পাঠকের এতসব মাথাব্যথার দরকার নেই আর সাধারণভাবে সাহিত্য পাঠকের ক্ষেত্রে, বুঝতে পারলে পৃথক ভাবনায় বাঙালী বলে পৃথক সমস্যাও নেই। কিন্তু রচনায় এমন কি মৌখিকভাবেও ব্যবহার করতে হলে ভাষার জ্ঞানটা সবারই খুব আবশ্যিক এবং বাংলার বাইরের বাঙালীর কিছু সমস্যা তাতে অবশ্যই আছে।

প্রথম যা সমস্যা, তা হল বাংলার বাইরের বাঙালী বাংলা ভুলে যাচ্ছে অথবা নাকি একেবারেই শিখছে না। এক ধরনের বাংলা তো বাংলাভাষীমাত্রই জানেন, অন্তত বলেন। তা হলে যে বাংলা ভুলে যাচ্ছে তা অবশ্যই মানসম্মত বাংলা, যা মোটামুটি কলকাতা এবং তার অদূর চারপাশের শিক্ষিতদের ভাষা এবং যা সাহিত্য, শিক্ষকতা, সভা, সমিতি ইত্যাদি সকলরকম সংস্কৃতিমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যবহার হয়। যদিও এই বিরাট দেশ ভারতবর্ষে এবং বাংলাদেশে নানা জায়গায় নানারকম বাংলা বলা হয় অর্থাৎ বাংলার অনেক উপভাষা চলিত আছে তবু যে একজায়গার ভাষাই এমন করে প্রাধান্য পেয়েছে, তাতে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। ভাষাতে বিভিন্নতা এবং বৈচিত্র্যই স্বাভাবিক। কিন্তু ঐতিহাসিক ধারায় বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে কোন এক বিশেষ জায়গায়, সচরাচর রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক রাজধানীর ভাষা অন্যগুলির তুলনায় বেশী সম্মানের অধিকারী হয়ে ওঠে। এই সম্মান তাকে ক্রমশ সাহিত্য, সংস্কৃতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করে এবং প্রতিষ্ঠা তাকে করে ঐ ভাষাভাষীর কাছে আদরণীয়। বাংলাভাষার ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটি ঘটেছে ঐ বিশেষ ভাষাটিকে কেন্দ্র করে। রবীন্দ্রনাথ ১৩৪৮ সালে একে 'সাহিত্যিক কথাভাষা' বলে মেনে 'বাংলাদেশের সকল দেশী ভাষা' বলে গণ্য করেছেন। (বাংলাভাষা পরিচয়, রবীন্দ্রনাথ)।

বহির্বঙ্গের বাংলায় সেই ভাষা থেকে সরে আসার অজস্র লক্ষণ ক্রমশ অজস্রতায় প্রকাশ পাচ্ছে। বিহারে আমরা তার প্রমাণ প্রতিদিনই পাই। মানভূম, সিংভূম, ভাগলপুর, কিষাণগঞ্জ—নানা জায়গায় নানারকম বাংলা চলিত। এর উপর হিন্দী এবং বিহারের নানা ভাষা তো আছেই। এদের প্রভাব স্বীকৃত বাংলার উপর ক্রমবর্ধমান। প্রভাব ঘটাতে গিয়ে স্বীকৃত সাহিত্যিক বাংলা কারুর মতে 'খোট্টাই বাংলা', কারুর মতে 'বিকৃত বাংলায়' দাঁড়াচ্ছে।

ভাষার পরিবর্তন এবং নানা নতুনত্বের উদ্ভব নিশ্চয় এবং অপ্রতিরোধ্যভাবে স্বাভাবিক।

তার একটিমাত্রকল সর্বত্রচলিত এবং স্থায়ী হতেই পারে না। মৌখিক ভাষা প্রভাবিত হয় আগে এবং তারপর লেখাকেও সম্পূর্ণভাবে অপ্রভাবিত রাখা যায় না। বাংলার ক্ষেত্রে এমনিই ঘটছে। —প্রায়ই কথা ওঠে, বহির্বঙ্গে বাংলার অস্তিত্বটা তো আর নতুন নয়। সে চিরদিনই ছিল, অন্যভাষাদের আশেপাশে নিয়েই ছিল। তখন যদি এই সমস্যাটা এমন করে উচ্চকিত হয়ে দাঁড়ায় নি এখনই কেন তা হলে বাইরের প্রভাবকে সে ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না বা রাখছে না।

এইখানে ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা এসে পড়ে। যোগাযোগের প্রধানতম উপায় ভাষা। এই যোগাযোগের সূত্রে অধিক ব্যবহৃত শব্দ বা বাক্যাংশের উপর এক ধরনের সাংস্কৃতিক বিশেষ অর্থ এমন কি গুরুত্বপূর্ণ ভাবও অর্পিত হয়ে যায়। বাংলার বাইরে, বাঙালী ছাড়া বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালীর যোগাযোগ ক্রমশ বাড়ছে। পঠন-পাঠনেও বাংলাচর্চা প্রয়োজনগত ভাবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক ভাবেও কমে আসছে। সচেতন এবং সুযোগ থাকলে অবশ্য ভাষার সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগকে বিচ্ছিন্ন হতে না দিয়ে তাকে মোটামুটি নিজের রূপে টিকিয়ে রাখা চলতে পারে। (যেমন, ভাগলপুরের ভিতরদিকের এক শ্রেণীর বাঙালীর বাংলা আমূল বদলে গেলেও, শহরবাসী বাঙালীর ভাষা বিহারে সাধারণভাবে প্রচলিত বাংলা থেকে আলাদা নয়।) মানসম্মত বাংলা থেকে কিছু পরিবর্তন স্বাভাবিক। সেটা শ্রোতাদের এমন কি শিক্ষকদেরও অভ্যাস হয়ে আসছে। অর্থাৎ এই ভাবেই মানসম্মত আদর্শ বাংলা থেকে অন্য বাংলা ক্রমশ সরে আসছে এবং আসবে। বাংলাচর্চার ব্যক্তিগত অনুশীলন এবং প্রতিভার কথা আলাদা কিন্তু সামগ্রিকভাবে সাধারণের মধ্যে চর্চার ক্ষেত্রে বিবিধ পরিবর্তনের সঙ্গে 'হামেশাই মুকাবলা' হয়। মানসম্মত বাংলা থেকে কতটা সরে আসাতে মান বেশী যায়, যোগ্য ব্যক্তি বা সংস্থা প্রয়োজন বোধে তা নিরূপণ করবেন হয়তো। তবে বহির্বঙ্গে বাংলা চর্চাকে জীবন্ত ও কর্মক্ষম রাখতে হলে বাংলার বাইরের বাংলাভাষাকে আদর্শ বাংলা সচেতন ভাবে শিখতে হবে। ইংলণ্ডে সর্বত্র একই ইংরেজী বলা হয় না। কিন্তু এক সর্ববক্তা, সর্বমানসম্মত সাহিত্যিক ইংরেজী, যা Queen's English নামে পরিচিত, তা সব ছাত্র সচেষ্ট হয়ে শেখে, সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই শেখানো হয়। হিন্দীভাষার ক্ষেত্রে মানসম্মত হিন্দী কথাটি, তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও মোটামুটি ভাবে ক্লাসে শিক্ষা দেওয়া, সভাসমিতির ভাষণ ইত্যাদি যে হিন্দীতে হয় তাকেই মানসম্মত বলে গ্রহণ করে শেখানো হয়ে থাকে। ভোজপুরী, মৈথিলী ইত্যাদি ভাষীরা তো সচেতনভাবে তা শেখেনই, খড়িবোলী যাঁরা নিজেদের মাতৃভাষা বলে জানান, তাঁরাও সেই মানসম্মত হিন্দীর ব্যাকরণ রপ্ত করেন।

বহির্বঙ্গের বাঙালীকেও মানসম্মত বাংলা শিখে নিতে হবে। এই শেখা বা শেখানোর কাজটা এমন কিছু শক্ত নয় কিন্তু শিক্ষক বা ছাত্র উভয়েই ভাবেন, 'বাংলা তো আমাদের মাতৃভাষাই, তা আর আলাদা করে শিক্ষার কি!' যদিও ঐ মানসম্মত বাংলা শিখতে এঁদের সচেতন হওয়া খুব দরকার। আবার কখনো কখনো বক্তার নিজস্ব বাংলা জ্ঞান বিষয়ে একটা কুণ্ঠিত স্পর্শকাতরতা তাঁকে আদর্শবাংলা শেখার প্রতি বিমুখ করে দেয়। তাঁর ধারনা, তাঁর বাংলা খারাপ। এই ধারনা আবার বাংলা শেখা বা চর্চাকে কঠিন মনে করাতে থাকে। এই ব্যাপারে, সর্বপ্রথম ধারনা তৈরী করতে হবে যে, কোন ভাষাই নিজের প্রয়োজন ক্ষেত্রে খারাপ বা অযোগ্য নয়, ভাষা বিজ্ঞানের চোখে

তো নয়ই। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভাষামাত্রেই সমান কিন্তু বিজ্ঞানেতর কারণে কোন বিশেষ ভাষাটি বলে যখন সর্বমান্য বলে গ্রহণীয় এবং চর্চার বস্তু হয়ে ওঠে, তখন সুবিধে এবং নিজস্ব সংস্কৃতির দিক দিয়ে তাকে শেখা প্রয়োজন।

এরপর কয়েকটি বিষয়ে মনোযোগ দরকার। ভাষাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করা, বিশ্লেষণ করার বিজ্ঞানই ভাষা-বিজ্ঞান। কাঠামো বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে ভাষার গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলি যাদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

প্রথমত, প্রকাশ, যা নাকি ধ্বনি, শব্দ, বাক্যাংশ, বাক্য প্রভৃতি নিয়ে ভাষার যা আত্মপ্রকাশের দিক, তারই রীতিবদ্ধ নিয়ম।

এই প্রকাশ-উপাদানগুলি একক বা সামগ্রীকভাবে যে অর্থের ব্যঞ্জনা দেয়, লোকাস্মৃতি এবং সাংস্কৃতিক ভাষার অর্থরীতিতে তারই বর্ণনা।

পরিশেষে প্রকাশ এবং অর্থরীতির যোগবন্ধনের নিয়ম, ভাষাবিজ্ঞান যাকে এসোসিয়েশন বলে।

শিখতে চাই এমন ভাষার, আমাদের ক্ষেত্রে মানসম্মত বাংলার একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণসহ বর্ণনা সর্বপ্রথম প্রয়োজন। তার দ্বারাই সর্বমান্য বাংলার প্রকাশ এবং অর্থব্যঞ্জনা এবং তাদের সংযোগ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ ধারণা তৈরি হবে। বাংলার বাইরের বাংলায় ধ্বনি থেকে নিয়ে বাক্য পর্যন্ত কোথায় কোথায় তার থেকে পার্থক্য, সে বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মতভাবে স্পষ্ট ধারণা হবে। সেই পার্থক্য মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা এবং মিটিয়ে নেওয়াও তখন সহজ হতে পারে। তাই কোন এক ধরণের বাংলা বলে বলেই মানসম্মত বাংলার কাঠামো বিষয়ে তার খুব সচেতন ঔৎসুক্য থাকে না। সমস্ত পরম্পরার ধারায় স্বাভাবিকভাবে সে যে ভাষাকে পাচ্ছে অস্পষ্ট আন্দাজে 'তাতে কিছু কিছু ভুল আছে' এইমাত্র তার ধারণা। কিন্তু এটুকুর উপরে ভরসামাত্র না রেখে তাকে ধ্বনি থেকে শুরু করে উচ্চারণ, শব্দ গঠন, বাক্য রচনা অবধি নিয়ে যেতে হবে।

এইখানে ভাষাশিক্ষায় অর্থাৎ শেখায়, শেখানোর অন্যতম প্রয়োজনীয় একটি বস্তুর উল্লেখ আবশ্যিক। সে হল উচ্চারণ অভিধান। বাংলার বাইরে বাংলাশিক্ষা প্রতিপদে সেই প্রয়োজনকে অনুভব করে। বিরাট দেশের বহু অঞ্চলে কিছু কিছু এবং কোথাও কোথাও যথেষ্ট পরিমাণে বাঙালী বসবাস করছেন। আদর্শ বাংলা শেখার সুযোগ সকলের নেই। একই শব্দের নানান রকম উচ্চারণ প্রচলিত আছে এবং তা স্বাভাবিকও: একটি ত্রুটি করে নতুন ভ্রান্তিও জন্ম নিচ্ছে। এই অবস্থায় সর্বস্বীকৃতিপ্রাপ্ত মানসম্মত বাংলার উচ্চারণ যদি অভিধানবদ্ধ হয়ে সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছায় তা হলে স্বীকৃত উচ্চারণগুলি বাংলাভাষী শিখে নেওয়ার চেষ্টা করতে পারেন। ড্যানিয়েল জোন্স-এর ইংরেজি ভাষার উচ্চারণ-অভিধান ইংরেজি বলতে আগ্রহী মাত্রের যথেষ্ট অবলম্বন হয়।

এই অভিধান তৈরি হলে বাংলা উচ্চারণের codified হবার সমস্যাটাও নীতিনিয়মের ক্ষেত্রে অনেকটা মিটে যাবে। কারণ অভিধান যখন তৈরি হয় সুষ্ঠুতর আদর্শকে অবলম্বন করে। তাকেই সে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়। তাতে এমন কি, ভাষার পরিবর্তনও নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসে। লাভ বললে সেটা ভাষার পক্ষে লাভ বটে।

এই শ্রেণীর অন্য একটি প্রয়োজন, মানসম্মত বাংলার বাগধারা, প্রবাদবাক্য প্রভৃতি সং

সংস্কৃতিগত দিক থেকে বিশেষ শব্দাবলীর পুস্তিকাচিত্রীয় নিজস্ব বিন্যাস ধারণাগুলির একটি বর্ণানুক্রম ব্যাপক অভিধান রচনা। ভাষা শিখতে হলে, ভাষার বর্তমান ছোট ধ্বনি থেকে নিয়ে ব্যক্তিগত বা সংস্কৃতিগত বিমূর্ত ভাবনাগুলি বিষয়েও ধারণা থাকা একান্তই দরকার।

বুঝতে পারা, বলতে পারা, পড়া এবং লেখা এই চার নিপুণতা অর্জিত হলে কোন ভাষা শেখা সফল বলা চলে। বাংলার বাইরে বাঙালীর বাংলাশিক্ষায় তা অর্জনের উপায় সংক্ষেপে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। তবে ভাষাশিক্ষায় ছাত্রের শিক্ষার ইচ্ছাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার অধিকারী। সেই ইচ্ছা জাগা এবং তাকে জাগিয়ে রাখতে পারাই বোধ হয় সমস্যা সমাধানের পথে প্রথম পদক্ষেপ।

গত সংখ্যায় 'পাতাল কোথায়?' প্রবন্ধের ৪নং প্যারার শেষ অংশে 'আরো আশ্চর্যের ………পারে না।' এর পরিবর্তে হবে—আরও আশ্চর্যের কথা উত্তর দক্ষিণের এই খোলা জায়গা দুটো ছাড়া অন্য সমস্ত বলয়টি এতই চুম্বকিত যে ওখান থেকে ছাড়া অন্য কোনো জায়গা দিয়ে বিকিরণ যাতায়াত করতে পারে না।

মহেঞ্জোদড়োকে নিয়ে

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর

কৃষ্ণ যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় সংহিতার ১/৭/৪/৪ সূক্তে বলা আছে 'যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ'। যজ্ঞেরই নাম বিষ্ণু।

এই সূক্তের বক্তব্যটি মৌন অর্থে ডুবে থাকলো বেদেই, কিন্তু নানান্ ভাষ্যকার ব্যাখ্যা করলেন নানান্ ভাবে। গীতায় ব্যাখ্যা হলো, কোন এক সময় প্রজাপতি সৃষ্টি করলেন জীব কুলকে এবং তাদিকে বলে দিলেন যজ্ঞ কর যজ্ঞই তোমাদের সব বাসনা পূর্ণ করবে।

সহ যজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বম্ এষ বোঽস্ত্বিষ্ট কামধুক্॥ (গীতা ৩/১০)

যজ্ঞ করে দেবতারা সন্তুষ্ট হবেন। তাঁদের সন্তোষেই তোমরা সুখী হবে। তাছাড়া দেবতাদের সন্তোষের ফলেই অন্নাদি উৎপন্ন হয়, এবং সেই অন্নের দ্বারা যজ্ঞও হয় এবং যজ্ঞের অবশিষ্টাংশ ভক্ষণ করে সকলের জীবন সুরক্ষিত হয়। আর দেব সন্তোষের ফলে অর্থাৎ যজ্ঞের ফলে অন্ন হয়, অন্ন থেকেই শরীর ধারণ করা যায়, অপর পক্ষে—

অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যক্ আদিত্যমুপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাৎ জায়তে বৃষ্টিঃ বৃষ্টেরন্নং ততঃপ্রজাঃ॥ (মনুসংহিতা ৩/৭৬)

অর্থাৎ অগ্নিতে আহুতি দিতে ঘৃতঃ প্রভৃতির প্রয়োজন, তাতে ধূম হবে, সেই ধূম, সূর্যে উপস্থিত হবে, তাতে মেঘ হবে, সেই মেঘে বৃষ্টি হবে, বৃষ্টির দ্বারা অন্নের সৃষ্টি হবে, এবং সেই অন্নেই জীবকুল শরীর ধারণ করবে।

গীতা এবং মনুতো বলেন, অগ্নি, সূর্য, ধূম, মেঘ, এরা বৃষ্টির সৃষ্টিবিজ্ঞানে পরস্পর কার্যকারণ সম্বন্ধে রয়েছে কিন্তু একটা জায়গায় জড়িয়ে রইলো মেঘ সৃষ্টির বিজ্ঞানের সঙ্গে যজ্ঞ করার ব্যাপারটা এবং যজ্ঞ করার অধিকারটা কেমন করে সবার হাতছাড়া হয়ে কেবল পুরোহিতের হাতেই রইলো?

এ সম্পর্কে মনু ও গীতায় একটা সেতু বন্ধন রচনা করা আছে, সেটা এইভাবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারটি বর্ণের কর্মবিভাগ করা আছে। এটা ওদের স্বভাব প্রভাব গুণের জন্য (কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাব প্রভবৈর্গুণৈঃ (গীতা ১৮/৪১)

এ ব্যাখ্যায় এমন জট পাকিয়ে আছে যে সে জটছাড়ান অদ্যাবধি কারোর করে কুলোয় নি। কারণ বেদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারটি সংজ্ঞা আছে ঠিকই কিন্তু তাদের মধ্যে যে জাতি নামক এক একটি সত্তার অস্তিত্ব আছে, তেমন উল্লেখও নাই; আর ব্রাহ্মণ ও পুরোহিত যে অভিন্ন এবং সেই অভিন্ন-সূত্রেই যে সৌত্রিক সন্তানদের পৌরহিত্য অধিকার অবাধনীয় হবে অপরের হবে না এটা কিন্তু বলা নাই; অথচ প্রবিভক্ত কর্মসম্পন্ন এক এক সংজ্ঞার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য, শূদ্রদের সন্তানগণ সেই সেই গুণ ও কর্মের এতটুকু ছোঁয়াচ না পেলেও, জন্ম সূত্রেই তারা সেই সংজ্ঞা এবং জাতি অভিন্ন হয়ে যায়। এ প্রচলন স্মরণাতীত কাল থেকে, এই ভারতে।

তবুও বৈশিষ্ট্য, অন্যান্য সংস্কার সম্পাদন কর্ম বৃত্তিতে পূর্বের রীতি থেকে কোনদেও ব্রাহ্মণ বর্ণ এবং জাতির অভিন্নতার সঙ্গে পৌরোহিত্য অধিকার তাদেরই আছে ; এটাও নড়চড় কদাপি হয় নাই। অর্থাৎ পুরোহিত এবং ব্রাহ্মণ অভিন্ন হয়েই আছে। যেমন রক্ষা, বাণিজ্য, এবং শ্রমিক বৃত্তিতে বর্ণ এবং জাতির দলছুট হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তাদের কোন বাধা আসে নাই।

কিন্তু পৌরহিত্য-বৃত্তির অভ্যন্তরে যে অধিকার রক্ষার একটা প্রবল সংগ্রাম বৈদিক সূক্তির মধ্যেও নমুনা পাওয়া যায়, সেটা এমনি দৃঢ়মূল যে, আজও ভারতীয় সমাজে তা অবিচ্ছিন্ন। পৌরহিত্যের অধিকার রূপটি যে ভারতের ভৌগোলিক অবস্থার যথেষ্ট পরিবর্তনের কারণ হলেও অর্থাৎ সেই সুদূর অতীতের ভারতের ক্রমেই সংকোচন হলেও এবং বর্ণ ও জাতির বহুধা বিভক্তি এলেও পুরোহিত ও ব্রাহ্মণ যে অভিন্ন এ ধারাটি অক্ষুণ্ণই আছে।

অন্য কোন বর্ণের মধ্যে প্রচুর পাণ্ডিত্য থাকলেও পৌরহিত্যে অধিকার কিন্তু ভারতবর্ষে সেই একই ধারায় অবিচ্ছিন্ন আছে। এই অধিকার রক্ষার জন্য পূর্বেও সংগ্রাম হয়েছিল এবং তারপরে নানান্ মিথ্যা গল্পের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ এবং পুরোহিত যে অভিন্ন এবং ব্রাহ্মণই যে একমাত্র অধিকারী এটি দেখাতে পুরোহিত সম্প্রদায় আজও সরব সচেষ্ট। এর জন্য—

( ) ভৃগুর পদাঘাত ঘটেছিল বিষ্ণুর বক্ষে। অর্থাৎ যজ্ঞ ও বিষ্ণু অভিন্ন হলেও পুরোহিতই সবার ওপরে। তিনি যজ্ঞ ও বিষ্ণুকে অবশ্যই পদাঘাত করার অধিকারী।

(২) পুরোহিতের অবমাননার জন্য বেণ রাজার পতন।

(৩) নহুষ রাজার দুর্দশার কারণ, ব্রাহ্মণ-পুরোহিতকে ঘৃণার সহিত অপমান করা।

(৪) বিশ্বামিত্র ত্রিশঙ্কু/বসুরাজ/বশিষ্ঠ প্রভৃতির উপাখ্যানের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের শ্রেষ্ঠত্বই বিজ্ঞাপিত হয়ে আছে। প্রতিটি কাহিনীতেই আছে অতীন্দ্রিয় গোচর করার জন্য ব্যক্তিবাদের মাধ্যমে পুরোহিত-শ্রেষ্ঠত্বই প্রচার। যতদিন কোন রাজা মহারাজা ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সেবা করেছেন ততদিন তিনি ঈশ্বর, আর যখনই পুরোহিতের অবমাননা করেছেন তখনই তার নরকপ্রাপ্তি ঘটেছে প্রতিটি পুরাণে।

এমনি চিত্রণ দেখা যায় বৈদিক সূক্তে। যতদিন ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের সেবা করতেন বণিক বা পণিরা ততদিন পণিদের জন্য ঋষি প্রভৃতির কাছে সুখ সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করতেন। যেই, পণিরা বুঝতে পারলেন পুরোহিতদের এটা ব্যবসা মাত্র, সেদিন থেকে তাঁরা দুগ্ধ, ঘৃত, দধি এবং যজ্ঞের অন্যান্য সুখাদ্য দ্রব্যের উপাদানগুলি দেওয়া বন্ধ করলেন, সেইদিন থেকে 'পণিরা' হলেন অসুর, শত্রু।

কথাটা খুলে বলা দরকার—

ঋগ্বেদের ১০।১৫৬।৩ সূক্তে দেখা যাচ্ছে, ঋষিদের একটি প্রার্থনা—

'অগ্নে সূনৃতং রয়িং ভর পৃথুং গোমন্ত মশ্বিনম্।
অংধি খং বর্তয়া পণিম্॥

অর্থাৎ—ওহে অগ্নি! পণিদের প্রচুর ধন দাও, গাভী দাও, অশ্ব দাও, আকাশকে বৃষ্টিজলে অভিষিক্ত কর। পণিদের বাণিজ্য প্রসারিত কর।

তারপর সেই ঋগ্বেদেরই ৬।৪৫।৩১ সূক্তে দেখা যাচ্ছে পণিদের মধ্যে বৃবু নামে কোন পণিকে

ঋষি বলেই আখ্যাত করা হয়েছে. সে আখ্যানের বক্তা বার্হস্পত্য শংযু নামে কোন ঋষি—"অধি বৃবুঃ পণীনাং বর্ষিষ্ঠে মূর্ধণ্য স্থানাৎ উরুঃ ।

অর্থাৎ—পণিদের কুলে মাননীয় বৃবু খুবই উচ্চস্থানে আসীন রয়েছেন ।

যে ঋগ্বেদের কয়েকটি সূক্তে পণিদের এত প্রশংসা, পণিদের জন্ত এত দরদ, সেই পণিদিকেই আবার শত্রু, দেবদ্বেষী এবং তাদিকে বিতাড়িত করার জন্ত অসুর এবং রাক্ষস বলার ঘোষণাও দেখতে পাওয়া যায় যজুর্বেদের বাজসনেয় সংহিতায় ৩৫।১ সূক্তে—

অপেতো যন্ত পণয়ঃ অসুম্না দেব পীয়বঃস্রাত্যাঃ ।

অর্থাৎ দেবদ্বেষী, অসুখকর রাক্ষস পণিগণ দূর হও ।

অতএব স্বাভাবিক প্রশ্ন ওঠে, একই বৈদিক সংস্কৃতিতে যে পণিদের এত প্রশংসা আবার সেই পণিরাই এত নিন্দনীয় হল কেন ? নিশ্চয় অকারণে হয়নি এবং বিনা কারণেও হয়নি, আর যে ঋষিরা প্রশংসা, আবার নিন্দা করেছেন তাঁরা কি একই গোষ্ঠির ? নাকি ভিন্ন গোষ্ঠির ? অথবা স্বার্থবশেই প্রশংসা, আর স্বার্থহানিতেই নিন্দা ?

এ সন্ধান নিতে গিয়েই ঋকের ৪র্থ, ৫ম এবং ষষ্ঠ মণ্ডলের সূক্তগুলির মধ্যে অনেক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়, যে তথ্যগুলি জের টেনে চলেছে ১ম মণ্ডল থেকে এবং একেবারে বিচ্ছিন্ন প্রায় হয়ে গিয়েছে দশম মণ্ডলে। তারপর ঋকের অন্যান্য স্থানে 'পণি'দের তেমন প্রসঙ্গ নাই একেবারে দীর্ঘকাল পরে এসেই যেন যজু ও অথর্ব বেদে সেই পণিপ্রসঙ্গ ।

পরিষ্কার বোঝা যায় পণিরা এককালে আর্য-ঋষি সমাজের অচ্ছেদ্য অংশ বলেই তাঁরা মাননীয় পরিবারদের অন্যতম ছিলেন। এঁরা ছিলেন গোধনজীবী বাণিজ্যে নিপুণ, অর্থসংগ্রহে সুদক্ষ হিসাবী এবং সক্রিয়, ব্রাহ্মণ আর্যদের যজ্ঞ-কার্যের একান্ত উপাদান ঘৃত, দধি, দুগ্ধ ও অন্যান্য সুখ সুবিধার যাবতীয় উপাদান দিয়ে রীতিমত সহায়তাই করতেন ।

সূক্তগুলিতে পণিদের বহুস্থানে যাতায়াতের উল্লেখ দেখা যায়, তাঁরা যে উৎকৃষ্টশ্রেণীর যানবাহন হাতী ঘোড়া, দ্রুতগামী জলযান ব্যবহার করতেন বাণিজ্য-ব্যপদেশে, তারও উল্লেখ সুস্পষ্ট ।

ঋষিরাও তাঁদের দেখা পান বাহনের সাহায্যে গান্ধারদেশ (পরে এদেশ গান্ধার। পরে কান্দাহার নাম ?) পারদদেশ (পরে পারস্য ?) কোলা (পরে ক্যালডিয়া ?) শর্মনদেশ (এই কি আরবস্থান ?) আবিনীয় পরে কি আবিসিনীয় ?) সারস্বত (এই কি রাজস্থান ?) কালিন্দা (আফগানের উত্তরে ?) প্রভৃতি দেশে আসতেন এবং বাণিজ্যের জন্ত পণিরাও আসতেন ।

এ রীতিটি তাঁদের পূর্বপুরুষ ক্রমেই যে চলতো তারও ইঙ্গিত পাওয়া যায় ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের একটি সূক্তে (১।৩০।৯)　　অনুপ্রত্নস্যৌকসো হুবে তুবিপ্রতিং নরঃ ।

যস্তে পূর্বং পিতা হুবে ।

এই সূক্তটির বক্তা শুনঃ শেপঃ। তিনি বলেছেন আমাদের পিতৃগণ প্রাচীন আবাসে থেকেই ইন্দ্রের উপাসনা গাথা গেয়েছিলেন, আমরাও তোমার প্রণতি করছি। 'প্রত্ন ও কাস' মানে প্রাচীন আবাস। প্রত্ন মানে প্রাচীন। আজকের প্রত্নতত্ত্ব আখ্যাটির জন্ম সেখেই দেখা যায় ।

এতে বোঝা যায় শুনঃ শেপের জীবিতকালের আবাস, পিতৃপুরুষদের আবাস এক নয় ।

তখন তিনি অঙ্গ দেশের বাসিন্দা। এই শুনঃ শেপের কাহিনীটি রামায়ণে ১-৬১-৬২ অধ্যায়ে পাওয়া যায়। ঋচীকের পুত্র। আবার ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে শুনঃশেপ হলেন অজীগর্তের পুত্র। হয়তো এক নামেই ভিন্ন পুরুষ। কারণ ভাগবতের ৯-১৬-৩০ অধ্যায়ের কাহিনী এবং ঐতরেয় কাহিনী এক।

তা যাক—দীর্ঘকাল জুড়ে আর্যবংশীয়গণ যে বিশাল ভূখণ্ডে পুরুষানুক্রমে ভ্রমণ করতেন তা নিঃসন্দেহ। তাঁদের ভ্রমণ এবং স্বচ্ছন্দ্যের ভার থাকতো পণিদের ওপর। পণিরা বণিক ছিলেন। কারণ সেই পণি শব্দের বিবর্তনেই বণিক। পণি থেকেই পণ্য। আবার পণিজ ও বণিজ শব্দ যে এক তাও ঠিক। আর বণিজ—বাণিজ্য শব্দের মূলে যে পণি আছে তাও ঠিক।

পণ্ডিতেরা আরও এগিয়ে বলেন পণি শব্দেই গ্রীসের ভাষায় 'ফোনিক' এবং ইংরাজীতে ফিনিশীয়।

সেই পণিকরা আর্য্য ব্রাহ্মণের খুবই সেবা করতেন। আর ব্রাহ্মণগণও তাদিকে সমাজের মাননীয় অঙ্গ বলে মনে করতেন। কিন্তু পণিকগণের অধঃস্তন বংশীয়রাও যেমন একই বংশগত ধারা রক্ষা করতে পারেন নি, তেমনি যাজ্ঞিক আর্য্যগণের বংশীয়রাও তাঁদের সঙ্গে সে সৌহার্দ্য রক্ষা করতে পারেন নি।

পূর্বতনদের আচরণ অধস্তনরা একই দৃষ্টিতে দেখতে পারেন না। ধন গর্বিতা আর বর্ণজাতিগত কৌলিন্যবোধ এবং কৃত্যাগত মান্ততার হেরফের হয়েই থাকে। এ সম্পর্কে কারণ থাকে বিভিন্ন। বিশেষ কারণ অধিকার রক্ষার প্রবৃত্তি। অর্থাৎ মূলে থাকে পেটের লড়াই।

সেই পেটের লড়াইটাই অধিকার রক্ষার প্রেরণা যোগায়, অপর দিকে অধিকার রক্ষায় জাগিয়ে প্রাচুর্যশক্তিটাও উত্তরোত্তর মোহ, লজ্জা, ভয়, ঘৃণা সৃষ্টি করে অবশেষে সামাজিক জীবনকে অধিকার স্থিতির একটা মানসিক দিক এমন ভাবে সংঘর্ষকে ডেকে আনে, যার ফলে সমাজের রূপ বদলায়, এবং দেশত্যাগের মত যে বীভৎস যন্ত্রণার ইতিহাস তাও ঘটে সমাজের চলমান জীবনযাত্রায়।

বৈদিক পণিশ্রেণীর মানুষ আর যাগযজ্ঞের অধিকার রক্ষায় একান্ত আগ্রহী ব্রাহ্মণসমাজ পরস্পর বিচ্ছিন্ন, বিদিষ্ট, অবশেষে পরস্পর শত্রু হয়েছিলেন এটা ঋকের ঐ মণ্ডলগুলিতে আজও ছাপ রয়েছে।

'পণি'গণের অধস্তন বংশীয় সন্তানগণ, ব্রাহ্মণ আর্যদের মধ্যে দেখেছিলেন এঁরা দুধ, ঘৃত, দধি পান করেন, কিন্তু উৎপাদন করার জন্য নিজেদিকে ব্যাপৃত রাখতে চান না। ও কাজ করলে, যাগ, যজ্ঞ ও অধ্যাত্ম-চিন্তায় ব্যাঘাত হয় এই যুক্তিতে, পণিদের প্রতি তাদের পূর্ব পূর্বাচরণ থেকে সরে যাওয়াটাকে নিন্দনীয় বলে ধারণা করতেন।

পণিগণ ক্রমেই কঠোর হলেন। ব্রাহ্মণ আর্যদের সঙ্গে বিরোধের সূত্রপাত হল। অপর দিকে বহু দরিদ্র আর্য ব্রাহ্মণ পণিদের দলে চলে এলেন, ব্রাহ্মণগণও একটা শক্ত ঘাঁটি করলেন নিজের মধ্যে, এবং পণিদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য, কিংবা আর্যদের অধিকৃত ভূখণ্ডে পণিদের বিতাড়িত করার জন্য অন্য রাজা বাহুকে উত্তেজিত করতে লাগলেন। উত্তেজনাটি এমন ঘটলো যে, যার ফলে একদিকে পণি, অপরদিকে ক্ষত্রিয়, আর সে দলে পরামর্শ ও উত্তেজনার স্রষ্টা আর্যব্রাহ্মণ। এই গোপন বিরোধ প্রথম ঘটান 'অথর্বা' ঋষি। তারপর 'অযাস্য ঋষি' এবং অঙ্গিরার পুত্র ও শিষ্যের দল। ঋষি পত্নীরাও যোগ

দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রণী হয়ে আছেন মুদগল পত্নী 'ইন্দ্রসেনা'।

এদিকে ব্রাহ্মণ আর্যগণ ঘোষণা করলেন 'পণিগণ' ব্রাত্য। ওরা আর্যহীন। ব্রাত্যের অর্থ মলিন সংস্কার, নীচ, ছোটলোক। মনু প্রভৃতির নামে যে সব সংহিতা সেখানে ব্রাত্য মানে 'সাবিত্রী দীক্ষা হীনতা'।

তা যাক্ একাহিনী শুরু হয়েছে ঋক বেদের ১।১২৪।১১ সূক্তে, তার এখানে ওখানে টুকরো টুকরো সূক্তি, তারপর টানা প্রসঙ্গ ১০।১০৮।৭ থেকে। তবে ব্রাহ্মণ আর্যগণ যে পণিদের প্রতি অত্যাচার করতেন, ভিটেমাটি থেকে উৎখাত করতে, তার নিদর্শন ঋকের ৬।৫১।১৪ সূক্ত থেকে। এবং ১০।১০৮।৭ সূক্তে।

পণ্ডিতগণ মনে করেন ঋকবেদের সূক্তিগুলোকে পণিদের প্রতি ব্রাত্য আখ্যাটির নিদর্শন আজও রয়েছে, সেটি আফগানি স্থানের পাহাড়ী জাতি। ওরাই সেই আদ্য পণিদের বংশধর। ওরা কিন্তু নীরবে আর্য্য ব্রাহ্মণদের সম্পর্ক ত্যাগ করেনি রীতিমত দুর্ধর্ষ সংগ্রামের পরই তা করেছিল। সে সংগ্রাম কিছুটা আত্মরক্ষা কিছুটা প্রতিসংগ্রাম কিছুটা আর্য্য ব্রাহ্মণদিকে জব্দ করার প্রচেষ্টার মাধ্যমে।

এতবড় একটা বিপর্য্যয় ঘটেছিল আর্য্যাবর্তের পূর্বাঞ্চলে সরস্বতীর উপকূলে। পণিদের অন্যতম প্রধান 'বৃব'র, তার পুত্রও সেই সংগ্রামে নিহত হন। কিন্তু ধনী পণিরা আর্য্য ব্রাহ্মণদের সংস্রব ত্যাগ করতেই বাধ্য হয়েছিলেন এবং তাঁরা যে সিন্ধুর অববাহিকা অঞ্চলে এক বিশাল গোষ্ঠী স্থাপন করেছিলেন সে সম্পর্কেও যে সব সূক্তি ঋকবেদের ১০ম মণ্ডলে পাওয়া যায় তা আজকের গবেষকগণ পরিষ্কার বুঝতে পারেন। পণিরা সমুদ্র পথেই যাত্রা করেছিলেন এবং নিম্ন সিন্ধু অঞ্চলে গিয়ে আবার তীব্র সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন বিশাল দুর্গ নির্মাণ করে তারও নিদর্শন পাওয়া যায় ঋক্‌বেদেরই সূক্তিতে।

পূর্বাঞ্চলের ক্ষত্রিয় রাজ ও চুপ করেছিলেন না, তিনি পশ্চিমাঞ্চলে পণি নিধনে আবার উদ্যোগ করেন। এই সময়টায় আর ব্রাহ্মণগণ যে পণিদের সঙ্গে একটা সন্ধি স্থাপন করতে চেয়েছিলেন সেটা বোঝা যায় ১০।১০৮। সূক্তে। ও সূক্তে বোঝা যায় 'সরমা' নামে কোন দূতীকে ব্রাহ্মণরা নিযুক্ত করেছিলেন। 'সরমা' রসা নদী পার হয়ে পণিনগরে উপস্থিত হতেই পণিরা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন রসা নদী পেরিয়ে এলে কি ভাবে? সরমা এমনভাবে উত্তর দেয় যেন পণিরা বোঝেন যে ব্রাহ্মণগণ প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী, তাঁদের অসাধ্য কিছুই নাই। সরমার উক্তিতে পণিরা সগর্বে বলেছিলেন— অয়ং নিধিঃ সরমে অদ্রি বুধ্নো গোভী রশ্বেভি বসুভি ন্যৃষ্টঃ।

রক্ষন্তিতং পণয়ো যে সুগোপো

রেকুপদং কমা জগন্থ (ঋক্ ১০ ১০৮ ৭)

অর্থাৎ সরমা আমাদের ধন সম্পদ পর্বত দিয়ে ঘেরা এবং সুরক্ষিত, আর গাভী, অশ্ব এবং আরও সম্পদ আমাদের প্রচুর, এসব রক্ষা করতে বলশালী পণিরা ভালই জানে।

এই ভাবে উক্তি প্রত্যুক্তির ফল এই হলো যে আর্য্য ব্রাহ্মণদের সঙ্গে পণিদের আর সন্ধিই হলো না। সংগ্রামই তার শেষ পরিণতি এবং সে সংগ্রামে পণিদের ক্ষতি এত বেশী হলো যে, আবার দেশত্যাগ, এবং অবর্ণনীয় পণিবিনাশ। ব্রাত্য পণিদের দুর্গগুলি একএকটা বিরাট বিরাট ঢিপিতে

পরিণত হলো। যারা অবশিষ্ট ছিলেন তাঁদের কয়েকটি গোষ্ঠি স্থল পথে, কয়েকটি জলপথে এসে উপনীত হলেন ভূমধ্য সাগরের কূলে। আজকের প্রত্নতাত্ত্বিকগণের অভিমত ব্রাত্য পণিকগণ আবার যে মুক্তন করে উপনিবেশ স্থাপন করলেন, সে স্থানগুলি সিরিয়া এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল। যার নাম ফিনিশিয়া।

এঁরা যে এখানে এসেছিলেন বেশ স্বচ্ছন্দ গতিতে, তা হয়নি, অনেক দুর্যোগের মধ্য দিয়ে। আজকের ইতিহাস গবেষকরাই যে ফিনিশিয়াদের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে একথা লেখেন তা নয়, আমরা ঋক্ বেদের সূক্ত পাঠ করতে গিয়েও পরিষ্কার বুঝতে পারি মর্ত ও দেবকুলের চিকিৎসক ছিলেন অশ্বিনীকুমার (যমজ ভ্রাতা, উভয়েই চিকিৎসক)। এঁদের প্রয়োজন সবারই, এঁরা তাই নিরপেক্ষ থাকতেন। উভয় পক্ষেরই দেওয়া বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী ছিলেন। এঁদের জাহাজ, হাতী, ঘোড়া এবং অন্যান্য যানবাহন ও ছিল। সেই অশ্বিনীকুমার ভ্রাতৃদ্বয়কে সম্বোধন করে যে দুটি সূক্ত রচিত হয়েছে (১।১৮২।৫-৬) তাতে জানা যায়—

যুবমেতং চক্রথুঃ সিন্ধুষু প্লবমাত্মন্বন্তং পক্ষিণং তৌগ্র্যায় কম্।
যেন দেবত্রা মনসা নিরূহথুঃ সুপপ্তনী পেতথুঃ ক্ষোদসো মহঃ।
অববিদ্ধং তৌগ্র্যমপ্স্বন্তরনারম্ভণে তমসি প্রবিদ্ধং।
চতস্রো নাবো জঠলস্য জুষ্টা উদশ্বিভ্যামিষিতাঃ ॥

অর্থাৎ ওহে অশ্বিদ্বয়! আপনারা পণিপতি সন্তান-সন্ততির জন্য বেশ মজবুত এবং দাঁড়যুক্ত পোত পাঠিয়েছিলেন। দেবতাদের মধ্যে আপনারাই অনুগ্রহ করে তাদিগকে পোতে তুলে নিয়ে অনায়াসে মহাসাগর থেকে উদ্ধার করেছেন। সেই সময় পণিপতির সন্তানগণ আশ্রয়হীন পীড়িত এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল, আপনাদের চারখানি পোত তাদিকে পার করে দিয়েছিল।

এখন বলা যায় চিরদিনের মত ব্রাত্যপণিগণ তাঁদের পূর্ব নিবাস ছেড়ে চলে গেলেন, আর পিছনে পড়ে থাকলো তাঁদের ফেলে যাওয়া সম্পদ্ সুদৃঢ় রচনায় নির্মিত দুর্গ, আর অসংখ্য মৃতদেহের স্তূপ। সেই শবরাশির স্মৃতিজাগান নামই তো 'মহেঞ্জো-দড়ো'।

এখন সে-ভূমিটি পাকিস্তানের অন্তর্গত সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলায়। পণ্ডিতগণের মধ্যে যদিও মহেঞ্জোদড়ো নিয়ে বিতর্ক রয়েছে যে এখানে অতীত সভ্যতার চিহ্নগুলি কি বৈদিক অথবা প্রাক্‌বৈদিক?

তবে এবিষয়ে মতদ্বৈধ নাই যে, এখানে যে সভ্যতা সংস্কৃতির চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলি বেশ উন্নত ধরণের মস্তিষ্কের আহৃত এবং সংগঠিত। আমরা ঋক, যজু, অথর্ব বেদের বিভিন্ন সূক্তির মধ্যে আর্য ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তাঁদেরই সমাজের এক সময় বিশেষ মান্য পণি বা বণিক সমাজের প্রশস্তি পাই আবার তাঁদিকেই ব্রাত্য বা অসভ্য বর্বর বলে অবজ্ঞার কথাও পাই, তাছাড়া পণিদের প্রতি অত্যাচার করার সূক্তিও পাই, তার দ্বারা প্রমাণ করার প্রসঙ্গ আসে যে বর্তমান আবিষ্কৃত 'মহেঞ্জো-দড়ো' বা মৃতের স্তূপ নগরীটি আর্য ব্রাহ্মণদের উন্নত সভ্যতাকে পঙ্গু করে, যে সময় থেকে পুরোহিততন্ত্রের উদয় হয়-তারই পরিমিত নিদর্শন।

সমীক্ষার আলোয় পীরগাজী কারামত

কনককান্তি বসু

বাংলাদেশে অনেক পীর, অলি, গাওছ, কোতব, আবদাল সমাধিস্থ হয়েছেন। কিছু কিছু আলেম তাদের জীবনকথা লেখার চেষ্টা করেছেন কিন্তু সেইসব জীবনী অতিরঞ্জনের পথ ধরে কেবলমাত্র অলৌকিক কারামত কাহিনীর সমষ্টিতে যেন পরিণত হয়েছে। লোকের মুখে মুখে সেই কাহিনী আরো বহুগুণ পল্লবিত হয়ে বিভিন্ন দলের বক্তব্যে দাঁড়িয়েছে। মধ্যযুগের প্রথম পর্বের ইতিহাসের কিছু উপাদান ঐসব পীরদের জীবনকথা থেকে উদ্ধারের কোন পথ খোলা নেই। পীরস্থান ও আস্তানাগুলি বিচিত্র সংস্কার ও আত্মপ্রবঞ্চনার ক্ষেত্রে পরিণত হওয়ায় দরিদ্র লোকসমাজ যেদিন এইদিকে সতর্ক ও সংশয়ী দৃষ্টি ফেলেছে সেইদিনই মনের দিক থেকে তার মোহভঙ্গ ঘটেছে। আজও বৎসরান্তে পীরের উরসে যে অগণিত ভক্তের সমাগম হয় তাদের গতিবিধি এবং কার্যক্রমের প্রতি যথাযথ দৃষ্টি দিলে সংশয়ী, মেলা ও উৎসবপ্রিয় এবং নির্ভেজাল বিশ্বাসীর মিশ্রণ দেখা যায়।

বাংলার প্রতিটি জেলায় অগণিত পীরের মাজার রয়েছে পীর ও মাজারকে কেন্দ্র করে প্রচলিত আছে অসংখ্য লোককথা যেগুলির মূল রূপরেখা ও কাহিনী কাঠামো কয়েকটি বাঁধাধরা ছকের মধ্যে যৎসামান্য ব্যতিক্রম নিয়ে চলে আসে। আমরা ক্ষেত্রসমীক্ষার পরে মোটামুটি পাঁচটি বিস্তৃত স্টোরি মোটিফে এগুলিকে সাজাতে পারি।

১। বিশেষ বিশেষ রোগারোগ্য অথবা বিপদের মাজারের ধুলপড়া, তেলপড়া ও জলপড়ার মাহাত্ম্য-সূচক কাহিনী। সমীক্ষায় মনোনীত স্থান ছিল তালিবপুর। ১৩৮২ সনে কাজমের উরসে সমবেত ঔষধ প্রার্থীদের কাছে ৩২টি জোড়া পোস্টকার্ড দিয়ে রোগীর ঐ ঔষধ গ্রহণের ফলাফল জানাতে অনুরোধ জানানো হয়। ২৬টি ক্ষেত্রে কোন উত্তর পাওয়া যায়নি। ৬টি ক্ষেত্রে উত্তর গদাই বাদশাহ রহমাতুল্লা আলাইহের প্রচারকে সত্যে প্রতিষ্ঠা করেনা। কলমহ কাটারি ফকিরের মাজারে গৃহপালিত প্রাণীর রোগারোগ্যের ব্যাপারে যে কয়েকটি পত্রের উত্তর পাওয়াগেছে তা থেকেও কোন উৎসাহজনক সিদ্ধান্ত সম্ভব নয়।

২। দীঘি বা জলাশয়ের দিক পরিবর্তনের কারামত ও প্রয়োজনে হিন্দুর সংরক্ষিত জল কলুষিত করণ। এই ধরনের কাহিনীর একটি আদিরূপ পাওয়া যায় পশ্চিম দিনাজপুরের পুরানপাড়া ধলদীঘি থেকে। কাহিনীটি এই যে, প্রাচীনকালে এক রাজার দুই রাণী এখানে দুটি দীঘি কাটান। হিন্দুর নিয়ম অনুসারে দীঘি দুটি উত্তর-দক্ষিণে কাটানো হয়েছিল। কালো রাণীর নামে একটি দীঘির নামকরণ হয় কালোদীঘি ফর্সা রাণীর নামে দ্বিতীয়টির নাম হয় ধলদীঘি। দীঘি কাটানোর পর কালোদীঘির যথারীতি জলে ভরে যায় কিন্তু ধলদীঘিতে জলের দেখা পাওয়া গেল না। এই সময়ে আতাউল্লা হযরত তাঁর ভক্তশিষ্যদের নিয়ে এখানে দিন যাপছিলেন। ধলদীঘির সমস্যার কথা শুনে উনি বললেন যে তাঁর কারামতিতে ধলদীঘি জলপূর্ণ হতে পারে। রাজরাণীর অনুমতি নিয়ে আতাউল্লা ধলদীঘির দিক পরিবর্তন ঘটিয়ে পূর্ব-পশ্চিম ঘুরিয়ে দিলেন এবং দীঘি জলপূর্ণ হল। রাজরাণী সন্তুষ্ট

হয়ে দীঘিটি দরবেশকে দান করেন এবং দীঘির পাড়েই তাঁর বাকি জীবন কাটান।

ধলদীঘির অবস্থিতি বানগড়ের ধ্বংসাবশেষের কাছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে যে খননকার্য ওখানে চালানো হয় তাতে গুপ্ত-কুষাণ আমল থেকে স্থানটি যে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা প্রমাণিত। কাহিনীটি তুর্কী আক্রমণের পরবর্তী পর্যায়ে কোন ভূম্যধিকারীকে ইসলামের ধর্মমতে আনায় বলা যেতে পারে। কিন্তু দীঘি দুটি (প্রায় জলহীন) দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায়, এদুটি এক সময়ে কাটানো নয়। কালোদীঘি বলে খ্যাত দীঘিটি ধলদীঘির বহুপূর্বে এমন অনুমানের যথেষ্ট কারণ বর্তমান। এছাড়া ঐ পীরকাহিনীর একেবারে উল্টো লোককথা স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত আছে। ২৪-পরগণায় পীরসাহেবের নামেও অনুরূপ কাহিনী পাওয়া যায় যেখানে কারামতের চাইতে ভিন্ন কোন শক্তি কাজ করেছিল বলে অনুমিত হয়।

জলাশয় কলুষিত করার ব্যাপারটিতে কারামত বা যাদুর কোন ভূমিকা দেখা যায় না। হিন্দুর পানীয় জলে গোমাংস ফেলে দিলে তা ব্যবহারের অযোগ্য হয় এবং পানীয় জলের অভাবে মানুষ বিপদে পড়ে। মহাস্থানের পীরকাহিনীতে এই ঘটনার আভাস আমরা দেখি। মুসলমানরা বাগদীরাজাকে যুদ্ধে জয় করার জন্য এই একই পথ অবলম্বিত হয়েছিল। 'একদিন প্রাতঃকালে মোহম্মদান সৈন্যগণ উক্ত রাজার অধিকৃত গ্রামগুলি আক্রমণ করেন। রাজাও বহু সৈন্যসহ তাহাদের সম্মুখীন হন। সমস্ত দিনব্যাপী ঘোরতর যুদ্ধ হওয়ার পর রাজার বহু সৈন্য হতাহত হইল। পরদিন যুদ্ধকালে রাজার সৈন্য সংখ্যা মুসলমান সৈন্য সংখ্যার দ্বিগুণ দেখিয়া মুসলমান সেনাপতি চিন্তাযুক্ত হইলেন। ভীষণ যুদ্ধ হওয়ার পরে মুসলমান সৈন্যগণের মধ্যে শাহ্-জোলায়মান ও অন্যান্য বহু যোদ্ধা শহীদ হইয়া গেলেন। সেনাপতি মোল্লাও মোনাজাত পরে নিদ্রিত হইয়া স্বপ্নে দেখিলেন, কেহ তাঁহাকে বলিতেছেন, বাগদীরাজার বাটীতে 'জিয়ৎকুণ্ড' নামে একটি পুষ্করিণী আছে, তথায় দুই জেলেরা বাস করে। আহত সৈন্যগণকে উহাতে নিক্ষেপ করিলে, উহাদের চোটাতে সুস্থ হইয়া উঠে। এই হেতু তাহাদের সৈন্যসংখ্যা হ্রাস পাইতেছে না। যদি কোন উপায়ে উহাতে একখণ্ড গরুর গোশত্ নিক্ষেপ করা যায়, তবে উক্ত জেলেরা পলায়ন করিবে। সেনাপতি অতি কৌশলে একখণ্ড গরুর গোশত্ উহাতে নিক্ষেপ করায় জয়ের পথ উন্মুক্ত হইল। এই ভাবে জলাশয় কলুষিত করার চেষ্টা সারা বাংলায় হয়েছে এবং তার জন্য কোন যাদু বা মন্ত্র বা কারামতির প্রয়োজন হয়নি।

৩। জনসাধারণ, রাজা, কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি বা ভিন্নধর্মী অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মানুষের সামনে আকস্মিক পীরের কারামত প্রদর্শন। এই পর্যায়ের অভিনব কাহিনীটি পাওয়া যায় শেখপুরার দাতাপীরের নামে। তিনি ৫৭৩ সনের ২৫শে চৈত্র শেখপুরায় আসেন। তৎকালীন শাসনকর্তাদের কাছে আস্তানা গড়ার জন্য একটি কবালের মাপে মাপে জমি চান। শাসকেরা তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করে ঐ জমি দানের হুকুম দেন। ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা যখন জমি দান করতে আসে তখন একটি কবাল ধরে জমি মাপতে গিয়ে তারা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। কবাল ধরে টান দিতে সেটি চারিদিকে বেড়ে যেতে থাকে। বাড়তে বাড়তে যখন সেটি ৩০ বিঘে ছাড়িয়ে যায় তখন ঐখানে থামিয়ে সেই ৩০ বিঘের মত জমি পীরসাহেবের আস্তানার জন্য দান করে কর্মচারীরা কোনক্রমে পালায়। দাতাপীর ৫৮৬ সালের ১৭ই পৌষ ইহলোক ত্যাগ করেন। এই কাহিনীর কারামতি

বিদ্যার সাগর হইয়া পড়েন। তৎপর তিনি মক্কা শরীফ ও মদিনা শরীফে কিছুদিন পড়িয়া চল্লিশটি হাদিছ কেতাবে দখল লাভ করেন। ইহার পরে তিনি বহু দুর্লভ কেতাব সংগ্রহ করিয়া ধারাবাহিক ১৮ বৎসর অধ্যয়ন করেন।

বাংলায় তুর্কি আক্রমণের পর থেকে সমগ্র মধ্যযুগ ধরে পীরগাজিদের মাধ্যমে ধর্ম প্রচারে জোর দিতে হয়েছিল। বাংলার মাটিতে তখন হিন্দু ও বৌদ্ধতন্ত্রের যাদুধর্মী মন্ত্রের পাশাপাশি সহে অসংখ্য বৈদিক ধারার কালো যাদু ও কিছু সাধনার মত গোপন ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ প্রচলিত রয়েছে। সর্বোপরি আছে মূর্তিপূজা। এর একটির ও সরাসরি বিরুদ্ধাচরণ করলে লোকসমাজে মান্য হওয়া কঠিন। তাই লোকসমাজের মনোমত ধর্মচর্চার পথ ধরেই পীরগাজীরা ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়েছেন। গৌড় বা অন্যত্র অবস্থিত শাসনযন্ত্র এই পীরগাজীদের দিয়ে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিয়ে নেবার জন্য তাদেরকে মোটামুটি সুনজরে দেখেছে। এই শাসনযন্ত্র অনেকক্ষেত্রে বৈষয়িক সুযোগ-সুবিধা দিয়ে এই পীরদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছে। রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারীদের বদান্যতায় অনেক পীরগাজী সাময়িকভাবে উপকৃত হয়েছেন ঠিকই কিন্তু পরবর্তীকালে শরীয়ত শাসনে তাদের অনেককে বেদম হতে হয়েছে। শাসনযন্ত্র যখনি লক্ষ্য করেছে যে, লোকসমাজ নিজ নিজ ধর্মে অটল থেকে পীরদের কাছ থেকে শুধু উপরি কিছু বৈষয়িক লাভের জন্য হাজিরা দিচ্ছে তখনি তারা ধৈর্য হারিয়ে কোন বিশেষ পীরকে শরীয়তের চাদর দিয়ে আপাদমস্তক মুড়ে দিয়েছে। এরপরই অসংখ্য বিধিনিষেধ সেখানে আরোপিত হয়েছে। অর্থাৎ, ঐ পীর সম্পর্কে মুসলমান ভিন্ন অপর ধর্মের মানুষকে নিরুৎসাহ ও ভয়োদ্রেক করার যাবতীয় পরিবেশ তখন তৈরী করা হয়েছে। হজরত শাহাপীরের নামে যে অছিয়ৎ দেখা যায় সেখানে ভিন্নধর্মীয় ভক্তদের সংখ্যা কমাতে বলা হল : ১। যাহা আমার আত্মবোধ ও উপদেশ আমার খলিফা মুরিদান ও সমস্ত ঈমানদার মুসলমানের কাছে ব্যক্ত করলাম। সবাই শক্তিমত আমল করেন। হায়াৎ কারো কায়েম নয় ২। জীবিত কি মৃত পীরের ছুরাত হাজের নাজের জেনে ধ্যান করা হারাম। যারা করে তারা বেইমান। ৩। পুত্রকন্যাদের দীন-ই-এলেম শিক্ষা দেবে। ৪। মা-বোন, স্ত্রী, কন্যাদের পর্দায় রাখবে। ৫। হিন্দুর পূজা-পার্বণ মেলা অনুষ্ঠানে ও গান-বাজনায় সাহায্য করবে না বা সেখানে যাবে না। পূজোর পাঁঠা, কলা, আখ, দুধ ইত্যাদি বিক্রি করবে না। ভেট দেবে না। দিনে গোসল করিতে হবে। ৬। কেউ মুড়িয়ে দাড়ি কামাবে না। কাছা দিয়ে কাপড় পরবে না। অছিয়তে আরো কিছু উপদেশ দিয়ে যে ফিরিস্তি দেওয়া আছে তাতে স্পষ্ট বোঝা যায় উক্ত পীরসাহেব সম্পর্কে অমুসলমানদের উৎসাহ অবদমিত থাকুক- এটাই আসল উদ্দেশ্য।

ভরসার কথা, বাংলার গ্রামে-গঞ্জে হাটে-বাজারে এখনো অসংখ্য পীরগাজী রয়ে গেছেন যারা সমাজের দুর্বলতর অংশের দুঃখের ভরসাস্থল এবং যাদের হাজার চেষ্টা করেও কোন বিশেষ ধর্মীয় ছাপ দেওয়া যায়নি। ভগবানগোলার মিঞাপাড়ায় কবিরশাহ আজও সর্বধর্মের মানুষের দ্বারা পূজিত হন। এঁর বাকি ইটের ছিল বাজনায়। এইভাবে শেখপুরার দাতা, সায়েকবাগের মজদার, তোকিয়ার দেওয়ান এবং তোলাপীর, বেলডাঙার কবিরসাহেব, হিলোড়ার বড়ানবিবি, হাসপাতির মহুঁয়া, জগন্নাথপুরের বাবার সাহেব, মহীপালের পাঁচপীর, মহাসন্দীর হজরতপীর, শাহ আবদুল,

আল্পনা

মঞ্জুলা সরকার

আল্পনা বাঙলার লোকশিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ আল্পনা হচ্ছে সমতল ভিত্তিক চিত্রণ। আবার প্রধানত ভূমিতে আঁকা হয় বলে একে ভূমিচিত্রও বলা হয়ে থাকে। লোকশিল্পে চিত্রকলার যে তিন সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হল ভৌমিক চিত্র। এক্ষেত্রে ভৌমিক চিত্র বলতে নিঃসন্দেহে আল্পনা এবং তার সমশ্রেণীর চিত্রকেই বোঝাবে। তবে মুখ্যতঃ ভূমিচিত্র হলেও পিঁড়ি, কলসী, ঘট, সরা এবং প্রাচীর ইত্যাদিতেও আল্পনা দেওয়া হয়ে থাকে।

আল্পনাকে কোনক্রমেই বর্ণনাধর্মী বলা চলে না। এই শিল্প প্রকৃতিতে সিম্বলিক অর্থাৎ প্রতীকধর্মী। সুতরাং এই জাতীয় চিত্রকে নিঃসন্দেহে সিম্বলিক স্কুল অর্থাৎ প্রতীকচিত্র বলা যায়।

ক্ষণস্থায়িত্ব আল্পনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবে এবং ব্রতানুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আল্পনা রচিত হয় এবং প্রয়োজন শেষে তা মুছে ফেলা হয়ে থাকে। এই শিল্প সম্পূর্ণ কল্পনাশ্রয়ী বলেই বোধহয় আল্পনা আঁকা বলে না, আল্পনা দেওয়া বলে।

কাঁথাশিল্পের মত আল্পনাও একান্তভাবে মেয়েদের দ্বারা চর্চিত। কুমারী এবং বিবাহিতা নারীরা বিভিন্ন ব্রত পার্বণ উপলক্ষ্যে আল্পনা দেন। অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখ শিল্পগুরুগণ বাঙলার মেয়েদের আঁকা আল্পনা থেকে অনেক নূতন প্রেরণা পেয়েছিলেন। ফরিদপুরের বগলাদেবী, নগেন্দ্রবালাদেবী প্রমুখ অশীতিপর বৃদ্ধাদের আঁকা আল্পনার নৈপুণ্য ও সৌন্দর্যের কাছে প্রখ্যাত শিল্পাচার্যরাও হার মেনেছিলেন। খুলনার সেনহাটীর কমলাময়া'র আল্পনাশিল্পের খ্যাতি ছিল কিংবদন্তীর মত।

শুক্রনীতিসার নামক প্রাচীন শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে এই প্রকার শিল্পকর্ম নারীরা নিজেদের হাতে রচনা করেন স্ত্রীলোকদের যে সব চিত্র অঙ্কনের কাজে মুনি প্রণীত কোন ক্রিয়ার উল্লেখ নেই, স্মার্তরঘুনন্দন 'তিথিতত্ত্ব'তে সেগুলিকে 'যোষিৎব্যবহারসিদ্ধা' বলে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং আল্পনাও অবিসংবাদিতরূপে এবং সর্বতোভাবে যোষিৎব্যবহারসিদ্ধা।

আল্পনা হল গণশিল্প, অর্থাৎ এটি সাধারণ মানুষের দ্বারা চর্চিত। কোন বিশেষ শিল্পী সম্প্রদায়ের মধ্যে বাঁধা পড়েনি এবং ধনীসমাজের পৃষ্ঠপোষকতা বা অনুগ্রহকে কখনো নির্ভর করেনি বলেই আল্পনা ঐতিহাসিক প্রত্নবস্তুতে পরিণত হয়নি। আজও তার অনুশীলন ও চর্চা ব্যাপকভাবে হয়ে চলেছে।

যদিও আল্পনা অথবা আলিম্পন শব্দটি সচরাচর কোন প্রাচীন শিল্পশাস্ত্রের পরিভাষার মধ্যে পাওয়া যায় না; তবু খিলহরিবংশের বিষ্ণুপর্বের সাতচল্লিশতম অধ্যায়ে ৫০নং শ্লোকে আলিম্পন অর্থাৎ, আল্পনার উল্লেখ আছে।

পটিস্রতান্তঃ শৈলেন্দ্রো ভাতিতাদ্বিবিধাম্বরম্ ।
আলিম্পনৈর বিবিধৈঃ সমন্তাদ্ভক্তিকল্পিতঃ ॥ ৫০ ॥

ঐ পুরাণে আলপনার বর্ণবিন্যাস এবং অন্যান্য নানা বিষয় সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা রয়েছে, যেমন—

বর্ণদ্রব্যাদিভেদেন ভূমিকং সমবর্ণদম্ ।
তস্মিন্ মানবিভাগস্তু কৃত্বা ভাগত্রয়ং পুনঃ ।
কর্ণিকা কেশরাভাগে সর্বপত্রাণি লেখয়েৎ ।
দলাগ্রাণি মূলভাগে পত্রবর্ণকমেবথবা ॥
ত্রিবর্ণমেককং বা যাবৎ পত্রাসন্নাপি তু ।
চতুর্দেকেৎবে বা প্রাচ্যাং বীথী পত্রবিহগ কৈঃ ॥
নয়নাক্তং লিখা বৎস পদ্মনীলোৎপলোৎপলৈঃ ।
শঙ্খাদিমথ বজ্রাদিলিখেদ্বিন্দু গদাপিবা ॥
মুক্তাফল প্রবালোত্থা পুষ্পরাগকৃতাথবা ।
সিতকুঙ্কুমরাগৈ বা নীলমরকতৈরপি ॥
শালি ষষ্টিক চূর্ণে বা যবগোধূম আথবা ।
কৌসুম্ভ রজনীভূত পত্রচূর্ণাকৃতা শুভা ॥
সর্বাঙ্গুলোন্নতো রেখা সমা পুঞ্জবিবর্জিতা ।
সর্বশোভা সমাযুক্তং মণ্ড পঙ্ক বিরচয়েৎ ॥

এই শ্লোকের মাধ্যমে বলা হয়েছে যে, এমনভাবে বর্ণবিন্যাস হবে যেন তা সর্বত্র সমানভাবে দেখতে পাওয়া যায়। তারপর মানবিভাগ অনুসারে বিভক্ত করে, পুনর্বার তিনভাগে বিভক্ত করতে হবে। কর্ণিকা এবং কেশরের শেষভাগে পত্রগুলি অঙ্কিত হবে। দলের অগ্রভাগগুলি মূলদেশে অথবা পত্রবর্ণ ধার সমীপ পর্যন্ত থাকবে। চতুর্দিকে অথবা এক পূর্বদিকেই ফুল-পাতা-পাখী ইত্যাদির চিত্র রচনাই বিধি। মণ্ডলটির 'নয়নাক্ত' এবং সর্বশোভাযুক্ত হবে। বৃত্তটির অভ্যন্তরে নীলপদ্ম, কহ্লার বা শ্বেতপদ্মের চিত্র শোভা পাবে। এতদ্ব্যতীত শিব, ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণের প্রতিকৃতি অথবা শূল, অঙ্কুশ, বজ্র, নারাচ, খড়্গ প্রভৃতি আয়ুধের নক্সা এ মণ্ডলের কেন্দ্রে স্থান পাবে। সেই সঙ্গে থাকবে ময়ূর ও অন্যান্য বিহঙ্গকুল এবং মাল্য, বৃত্ত, স্বস্তিক প্রভৃতি প্রতীকচিহ্ন সমূহ।

এই সূত্রে উল্লেখ্য যে, আলপনা জাতীয় ভূমিচিত্র রচনায় প্রয়োজনীয় উপকরণের তালিকায় সংযোজিত হয়েছে মুক্তাফলচূর্ণ, কুঙ্কুম, হরিদ্রা অথবা ভূর্জপত্রচূর্ণ। এগুলির প্রত্যেকটি মণ্ডলচিত্রণের পক্ষে শুভ বলে বিদিত। এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে ভূমিচিত্র বিশেষতঃ মণ্ডল রচনায় রেখোরেখা সর্বত্র সমান হবে এবং রেখার উচ্চতা হবে এক যব থেকে এক অঙ্গুলি পরিমাণ। চূর্ণ কখনো একস্থলে পুঞ্জীভূত হবে না।

প্রকৃতিগত বিচারে আলপনা দু শ্রেণীর আর্দ্র ও শুষ্ক। সোমেশ্বরের অভিলষিতার্থ চিন্তামণিতে খুব সম্ভবত এই দুই জাতীয় আলপনাকে যথাক্রমে রসচিত্র ও ধূলিচিত্র নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। শুষ্ক আলপনার উপাদান যে চূর্ণদ্রব্য তা বলা বাহুল্য। আর আর্দ্র আল্পনা তরল পদার্থ দিয়ে আঁকা। সাধারণতঃ তরল সাদা পিটুলি গোলা এর একমাত্র উপাদান বলে, আল্পনা বর্ণবহুল নয়, তা বলা

ঘোড়া চাইল থাকে কন্যা আর থান ছড়া।
মাঝে মাঝে থাকে কন্যা পিঁজলচীর পাড়া॥
আলিপনা আইক্যা কন্যা জ্বালে ঘিয়তের বাতি।
ভূমিতে লুটাইয়া কন্যা করিল প্রণতি॥

যদিও বাঙলার আল্পনা অধিকাংশ সাদা তবে অন্য রঙের বৈচিত্র্য আছে। এতে কলাপাতা শুকিয়ে গুড়ো করে সবুজ রঙ, হলুদ, কালোভুষো আর ইট গুড়ো বা সুরকি লালরঙ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

বাঙলার আল্পনার অন্যতম বৈশিষ্ট হল রেখা আঁকার পদ্ধতি। এই রেখা কোথাও ধারালো কৌণিক কিম্বা অনমনীয় নয়। এর প্রতিটি টান দীর্ঘ, বলিষ্ঠ, অকম্পিত, অভঙ্গুর এবং পেলব। রূপগতিতে রেখায়িত আকৃতিগুলির গড়নে বর্তুলতাটুকু লক্ষণীয়। এই প্রসঙ্গে আবার স্মরণ করা যেতে পারে, বাঙলার যাবতীয় চিত্রই রেখাপ্রধান এবং সেই রেখার প্রতিটি বৈশিষ্ট্য আল্পনার রেখার মধ্যে বিদ্যমান।

বাঙলায় আল্পনা স্থান পায় গৃহস্থঘরে নানা ব্রত ও লৌকিক পূজার অঙ্গরূপে। পৌরাণিক দেবদেবীর পূজাতে আল্পনার ব্যবহার থাকলেও শাস্ত্রীয় পূজায় একমাত্র মাঙ্গলিক চিহ্ন ছাড়া আল্পনার আর কোন উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন সাধারণত থাকে না।

আল্পনার প্রত্যক্ষ প্রয়োজন ও ব্যবহারগত যোগ নারীব্রতের সঙ্গে। যে বিষয় ও বস্তুগুলি কামনা করে ব্রত পালন করা হয়, মেয়েরা সেগুলিই ছবি এঁকে আল্পনা দেন।

আল্পনা একান্তভাবে বাঙলার লোকশিল্প নয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে আল্পনার প্রচলন রয়েছে। আবার ভারতের বাইরে অনেক দেশের নাগরিক এবং আদিবাসী উভয় সমাজেই এই শিল্পরীতির প্রচুর নিদর্শন মেলে।

পশ্চিম ভারতে বিশেষতঃ গুজরাট ও বোম্বাই অঞ্চলের মহিলা সমাজে রঙ্গোলিশিল্প আজও প্রভূত পরিমাণে অনুশীলিত হয়। সেখানে অতিথির সম্মানে, ভোজনের আসনপাটি রঙ্গোলি দিয়ে অলংকৃত হয়। বোম্বাইতে অতিথি অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত রঙ্গোলির কতকটা প্রতিরূপ হল বাঙলার নববধূ আগমনের পান-সুপারী লেখা আল্পনাটি।

রঙ্গোলিতে রেখাঙ্কনের প্রাথমিক কাজটুকু সাদা রঙে। তারপর ফাঁকা অংশগুলি বিভিন্ন রঙ দিয়ে ভরাট হয়ে থাকে। উপকরণের মধ্যে থাকে চালের গুঁড়ো, কাঠকয়লার গুঁড়ো, সাদা খড়িগুঁড়ো, বিভিন্ন শস্যের চূর্ণ, সুরকি গুঁড়ো প্রভৃতি। চূর্ণ রঙ আঙুল দিয়ে নক্সার বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। আবার এক-একটি রঙ্গোলিতে গুঁড়ো রঙ আঠা কিম্বা জলের সঙ্গে মিশিয়ে অর্ধতরল করে তুলি অথবা তুলোর সাহায্যে লেপন করা হয়ে থাকে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে টাটকা ফুল ও ফুলের পাপড়ির ব্যবহার নক্সার অনবদ্য সৌন্দর্য সৃষ্টি করে।

লাল, নীল, হলুদ, সাদা, কালো প্রভৃতি বর্ণের সাহায্যে বিভিন্ন মাপের বৃত্ত, নানান আকৃতির রেখা, বিন্দু, রুইতন ইত্যাদি অসংখ্য রকম জ্যামিতিক নক্সার সমাহারে রঙ্গোলির সৃষ্টি হয়।

জ্যামিতিক অলঙ্করণের সঙ্গে পশু-পাখীর আকৃতিও সংযোজিত হয়। আবার হাতী, ঘোড়া,

পক্ষ ময়ূর এবং অন্যান্য পরিচিত প্রাণীর সঙ্গে অদ্ভুত কাল্পনিক জীবের অবয়ব চোখে পড়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ফুল-লতা-পাতার মণ্ডনও রঙ্গোলীর অন্যতম অঙ্গ এবং হংস, পদ্ম, কলসও বিশেষ প্রিয়। অধিকাংশ রঙ্গোলিতে পূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্ম কেন্দ্রীয় অলংকরণরূপে শোভা পায়।

মধ্যপ্রদেশ এবং বোম্বাই অঞ্চলের আল্পনা এই সূত্রেই উল্লেখিত হয়েছে। এ ছাড়া উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারেও চূর্ণরঙে রচিত আল্পনা জাতীয় ভূমিচিত্র ও প্রাচীরচিত্রের ব্যবহার আজও অব্যাহত।

বাংলার প্রতিবেশী উড়িষ্যার নারীসমাজে আল্পনার আদর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিবাহের পর নববধূ যখন প্রথম শ্বশুরগৃহের বহির্দ্বারে এসে দাঁড়ান তখন কোন এয়োস্ত্রী এসে বধূর হাতে তুলে দেন একবাটি চালবাটা। তাই দিয়ে নববধূ নিজের দুটি পায়ের আঙুল দিয়ে মহলে রচনা করেন পদচিহ্ন এবং সেই চিহ্নিত পথের উপর পা রেখে রেখে বধূ শ্বশুরগৃহের অভ্যন্তরে প্রথম পদার্পণ করে। সেই সঙ্গে বধূর হাতেই আঁকা হয় লক্ষ্মীর ঘরে বা লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ। প্রায় মাসান্ত পর্যন্ত ঘরের নানাস্থানে আলপনা দিয়ে বধূ সবার প্রশংসা আহরণ করে নেন। প্রায় দু-তিন মাস পর্যন্ত এই আলিম্পন রচনা নববধূর অবশ্য করণীয় শিল্পচর্চা। উৎকল-কন্যার হাতে গৃহপ্রাচীরও সচিত্র হয়ে ওঠে। ঘরের সমস্ত দেওয়াল, পৈঠা, মেঝে এবং ঘরের প্রতিটি দ্বারে রচিত আলপনায় লতা, পাতা, ফুল আর পাখীর নক্সাই প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতির প্রভাব লক্ষণীয়। আলপনার অলংকরণ থেকে ঘরের কোন অংশই বাদ পড়ে না। এমনকি বসবার ঘরে কর্তাব্যক্তিদের আসন বা পিঁড়ি ঘিরে, জলের গেলাস বেষ্টন করে বৃত্তাকারে সুন্দর আলপনা দেন বধূরা। কাঠকয়লার গুঁড়ো, সিঁদুর, নীল, পাতার রস প্রভৃতি বস্তু থেকে মেয়েরা নিজেরাই আলপনার রং সংগ্রহ করে নেন।

দক্ষিণ ভারতের সর্বত্র আল্পনার প্রচলন আছে এবং তা কোলাম নামে পরিচিত। বাংলায় যেমন বিভিন্ন ব্রতের জন্য পৃথক পৃথক অলংকরণযুক্ত আল্পনা নির্দিষ্ট, দক্ষিণ ভারতে কিন্তু তা নয়। ওখানে প্রচলিত আল্পনাগুলি যে কোন পূজা বা উৎসব উপলক্ষ্যে দেওয়া চলে। নক্সাগুলি মূলতঃ জ্যামিতিক। সরল বা ঢেউখেলানো দড়ির ফাঁসের মত রেখা এবং বিন্দু অথবা বৃত্ত সাজিয়ে রচিত। রেখাগুলি উপর থেকে নীচে অথবা আড়াআড়িভাবে কয়েক সারিতে সাজানো থাকে এবং তাদের ফাঁকে ফাঁকে বিন্দুগুলি স্থান পায়। বৃত্তগুলি সাধারণতঃ একটির উপর আরেকটি এই ভাবে পর পর গোল হয়ে ঘুরে বিকশিত পদ্মের আকার নেয়। বাংলার মত ফুল, লতাপাতার মণ্ডন বা প্রাণীজগৎ এই আল্পনাগুলিতে স্থান পায়নি।

এই আল্পনাগুলি মূলতঃ চূর্ণরঙে রচিত হয়। এর উপকরণ হল খড়িগুঁড়ো ও চুনচূর্ণ, সিঁদুর বা কুমকুম। মেয়েরা শুধু হাত দিয়ে আল্পনা দেন। আবার নক্সা নিখুঁত করার জন্য এক অভিনব পদ্ধতিও প্রচলিত আছে। ফাঁপা বাঁশের গায়ে সরু ছিদ্র খুঁড়ে নানা নক্সার আকারে ছোট-বড় ফুটো করা হয়। তারপর বাঁশের খোলে খড়িগুঁড়ো ভরে মাটিতে গড়িয়ে দিলেই মুহূর্তে পুরো আল্পনার নিখুঁত ছবিটি ফুটে ওঠে।

কোঁড়া, সাঁওতাল, ওরাঁও, মুণ্ডা প্রভৃতি আদিবাসীগোষ্ঠী বাঙালীর প্রতিবেশী। এই সব আদিবাসী সমাজে ধর্মীয় এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে ভূমির উপর আল্পনা জাতীয় চিত্র স্থান পায়। যদিও আদিবাসী সমাজে সাধারণত বিভিন্ন রঙ দিয়েও আল্পনা রচনা হয়, কিন্তু সাদা পিটুলি দিয়ে

আর নক্সা আঁকার ও রেওয়াজ আছে। আদিবাসীদের আল্পনাতেও লাল, সাদা এবং কালো এই তিনটি রঙ মুখ্য। এক্ষেত্রে সাদার জন্য চালের গুঁড়ো, লালের জন্য পোড়া রাঙামাটি আর কয়লার গুঁড়ো দিয়ে কালো রঙ হয়।

উচ্চতর সংস্কৃতিজাত চিত্রকলায় বিভিন্ন রঙ যেমন গূঢ় অর্থবহ, তেমনি আদিবাসীদের আল্পনা জাতীয় চিত্রে প্রত্যেক রঙের স্বতন্ত্র অর্থ আছে। অর্থাৎ প্রত্যেকটি রঙই একেকটি গূঢ় ঐন্দ্রজালিক অভিপ্রায়ের প্রতীক। যেমন ছোটনাগপুর অঞ্চলের অধিবাসী ওরাঁওগোষ্ঠি বিশ্বাস করে সাদা, লাল আর কালো এই তিনটি রঙ রামধনুর প্রতীক এবং যাবতীয় অনিষ্টকারী শক্তি ও দুষ্ট আত্মার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে এই রঙ বিশেষভাবে সহায়তা করে। ওরাঁও সমাজে ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মের অন্যতম অঙ্গ হল নানা রঙ দিয়ে রচিত আল্পনা। এটি প্রধানত মেয়েদেরই কাজ। উপকরণের মধ্যে মুখ্য হল কয়লার গুঁড়ো, চালের গুঁড়ো আর চুনীর মাটি। মেয়েরা পিটুলি দিয়েও ভূমিচিত্র আঁকে। আবার পাথরের পাটা যাকে ওরা 'পুলথি' বলে, তার ওপরেও পিটুলি দিয়ে আলংকারিক নক্সা রচনা করে।

পিটুলির মত তরল পদার্থ দিয়ে ছবি আঁকা পার্বত্য গারো জাতির মধ্যেও প্রচলিত। ওদের শস্য উৎসবের সময় ময়দা জলে গুলে বাড়ীর দেওয়ালে, থামে আঙুল দিয়ে ওরা নানারকম আকৃতিবিশিষ্ট নক্সা আঁকে।

বীরহোর সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন রঙ বিভিন্ন বোঙ্গা অর্থাৎ দেবতার প্রতীক। যেমন, 'বাঘোট'-এর প্রতীক হল কালো, 'নাগ-এরাদুর্তি'র প্রতীক হল লাল এবং সাদা হল 'বুরু বোঙ্গার' প্রতীক। দেবতাদের পূজার স্থানটি গোবরমাটি দিয়ে নিকিয়ে তারপর আলপনা দেওয়া হয়। এক্ষেত্রেও মুখ্য উপকরণ হল কয়লার গুঁড়ো, রাঙামাটি আর চালের মিহি গুঁড়ো।

খড়িয়া সমাজে যে আল্পনাগুলি প্রচলিত, সেগুলির রেখাঙ্কিত নক্সাও কখনো কয়লাগুঁড়ো, কখনো চালের গুঁড়ো আবার কখনো চুনীর লাল মাটি দিয়ে আঁকা হয়।

সামাজিক ও ধর্মীয় ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষে নানা রকমের আল্পনা দেবার রীতি মুণ্ডা সমাজে চলিত আছে। ঐ সব আল্পনায় কিছু রঙিন আর বাকি সাদা রঙের। এই আদিবাসীগোষ্ঠির একটি বিশিষ্ট সামাজিক অনুষ্ঠানের নাম 'লুতুর টুকাই' অর্থাৎ কান ফুটো করার অনুষ্ঠান। যার শিশুসন্তানকে কেন্দ্র করে এই অনুষ্ঠান, তার বাড়ীর উঠোনে ঘন পিটুলি দিয়ে বিচিত্র জ্যামিতিক নক্সা আঁকা হয়ে থাকে।

পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলায় আদিবাসি কোড়াদের বাস। এঁদের পূজা পার্বণের অন্যতম হল পাঁচপিরি বা সত্যনারায়ণ পূজা। অঘ্রাণমাসে ইতু সংক্রান্তির রাত্রে এই পূজা উপলক্ষে পূজাস্থানে যে বিচিত্র আলপনাটি স্থান পায়, সেটি আঁকা হয় চালেরগুঁড়ো, সিঁদুর, উনানের পোড়া মাটি, কাঠকয়লার গুঁড়ো ইত্যাদি দিয়ে।

আদিবাসী সংস্কৃতির আল্পনা প্রসঙ্গে সবর উপজাতির সমাজে প্রচলিত ইত্তালন অর্থাৎ দেওয়াল লিখনের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। নামে দেওয়াল লিখন হলেও ইত্তালন আসলে দেওয়ালের ওপর পিটুলিগোলা দিয়ে আঁকা আল্পনা। বাঙলাদেশে শস্য ও ধনসম্পদ কামনায় যেমন লক্ষ্মীব্রত আল্পনা রচিত হয়, তেমনি সবরেরাও দেওয়ালের গায়ে পিটুলিগোলা দিয়ে পশু, মানুষ ইত্যাদি সমৃদ্ধিসূচক চিত্র এঁকে শস্য ও ধনবৃদ্ধি কামনা করেন।

বৌদ্ধযুগের মনীষী

সুধাংশুবিমল বড়ুয়া

ভগবান বুদ্ধের সমকালে ও পরবর্তী যুগে বৌদ্ধ ধর্মের কল্যাণে ভারতবর্ষে বহু মনীষীর আবির্ভাব ঘটেছিল। তাঁদের সাধনা ও আত্মত্যাগের ফলে বৌদ্ধধর্মের কল্যাণী মহিমা বিস্তারলাভ করেছিল দেশে-দেশান্তরে।

ভগবান বুদ্ধের অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের মধ্যে সর্বাগ্রে সারীপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নের নাম করতে হয়। অসাধারণ প্রজ্ঞা ও চারিত্রমহিমার জন্য এঁরা বুদ্ধের প্রধান শিষ্যের মর্যাদা পেয়েছিলেন। বৌদ্ধধর্মের প্রসারে ও ভিক্ষুসঙ্ঘের গঠনে এঁদের দান অসামান্য। বুদ্ধের অন্যতম সাক্ষাৎ শিষ্য মহাকাশ্যপ। স্বয়ং বুদ্ধদেব এই ধীমান্ ভিক্ষুর সঙ্গে আপন পরিধেয় বস্ত্র বিনিময় করে তাঁকে সম্মানিত করেন। ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণের অব্যবহিত পরে রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহায় যে প্রথম বৌদ্ধ সংগীতি অনুষ্ঠিত হয় তার মূলে ছিলেন ভিক্ষু মহাকাশ্যপ। আবার ধর্ম ও বিনয়ে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি এই সংগীতির সভাপতিত্বের পদেও বৃত হয়েছিলেন।

কুশীনগরে বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর নবদীক্ষিত ভিক্ষু সুভদ্র বলেছিলেন, 'এখন আমরা মুক্ত, নিজেদের ইচ্ছামত চলতে পারব। এত বিধিনিষেধও আর মানতে হবে না।' এই অশোভন মন্তব্য শুনে মহাকাশ্যপ চিন্তিত হলেন বুদ্ধের ধর্মের স্থায়িত্ব ও বিশুদ্ধি সম্বন্ধে। এর ফলে অল্পকালের মধ্যে মগধরাজ অজাতশত্রুর পৃষ্ঠপোষকতায় রাজগৃহে প্রথম বৌদ্ধসংগীতি আহূত হয়। এই সংগীতিতে বিনয় ও সূত্রপিটক সংকলনে প্রধান অংশগ্রহণ করেন যথাক্রমে ভিক্ষু উপালি প্রথম জীবনে ছিলেন শাক্যকুলের ক্ষৌরকার। আপন চরিত্র ও প্রজ্ঞাবলে তিনি বৌদ্ধ সঙ্ঘে বিশেষ সম্মানিত হন। স্বয়ং বুদ্ধদেব তাঁকে শ্রেষ্ঠ বিনয়ধর বলে অভিহিত করেন। বুদ্ধের পিতৃব্যপুত্র আনন্দ একাধারে তাঁর একান্ত সচিব, সেবক ও বন্ধু। আজীবন তিনি ছায়ার মত বুদ্ধের অনুসরণ করেছেন। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে তিনি ধর্মভাণ্ডাগারিকরূপে পরিচিত।

সে যুগে যেসকল মহীয়সী নারী ভিক্ষুণী সঙ্ঘে যোগদান করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে বুদ্ধের বিমাতা ও ধাত্রী গৌতমী, রাজা বিম্বিসারের মহিষী ক্ষেমা এবং পটাচারা ও উৎপলবর্ণা অগ্রগণ্যা। অনুপম চারিত্রমাধুর্য এবং ধর্ম ও বিনয়ে পারদর্শিতার জন্য এঁরা স্বয়ং বুদ্ধকর্তৃক প্রশংসিত হয়েছেন।

যে সকল ব্যক্তির আন্তরিক প্রয়াস বৌদ্ধধর্মের গঠনপর্বে বিশেষ শক্তিবেগ সঞ্চার করেছিল, তার মধ্যে বুদ্ধের একনিষ্ঠ ভক্ত মগধরাজ বিম্বিসারের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তিনি বুদ্ধকে প্রসিদ্ধ বেণুবন বিহার দান করেন এবং আজীবন তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তাঁর পুত্র অজাতশত্রু প্রথম জীবনে দেবদত্তের প্ররোচনায় নানাভাবে বুদ্ধের বিরোধিতা করলেও পরিশেষে অনুতপ্ত হয়ে বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করেন এবং বৌদ্ধধর্মের উন্নতিবিধানে আত্মনিয়োগ করেন। প্রথম সংগীতির পৃষ্ঠপোষকরূপে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর মাতুল ও শ্বশুর কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ছিলেন বুদ্ধের অন্তরঙ্গ বন্ধু

ও একনিষ্ঠ ভক্ত। কোশলে বৌদ্ধধর্মের সমৃদ্ধির মূলে তাঁর প্রভাব অপরিসীম। এই প্রসঙ্গে অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠী, বিশাখা, ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী ও জীবক প্রমুখ সর্বনিষ্ঠ ও প্রভাবশালী গৃহী-ভক্তদের নাম করা যেতে পারে। অনাথপিণ্ডিক বুদ্ধ ও ভিক্ষু-সঙ্ঘের জন্য শ্রাবস্তীর সুরম্য জেতবন বিহার নির্মাণ করেন। বুদ্ধের শ্রেষ্ঠ উপাসিকা বিশাখা জেতবন বিহারের অদূরে বুদ্ধের জন্য প্রসিদ্ধ পূর্বারাম বিহার নির্মাণ করেন। বিশাখার পিতা ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী বিত্তবান ও মহাপ্রাজ্ঞ ছিলেন। বিশাখার পতিগৃহে যাত্রাকালে তিনি যে মূল্যবান উপদেশ দিয়েছিলেন তা আজও বৌদ্ধদের বিবাহ অনুষ্ঠানে পঠিত হয়। বুদ্ধের অন্যতম প্রিয়পাত্র ছিলেন তৎকালীন ভারতের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক জীবক। তিনি বিম্বিসারের গৃহচিকিৎসক ছিলেন এবং বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু-সঙ্ঘের চিকিৎসার ভার পান। জীবক তাঁর আম্রকাননে বুদ্ধের জন্য একটি সুরম্য বিহার নির্মাণ করেন। আবার অনুতপ্ত অজাতশত্রুকে তিনিই প্রথম বুদ্ধের নিকট নিয়ে যান।

বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে মৌর্যসম্রাট অশোকের গুরুত্ব অসাধারণ। ভগবান বুদ্ধের বাণীকে জীবনে গ্রহণ করে তিনি তাঁর রাজশক্তিকে মানবকল্যাণে নিয়োজিত করেছিলেন। অশোকের প্রচারের ফলে বৌদ্ধধর্ম শুধু ভারতবর্ষে নয়, ভারতের বাইরেও বিস্তার লাভ করে। তিনি পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রাকে বৌদ্ধসংঘে দান করে বুদ্ধের বাণী প্রচারের জন্য সিংহলে প্রেরণ করেন। পাটলিপুত্রে তৃতীয় বৌদ্ধসংগীতির আয়োজন তাঁর অন্যতম কীর্তি। মোগ্গলিপুত্র তিস্স স্থবির এই সংগীতির পরিচালনা করেন। অশোক ব্যক্তিগত জীবনে নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ হলেও সর্বসম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর সমদৃষ্টি ছিল। এই ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের জন্যই বর্তমান ভারত অশোকচক্রকে জাতীয় প্রতীকরূপে গ্রহণ করেছে।

অশোকের পরে গ্রীকরাজ মিলিন্দ, কুষাণ সম্রাট কণিষ্ক, হর্ষবর্ধনএবং ধর্মপাল ও দেবপাল প্রমুখ বাংলার পালরাজগণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'মিলিন্দপ্রশ্ন' গ্রন্থে উল্লিখিত গ্রীকরাজ মিলিন্দ বা মিনান্দার খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকে রাজত্ব করতেন। বর্তমান পাঞ্জাবের অন্তর্গত শিয়ালকোটে ছিল তাঁর রাজধানী। ভিক্ষু নাগসেনের সঙ্গে যুক্তিতর্কে তাঁর অসাধারণ বিচারবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। পরিশেষে তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। তিনি প্রসিদ্ধ মিলিন্দ বিহার নির্মাণ করেন এবং নানাভাবে বৌদ্ধধর্মের সহায়তা করেন। ভিক্ষু নাগসেনের 'মিলিন্দপ্রশ্ন' পিটক-বহির্ভূত পালি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

বৌদ্ধযুগের ইতিহাসে অশোকের পরেই কণিষ্কের স্থান। এশিয়ার বিশাল ভূখণ্ডে বৌদ্ধধর্ম বিস্তারে সহায়তা করে বস্তুতঃ তিনি অশোকের আরব্ধ কর্ম সুসম্পন্ন করেন। গুরু পার্শ্বিকের পরামর্শে কাশ্মীর অথবা জলন্ধরে চতুর্থ বৌদ্ধ সংগীতির আয়োজন্ কণিষ্কের অন্যতম স্মরণীয় কীর্তি। এই সংগীতিতে সংস্কৃত ভাষায় বৌদ্ধশাস্ত্রের তিনটি মহাভাষ্য রচিত হয় এবং তা তাম্রপটে উৎকীর্ণ হয়ে একটি বিশেষ স্তূপে রক্ষিত হয়। পণ্ডিত বসুমিত্র এই সংগীতির সভাপতি এবং মহাকবি অশ্বঘোষ সহ-সভাপতি ছিলেন। বুদ্ধচরিত, সৌন্দরনন্দ, শারীপুত্রপ্রকরণ প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা অশ্বঘোষ যত বড় কবি তত বড় দার্শনিক ছিলেন। কণিষ্কের রাজত্বকালে মহাযানের উদ্ভব ও গান্ধারশিল্পের আবির্ভাব বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটনা। পুরুষপুরের কণিষ্ক মহাবিহার ও স্তূপ তাঁর স্মরণীয় কীর্তি।

হর্ষবর্ধন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং বহু স্তূপ ও বিহার নির্মাণ করেন। প্রয়াগে প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর তিনি যে সম্মেলন করতেন, প্রথম দিন বুদ্ধের পূজা দিয়ে তার সূচনা হত। ভিক্ষু হিউয়েনসাঙকে তিনি বিশেষ ভক্তি করতেন। হর্ষবর্ধনকর্তৃক চীনসম্রাটের সঙ্গে দূত বিনিময় ভারতচীন মৈত্রী ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

আরো পরবর্তী কালে পাল-চন্দ্রযুগে বাংলা ও মগধে বৌদ্ধধর্মের যে পুনরুজ্জীবন ঘটে তার মূলে ধর্মপাল ও দেবপাল প্রমুখ নৃপতিবৃন্দের দান অসামান্য। নালন্দা, বিক্রমশীলা ও সোমপুর প্রভৃতি মহাবিহার তাঁদের বদান্যতায় পুষ্ট হয়েছিল। শীলভদ্র ও দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান প্রমুখ এসকল বিহারের প্রসিদ্ধ আচার্যগণ একদিন দেশবিদেশের প্রণাম টেনে এনেছিলেন।

যে সকল নৈয়ায়িক ও দার্শনিক পরবর্তী বৌদ্ধদর্শনকে বিশেষ সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের মধ্যে দ্বিতীয় শতকের মাধ্যমিক দর্শনের প্রবক্তা নাগার্জুন অগ্রণী। শুধু দর্শনে নয়, আয়ুর্বেদ এবং রসায়নশাস্ত্রেও তিনি অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। বিজ্ঞানবাদের শ্রেষ্ঠ আচার্য ছিলেন অসঙ্গ। দ্বিতীয় শতকে পেশোয়ারে তাঁর অনুজ বসুবন্ধু বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁর অভিধর্মকোষ বৌদ্ধদর্শনের বিশ্বকোষ। তাঁর প্রধান শিষ্য দিঙ্‌নাগ মনে হয় গুরুকেও অতিক্রম করে গেছেন। তিনি মধ্যযুগীয় ন্যায়শাস্ত্রের জনক নামে খ্যাত। দিঙ্‌নাগের উত্তরসাধকদের মধ্যে প্রমাণবার্ত্তিকের লেখক ধর্মকীর্তি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। তিনি ভারতীয় কান্ট নামে পরিচিত।

পালি ভাষ্যকারগণের মধ্যে আচার্য বুদ্ধঘোষ সর্বশ্রেষ্ঠ। পঞ্চম শতকে তিনি সিংহলে গিয়ে ত্রিপিটকের অমূল্য ভাষ্যগুলি পালিভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁর প্রথম ও প্রধান গ্রন্থ বিশুদ্ধিমার্গ বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শনের সারগ্রন্থ। তাঁর সমকালীন আর একজন ভাষ্যকার বুদ্ধদত্ত। তাঁর অভিধর্মাবতার গ্রন্থখানি বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। বুদ্ধঘোষের আরব্ধ কার্য সম্পূর্ণ করেন ধর্মপাল। ধর্মপালের ভাষ্যগুলি একত্রে পরমার্থদীপনী নামে অভিহিত।

ভগবান বুদ্ধের বাণীকে গ্রহণ করে এসকল মনীষী চিন্তায় কর্মে ও জ্ঞানে বৌদ্ধ-ভারতের গৌরবময় ঐতিহ্য রচনা করেছেন এবং দূরবাসী অনাত্মীয় জনেও আত্মার অমৃত আস্বাদনে তৃপ্ত করেছেন।

আলোচনা

কলকাতা : ১৯৭৭

১৭৫২ সালের 'হলওয়েলী' মানচিত্রে ভিত্তি কলকাতার সীমানা ছিল পশ্চিমে ভাগীরথী, উত্তরে সুতানুটি, পূর্বে লোনাজলাভূমি শিয়ালদহ ইত্যাদি, আর দক্ষিণে গোবিন্দপুর। বাগবাজারের খাল থেকে বড়বাজারের টাঁকশাল পর্যন্ত সুতানুটি, কাস্টম হাউস পর্যন্ত কলিকাতা আর কলিকাতার দক্ষিণে এখনকার ভবানীপুর পর্যন্ত গোবিন্দপুর। ১৭৫৩ সালে কলকাতার লোকসংখ্যা ছিল ৪ লক্ষ ২০ হাজার। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে পুলিশ কমিশনারের রিপোর্টে দেখা যায় কলকাতার লোকসংখ্যা পাঁচ লক্ষতেই সীমাবদ্ধ ছিল। কলকাতার বাড়বাড়ন্ত কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের পর থেকেই কোম্পানীর আর এক ভাগ্যান্বেষী ক্লাইভের আমল থেকেই যখন গ্রাম-গঞ্জ থেকে লোক ছুটে আসতে লাগলো শহরে। বনজঙ্গল কেটে বসতি শুরু হলো। ক্লাইভের পর হেস্টিংস, তাঁর আমলেই কলকাতা বাংলার রাজধানী। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে কলকাতার বহরটা দিনে দিনে বাড়তেই লাগলো।

বিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে খাস কলকাতার জনসংখ্যা একত্রিশ লক্ষ। সীমানাও তার ফেঁপে ফুলে চতুর্গুণ। মূল নগরীর আয়তন প্রায় ৪০ বর্গমাইল। কেউ বলতে পারেন না, কলকাতার শেষ সীমারেখা কোথায়—বোধহয় এর কোন দিকরেখা নেই। আসলে মূল আয়তনের কুড়িগুণ বেশী বর্তমান আয়তন (৫৩০ বর্গমাইল) আর এই মহানগরী বক্ষে ধারণ করে আছে আরো তিনগুণ বেশী জনসমষ্টি (প্রায় ৮০ লক্ষ লোকসংখ্যা) বৃহত্তর কলকাতার সীমানা বলতে বুঝাচ্ছে—বাঁশবেড়িয়া থেকে উলুবেড়িয়া, আর বজবজ থেকে কল্যাণী।

মূল কলকাতা আর বৃহত্তর কলকাতার সীমানা আর লোকসংখ্যার পরিচয় দেবার উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়—কিছুদিন আগে খবরের কাগজে একটি শাড়ী বিপনীর বিজ্ঞাপন ছিল 'বড়বাজারের গর্ব উত্তরপাড়া আর রাধানগরের শাড়ী'।

শুধু বড়বাজার কেন, হাওড়া গর্ব করতে পারে সাবওয়ের জন্য। কালিঘাট, চেতলা, উল্টাডাঙ্গা ব্রিজগুলোর জন্য। টালিগঞ্জ, বালিগঞ্জ, পার্কসার্কাস, এলাকাগুলো তাদের চওড়া রাস্তার জন্য। কলকাতার শুধু কয়েকটা অঞ্চলই যে কেবল কাজকর্মের জন্য গর্ববোধ করতে পারে তা কিন্তু নয়। মহানগরী ও তার আশেপাশে প্রায় চার হাজার জায়গায় এই গর্ববোধ করার মত কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে।

কাগজে খবর বের হচ্ছে 'বস্তীতে স্বস্তির নিঃশ্বাস'। পাকা পায়খানা, পাকা রাস্তা, জল আর বিজলী বাতির কল্যাণে বস্তী আর সে বস্তী নেই।

মহানগরীর তিন হাজার রেজিস্টার্ড বস্তীর মধ্যে ১৫০০ বস্তীর উন্নয়নের কাজ শেষ হয়েছে। বস্তীগুলো এখন আর জীবন্ত নরক নয়। ১৫০০ বস্তীর ১১ লক্ষ লোক আজ ভালভাবে বেঁচে থাকার সুযোগ পাচ্ছে।

কলকাতার উন্নয়নের আসল কাজ হল কলকাতার মানুষের আর্থিক এবং অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য। এখনও কয়েক লক্ষ লোক দারিদ্র্যসীমার নীচে—তাঁদের কর্মসংস্থানের ভাবনাও তো আমাদের ভাবতে হবে। তাঁরা অবাঙালী দালাল বা মহাজনদের দ্বারা শোষিত হচ্ছেন, তাঁদের তৈরী জিনিস বাজারে যে চড়া দামে বিক্রী হয় অথচ তাঁদের ভাগ্যে মজুরী সামান্য জোটে—যেমন একটি জামার জন্য দু' আনা বা একটি খেলনার জন্য চার আনা। তাঁরা যাতে আর শোষিত না হন তার জন্যও চেষ্টা করতে হবে।

পূর্ব কলকাতায় (কসবা) পশ্চিম হাওড়ায় (কোনা) এবং গঙ্গার কাছে (বৈদ্যবাটী-পাতুলি) তিনটি উপনগরী স্থাপন করা হচ্ছে।

পূর্ব কলকাতার এই নতুন উপনগরীতে গো-পালকেরা তাদের খাটালের ব্যবস্থা করতে পারবেন, দুধ সংরক্ষণাগারের ব্যবস্থা থাকবে, পশু চিকিৎসারও সুবিধা সুযোগ থাকবে। এই উপনগরীগুলোতে মৎস্যজীবীদের জন্যেও বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে। তাদেরকে জলাশয় দেওয়া হবে। ঐসব উপনগরীগুলোতে যানবাহনের সুব্যবস্থা থাকবে। পশ্চিম হাওড়ায় কোনাতে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে নিযুক্ত কর্মীদের সুবিধা দেওয়া হবে। আর ট্রাক-লরীর ডিপো বা পাইকারী বাজার গড়ে তোলা হবে এখানে।

শুধু উপনগরী নয়, উদ্বাস্তু কলোনীগুলোর দিকেও নজর দিতে হবে। যাদবপুর, গড়িয়া, টালিগঞ্জ প্রভৃতির উদ্বাস্তু কলোনীগুলিতে কিছু কিছু উন্নতি হয়েছে। কোটি কোটি টাকা খরচ হয়েছে বটে, কিন্তু সেটা হয়েছে কলকাতা মহানগরীর এককোটি লোকের জন্য।

১৭০৬ সালে কলকাতায় লোক চলাচলের রাস্তা ছিল মোটে দুটো, আর গলি বলতেও মোটে দুটি। আর আজ ১৯৭৭ সালে কলকাতা ও তার আশেপাশে যে কত রাস্তা ও গলি আছে তা সঠিক বলা যাবে না। তবে কলকাতায় মোট ৫০৯·৫৯ মাইল রাস্তা আছে।

কত রাস্তা চওড়া হলো, কত রাস্তা বড় হলো তার হিসাব কলকাতার নাগরিকেরাই ভাল দিতে পারেন। কোনদিন কেউ ভাবতে পেরেছিল যে, হাওড়া স্টেশন এলাকার নীচে একটি সুড়ঙ্গ পথ তৈরী হবে? তাও হয়েছে। লক্ষ লক্ষ লোক নিশ্চিন্তে দুবেলা রাস্তা পার হচ্ছেন গাড়ী-ঘোড়ার ঝামেলা বাঁচিয়ে। আর উপর দিয়ে ট্রাম-বাস চলছে মানুষের ভিড়কে বাঁচিয়ে।

দুবেলা অফিস টাইমে বড়বাজার ব্র্যাবোর্ন রোডের প্রচণ্ড ট্রাফিক জ্যামের সঙ্গে সবাই অল্প-বিস্তর পরিচিত। চারিদিকে বাস-ট্রাম-ঠেলা-রিক্সা আর মানুষের মিছিল। সবাই হাঁস-ফাঁস করতে থাকে কি করে ভিড় বাঁচিয়ে একটু তাড়াতাড়ি কাজের জায়গায় পৌঁছানো যায়। জ্যাম কেবল হাওড়া ব্রিজ, বড়বাজার বা ব্রাবোর্ন নিয়ে পড়ে থাকে না, তার ধাক্কা ডালহৌসী, শিয়ালদহকেও সামলাতে হয়।

কলকাতা থেকে হাওড়া ব্রিজে উঠতে বা কলকাতার দিকে হাওড়া ব্রিজ থেকে নামার সময় যানবাহন ও যাত্রীরা ভীত হবেন। ট্রাম-বাস গাড়ী লোক একেবারে বিপর্যয় কাণ্ড, সব সময় ট্রাফিক জ্যাম লেগেই আছে। শোনা যায়, সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা আরম্ভ হয়েছে। প্রায় তিন কোটি টাকার প্রকল্পে ব্রাবোর্ন রোড ফ্লাইওভার বা উড়ালপুলের কাজ শুরু হয় বছর তিনেক আগে। ব্রাবোর্ন রোড থেকে সরাসরি যাতে গাড়ী হাওড়া ব্রিজে যেতে পারে তার জন্য দোতলা রাস্তা শুরু হল, শুধু ব্রাবোর্ন রোডের মুখের জ্যামের সুরাহাই এতে হবে না, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, মহাত্মা গান্ধী রোড ইত্যাদির

সংযোগস্থলের ভিড় এতে হাল্কা হবে। ক্লাইভবাজারের ওপরে চারসারি পথ থাকছে। সবকটি পথ দিয়েই গাড়ী চলবে এতে স্ট্র্যাণ্ড রোড ও ব্রাবোর্ণ রোডের যানবাহন চলাচলের সুবিধা হবে। উড়ালপুলের পশ্চিমদিকের পথটি সম্প্রতি খুলে দেওয়া হয়েছে, এর ফলে ব্রাবোর্ণ রোডের সঙ্গে উড়াল পথের যোগাযোগ সম্ভব হয়েছে।

কোথায় গেল বৈঠকখানার সেই বিরাট বটগাছ যার তলায় কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা জবচার্ণক ঘন কালো শীতল ছায়ার নীচে বসে গড়গড়া টানতেন রোজ। সেইখানেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতো হাট-বাজারের ব্যাপারীরা। চলত দর-দস্তুর, কেনা-বেচা আমদানী-রপ্তানীর আয়োজন। চার্ণক সাহেবের কলকাতাকে এখন আর কেউ স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারবে না। তাঁর আস্তানা বৌবাজার এখন অত্যন্ত ব্যস্ত পাড়া। দুপাশে তার বড় বড় দু-দুটো বাজার। সকালে-বিকালে লক্ষ লক্ষ লোকের কর্মচঞ্চল আনাগোনা। বৌবাজারের জন্যও নতুন প্ল্যান আছে। শিয়ালদা স্টেশনের উল্টোদিকে যে ঘিঞ্জিটা দেখা যায় যা শিয়ালদা কোর্ট নামে পরিচিত—ওটাও ভবিষ্যতে বিরাট রূপ নেবে। বহুতলা বিশিষ্ট এই বাড়ীটিতে থাকবে কোর্ট। কোলে আর বৈঠকখানা—দুটো বাজারও এখানে চলে যাবে, হকারদের জন্য দোকানের ব্যবস্থা থাকবে।

শিয়ালদা স্টেশন পৃথিবীর সব চাইতে ব্যস্ত স্টেশন। প্রতিদিন প্রায় আট লক্ষ যাত্রী এই স্টেশনে যাতায়াত করে থাকেন। আর গাড়ী ঘোড়া মানুষের তো বিরাম নেই। শিয়ালদা অঞ্চলের এ প্রচণ্ড ট্রাফিক সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা চলছে। একটি হাল্ক বা রিজি উড়ালপুল তৈরী হতে চলেছে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোডের (মহাত্মা গান্ধী রোড ও বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটের মোড় পর্যন্ত) উপর দিয়ে গাড়ী-ঘোড়া যাতায়াত করবে আর মাঝখানের ফোকরগুলি দিয়ে লোক চলাচল করবে অর্থাৎ পথচারী, দ্রুতগতি যান, ধীরগতি যান প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা রাস্তা থাকবে। পথচারীরা নির্বিঘ্নে রাস্তা পারাপার হতে পারবেন আর দ্রুতগতি যানগুলি ট্রাফিক জটে আটকে পড়বে না। অচিরেই গাড়ী-ঘোড়া ও লোকের এই নাভিশ্বাস অবস্থা থেকে শিয়ালদা কিছুটা মুক্ত হবে।

এত লোকের জীবন যে শহরের উপর নির্ভরশীল, এত লোকের ভালবাসা যে শহরকে জড়িয়ে আছে সে শহরকে নতুন জীবনের পথে সুপ্রতিষ্ঠিত করার কাজ আরম্ভ হয়েছে। যেদিন কাজ শেষ হবে, সেদিন হয়ত আমারই মতো কোনো লেখিকা আনন্দ ও গর্বের সঙ্গে কলকাতার উন্নতি ও রূপান্তরের কথা লিপিবদ্ধ করবেন।

সাধনা সেনগুপ্তা

সমকালীন ঃ প্রবন্ধের পত্রিকা

সম্পাদক ঃ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

পঁচিশ বর্ষ ॥ বৈশাখ ১৩৮৫

সমকালীন । প্রবন্ধের পত্রিকা

সূচিপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক সুশীল প্রিন্টার্স ২ ঈশ্বর মিল বাই লেন,
কলি-৬ হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলি-১৩ হইতে প্রকাশিত

॥ একের পর এক ॥

একের পর তো এক হয় না, দুই হয়। কথাটা সত্যি।

সি. এম. ডি. এ-র ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। একটা কাজ শেষ হলে দ্বিতীয় কাজ শেষ করতে হয়।

যে কাজ এবার শেষ হল,—অর্থাৎ বড় রকমের কাজ, সেটা হল, বালীগঞ্জ-কসবা সেতু। অবশ্য এর আগে যে কোনও কাজ শেষ হয়নি তা নয়। হাওড়া সাবওয়ে, চেতলা, কালীঘাট আর অরবিন্দ সেতু, ব্রাবোর্ণ রোডের উড়ান পুল এগুলিও নিশ্চয়ই শেষ হয়েছে। তবে হালে শেষ হল বালীগঞ্জ-কসবা সেতুটি।

এতে যে লোকের যে কি উপকার হবে সেটা ভাল করে বলতে পারবেন যাঁরা এর আগে লেভেল ক্রসিং-এর শিকার হয়েছেন। অর্থাৎ বাস, ট্যাক্সী, রিক্সা দাঁড়িয়ে আছে দুদিকে, অফিস যেতে বা বাড়ি ফিরতে দেরী হচ্ছে। যেতাও ফিরতি। অথবা যখন সময় সংক্ষেপ করবার জন্য বহু লেভেল ক্রসিং-এর বাধা উপেক্ষা করে হাজার হাজার লোক ঝুঁকি নিয়ে এপার ওপার করবার চেষ্টা করছেন এবং দ্রুতগতি ইলেকট্রিক ট্রেনের জন্য দুর্ঘটনায় পড়ছেন।

আরও আছে। একদিকে বালীগঞ্জ জমজমাট, ওদিকে কসবার ভবিষ্যৎ কি অন্ধকারে থাকতে পারে? বালীগঞ্জ-কসবা সেতুটি সেইরকম একটা সেতুবন্ধন। এর ফলে কসবা বাড়বে, ভাল হবে এমনকি (আপনারা অনেকেই জানেন না) কসবার পেছনে একটা নতুন উপনগরী স্থাপিত হতে চলেছে। যদি কোনদিন সময় হয়, দেখবেন গিয়ে সল্ট লেক থেকে গড়িয়া পর্যন্ত বিরাট ইষ্টার্ণ মেট্রোপলিটন রাস্তাটি রূপ নিচ্ছে।

প্রায় আড়াই কোটি টাকা খরচ হল বটে, অনেক দিন সময় লাগলো বটে, কিন্তু আজ যখন বালীগঞ্জ-কসবা সেতুর কাজ শেষ, তখন ভাববেন, একের পর এক নয়, একের পর দুই।

সি. এম. ডি. এ-র দু-নম্বর কাজ কোনটা শেষ হবে? এসপ্লানেডে বিরাট বাস টার্মিনাস? অক্‌ল্যাণ্ড-স্কোয়ারে বিরাট জলাধার? সুবোধ ম'ল্লক স্কোয়ারে অনুরূপ জলাধার? গার্ডেন রীচের বিরাট জল প্রকল্প? নাকি হাওড়ায়? ইষ্টার্ণ মেট্রোপলিটন বাইপাস? নাকি ব্যারাকপুর থেকে কল্যাণী পর্যন্ত এক্সপ্রেসওয়ে?

আরও আছে। নতুন নির্দেশে বস্তী জীবনে আসছে নতুন স্বাচ্ছন্দ্য। বহু জায়গায় জলনিকাশী ব্যবস্থা, বহু ক্ষেত্রে কলকাতার উন্নতি। সবই হবে। একের পর দুই, দুইয়ের পর তিন, তিনের পর চার।

আপনার কাছে সি. এম. ডি. এ-র প্রশ্ন অঙ্ক নিয়ে নয়। এক, দুই, তিন, চার নয়। প্রশ্নটা কলকাতাকে নিয়ে। ভালবাসার শহর আর একটু ভাল হতে পারে না?

সেভিংস ডিপজিট বার্ষিক ৪½%

ফিক্সড ডিপজিট

১ বছর থেকে ৩ বছর বার্ষিক ৬%

৩ বছরের বেশী কিন্তু ৫ বছর পর্যন্ত বার্ষিক ৭½%

৫ বছরের বেশী বার্ষিক ৯%

১ বছরের কম বিভিন্ন মেয়াদের সুদের হারের জন্য নিকটতম ইউবিআই শাখায় খোঁজ নিন।

ইউবিআইতে টাকা জমানো লাভজনক

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

কখন বা গান বা বাজানো। এমনি করে গানের 'আসর' নয়,—গানের 'আড্ডা' সেদিন বেশ জমে উঠেছিল। এই ধরণের আড্ডায় আমি প্রথমে কৃষ্ণনগরে এবং পরে এই কলকাতা শহরে প্রায় নিয়মিত হাজিরা দিয়ে এসেছি। তাঁর মৃত্যুর পর তাই আমার সবচেয়ে প্রথম মনে পড়ছে এই আড্ডার কথা যেখানে বসে অনেক শুনেছি এবং অনেক শিখেছি। তাঁর সঙ্গীত জগতের কথা তাঁরই মুখে যা শুনেছি তাই আজ আমি বলতে চাই।

সিভিল সার্জন দীননাথ সান্যালের বড়ছেলে অমিয়নাথের ১৮৯৫ সালে জন্ম হয়। জন্ম অবধি অমিয়নাথ পিতার সঙ্গে উত্তরভারতে অনেক জায়গায় ঘুরেছেন এবং সঙ্গীতরসিক পিতৃদেবের সঙ্গে অনেক 'বাইজেদের' আসরে গিয়েছেন। আই এস সি পাশ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বেঙ্গলীরেজিমেন্টের সঙ্গে তিনি মেসোপটেমিয়া যান। ১৯১৯ সালে মেসোপটেমিয়া থেকে ফিরেএসে মেডিক্যাল কলেজে পড়তে থাকেন। ডাক্তারীতে তাঁর খুব উৎসাহ ছিল যদি ও মেডিক্যাল কলেজের ডিগ্রি নেবার শেষ পরীক্ষা তিনি দেন নি। তাঁর স্বভাবসুলভ হাল্কা চালে আমাকে একবার বলেছিলেন যে গানের সমঝদারী করবার জন্যে যে পোষ্টমর্টেম করার দরকার তার প্রথম তালিম তিনি পেয়েছিলেন মেডিক্যাল কলেজে আর দ্বিতীয় তালিম অবশ্য গুরুজী শ্যামলাল ক্ষেত্রীর কাছ থেকে। আর গানবাজনার ক্ষেত্রে সুর ও তানের ব্যবহার হোমিওপ্যাথিক ডোজই যথার্থ আর্ট। এটা অবশ্য উত্তরকালে তাঁর হোমিওপ্যাথিক ডিগ্রি লাভ করার সম্পর্কে সরস বাক্যালাপ বলে মনে হলেও শিল্প বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে একটা যথার্থ তুলনা বটে।

কলকাতায় স্কটিশ কলেজে আই এস সি পড়বার [illegible] এবং পরে মেডিক্যাল কলেজে ও হোমিও কলেজে পড়বার সময় এবং ল্যান্সডাউন রোডে নাটোরের মহারাজার বাড়ীতে আর হ্যারিসন রোডে শ্যামলাল ক্ষেত্রীর বাড়ীতে বড় বড় গাইয়েদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। একদিকে যেমনি তখন অনেক গান বাজনা শুনেছেন অন্যদিকে তেমনি বদল খাঁ এবং বিশ্বনাথ রাও প্রমুখ মহামান্য খেয়ালী, ধ্রুপদীয়া বা রবাবীদের কাছ থেকেও সেই সময় সঙ্গীত জিজ্ঞাসার মাধ্যমে কিছু তালিমও নিয়েছেন। এছাড়া তাঁর পিতৃদেবের সঙ্গে থাকাকালীন তাঁদের বাড়ীতেও গান বাজনার আসর বসত প্রতি পূর্ণিমার রাতে। সেখানে জেনুবাবু অর্থাৎ পিতৃবন্ধু শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী মহাশয়ের কাছে এসরাজ বাজনায় অমিয়নাথ উৎসাহ লাভ করেন। সে সময় হিন্দী গানের আসরগুলো কৃষ্ণনগরে ছিল জমজমাট। সুতরাং সবরকম গানের 'সাড়ে বত্রিশ ভাজা'-য় তাঁর মন গানের সুরে বেঁধে গিয়েছিল। তাঁর এই কথাটার তাৎপর্য এবার বলি।

সকলেই জানেন যে অমিয়নাথ আমাদের দেশের তথাকথিত 'উচ্চাঙ্গসঙ্গীত' নিয়েই সমঝদারী করেন। এদিকে গানের আড্ডায় বসে ভাল খাম্বাজ গান বলতে তানসেনের বিখ্যাত ধ্রুপদ গান 'বংশী ধুন সো বজাবী' গানের সঙ্গে থিয়েটারের গান 'চেওনা চেওনা এদিকে চেওনা' প্রচুর রস দিয়ে গাইতেন। এমনি করে খই সুরে এ মায়া প্রপঞ্চময়, দেওগিরি সুরের আগমনী গান 'গা তোল গা তোলো বাঁধ মা কুন্তল,' গোবিন্দ দাসের 'ভজন পূজন যাজন যজন' বা কাঙ্গালে'চাঁদ বাঁধা 'বিদ্যাসুন্দর' পালার 'ঐ দেখা যায় বাড়ী আমার' ইত্যাদি গান গেয়ে বৈজু, তানসেন, অদারঙ্গ, সদারঙ্গ ইত্যাদি মহারথীদের লেখা গানগুলোর সঙ্গে পাশাপাশি পাল্লা দেওয়াতেন।

এমনি করে সঙ্গীত প্রবৃত্তি বিস্তার সঙ্গে নিজেকে নিযুক্ত রেখে প্রাথমিক তালিম নেবার পর ভারতীয় শিল্প সৌন্দর্য তত্ত্ব নিয়ে অমিয়নাথ ১৩০৭ সাল থেকে মূল সংস্কৃত বইগুলি পড়তে আরম্ভ করেন। ইতিমধ্যে তাঁর মনের মধ্যে অনেক জিজ্ঞাসা জড়ো হয়েছে এবং নিজের সঙ্গীতজ্ঞতা দিয়ে কিছুটা নিষ্পত্তিও হয়েছে। এবং তিনি তাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্ত গুলোর সমর্থন ঐসব গ্রন্থের মধ্যে খুঁজে পেয়ে অবাক হয়েছেন। তিনি বারবার বিনয় করে বলতেন যে তখনকার সঙ্গীতগুণীদের সঙ্গে কথা বলে একথা স্থির বুঝেছিলেন যে তাঁর মতামত গুলো কিছু নতুন আবিষ্কার নয়,—তা যেন হারানো মানিক খুঁজে পাওয়া মাত্র।

এ কথা সবাই জানেন যে ধর্মোপাসনার মতন ভারতীয় রাগ সঙ্গীত অনুশীলন পদ্ধতিও গুরুমুখী। অমিয়নাথ বলতেন যে শুধু প্রয়োগ পদ্ধতি নয়,—সমস্ত রাগের অঙ্গও শিক্ষাগুরুর কথা তিনি প্রায়ই বলতেন। তাঁর ইংরাজী লেখা রাগ রাগিণী সম্বন্ধে গবেষণামূলক বইখানি প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদ করবার সময় একদিন আমি 'বেক', 'গুবেক' এবং 'মাতৃকা' এই তিনটি শব্দের উৎস জানতে চাই। কারণ সমগ্র বইখানিতে রাগ রাগিণীর বিচার প্রসঙ্গে এই তিনটি শব্দ বারংবার ব্যবহার করা হয়েছে এবং প্রচলিত মেল, ঠাট, আরোহী, অবরোহী জনক-জন্য, উত্তরাঙ্গ-পূর্বাঙ্গ, ওড়ব-ষাড়ব প্রভৃতি শব্দগুলি রাগ রাগিণী বিচার প্রসঙ্গে ব্যবহার করা হয়নি বললেই হয়। আমার প্রশ্নের উত্তরে অমিয়নাথ বলেছিলেন যে তিনি গুরু শ্যামলালজীর কাছে থেকেই এই সম্বন্ধে জানতে পারেন এবং শ্যামলালজীও এ সম্বন্ধে তাঁর গুরু গণেশলালজীর কাছ থেকে উপদেশ পেয়েছিলেন।

বালীগঞ্জে শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর বাড়ীতে ১৩৫৭-৬০ সালে সপ্তাহে দুদিন করে অমিয়নাথের সঙ্গীত বৈঠক বসত। সুরেশদা ছিলেন এই আসরের প্রধান হোতা কারণ তিনিই অমিয়নাথকে তাঁর বাড়ীতে সপ্তাহের দুদিন করে ধরে রাখতেন। সেখানে আমি ছাড়া প্রায় নিয়মিত হাজিরা দিতেন অমিয়নাথের বাল্য সুহৃদ সঙ্গীত রসিক ডাঃ হরিচরণ দত্ত, শ্রীব্রজেন্দ্রপ্রসাদ নিয়োগী ও শ্রীজিতেন বন্দ্যোপাধ্যায়। মাঝে মাঝে সুগায়ক ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়েরও শুভাগমন ঘটত। অনেক গান ও গল্পের অবতারণা করা হয়েছিল এই আসরগুলিতে তার মধ্যে দু একটা বলা নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

অমিয়নাথ বলতেন যে বদল খাঁ সাহেবের কাছ থেকে শেখা গানের স্থায়ীগুলো শুনলে বোঝা যায় যে তার গঠন প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যের জন্য কতখানি সঙ্গীতজ্ঞতা প্রয়োজন হয়। বিখ্যাত গানের স্থায়ীগুলো তিনি প্রায়ই মুখে মুখে শোনাতেন আর সুরেশদার কাজ ছিল তৎক্ষণাৎ সেগুলো স্বরলিপিতে ধরে রাখা। একদিন তিনি কলকাতার সেতারী হাকিমজীর কাছ থেকে শেখা 'জোবনেরে যোবন মদমাতি' গানখানি 'পূরিয়া' রাগের মাধ্যমে শোনান। পরে খেয়ালী মৌজুদ্দিনের গলায় সুরের উৎকর্ষের জন্যে শোনা এই গানখানি নতুন করে শুনিয়ে বোঝালেন যে তিনি কেমন করে মৌজুদ্দিনের গলায় 'জোবনেরে' এই কথা ও তার স্বরপ্রয়োগের মধ্যে সমগ্র গানখানির ছন্দ ও ব্যঞ্জনা নতুন করে উপলব্ধি করেছিলেন।

আর একদিনের কথা। যথারীতি বদল খাঁ সাহেবের গানের একটি স্থায়ী শুনছি এবং সুরেশদা টুকে নিচ্ছেন তার স্বরলিপি। অমনিই মনে হল যেন হীরের টুকরো একখানা, যেটা পাবা

জহুরী অনেক ঘষে মেজে তার চমক বের করছে। বুলবুল গানখানির সুরকার নিশ্চয়ই একজন সত্যিকারের গুণী। স্থায়ী অংশ শেষ হতে অন্তরাটুকুও শুনতে চাইলুম। অমিয়নাথ তৎক্ষণ প্রসঙ্গান্তরে চলে গিয়ে বললেন 'গান তো অনেক শুনেছ। গান দেখেছ কি?' বুঝলুম হেঁয়ালীর ভাষা। ঘাড় নেড়ে বোঝালুম যে দেখি নি। তখন অমিয়নাথ বেনারসের মোতিবাঈয়ের কাছে শোনা আড়ানায় বাঁধা 'মুরলী মোর কাহে ছিন্ লয়ে' গানখানি শোনালেন। বিপ্রলব্ধা প্রেমিকার কাতরোক্তি 'আমার অভিমানের বংশীটি তুমি কেন খুলে নিলে।' মধ্যম পঞ্চম ও কোমল গান্ধারের অংশের ছোট ছোট মুড়কি তান ও ঠোক দিয়ে পরে 'কাহে' কথাটার উচ্চারণের সময় যখন পঞ্চম থেকে তার সপ্তকে গিয়ে মীড় দিয়ে কোমল নিখাদ ছুঁয়ে পঞ্চমে দাঁড়ালেন তখনই গানখানির মধ্যে অভিমানের কাতরোক্তি স্পষ্ট ফুটে উঠলো। আর পঞ্চমের স্পর্শে হল মূল রস শৃঙ্গারের প্রতিষ্ঠা। গান শেষ হতে আমার মতামত জানালুম। বললেন 'হ্যাঁ শোনবার কান তৈরী হয়েছে অনেকটা। মোতি বাঈয়ের গলায় অবশ্য আমি অনেক বেশী কিছু শুনেছিলুম এবং সেই সঙ্গে দেখেছিলুম বাঈজীর অভিমান ভরে থরথর করে কাঁপা ঠোঁট দিয়ে সেই কথাগুলো বলবার ভঙ্গী আর জলভরা ছলছল নত চোখের কাজল ভরা চাহনী। এখন বোঝ গান কি করে দেখতে হয়।'

অমিয়নাথ সম্বন্ধে বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় সঙ্গীতের প্রচলিত মতাদর্শের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহী মূলক মতামত গুলো। তখন বোধহয় পঞ্চাশসাল। একদিকে হচ্ছে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ব্যাপক উত্থান। অন্যদিকে ওস্তাদদের মুখে মুখে রবীন্দ্রসঙ্গীতের নিন্দা। অভিযোগ রবীন্দ্রনাথ রাগ সঙ্গীতের ঐতিহ্যকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথের 'সঙ্গীতের মুক্তি' প্রবন্ধকে ঘিরে অনেকেই সোচ্চার। কৃষ্ণনগরে অমিয়নাথের বৈঠকখানায় কয়েকজন স্থানীয় ওস্তাদজমায়েত হয়েছেন। তাঁরা একযোগে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে আক্রমণ করছেন এবং সুরসিক বীরেনদা,—শ্রীবীরেন্দ্রমোহন আচার্য,—অভিমন্যুর মতন একাই লড়ে যাচ্ছেন। এমন সময় অমিয়নাথ আমাকে রবীন্দ্রনাথের 'আমার নিশীথ রাতের বাদল ধারা' গানখানি চতুর্মাত্রিক তালে গাইতে বললেন। গান শেষ হলে তিনি খাতা কলম নিয়ে একটা স্বরলিপি করে আমাকে দেখিয়ে দিলেন এবং তারপর কি একটা হিসাব করে নিয়ে বললেন যে গানখানিতে যে রাগের ব্যবহার হয়েছে তার নামকরণ হোক 'মালব-কল্যাণী' এই বলে প্রায় দশ মিনিট ধরে ঐ রাগে আলাপ করলেন। ওস্তাদদের তখন মুখচুণ। সমস্ত তর্ক যুদ্ধের সমাপ্তি সেদিন ওইখানেই হবার কথা কিন্তু অমিয়নাথ তখনও থামেন নি। একটার পর একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত উল্লেখ করেন আর সুর বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে থাকেন যেমন বেহাগে বাঁধা 'দীপ নিভে গেছে মম' গানখানিতে কড়ি মধ্যমের প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য। 'এবার অবগুণ্ঠন খোল' গানখানির মধ্যে ছন্দের বাঁধুনী আর মধ্যমের দীপ্তি। বাংলার মেঠো সুরে বাঁধা 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন' গানখানি কোমল রেখাবের প্রয়োগ দিয়ে অভিমানের ছায়া; কোমল ধৈবতের পাশ ছুঁয়ে 'কবে তুমি আসবে বলে' গানটিতে নীল আকাশের সাগরে ভরা একাদশী চাঁদের খেয়াপাড়ি দেওয়া। আর কত বলব? সকলেই তখন অবাক বিস্ময়ে জামালানন্দী বদল খাঁ সাহেব বিশ্বনাথ রাও প্রমুখ ওস্তাদের কাছে তালিম নেওয়া অমিয়নাথের কাছে যেন ভূতের গল্প শুনছেন। সব কথা এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলে অমিয়নাথ সেদিন, হঠাৎ চুপ করে গেলেন তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন 'এক অক্ষর শ্রেণীর রাগই

৪০০ শত সংখ্যায় ওপর হওয়া সম্ভব। তারপর ষাড়ব ও সম্পূর্ণ জাতির রাগ রাগিণীর সংখ্যা কত হতে পারে বুঝে দেখ। রাগ রাগিণী নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করবার আগে যদি এই উপলব্ধি সকলের হোত তো একদিনে তিনি ভারতীয় সঙ্গীতের সুরকার ও সঙ্গীতকারদের মধ্যে সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী হতে পারতেন।'

সঙ্গীত সম্বন্ধে অমিয়নাথের মনন ছিল সংস্কার মুক্ত। ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্র মতঙ্গের বৃহদ্দেশী বা নারদকৃত সঙ্গীত মকরন্দ ইত্যাদি সংস্কৃত বইগুলি তিনি নিজে সংস্কৃত পণ্ডিতদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে পড়ে ছিলেন অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক সঙ্গীত তত্ত্ববিদদের লেখাও বাদ দেননি কিন্তু কারও মতামত তিনি অন্ধ বিশ্বাসে গ্রহণ করেন নি। তারই ফলে তার নাট্যশাস্ত্রের ওপর লেখা এবং এই পত্রিকায় প্রকাশিত মতামতগুলি স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। দেশ পত্রিকার ২৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮ সংখ্যায় অধ্যাপক শ্রীসুধীরচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় অমিয়নাথের লেখা বইয়ের ও বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত লেখাগুলির একটি তালিকা প্রকাশ করেছেন। যেটুকু আমার দেখা তাতে মনে হয় যে তাঁর নিজের সংরক্ষিত অপ্রকাশিত লেখাগুলির সংখ্যা ছিল অনেক বেশী। দুঃখের বিষয় যে সেগুলি এখন খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। অনেক সুরেশবাবুর চেষ্টায় তাঁর কাছ থেকে ইংরাজীতে লেখা রাগালাপ সংক্রান্ত একখানি বই প্রকাশ করবার সম্মতি একজন প্রকাশক আদায় করতে পেরেছিলেন এবং তার কিছুদংশ অমিয়নাথ নিজেই প্রুফ সংশোধন করেছিলেন। এই অমূল্য বইখানি প্রকাশিত হলে রাগ সঙ্গীত জগতে যে এক বিশেষ সংযোজন বলে পরিগণিত হবে এ বিশ্বাস আমি রাখি।

অমিয়নাথের যতগুলি লেখা এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে ইংরাজীতে লেখা 'রাগ ও রাগিণী' এবং নাট্যশাস্ত্রের ভূমিকা হিসাবে লেখা ও কয়েকটি 'সমকালীন' পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কেননা এগুলি কোনও সঙ্গীত বিষয়ে লেখা বইয়ের চর্বিত চর্বণ নয় অথচ রচনাগুলি আমাদের রাগ সঙ্গীত সম্পর্কে প্রচলিত ধ্যান ধারণাগুলোকে কিছুটা ওলোট পালট করে দিয়ে নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিতে পারে।

ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রখানির অনুবাদ অমিয়নাথের অপ্রকাশিত রচনাগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেই বইখানির ভূমিকা প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্যের কিছুটা ধারাবাহিক ভাবে সমকালীন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই কয়টি রচনা পড়লেই বোঝা যায় যে এ পর্যন্ত নাট্যশাস্ত্রের ওপর ইংরাজী বা বাংলায় যে সমস্ত লেখা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে কতকগুলি ভ্রমাত্মক তথ্য এতাবৎকাল প্রামাণ্য বলেই চলে আসছে। সঙ্গীত, নাটক ও নৃত্য বিষয়ক এই বইখানির বাংলা অনুবাদের ভূমিকায় অমিয়নাথ দেখিয়েছেন যে ভারতীয় সঙ্গীত নাটক ও নৃত্য পরিবেশন পদ্ধতি সে সম্বন্ধে তাত্ত্বিক ধ্যান ধারণাগুলি পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম এবং নিখুঁত। নৃত্য-নাট্য, সিম্ফনী অর্কেষ্ট্রা, অপেরা বা স্ত্রী পুরুষের হাত ধরাধরি করে যুগল নৃত্য ইত্যাদির প্রয়োগ পদ্ধতি নাট্যশাস্ত্রের মধ্যেই রয়েছে অথচ তার ভ্রমাত্মক অনুবাদের ফলে যথাযথ ভাবে নাট্যশাস্ত্রের অনুশীলনী এ পর্যন্ত হয় নি।

ইংরাজীতে 'রাগ ও রাগিণী' সম্পর্কে লেখা বইখানির মধ্যে অমিয়নাথের বিজ্ঞান নিষ্ঠ যুক্তিগুলো যে চমকপ্রদ সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই। বইখানি প্রকাশ করার আগে অমিয়নাথ

তাঁর বন্ধু জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন বসু মহাশয়কে বইখানি দেখতে অনুরোধ করেন। আদ্যোপান্ত পড়বার পর বসু মহাশয় অমিয়নাথকে এই নতুন পদ্ধতির মাধ্যমে পরীক্ষা চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করেন। অসংখ্য গান ও বাজনার স্বরলিপিগুলি বিশ্লেষণ করে অমিয়নাথ কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যেগুলি প্রচলিত মতামতের বিরুদ্ধবাদী। কয়েকটি উল্লেখ যোগ্য সিদ্ধান্তের কথা এখানে বলবার প্রয়োজন বলে মনে হয়।

১। রাগ বা রাগিণীর মধ্যে স্ত্রী পুরুষ লিঙ্গভেদের লক্ষণ নির্ধারণ।

২। যে কোন ও একটি গানের রাগ বা রাগিণীর ব্যবহারের বৈশিষ্ট্যে ন্যূনপক্ষে চারটি স্বরের যে কোনওটি বাদীস্বর হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে।

৩। রাগ বা রাগিণীকে সঠিক সনাক্ত করতে হলে আরোহী, অবরোহী, মেল, ঠাট, পকড় বা থাম তাদের লক্ষণগুলির চেয়েও বাদীস্বর, খণ্ডমেরু বা মাতৃকার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার অনেক বেশী কার্যকারী।

৪। ইংরাজী 'মেলডী' আর ভারতীয় রাগরাগিণীর পরিবেশন পদ্ধতির পার্থক্য কোথায় তার নির্দেশ দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন যে সারা পৃথিবীর সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্যে একটা মূলগত ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

৫। রাগ রাগিণীর জন্ম যে একান্তভাবে 'মাতৃকা' ও 'খণ্ডমেরুর' যথাযথ প্রয়োগ নির্ভর সেকথা বিশদভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

অমিয়নাথ সম্পর্কে এতগুলি কথা বলার পরও মনে হচ্ছে যে কথা বলার প্রয়োজন সেকথা জোর গলায় বলা হল না এবং এপর্যন্ত হয় নি। তার কারণ প্রথমতঃ এই যে তাঁর সঙ্গীতমনস্কতার পরিমাপ করা আমাদের মতন সাধারণ লোকের পক্ষে সম্পূর্ণভাবে সম্ভব নয় এবং দ্বিতীয়ত, আমাদের কণ্ঠনিনাদে কর্ণপাত করবার মতন এমন কোনও নামকরা মহারথীদের খবর পাইনি যিনি তাঁর লেখাগুলি সম্যক ভাবে পড়েছেন ও অনুধাবন করবার চেষ্টা করেছেন। এছাড়া একথাও সত্য যে বইগুলি পড়তে চাইলেও বাজারে পাওয়া যায় না কারণ আগের মুদ্রণগুলি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। সম্প্রতি 'স্মৃতির অতলে' বইখানি শ্রীশ্রীশকুমার মহাশয় ও সুরেশদার যুগ্ম প্রচেষ্টায় প্রকাশিত হয়েছে এবং আশা করছি যে অন্যান্য বইগুলির পুনর্মুদ্রণ ও পত্রিকার লেখাগুলি বইয়ের আকারে প্রকাশ করা সম্ভব হবে।

১৯৭৮ সালের ২৪শে জানুয়ারী অমিয়নাথ ইহলোক ত্যাগ করেছেন। সেই সঙ্গে যদি তাঁর বইগুলির পুনর্মুদ্রণ বা অপ্রকাশিত লেখাগুলি প্রকাশ করা সম্ভব না হয় তাহলে বুঝতে হবে ভারতীয় রাগসঙ্গীত জগতের একটি অপূরণীয় ক্ষতি হল।

পাশের রাজ্যে লৌকিক দেব-দেবী : বিহার

ভোলানাথ ভট্টাচার্য

লোকসমাজের দেব-দেবী পৌরাণিক দেব-দেবীদের মতো অনেক সময়ে নিজের অধিষ্ঠানক্ষেত্র বিস্তৃত করতে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে গিয়েছেন এমন উদাহরণ বেশকিছু মিলতে পারে। কখনো কখনো দেখা যায় কোন লৌকিক দেব বা দেবী একই সঙ্গে দুটি বা তিনটি রাজ্যে পূজিত হচ্ছেন। হয়ত সেই পূজার কৃত্যাদিতে সামান্য পার্থক্য ঘটে। পশ্চিম বাংলার প্রতিবেশী রাজ্য বিহার, ওড়িশা এবং আসামে সন্ধান করলে লৌকিক দেব-দেবী সংক্রান্ত পারস্পরিক প্রভাবের কিছু তথ্য পাওয়া যেতে পারে। কিছু সংখ্যক দেব-দেবী দেখা যায় যাঁর প্রভাব-সীমা ছোট্ট একটি অঞ্চলের মধ্যে বদ্ধ, হয়ত একটি বা দুটি গ্রামের মধ্যে তাঁর পরিচিতি সীমায়িত। উদাহরণ স্বরূপ কিছু সংখ্যক গিনি দেবী ও চণ্ডিনী দেবীর কথা উল্লেখ করা যায়। অনেকগুলি আখ্যান পরিবর্তনের ফলে রুক্মিনী দেবী বিহার রাজ্যে প্রতিষ্ঠিতা আছেন। কিন্তু এঁর তৈজস হয়ে গেছেন পশ্চিমবঙ্গে, নিগদায়। ওড়িশার সঙ্গেও রুক্মিনী দেবী একাধিক দিক থেকে অচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। এই দেবী আর তাঁর তৈজসকে কেন্দ্র করে বাংলা, বিহার, ওড়িশার লোকসমাজ ও আদিবাসীসমাজের মানুষের ধর্মসাধনায়, লোকবিশ্বাস ও সংস্কারের রাজ্যে এক অভাবিত সেতুবন্ধন ঘটেছে। তাছাড়া লোকসমাজ ও আদিবাসী সমাজের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করে তুলতে দেবী রুক্মিনীর ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। রুক্মিনী, শীতলা বা অনুরূপ কিছু দেব দেবীর অস্তিত্ব বদল ঘটেনি। তাঁরা একই নামে দুই বা তিনটি রাজ্যে পূজিত হন। আবার কিছু দেব-দেবীর ক্ষেত্রে দেখা যায় ভিন্নরাজ্যে যাওয়ার সঙ্গে নামান্তর ঘটেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেইসব লৌকিক দেবদেবীদের চিনতে খুব অসুবিধা হয় না। তাঁদের প্রকৃতির মিল, পূজা-কৃত্যের মিল এবং সর্বোপরি পরিণামের মিলে তাঁদের আসল রূপ পরিচয় স্বপ্রকাশ হয়ে পড়ে।

বিহারের লোকধর্মের প্রতিচ্ছবি পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে প্রথমে নজরে আসে যে, এখানকার লোকসমাজ প্রধান পৌরাণিক ধর্মের দেব দেবীর প্রভাবে আচ্ছন্ন। তুলনামূলকভাবে বেশ দুর্বল হলেও এই প্রভাবধারা অবশ্যই আছে তবে তার কতটুকু আদিবাসী সমাজের ধর্মচেতনার ফল আর কতটুকু তত্ত্ব লোকসমাজের — এই প্রশ্নের সঠিক জবাব পাওয়া কঠিন।

দেবী মহামায়া

দুর্গাপূজার পর অক্টোবর—নভেম্বর মাসে বিহারের প্রায় সব গ্রামে (এমনকি সাঁওতাল পরগণার গ্রামগুলিতেও) নবরাত্রে এই দেবী মহামায়ার পূজা হয়ে থাকে। ফল, সিঁদুর, রঙিন কাপড় ইত্যাদি এবং পাঁঠা ও পায়রা দেবীর উদ্দেশে নিবেদন করা হয়। কখনো কখনো অন্যান্য প্রাণী নিবেদন করে তাদের কান কেটে ছেড়ে দেওয়া হয়। দেবীর কাছে বছর বছর বহু ভক্ত মানত করেন। মনোবাঞ্ছা পূরণ হলে পরের বছর সাধ্য অনুসারে ভক্তরা দেবীর পূজা বেদী লাল কাপড়ে মুড়ে দেন, সাতটি মাটির পাত্র পরিপূর্ণ করে তাতে একটি করে কাঠের চুক্তি দিয়ে দেন। দেবী মহামায়ার প্রত্যেকটি আখড়ায় সাতটি পৃথক দেবীর জন্য সাতটি করে বেদী নির্মিত দেখা যায়। এই সাত দেবী

মুহূর্তে পশ্চিম বঙ্গের লৌকিক দেবী সাতবোন, সাত বউনি, সাতবিবি ও লোকসংস্কারে সংখ্যা হিসাবে সাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই সূত্রে পরিশীলিত ধর্মের সপ্তমাতৃকাতত্ত্ব এসে যায়। অবশ্য সপ্তমাতৃকার তালিকা সেখানে তেমন নির্দিষ্ট নয়। ব্রহ্মাণী, ইন্দ্রাণী নিয়ে গোলযোগ বড় কম নেই। সেদিক থেকে তন্ত্রের সপ্তমাতৃকার তালিকা বেশ আকর্ষণীয় যেমন, (১) গর্ভধারিণী জননী (২) ধাত্রী বা স্তন্যদায়িনী জননী (৩) গবী বা গো-মাতা (৪) গ্রাম মাতৃকা (৫) দেশ মাতৃকা (৬) ভাষা মাতৃকা এবং (৭) মাতা জগৎ অম্বিকা।

চেলাই মাই

আজ থেকে প্রায় আশী বছর আগে স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় উত্তর চব্বিশপরগণায় নৈহাটির কাছে এক লৌকিক দেবীর অস্তিত্বের কথা জানিয়েছিলেন যাঁর নৈবেদ্য ছিল মাটির ঢেলা। এই দেবীকে তখন কেউ কেউ বৃক্ষদেবী বলে চিহ্নিত করেছিলেন। শাস্ত্রীমহাশয় এঁকে চণ্ডীর রকমফের বলে মনে করতেন এবং ভক্তদের কাছ থেকেও জেনেছিলেন ইনি ঢেলাই চণ্ডী। বিহারে অনুরূপ এক দেবীর সন্ধান আমরা পাই যাঁকে 'ঢেলাই মাই' নামে ডাকা হয়। ভাগলপুর শহর থেকে মাইল তিনেক দূরে বাড়াঁরিঘাটের কাছাকাছি একটি দেবী-থানের পাশ দিয়ে যাবার সময় বর্তমান আলোচক দুজন আধুনিক পরিচ্ছদশোভিত যুবককে রাস্তার পাশ থেকে মাটির চাপড়া তুলে দেবীর থানের উদ্দেশ্যে ছুঁড়তে দেখেছেন। এই দৃশ্যে বিস্মিত হয়ে অনুসন্ধান করা হয়। জানা যায়, ইনি অতি পরিচিতা ঢেলাই মাই। জনৈক ভক্তের কথা অনুযায়ী বলা যায়, ঢেলাই বা মাটির ঢেলা পেলে সন্দেশ-রসগোল্লা ফেলে দেন। স্বর্গীয় শাস্ত্রীমহাশয় বর্ণিত নৈহাটির ঢেলাই চণ্ডীর থানটি তখন একটি খেজুর গাছের তলায় ছিল, সম্ভবত সেইকারণে অনেকে ওকে লৌকিক বৃক্ষ দেবী আখ্যা দিয়েছিলেন। অন্যভাবে খেজুর গাছের চেহারার সঙ্গে রঙিন সর্পদেবীর মিল দেখে আবার কেউ কেউ ঢেলাই চণ্ডীকে সর্পদেবী বলেছিলেন। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয়, পরবর্তীকালে খেজুর গাছটি মরে যাবার পর ঢেলাই চণ্ডীর থানটি সেখানেই অন্য এক গাছতলায় থেকে যায়। বৃক্ষদেবীর কোন নির্দিষ্ট গাছ নেই— এ এক বিচিত্র ব্যাপার। আসলে পূজা আমরা বৃক্ষকে করি না—বৃক্ষপ্রতীককে করি। বিহারে ঢেলাই মাইয়ের সঙ্গে বৃক্ষের কোন সম্পর্ক নেই। এখানে প্রতীক হিসাবে যে যে গাছ লোকসমাজে পূজা পায় তার মধ্যে কাশিম (পোকাবি), কিকর (বাবলা), বেল, কদম, কাঁঠাল, নিম, মহুয়া, পেপা (চাল-কুমড়ো), টেঁড় (গাব), পিপখন (পাকুড়), বোড় (বট), পিপল (অশথ), জাম্বুর (জবা), শিমর (শিমুল) ইত্যাদি প্রধান। ঢেলাই মাই এগুলির কোনটির সঙ্গে সম্পৃক্ত নন্। সম্ভবত ধরিত্রীপূজার একটি সহজ সরল লৌকিক রূপ আমরা ঢেলাই মাইয়ের পূজার মধ্যে দেখতে পাই। কৃষিকাজের প্রধান উপকরণ যে ভূমি তারই প্রতীক দেবী হলেন এই ঢেলাই মাই। ব্যাপারটি আরও স্পষ্ট হয় যখন দেখা যায় বীজরোপণের সময়ে কৃষকেরা ঢেলাই মাইকে আখ্ সট্ নিবেদন করেছেন।

ঘোড়াই মাই—হাথি মাই

কহলগাঁর কাছে একটি লোকদেবীর থান আছে যা দেখার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম বাঙলার শিনি দেবীর থানগুলির সাজসজ্জা স্মরণে আসে। এই দেবীর থানে ছোটবড় অসংখ্য মাটির ঘোড়া পড়ে আছে। ভক্তরা মাটির ঘোড়া দিয়ে এই দেবীর কাছে মানত করে। মনের বাসনা পূর্ণ হলে আরো অনেক

ঘোড়া দিয়ে এই দেবীর কাছে মানত করে। মনের বাসনা পূর্ণ হলে আরো অনেক ঘোড়া দিয়ে দেবীর থান সাজানো হয় এবং অথ্‌নই ও অন্যান্য দ্রব্য নিবেদন করা হয়। অনুরূপ সাজসজ্জা এবং অনুষ্ঠান ও কৃত্য পালন করা হয় হাথি মাইয়ের থানে।

বন্দি দেবী

এক সামন্ত রাজা মস্ত দীঘি কাটিয়েছেন। দীঘির পাশে চারধারের জমিতে চমৎকার ফুল-বাগান সাজিয়েছেন। সেই ফুল-বাগান থেকে প্রতিদিন রানীর নির্দেশে এক পরিচারিকা ফুল তুলে আনে দেবী গৌরীর পূজার জন্য। একদিন রানীর পরিচারিকা ফুল তুলছে এমন সময় একটি ফুটফুটে মেয়ে সেই ডালা সমেত ফুল চেয়ে বসল। পরিচারিকা অসহায়ভাবে বলল, 'আমার আর দিতে কি ? কিন্তু রাণীমা যে রাগ করবেন। জানো না তো এ ফুল দেবী গৌরীর পূজার জন্য তোলা হচ্ছে।' মেয়েটি পরিচারিকার কথা শুনে শুধু হাসছে।—বিহারের লোকদেবী বন্দি বা বন্তি মাই সম্পর্কিত এই লোককথা শুনতে শুনতে স্মরণে আসে পশ্চিম বাঙলার হুগলী জেলার দেবী রাজবল্লভীর কথা। অবশ্য পার্থক্য একটু আছে, পশ্চিম বাঙলার রাজবল্লভীর প্রতিষ্ঠা রাজা ও বণিকের যৌথ আনুকূল্যে। কিন্তু বিহারে বন্তি দেবীর প্রতিষ্ঠা মূলত লোকসমাজের আন্তরিক ভক্তিপ্রভাব। এই প্রসঙ্গে আরেকটি লক্ষ্য করার আছে। দেবী রাজবল্লভীর পূজায় মহানবমীর দিনে 'প্যাঁচের বলি' নামে এক বিচিত্র ধরণের বলিপ্রথা লক্ষিত হয়েছে। পাঁঠাটি হাড়ি কাঠে না ফেলে মুক্ত অবস্থায় তার মুণ্ড ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন করার নাম প্যাঁচের বলি। বিশেষ মানত উপলক্ষে দেবী বন্তির কাছে প্যাঁচের বলি উৎসর্গ করা হয়। তবে তা কখনো পাঁঠা নয়, ছাগল। বন্তি দেবী সম্পর্কে প্রাথমিক যে তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল তাতে অনুমিত হয়েছিল যে এই দেবী 'বহ্নি' অর্থাৎ আগুনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কিন্তু বন্তির সঙ্গে যুক্ত পৃথক এক লৌকিক দেবী এখানে আছেন এবং তিনি বন্তি দেবী নয়—অগ্নী দেবী নামে সমধিক পরিচিতা।

গোরেয়া বাবা

বিহারের প্রায় সর্বত্র এই গোরেয়া বাবার মহিমা প্রতিষ্ঠিত। গৃহপালিত জীবজন্তু বিশেষ করে গবাদিপশুর রোগাভোগা ও কল্যাণের জন্য গোরেয়া বাবার পূজার্চনা অনুষ্ঠিত হয়। গোরেয়া প্রসঙ্গে পশ্চিম বাঙলার নদীয়া জেলার কাটাদি ফকীর এবং উত্তর বাঙলার লোকপূজ্য মানিক পীর সাহেবের কথা স্মরণে আসে। গোরেয়ার সঙ্গে গবাদিপশুর ব্যাপারে আরেক লোকদেবতার কথা শোনা যায়, তাঁর পরিচিতি গবনাই বাবা হিসাবে। লোকশ্রুতি, গবনাই বাস্তবে এক রাখাল বালক ছিলেন। একবার মাঠে গরু চরাতে চরাতে গবনাই বাঘের দ্বারা আক্রান্ত হন। প্রাণপণ লড়াই করে গবনাই ঐ বাঘের আক্রমণে নিহত হন এবং পরে দেবাদিষ্ট মহিমায় উন্নীত হন। গবনাই বাবাকে নিয়ে বেশকিছু লোকগীতি সৃষ্টি হয়েছে। বাঙলায় যেমন মানিক পীরের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে বাদিয়াদের লোকেরা গ্রামে গ্রামে গান গেয়ে বেড়ায়, বিহারে তেমনি একটি ছোট মূর্তি নিয়ে কিছু কিছু লোক গবনাই গীতি পরিবেশন করে। গবাদিপশুর ব্যারাম ঘোচানোর জন্য গোরেয়া এবং গবনাইয়ের পূজা দেওয়া হয়। কাটাদি ফকীর এবং মানিক পীরকে কেন্দ্র করে বাঙলায় যেমন মেলা বসে বিহারে তেমনি বসে গোরেয়া ও গবনাই বাবাকে কেন্দ্র করে।

ভূত ব্রহ্ম

বিহারের নিতান্তই আঞ্চলিক লোকদেবতা ভূত ব্রহ্ম প্রায় অধিকাংশ গ্রামে পূজিত হন। সাধারণভাবে মৃত্যু না হয়ে যদি অগ্নিদগ্ধ বা বন্যপ্রাণীর আক্রমণে কোন ব্রাহ্মণের মৃত্যু হয় তাহলে মৃতব্যক্তি যে গ্রামে জীবিতকালে বসবাস করতেন সেই গ্রামের মানুষ মৃত ব্রাহ্মণকে 'ভূত ব্রহ্ম' জ্ঞানে পূজা দেন। এই পূজার নৈবেদ্যর মধ্যে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী হল পায়েস। তাছাড়া বর্ষায় ঘিয়ে নৈবেদ্য ভূত ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয় এবং সপ্ততোলা দেওয়া হয়।

সামে মাই

বিহারে এই স্থায়ী বা কালীর কোন মূর্তি গড়ে পূজা হয় না। অধিকন্তু ইনি কোন উচ্চবর্ণের মানুষের কাছ থেকে পূজাও পান না। এঁর ভক্তদের মধ্যে ডোমর, মেথর এবং দোসাধরা প্রধান। দেবী হিসাবে এঁর তেমন মর্যাদা আছে বলেও মনে হয় না। সাধারণত দেবী মহামায়ার আস্থানের বাইরে অনেকটা দূরে খানিকটা কুঠার সঙ্গে ইনি বিরাজ করেন। দেওয়ালির সময়েও ইনি কোন বিশেষ মর্যাদা পান না। সাধারণত এঁর কাছে শূয়োর উৎসর্গ করা হয়।

চিরকুমারী মাই

ভূত ব্রহ্ম বা সামে মাইয়ের মতো দেবী চিরকুমারীও নিতান্ত অঞ্চল বিশেষের দেবী। এঁকে শতছিন্ন বস্ত্র আচ্ছাদিত শীর্ণ বুড়ী হিসাবে বিহারের লোকসমাজ গ্রহণ করেছেন। এঁর থানের পাশ দিয়ে যিনি যখন যান তিনি কোন না ছেঁড়া কাপড় চিরকুমারী মাইয়ের উদ্দেশে ছুঁড়ে দেন।

চক্রদেবী বক্সী

সাধারণত গাড়ীর রাস্তার পাশে এর থান। এঁর ভক্ত বলতে চাকাওলা গাড়ীর চৌধুরীদের বোঝায়। গাড়ীর চাকায় তেল দিয়ে বক্সী মায়ের অর্চনা করা হয়। কখনো কখনো গাড়ী নিয়ে পথে বক্তোয়ারের ঝামেলা হলে বা গাড়ী খাদে পড়ে গেলে চৌধুরীরা বিশ্বাস করেন যে বক্সী মা অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তাই তাঁর সন্তোষ বিধানের জন্য বিশেষ পূজা দেওয়া হয়। তখন অনেক চৌধুরী একত্র হয়ে বক্সী মায়ের জয়ধ্বনিতে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তোলেন।

বুড়্‌চি মাই

গোজ্জার কাছে বাস-রাস্তা থেকে সামান্য দূরে একটি গাছতলায় ইনি বিরাজ করেন। মাটি লেপে বেদী তৈরী করে চিক্‌-সিঁদুরে লেপা একটি মাটির সাপকে সামনে রেখে তার পেছনে একটি সিঁদুর লেপা মূর্তি—এই হলেন বুড়্‌চি মাই। বছরভোর তাঁর পূজা হলেও কেউ-ই তেমন গুরুত্ব দেয় না। কিন্তু গ্রীষ্মকাল এলে ইনি সর্বজনপূজ্যা হয়ে ওঠেন। গ্রীষ্ম থেকে বর্ষা পর্যন্ত প্রায় প্রতিদিন বুড়্‌চির থানে কোন না কোন বিশেষ পূজা লেগে থাকে। শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে এঁর বার্ষিক পূজোৎসব হয়। বাঘকিনারের কাছ থেকে একজন বৈষ্ণবী বা এসে এঁর পূজা করেন এবং পূজার সময় লৌকিক পন্থ সম্পূর্ণ মুছে দিয়ে পৌরাণিক মতে এঁকে মা মনসাজ্ঞানে অর্চনা করা হয়। ব্রাহ্মণ-পূজারী দেবী-থানের নমস্কারী নিয়ে চলে গেলে বুড়্‌চি মাই আবার লোকসমাজ ও আদিবাসী সমাজের পূজ্যা হয়ে ওঠেন।

অরুণাচলের লোকগীতি

অশোককুমার বসু

ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত প্রদেশটির নাম অরুণাচল। ৩১,৪৩৮ বর্গ মাইল, পর্বত ও অরণ্য অধ্যুষিত অরুণাচলকে পাঁচটি জেলায় ভাগ করা হয়েছে। যথা—কামেং, সুবর্ণসিরি, সিয়াং, লোহিত ও তিরাপ। এই পাঁচটি জেলায় প্রায় ২০টি (ইন্দো—মঙ্গোলয়েড) উপজাতির বাস। এই সব উপজাতিকে,—সমাজনীতি, লোকাচার ও ভাষাগত পার্থক্যের জন্য ৭০টি শাখা প্রশাখায় ভাগ করা যায়।

অরুণাচলের প্রায় ৫ লক্ষ উপজাতিদের মধ্যে ৫০টি ভাষা প্রচলিত। কোন ভাষারই লিপি নেই। এদের কোন লিখিত ইতিহাসও পাওয়া যায় না। লোকগাথা ও কয়েকটি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ থেকে এদের ইতিহাস গড়ে নিতে হয়েছে। এইসব লোকগাথা ছাড়াও, সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের সুখ দুঃখ, প্রেম, বাৎসল্য, আশা আকাঙ্খা ইত্যাদি নিয়ে অনেক গান এদের ভাষায় পাওয়া যায়। গানের উপমাগুলি সহজ ও সরল—পাণ্ডিত্যের ভারে পীড়িত নয়। যদি ও অরুণাচলের প্রচণ্ড দুর্গমতার জন্য, অধিবাসীরা বহির্জগত হতে বহুযুগ ধরে প্রায় বিচ্ছিন্ন ছিল, তবুও লোকগীতিগুলি লক্ষ্য করলে সনাতন মানবের চিরন্তন হৃদয়ের আবেগাস্ফূর্তি পাওয়া যায়।

এই সব উপজাতিদের কথ্য ও মাতৃভাষা বলে আলাদা কিছু নেই। আমাদের চেনা জানা ব্যাকরণ অথবা বাক্য গঠনের প্রণালীর সঙ্গে এদের ভাষার বিশেষ মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। ভাষাবিদরা এইসব ভাষাকে তিব্বতী-ব্রহ্মভাষা গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

অব্যয় যুক্তিকরণ পদ্ধতিতে, এইসব উপজাতির অনেক ভাষাতেই বাক্য রচিত হয়। অব্যয়গুলি ভাষাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়েছে। বাক্যে এদের প্রয়োগ কৌশল বহু অর্থবহ। উদাহরণ স্বরূপ, গ্যালোং ভাষার কয়েকটি কথা দিয়ে, বাক্য রচনার পদ্ধতিটি বোঝানো যেতে পারে।

কাকেন — সুন্দর, কাকেন দো — সুন্দর (হয়)
কাকেনক দো — অতি সুন্দর (হয়)
ইন্ — যাওয়া
ইন্‌ডোকো — তুমি যাও (অনুজ্ঞা প্রকার)
ইন্‌ক ডোকো — তুমি অবশ্যই যাও (আদেশ)
ঙ ইন্ দো — আমি যাই।
ঙ ইন্‌লিদো — আমি যেতে ইচ্ছা করি।
ঙ ইন্‌গলিদো — আমি ঘুরে বেড়াতে চাই।

এই প্রথায় অব্যয় জুড়ে জুড়ে, গ্যালং ও অন্যান্যরা তাদের মনের ভাব অতি সহজভাবে বোঝাতে পারে। ভাষায় হয়তো বিপুল শব্দভাণ্ডার নেই, কিন্তু লোকজ শব্দসম্ভারের মধ্যে ভাব আদান প্রদানে বিন্দুমাত্র

অসুবিধা নেই। ভাষার মান নির্ভর করে, তার শব্দ ধ্বনি মাধুর্য এবং বাক্যের অর্থবহতার উপর। সে হিসাবে এইসব উপজাতিদের ভাষাগুলি খুব সুন্দর ও সমৃদ্ধ।

শিয়াং জেলায় আদি উপজাতির প্যালোং বা পালো একটি শাখা। একটি পালো রমণী গৃহকর্মরতা। তার কচি ছেলেটির ঘুম পেয়েছে, কাঁদছে। ছেলেটিকে পিঠে দোলায় ঝুলিয়ে, তার বাবা গান গেয়ে ভোলাচ্ছে।

এঁকুর তাকুর এত্ তাল্।
এচ্ঞ্গো তায়ঞ্গো আবুগে রেঙুম্॥
ইয়েদি তালিয়োনা
ইয়েদি বুয়োনা।
আবো ঙ তালিজাযা ঙুঞ্যাচো ঙুঞ্রেক্যো॥
মুপুক রেপিয়াক্ নিয়াক্প্ পিনাঙ্।
মুপুক কুমুক পিয়োকা ঙুঞ্যাগোগো ঙুঞ্রেক্যো॥

বাবা বলছে—কি হয়েছে বাছা? এই তো আমি, তোমার বাবা। তোমার মাথা রয়েছে আমার মাথায়। আমি কি তোমাকে বকেছি? আমি তোমায় কতো ভাল বাসি। রাগ করোনা সোনা আমার।

প্রথম দুটি লাইনের (ইকড়ি বিকড়ি চাম্ চিকড়ির মতো) কোন অর্থ নেই। আমাদের বাংলায় ছেলে ঘুমানো ছড়ায় যেমন আছে—কে মেরেছে, কে ধরেছে কে দিয়েছে গাল, এই ঘুম পাড়ানী ছড়াটাও যেন সেই ধরনের।

(ইয়েদি তালি য়োনা—কে তোমায় বকেছে বা বিরক্ত করেছে? ইয়েদি বুয়োনা—কে তোমায় বিরক্ত করছে? আবো ঙ—আমি তোমার বাবা। তালিজাযা—আমি তোমায় বিরক্ত করছি না। ঙুমযাচো ঙুঞ্রেক্যো—দুটি মাথা পরস্পরের কাছাকাছি রয়েছে। মুপুক রেপিয়াক্—কোমল চিত্ত। নিয়াক্প্ পিনাঙ্—আমরা দুজনে পরস্পরকে ভালবাসি। কুমুক পিয়াকো—রাগ করো না)

লোহিত জেলায় মিশমী উপজাতিদের বাস। তন্তুশিল্প এদের জীবনের অঙ্গ। তাঁত বুনতে না জানলে মেয়েরা বিবাহ যোগ্যা বলে গণ্য হয় না। একটি ইদু মিশমী (মিশমীদের একটি শাখা) কুমারী তাঁত বুনতে বুনতে মনের দুঃখে গান গাইছে।—এখনও তার ভালবাসার মানুষ জোটে নি—

আ—আ—লো গাদা ভোখক হা—না—
উ—উ আমি লো গাদা ভোখক হা—না—উ—উ—
নাক—উ—তো—ও—উজি—উ—
লো—ও—আম্বো উজি উ—উ—

লোক গীতিটি কুমারীর হৃদয়াবেগকে প্রকাশ করছে। প্রায় প্রতি কথাটি সুর টেনে টেনে সে গাইছে। আজও তার কাছে কেউই এল না বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। তাঁত বোনার সময়, বোনার কাঠির (আ আ ও আমি) আওয়াজ দিকদিকে ছড়িয়ে দিয়ে জানিয়ে দিক তার হৃদয়ের ব্যথা। সে

যে অবলা মেয়ে। নাক ও লোমাহ্‌বো গাছের মতোই সে নড়তে পারে না। কেউ যদি তার কাছে না এগিয়ে আসে সে কী করবে?

(আ—আ—তাঁত বোনার কাঠি। লো—ফুলে থরা। পাদা—জন্মাগত। তোথক—বোবাখরা, জোরে আওয়াজ করে কিছু জানানো। উ—উ—হৃদয়াবেগ প্রকাশের জন্য কণ্ঠ নিঃসৃত স্বর। আছিলো—সুতো গোটাবার বাঁশের কাঠি। নাক—একপ্রকার খামীর গাছ। হানা—দেওয়া, খবর ছড়িয়ে দেওয়া)

নদী কিম্বা ঝরণার জল কাক চক্ষুর মতো স্বচ্ছ সুশীতল। কার না চান করতে মন চায়? নদী-দীঘি-জল নিয়ে শুধুই যে বাংলার লোকগীতি আছে তা নয়। তিরাপ জেলার একটি ওয়াঞ্চু যুবক ও এই রকম সুন্দর জলে অবগাহনের সঙ্গে, প্রেমসাগরে ডুব দেওয়ার মিল খুঁজে পেয়েছে। সে গাইছে—

নিশোক্তুন কানোই সঙ্ জে—এ—নূ—উ
নোক্ কাওয়ান্ তো আজোয়া জান্‌হাম্ কোয়া

ছেলেমেয়েদের মধ্যে, অনুরাগ জন্মাবার ঠিক আগে হাসি খেলে যায় ঠোঁটের কোণে। সুশীতল স্বচ্ছ জল দেখলে, স্নান করে দেহ জুড়োতে সকলেরই ইচ্ছা হয়। সেইরকম, একটি সুন্দরীর প্রথম দর্শনেই প্রেম সায়রে ডুব দিতে ইচ্ছা করে। যুবক ও যুবতী যে কেউ এই প্রেমের গানটি গেয়ে থাকে বা গাইতে পারে। মানেটি বুঝতে পারলে, মনে হয় যেন বৈষ্ণব পদাবলীর পিরীতি রসের ভাবধারাটি ওয়াঞ্চুভাষার গানে ধরা পড়ছে।

(নিশোক্তুন—সহাস্যমুখ। সঙ্—পাথর, নুড়ি। জেনু—জলাধার অর্থাৎ নদী, পুকুর, ঝরণা ইত্যাদি। কানোয়—স্বচ্ছ, পরিষ্কার। নোক্—মানুষ। কাওয়ানতো—দেহ। জান্‌হাম্—স্বচ্ছ)

দুর্গম অঞ্চলে, ওয়াঞ্চুদের নিস্তরঙ্গ গ্রাম্য জীবনে দুষ্কর্ম, কলহ, বিবাদ করার সুযোগ খুবই কম। সামাজিক নিয়ম কানুন খুবই কড়া। তথাকথিত শিক্ষারও অভাব। তবুও সৎ অসৎ ইত্যাদি মৌলিক নীতি বোধ সম্বন্ধে—এরা, শিক্ষিত মানুষের মতই অবহিত। একটি গানে বলা হচ্ছে—

আপং পোংকাই জেজা নাই জেনাই নামহ্ লোম
হোয়া তো অজিক খাপ কাক্ লোই স্ হানই হামকোয় ।

অর্থাৎ—তেল, নামহ্ ও অন্যান্য পাতা মিশিয়ে যেমন সুন্দর রান্না হয়, সেই রকম একটি সৎলোক তার অমায়িক ও ভদ্র আচরণের জন্য সকলের সঙ্গে মিশতে পারে ও সর্বদা ভাল সম্বন্ধ রাখতে পারে।

(আপং পোং কাই—যে ব্যক্তি সকলের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে। জেজানাই—সকলের সঙ্গে মিষ্ট কথা বলে। লোম—সব্জী। জেনাই নাম্‌হ্—নামহ্ পাতা মিশ্রিত তরকারী। হোয়া তো—পাহাড়। অজিক্—একপ্রকার গাছের পাতা। লোমহ্—তরকারী রান্নার জন্য একপ্রকার পাতা। হামকোয়—হাওয়া)

প্রবন্ধের কলেবর স্ফীতির আশঙ্কায় মাত্র কয়েকটি গানের উল্লেখ করা হল। অরুণাচলের মোটামুটি সব উপজাতির ভাষায় বহু লোকগীতি পাওয়া যায়। অর্থ বোধগম্য হলে মনে হয় যেন চেনা গানের কলি। গানগুলি গেয়ে শোনালে, ধ্বনি মাধুর্যে চমৎকৃত হতে হয়।

লোকগীতির মুখ্য উপজীব্য মাটি ও মানুষ এবং প্রধান চিহ্ন যৌথতা। ভারতের অন্যান্য উপজাতিদের মতোই অরুণাচলের উপজাতিদের বিদ্যুৎ ও রাজপথ বিহীন জীবন—কৃষিভিত্তিক, সরল ও অনাড়ম্বর। উৎসবের অঙ্গ উৎসাহ ও পরিশ্রমের ফাঁকে ও অবসরকালে বহুযুগ আগে রচিত এই সব লোকগীতি, এরা প্রতিপরম্পরায় একই সুরে গেয়ে চলেছে। বাংলা ও অন্যান্য ভাষার মতো হয়তো এসব ভাষার অভিযোজনতা (adaptibility) কম, হয়তো বা অত সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী নয়, তবুও এইসব লোকগীতির মাধ্যমে প্রায় বিচ্ছিন্ন এই মানবগোষ্ঠীর সঙ্গে বৃহত্তর জগতের অধিবাসীদের চিন্তাধারা ও হৃদয়াবেগের সাযুজ্য লক্ষ্য করে বিস্মিত হতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে উপমার মিল দেখে, মনে প্রশ্ন জাগে যে সংলগ্ন প্রদেশের (আসাম ও বঙ্গদেশ) অধিবাসীদের চিন্তাধারা ও সংস্কৃতির দ্বারা এরা কী কোনকালে প্রভাবান্বিত হয়েছিল। অন্যথা মানব সভ্যতার প্রাক্কালে, যখন বিভিন্ন গোষ্ঠি ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়েছিল চারিদিকে তখন সেই একই চিন্তার বীজ সকলের মনেই নিহিত ছিল এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার তারতম্যে, সেই মূল বীজ কালক্রমে, নানা গোষ্ঠীর মধ্য দিয়ে, বিভিন্ন রূপে রূপায়িত হয়েছে যদিও তার অন্তর্নিহিত সুরটি এক। যাই হোক, লোক সংস্কৃতির ইতিহাসে, অরুণাচল আজও স্বল্প আলোচিত। অরুণাচলের লোকগীতির ব্যাপক গবেষণায় বহু অমূল্য ভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়া যাবে। বাঙালী গবেষক ও রসিকরা যদি তাঁদের অনুসন্ধানের ফল নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে ইংরাজীতে না লিখে বাংলা ভাষায় লেখেন, সেক্ষেত্রে বাংলা ভাষার সমৃদ্ধি তথা বাঙালীরা যে সাতিশয় উপকৃত হবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

বনমহোৎসবের আদিপর্বে

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর

বাংলা ১৩৮৩ সালের অগ্রহায়ণের সমকালীনে 'ভোজ রাজার' প্রণীত গ্রন্থাবলির মধ্যে 'যুক্তি কল্পতরু' গ্রন্থের বক্তব্য নিয়ে নিবন্ধ ছিল। অবশ্য আজও স্থির করা যায় নি 'ভোজরাজ' বলে আমরা কাকে বুঝবো? কারণ, ভোজ এই সংজ্ঞাটি তো কোন ব্যক্তির নয়, ওটা একটা প্রখ্যাত রাজ বংশের নাম। তা যাক, সেই খ্যাতি বিশেষিত পুরুষ যিনিই হন, তার নামে প্রচলিত ভোজ গ্রন্থাবলির মধ্যে দেখা যায় 'বন বিনোদ'ও একখানি গ্রন্থ রয়েছে। তখনকার সামাজিক ইতিহাস যাঁরা পড়েন, তাঁরা বোঝেন যে, বাংলায় তখনও পাল বংশের শাসন চলছে, যে বংশের সমাপ্তি হয় আনুমানিক ১১৬১ খ্রীষ্টাব্দে এবং দক্ষিণ-পশ্চিমের ভারতে তখন ভোজবংশীয়দেরই প্রাধান্য, যে প্রাধান্য আনুমানিক ১০০৫ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়।' এমনি প্রবাহ চলার সময়েই ১০৫৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এই গ্রন্থলেখক 'ভোজরাজ' জীবিত ছিলেন।

তিনি 'বনবিনোদ' গ্রন্থে যা উল্লেখ করেছেন সেটির সংক্ষিপ্ত রূপ আজকের 'বনমহোৎসবে' পরিলক্ষিত হয়। এ গ্রন্থের বক্তব্য কিন্তু সংক্ষিপ্ত নয়, বরং বলা যায়, কোন সুদূর অতীতের ভারতীয় সংস্কৃতিতে অথর্ব বেদের অন্তর্গত 'বনায়ুর্বেদেরই' সংগ্রথিত অবদান। অর্থাৎ বনায়ুর্বেদের বিশাল বক্তব্যগুলিকে বেশ একটি সংহিতা গ্রন্থের আকারেই রূপ দিয়েছেন।

গ্রন্থের বক্তব্য জানাতে প্রথমেই বলেছেন, ধর্ম ও অর্থহীন কতকগুলি সন্তানের জনক হওয়ার চেয়ে পথের ধারে ঘন পত্র ভরা একটি গাছ লাগানই ভাল, কারণ এর তলায় বসে পথের পথিক কিছুক্ষণের জন্যও বিশ্রামসুখ লাভ করে, তখন মহোৎসবের সুখ লাভ হয়—

'বহুভির্বত কিং জাতৈঃ পুত্রৈর্ধর্মার্থ বর্জিতৈঃ।
মহোৎসব সুখং যত্র লভ্যতে পথি বৃক্ষতঃ ॥

এর পরই গ্রন্থকার বলেছেন, পথের ধারে একটি বড় দীঘি খনন করলে দশটি কূপ খনন করে দেওয়ার চেয়ে ঢের উপকার করা হয় সমাজের, আবার একটি হ্রদ দশটি দীঘির চেয়েও কল্যাণকর, সুযোগ্য পুত্র দশটি হ্রদের তুল্য, কিন্তু একটি ছায়াতরু রোপণের অর্থ দশটি যোগ্য পুত্রের তুল্য 'দশ হ্রদ সমঃ পুত্রো দশপুত্রঃ পথি দ্রুমঃ'

ভোজরাজ এর পরেই নির্বাচন করে দিয়েছেন কোন কোন বৃক্ষ পথের ধারে বসাতে হবে। এক এক বৃক্ষের রোপণের পুণ্যফল অপর অপর বৃক্ষের পুণ্যফলের অযোগ্য বলে সঞ্চিত হয়—অশ্বত্থ বৃক্ষ রোপণের ফল মৃত্যুর পর আর তার পুনরাবৃত্তি হয় না। এমনিভাবে আমলকী, বট, নিম পাকুড় আম, শিরীষ, পলাশ, উডুম্বর (ডুমুর) মহুয়া, পিয়াল, জাম, তেঁতুল, কয়েৎ বেলও লাগালে সে ব্যক্তির পুণ্যফলের ইয়ত্তা করা যায় না।

ভোজরাজ বুঝেছিলেন আমাদের সমাজে কোন ব্যক্তিকে সামাজিক কাজে লাগাতে হলে, তার কাজে যদি পুণ্যবত্তার কর্মফল ঘোষণা না করা যায় তবে এদেশে কোন ব্যক্তিই সমাজ সেবক হয় না।

এই বিংশ শতাব্দীতে বনমহোৎসবের জন্য যে অর্থ ব্যয়িত হয়, তার সদ্ব্যবহার হয় কতটুকু? কারণ ঐ সব উৎসবে যাঁরা আগমন করেন, তাঁরা কি আর ফিরে চান ঐ লাগান গাছগুলির পরবর্তী অবস্থা কি ঘটে?

ভোজরাজ বুঝেছিলেন এ ভারতের সব চেয়ে বড় সংস্কৃতি হলো প্রতিটি কাজে ধর্মের ছোঁয়া আছে এটা বোঝাতে পারলেই সে কাজে মানুষের মন আকৃষ্ট হয়। পুরাণ এবং স্মৃতি গ্রন্থগুলিতে অশ্বত্থ, বট, বিল্ব, পাকুড় প্রভৃতি কয়েকটি নির্বাচিত বৃক্ষকে পবিত্র ধর্মবাহী বলে উল্লেখিত করায়, সেগুলি আজও আমাদের সমাজে দীর্ঘজীবী হয়ে আছে।

ভোজরাজ সেই হিসাবেই পথের ছায়াতরুগুলির রোপণের ব্যাপারে পুণ্যার্জনের প্রসঙ্গ এনে তাদের সবাইকে দীর্ঘজীবী করার পথ দেখিয়েছেন। এইজন্য বনমহোৎসবের আয়োজনটি সফল করার উদ্দেশ্যেই লিখেছেন—

অশ্বত্থমেকং পিচুমর্দ মেকং
ন্যগ্রোধমেকং দশ তিন্তিড়ীকম্।
কপিত্থ বিল্বামলক ত্রয়ঞ্চ
পঞ্চাম্র বাপী নরকং ন পশ্যেৎ॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি অশ্বত্থ, নিম ও বটবৃক্ষের এক একটি করে এবং তেঁতুল দশটি, কয়েৎবেল, বেল, আমলকীর তিনটি করে এবং আমগাছ পাঁচটি করে লাগবে তাকে ইহজন্মে, পরজন্মে নরক দর্শন করতে হবে না।

তারপরে, গ্রন্থের দ্বিতীয়ভাগে আরম্ভ করেছেন, গৃহীরাও যাতে বৃক্ষ রোপণ করে গৃহেরই শুভ ফল লাভ করতে পারে তার ব্যবস্থা। তাছাড়া কোন বৃক্ষ লাগালে সাপ, এবং বিষাক্ত কীট, বিরক্তিকর শব্দকারী পাখীর আবাস হয়ে ওঠে এবং বাড়ীতে বাস করেও তখন অশান্তি আসে, যা অশুভ হয় তারও ব্যবস্থা করেছেন। এই অধ্যায়টি খুব বিজ্ঞান সম্মত, তবে নিখুঁত কিন্তু বেশ বড় অধ্যায়। কয়েকটা উদাহরণ তুলছি—

গৃহস্য পূর্বদিগ্‌ভাগে ন্যগ্রোধঃ সর্ব কামদঃ।
উদুম্বর তথা যাম্যে বারুণ্যাং পিপ্‌পলঃ শুভ
প্লক্ষশ্চোত্তরতো ধন্যঃ বিপরীতং তু বর্জয়েৎ॥

অর্থাৎ বাড়ির পূর্বদিকে বট, লাগান ভাল, গৃহীর কল্যাণ হয়। অন্য দিকে বিপরীত ফল। এটা যে বিজ্ঞানসম্মত তা পূর্বঋষির বৈজ্ঞানিকগণ স্বীকার করেন। আর দক্ষিণে ডুমুর, পশ্চিমে অশ্বত্থ এবং উত্তরে লাগাতে হবে পাকুড় গাছ।

এমনি ভাবে না লাগলে কি হতে পারে এ প্রশ্ন উঠবে, কিন্তু ভোজ তার উত্তর দিয়েছেন যে ভাবে সেটাও খুব সুন্দর যুক্তি সম্মত বলেছেন।

প্রাণিনঃ সর্ব এবৈব জীবন্তি বায়ুমাশ্রিতা।
বায়বঃ বৃক্ষমাশ্রিত্য বহন্তি সুখ দুঃখদাঃ।

অর্থাৎ সব প্রাণীই বায়ুকে আশ্রয় করেই জীবন ধারণ করে, আর সেই বায়ুও বৃক্ষাদিকে আশ্রয় করে

সুখপ্রদ দুঃখপ্রদ হয়ে প্রবাহিত হয়। আবার এক এক বৃক্ষ এক এক প্রাণীর সুখপ্রদ ও দুঃখ প্রদত্ত হয় বলেই, তারাও অনুকূল হয়ে ভূমিতে অবস্থান করে। এর মধ্যে বৃক্ষের ছায়া সম্পর্কেও বিশেষ তথ্য আছে, প্রতিটি বৃক্ষের ছায়াই সকলের অনুকূল হয় না, তাই বট বৃক্ষের ছায়া পূর্বেই ভাল অন্যদিকে নয়।

এরপর ঐ প্রসঙ্গেই তোডরমল্ল লিখেছেন কুল, কদলী, দাড়িম, ছোলঙ্গনেবু (গোড়ানেবু) পলাশ, কাঞ্চন, অর্জুন কদম্ব এবং আরও (এদের তালিকায় অন্ততঃ আরও ২০টি) নির্বাচিত কয়েকটি বৃক্ষের রোপণ বাড়ির (বাস্তুতে) কোন অংশেই লাগাতে নাই, তাতে অশুভ হয়। এ সম্বন্ধে বৃক্ষ বৈজ্ঞানিকগণ গবেষণা করলে জানতে ও জানাতে পারবেন কেন নিষেধ করেছেন।

এরপর নিজেই প্রশ্ন তুলেছেন

বৃক্ষ গুল্ম-লতাদীনাং আশ্রয় স্থান মিচ্ছতাম্।
জীবনং পোষণং মাত্তিঃ বিজ্ঞো ভূমি ভেদতঃ।

অর্থাৎ বৃক্ষ গুল্ম লতা এরা সে কথা কয়ে বলে দেয় না, যে এই মাটি এই জল এই বায়ু আমাদের পোষণ, ভূমি বাস বৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল নাই এদের রোপণ কর্তাকে জেনে নিতে হবে, কি রকমের জল বায়ু ও মাটি কোন বৃক্ষের অনুকূল ও প্রতিকূল। তাই সমগ্র ভূমি পরীক্ষার প্রয়োজন।

আজ কৃষি বিষয়ক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রবৃন্দ নিশ্চয় অনুধাবন করবেন যখন শতাব্দীর ভারতে এনিয়ে গবেষণা অবশ্যই হয়েছিল এবং তারই প্রতিবেদনের লিপিমালা পাই তোডর লিখিত বন বিনোদ গ্রন্থ। তবে বর্তমানে আরও উন্নত ধরনের পদ্ধতিতে কৃষিবিদ্যাটি আমাদের যে ভাবে আয়ত্তে আসছে, সে সম্বন্ধে অতীতের ভারতবাসী যেভাবে অগ্রসর হয়েছিলেন সেটাও অল্প নয়, হয়তো সে পদ্ধতিটিতে আধুনিকদের কাছে নূতন করে গবেষণারও তথ্য থাকতে পারে।

ভূমি নিরূপণের প্রথম পদক্ষেপ —বন বিনোদে বলা হয়েছে—

জাঙ্গলানূপ সামান্য স্তাবদিহ মেদিনী
ভেদৈঃ সা ত্রিভতে যড়্‌ভি বর্ণতো রসত স্তথা।

অর্থাৎ ভূ-প্রকার তিনটি ভেদ। এই ভেদের দ্বারাই দেশের পরিচয়। আনূপ, জাঙ্গল ও সাধারণ। তবে বর্ণভেদেও রসের ভেদে ছ'প্রকার প্রকার ভেদ হয়। তথাপি এ সব ভেদ থাকলেও ঐ তিন প্রকার দেশেই তাদের ভেদ রয়েছে। বর্ণভেদ বললে এই বোঝা যায় যে, মাটির রং কাল, ফ্যাকাশে নীল, লাল, হলদে এবং সাদা আভাই থাকবে। কাল আভার মাটিতে মিষ্টি রসের প্রাধান্য, পাণ্ডু বর্ণের (ফ্যাকাশে) মাটিতে অম্ল রসই প্রধান, নীল আভায় লবণ প্রধান, লাল মাটিতে তিক্ত রসই প্রধান, হলদে মাটি—কটু রস এবং সাদামাটি হবে কষায় রস প্রধান—

'অসিত বিপাণ্ডু-শ্যামল লোহিত-পীত-শ্বেত-রোচিষঃ ক্রমাৎ।
মধুরাম্ললবণ তিক্তক কটুক কষায়া ভুবো রসতঃ।

তথাপি একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, বিষাক্ত কীট যে মাটিতে থাকে, অথবা পাথরে ভরা, অথবা উইঢিপী, কিংবা প্রচুর বালি, কিংবা কাঁকর বেশী অথবা লাঙল চালিয়েও দেখা যাবে হঠাৎ হঠাৎ গর্তে ভরে যাচ্ছে, কিংবা অনেক খুঁড়লে তবে জল বের হয়—সে মাটি কোন বৃক্ষেরই উপযোগী নয়।

বিন-পাষাণ-বল্মীক বিল মুক্তা জলোবরাঃ।

পূর্বোক্তা পার্থবিনা ত্রুভ্যো ন হিতাবহী।

এরপর বলেছেন এর বিপরীত হলেই বৃক্ষের পক্ষে হিতকর মৃত্তিকা। বিশেষ আত্মজা—

শ্যামা সমাসন্ন জলা হরিতা তৃণশাদ্বলা।

তত্মাৎ সর্বে যথাস্থানং প্ররোহন্তি মহীরুহা।

অর্থাৎ যে মাটির রং কাল, যার অল্প নীচেই জল, এবং বীজের বা কাণ্ড বীজের অঙ্কুর থেকে ওঠা শিশু চারাটির পাতা অল্পেই হরিৎ বর্ণের হয়, সে ভূমি প্রায় সব বৃক্ষেরই উপযোগী। তাছাড়া যে ভূমি, না জাঙ্গল, না আনূপ তাকেই বলা হয়—সাধারণ ভূমি, এবং সেই ভূমিই প্রায় সর্বপ্রকার বৃক্ষের উপযুক্ত—

ন জাঙ্গলা ন চানূপা ভূমিঃ সাধারণী স্মৃতা।

তত্মাৎ সর্বেঽপি তরবঃ প্রায়শঃ সম্ভবন্তকাঃ।

এরপর বিশদ তালিকা প্রস্তুত করে দেখিয়েছেন কোন বৃক্ষ আনূপ (জলাসন্ন ভূমির নাম আনুপ) ভূমিতে ভাল হয়—কাঁঠাল, জেলো মাদার (লকুচ) বাঁশ (তৃণবৃক্ষ) জম্বীর (জামির লেবু) জাম, তিল, কদম, আমড়া, খেজুর (এরকমেকটা প্রকার ভেদ আছে) সুপারি, কলা, কেতকী, নারিকেল।

আর জাঙ্গলদেশে ভাল হয় এই গাছগুলি সজিনা, বেল, সপ্তপর্ণী (ছাতিম) শেফালিকা (শিউলি) শমী, অশোক, ছোট-কুল, (সংস্কৃতে কর্কন্ধু, কিন্তু বদর নয়, বদরীও নয়) লেবু, আম আমড়া।

তারপর সাধারণ মাটিতে যেগুলির বাড়বাড়ন্ত হয় সেগুলি হলো ছোলঙ্গ লেবু, নাগ কেশর, চম্পক (চাঁপা) আম, প্রিয়ঙ্গু, দাড়িম।

এরপর গ্রন্থকার বলেছেন—এই সব বৃক্ষলতার সংজ্ঞানাম পৃথক পৃথক। অর্থাৎ এক কথায় ওদের নাম পাদপ হলেও কিন্তু প্রতিটি পাদপই এক গোষ্ঠির নয়। কেউ দ্রুম, কেউ লতা আর কেউবা গুল্মশ্রেণীর। আরও পরিষ্কার করে বুঝিয়েছেন, আগে ফুল তার পরে ফল, সেই ফলের বীজে যাদের জন্ম তারা দ্রুম। তবে সেই দ্রুমেরই আর একটি প্রকার ভেদ আছে সেটা হলো ফুল না হয়েও ফল হলে, সেটাকে এক কথায় দ্রুম বলা যাবে কিন্তু আগে ফুল পরে ফল এমন দ্রুমের সঙ্গে পার্থক্য বোঝাতে একটি নাম বনস্পতি অপরটির নাম বানস্পত্য।

যারা মাটিতে পড়ে লুটিয়ে থাকে তারা লতা, আর যারা মাটি থেকে মাথা তুলেও বেশী বাড়ে না, কিন্তু শাখা প্রশাখায় ভরে যায় তাদের গুল্ম। এই চার প্রকার পাদপগুলির নামও ওরা নিবদ্ধ করেছেন, সবই আমাদের জানা নাম।

দশম শতাব্দীতে কৃষি বিভাকে হাতে কলমে শিক্ষা দেবার জন্ত বীজ, কাণ্ড ও কাণ্ডকে কি ভাবে রক্ষা করতে হয় এবং কি অবস্থায় রাখলে তাদের কাছে অঙ্কুরের আশা করা যায় এবং তার প্রস্তুত করারই বা কি রীতি, প্রতিটি কাজের জন্ত তোক এক একটি শ্লোকের মাধ্যমে তারও একটা ছক করে দিয়েছেন।

যদি জলদি ফসল আশা করা যায়, তবে এই রীতি অবশ্যই অবলম্বন করতে হবে, তাছাড়া জলদি ফসলও যেমন কাম্য তেমনি বীজ থেকে অঙ্কুরও যাতে তাড়াতাড়ি বের হয় সেটাও কাম্য

হলে—তার রীতি এই রকম—

আবর্ত্ত্য পক্বং ফলতো বিশুষ্কং
বিমুচ্য বীজং পয়সা নিষিচ্য।
বিশোধিতং পঞ্চদিনানি সর্পিষা
বিড়ঙ্গ মিশ্রেণ চ ধূপয়েৎ ততঃ।

অর্থাৎ ভাল পাকা বীজগুলি সংগ্রহ করে কোন পাত্রে রেখে পাঁচদিন ধরে অল্প অল্প মাত্রায় দুধ ও ঘিয়ে সিক্ত রেখে, আর কতকগুলি বিড়ঙ্গে আগুন ধরিয়ে তার ধোঁয়াটা ঐ বীজে লাগাবে। এটা পাঁচদিন।

দ্বিতীয় প্রকার—ঐ বীজগুলি দুধে ডুবিয়ে ছেঁকে তুলে নিয়ে কিছু তিল আর কিছু ঘি একসঙ্গে বেটে ঐ বীজে ছড়িয়ে ছড়িয়ে দেবে। শুকিয়ে গেলে সেই বীজ ছড়ালে অঙ্কুর উঠবে দ্রুত, ফলনও হবে তাড়াতাড়ি।

তৃতীয় প্রকার—শুকনো বীজগুলিতে গোবর মাখিয়ে শুকিয়ে নেবার সময় যে কোন প্রকার চর্বির ধোঁয়া (চর্বি পোড়ানোর ধোঁয়া) তাতে লাগালেও চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই তা থেকে অঙ্কুর উৎপন্ন হবে। সেই বীজ লাগালে ভাল ফলও হবে।

এমনি ভাবে আরও দশ প্রকার বীজ শোধনের পদ্ধতির উল্লেখ দেখা যায়। আজকের দিনেও বীজ শোধন করে রোপণ করার পদ্ধতি অবলম্বনের উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। তবে কেমিকেল রসায়নগুলি প্রাচীনকালের নয়।

এরপর গ্রন্থে দেখান হয়েছে কোন পাদপ লাগাতে হলে তার আল বাঁধা কেমন হবে জল সেচন করে করতে হবে, কতটা জমি ছেড়ে ছেড়ে লাগাতে হবে, কোন পাদপকে কোন ঋতুতে, কোন মাসে লাগাতে হবে, কখন সে ফসল তুলতে হবে ইত্যাদি।— তবে প্রশস্ত কালের আরম্ভ হলো আষাঢ় ও শ্রাবণ মাস। আর একটি মত হলো—গ্রীষ্ম ছাড়া সব মাসেই লাগান চলে, যদি বীজ শোধন করা থাকে—

আষাঢ়ে শ্রাবণে মাসি বীজা বাপন-রোপণে।
গ্রীষ্মবর্জ্জং বর্ষীনাং কেচিদিচ্ছন্তি রোপণম্।

এই প্রসঙ্গে একটি বিশেষ কথা বলেছে, কোন পাদপ লাগানর পর কি ধরণের আগাছা তুলে ফেলতে হয় তাও জেনে নিতে হবে। তবে একটা কথা—পাদপের একান্ত নিকটবর্তী কোন আগাছাই রাখতে নাই।

সমীপজাতং যত্নেন তৃণগুল্ম লতাদিকম্।
ক্ষোটনীয়ং বিধিজ্ঞেন পাদপানাং স্বরক্ষণে।

এরপর শুরু করেছেন বৃক্ষ, লতা, গুল্মগুলি যে লাগান হলো—তাদের রক্ষণ-অবেক্ষণ না করলে তারা তো অচিরেই নির্মূল হয়ে যাবে। এটাতো আজ দেখাই যাচ্ছে, বহু আড়ম্বর বহু অর্থ ব্যয় করে হোমরা চোমরা অতিথি আনিয়ে বনমহোৎসবের অধিবাস করে দিকে দিকে গাছ লাগানোর বাচন ভাষণ প্রচার করা হয় সত্য কিন্তু যেগুলি হয়তো বা পোঁতা হয়, তারপর তাদের কি গতি হোলো সে খবরদারী আর থাকে না।

তাঁরাও দেখিয়েছেন অনেক কারণে ওরা বিনষ্ট হয়—প্রথম এবং ভীষণ কারণ হলো বৃক্ষলতাদির যেন অজীর্ণ রোগ না হয়, অর্থাৎ মাটিতে জল থাকতে থাকতে আর জল ঢালতে নাই,—পূর্বদত্ত জল শেষ হলেই, তারপর আবার জল সেচন করতে হয়। এর ব্যতিক্রম হলেই গাছ-গাছালির অজীর্ণ রোগ হয়—

মূলালয় স্থিতং তোয়ং শোষং ন ভজতে যদা।
অজীর্ণং তদ্বিজানীৎ ন দেয়ং তাদৃশং জলম্।

এইসব গাছ-গাছালির শত্রু কারা ?—কুয়াশা, জল যেখান ঝোড়ো হাওয়া, ধোঁয়া, আগুনের আঁচ, মাকড়সা, মশা, ফড়িং এবং কয়েকধরণের কীটই এদের প্রধান শত্রু। এরা পাতা ফুল ফলের বাইরে ভিতরে ক্ষতি করে।

নীহারাৎ চণ্ডবাতাচ্চ ধূমাদ্ বৈশ্বানরাদপি।
জাল কারাৎ তথা কীটাৎ পতঙ্গাৎ মশকাদপি।
পংক্তি মধ্যে, পত্রমধ্যে তথাবাহ্যে পুষ্পবাহ্যে ফলোপরে।
তৈলক্তা রোগাৎ তথা দেহাৎ রক্ষনীয়া প্রযত্নত।

প্রয়োজন হলে ভেষজের সেচনেও এদিকে রক্ষা করতে হবে।

পরিষ্কার বোঝা যায় কৃষি বিদ্যা এবং বনমহোৎসবের সুখ কি ভাবে লাভ করা যায় তা দশম শতাব্দীতে ছিলই, তারও বহু আগেই এই ভারতে তার গোড়া পত্তন হয়েছিল।

এরপর আর একটি বিষয়ের অবতারণা করেছেন সেটি হলো গাছ-গাছালি কে রক্ষা করতে যেমন তাদের শত্রুদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা করতে হবে, তেমনি তাদিকে সতেজ করে রাখতে জলেরও ব্যবস্থা করতে হবে। সেই জলের ব্যবস্থাটা প্রথমে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে যদি জানা যায় তবে তো সবচেয়ে ভালো। অর্থাৎ নদী, পুকুর, দীঘি, কুয়ো থেকে জল তুলে আনা তো যাবেই, কিন্তু রাজ্যের বহু বিস্তৃত সীমানায় সেটা তো সব আমাদের ব্যাপার নয়, কিন্তু তেমন ভাবে জল সেচন করা ছাড়া যদি প্রকৃতির কোন নিশানা (সিগন্যাল) দেখে ভূমির অভ্যন্তরে জল আছে কত দূরে জানা যায়, তবে সেটা জানলেই তো আরও ভাল হয়।

প্রকৃতির জল নিশানার বিজ্ঞান দেখে জলের সন্ধান পাতে অনেকটা দক্ষতা লাভ করেছিলেন 'পানি-মহারাজ'। তিনি আজ লোকান্তরিত। কিন্তু তিনি যে পদ্ধতিতে ভারতীয় ভূমির অন্তরে জলের অস্তিত্ব জানতে পারতেন, আজকের প্রকৃত বিজ্ঞান কিন্তু প্রায় বহুক্ষেত্রেই সাফল্য লাভের যে বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে, সেটা খুবই প্রশস্ততর। তথাপি বলা যায় সুপ্রাচীনকালে ভারতীয় প্রকৃতি বিজ্ঞানীদের সমীক্ষাও কোন দৈবলব্ধ জ্ঞান নয়, বারবার সমীহ সমীক্ষাই বলতে হয়। একটা দৃষ্টান্ত রেখে নিবন্ধ শেষ করছি, বারান্তরে তাঁদের অভিজ্ঞতার লিপিমালার উদ্ধার করা যাবে—

শুকনো জায়গায় বেতগাছ থাকলে তার পশ্চিমে তিন হাত দূরের মাটিতে দু'হাত আঠার আঙুল নিচে পশ্চিম বাহিনী জলের শিরা পাওয়া যাবে—

যদি বেতসোহম্বুরহিতে দেশে হস্তৈস্ত্রিভিঃ পশ্চাৎ।
সার্দ্ধে পুরুষে তোয়ং বহতি শিরা পশ্চিমা তত্র।

সৌর রসায়ন

হেমন্তকুমার সরকার

বোতলের গায়ে লেখা ছিল—'Drink me up' (আমায় পান কর)—এলিস বিশেষ কিছু না ভেবেই সেই বোতল থেকে তরল পদার্থটা গলায় ঢেলে দিল ; আর তারপর থেকেই ঘটতে লাগলো নানারকমের অদ্ভুত সব ঘটনা। আমাদের এই 'সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা' পৃথিবী তার চোখ মেলেই দেখতে পেল এক আলোকময় জগৎ তার অন্ধকারময় চেতনাকে আচ্ছন্ন করে দিয়ে আহ্বান জানাচ্ছে—'এস, আমার অমৃতধারায় সিক্ত হও,' বিস্মিত, চমকিত, পৃথিবী আঁজলা ভরে পান করল সূর্যের আলো। ঠিক সেই মুহূর্ত থেকেই পৃথিবীর জীবনেও ঘটতে লাগলো নানা বিস্ময়কর ঘটনা-প্রবাহ। আসুন রসায়নের সিঁড়ি বেয়ে সেই অদ্ভুত ঘটনা-প্রবাহের জগতটাকে ঘুরে আসা যাক।

এ কাহিনীর গোড়াপত্তন কয়েক কোটি বছর আগে,—ঠিক যখন সূর্যের চারপাশে ঘূর্ণায়মান গ্যাস ও ধূলিকণা জমাট বাঁধতে বাঁধতে বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহের রূপ নিচ্ছে, আমাদের সেই আদিম পৃথিবীতে তখন প্রাণের কোন চিহ্নই নেই। তার বায়ুমণ্ডলে তখন অক্সিজেন বলতে কিছুই নেই। আর অক্সিজেন ছাড়া প্রাণের অস্তিত্ব—সে তো কল্পনাই করা যায় না। আদিম পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ছিল তখন হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, জলীয় বাষ্প, অ্যামোনিয়া ও মিথেন গ্যাস। অক্সিজেন তৈরী হওয়া শুরু হয় বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগে। জলীয় বাষ্পের উপর সূর্য কিরণের অতিবেগুনী আলোকাংশের বিক্রিয়ায় জলীয় বাষ্প ভেঙে অক্সিজেন তৈরী হওয়া শুরু হয়। এ বিক্রিয়া কিন্তু বায়ুমণ্ডলের অভ্যন্তরে বেশীদূর প্রবেশ করতে পারে নি কার্বনডাই অক্সাইড প্রচুর পরিমাণে থাকায়।

জৈব রাসায়নিক ও জীববিজ্ঞানীদের ধারণা এই কার্বনডাই অক্সাইড, জলীয় বাষ্প, অ্যামোনিয়া ইত্যাদি গ্যাস থেকেই শুরু হয় প্রাণের গোড়াপত্তন। প্রথম প্রথম তৈরী হয় ফরম্যালডিহাইড, ফরমিক এসিড, হাইড্রোজেন সায়নাইড, অ্যাসেটিক এসিড ইত্যাদি অল্প জটিল অণু। তারপর এদেরই মিশ্রিত বিক্রিয়ায় তৈরী হয় সাক্সিনিক এসিড, গ্লাইসিন, অ্যালানিন, এস্পারটিক এসিড, অ্যাডেনিন ইত্যাদি জটিল অণু।

যদিও এই ঘটনাগুলো সেই 'প্রাক-জীবন' যুগেই ঘটেছিল, আমরা কিন্তু এগুলো সম্বন্ধে জেনেছি মাত্র বছর পঁচিশ-তিরিশ আগে। বেশ কয়েকজন বৈজ্ঞানিক, (এস. মিলার, এম. ক্যালভিন, ওপারিন ইত্যাদি) তাঁদের পরীক্ষাগারে অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই তথ্যগুলো সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন। বৈজ্ঞানিক মিলার তাঁর পরীক্ষাগারে মিথেন, অ্যামোনিয়া, জলীয় বাষ্প ও হাইড্রোজেনের মিশ্রণের মধ্যে দুই তড়িৎদ্বারের সাহায্যে প্রবাহিত করলেন বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ—কেবল মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য নয়, ক্রমাগত প্রায় এক সপ্তাহ ধরে। বিক্রিয়াজাত মিশ্রণের মধ্যে পাওয়া গেল হাইড্রোজেন সায়নাইড, অ্যালানিন (Alanine) এসপারটিক এসিড (Aspartic Acid), গ্লাইসিন, ফরমিক এসিড, অ্যাসেটিক এসিড ইত্যাদি। একটা বেশ উল্লেখযোগ্য ঘটনা লক্ষ্য করলেন মিলার—প্রক্রিয়াটি

যতই অগ্রসর হতে থাকলো, ততই গ্যাস মিশ্রণে অ্যামোনিয়ার মাত্রা কমতে লাগলো আর হাইড্রোজেন সায়নাইডের মাত্রা বাড়তে লাগলো। আবার যেই অ্যালনিন, গ্লাইসিন ইত্যাদি অ্যামিনো এসিড তৈরী হওয়া শুরু হল, অমনি হাইড্রোজেন সায়নাইডের মাত্রা কমতে কমতে শূন্যের দিকে এগোল। বৈজ্ঞানিক ক্যালভিনের কাজটা ছিল একটু আলাদা। তিনি অ্যামোনিয়া, মিথেন ও হাইড্রোজেনের মিশ্রণে 'ইলেকট্রন স্রোত' দিয়ে আঘাত করতে লাগলেন। তাঁর ধারণায় এই রকমই এক ইলেকট্রন স্রোত সূর্যের থেকে এসে আঘাত করা শুরু করেছিল আদিম পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ও পৃথিবী পৃষ্ঠে। এই পরীক্ষায় বিভিন্ন ধরণের আরও অনেক জটিল অণুর সন্ধান পাওয়া গেল। এই সমস্ত রাসায়নিক পরীক্ষা মোটামুটি ভাবে প্রমাণ করল যে 'প্রাক-জীবন' যুগের পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ছিল মিথেন, হাইড্রোজেন, অ্যামোনিয়া ইত্যাদি গ্যাসে ভরা, অক্সিজেন ছিল না বললেই চলে, কারণ অক্সিজেন থাকলে অ্যামিনো এসিড জারিত হয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল। এই সমস্ত বিক্রিয়া প্রকৃতির পরীক্ষাগারে শুরু করে 'রসায়নবিদ সূর্য'।

পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে মিলারের পরীক্ষায় তৈরী হয়েছে হাইড্রোজেন সায়নাইড এবং অবশেষে এই হাইড্রোজেন সায়নাইডই রূপান্তরিত হয়েছে অ্যামিনো এসিডে। এই অ্যামিনো এসিড প্রোটিন তৈরীর কাঠামো, আর প্রোটিন প্রাণ-সৃষ্টির ইট। আজ যে কোন শিক্ষিত মানুষ হাইড্রোজেন সায়নাইডের নামে আঁৎকে ওঠেন—কারণ আমাদের শরীরের মধ্যে হাইড্রোজেন সায়নাইড উপযুক্ত মাত্রায় গেলেই মৃত্যু নেমে আসে। অথচ রসায়নবিদ সূর্য তাঁর পরীক্ষাগারে তাঁর নিজস্ব আলো ও অন্যান্য কয়েকটা গ্যাসের উপস্থিতিতে এই অতিবিষাক্ত হাইড্রোজেন সায়নাইডকেই জীবজগতের অতিপ্রয়োজনীয় অ্যামিনো এসিডে রূপান্তরিত করে ফেলেছিলেন সেইপ্রাক-জীবন যুগের পৃথিবীতে।—এটা বিস্ময়কর নয় কি?

অবশ্য কত সহজে এই কথাগুলো লিখে ফেলা গেল, সমস্ত ব্যাপারটা কিন্তু তত সহজ নয়। এই অ্যামিনো এসিড এক সপ্তাহে তৈরী হয় নি, আর প্রাণ সৃষ্টি হয় নি কয়েক মাসে বা বছরে। প্রাণ সৃষ্টি হতে অন্ততঃ কয়েক হাজার বছর লেগেছিল। প্রাক-জীবন পৃথিবীর পরিবেশে প্রকৃতি তার পরীক্ষাগারে এক অমূল্য সৃষ্টিকে তৈরী করেছিল অল্প অল্প করে—অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে।

প্রাণ সৃষ্টির মূলে যে সূর্যের ভূমিকা অনস্বীকার্য সেই সূর্যের অভ্যন্তর থেকে ঘুরে এলে কেমন হয়? পাঠক, এখনই কিন্তু আবার ঘুরে মুখ ফেরাবেন না। কলকাতার গরমে চল্লিশ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উষ্ণতাতেই আপনার গলা শুকিয়ে, ঘেমে নেয়ে প্রাণ আই-ঢাই করে যাই যাই করতে থাকে, আর আমাদের সূর্যের উপরিভাগের উষ্ণতাই হল প্রায় ছ'হাজার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। যতই ভেতরে যাবেন, ততই উষ্ণতা বাড়তে থাকবে—বাড়তে বাড়তে শেষ পর্যন্ত একেবারে কেন্দ্রে প্রায় কুড়ি লক্ষ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা! সুতরাং কাজ নেই গিয়ে। তারচেয়ে বরং এখানে বসেই সূর্যের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করা যাক।

আসল কথা হল যে পৃথিবীতে বসেই মানুষ সূর্যের আহ্বান, উপাসনা ও বিশ্লেষণ করেছে। সূর্য ওঠা থেকে আরম্ভ করে সূর্য ডোবা পর্যন্ত মানুষ অত্যন্ত কুশলতা ও ধৈর্যের সঙ্গে সূর্যকে লক্ষ্য করেছে এবং তার সাহায্যে নানারকমের রহস্যের সমাধান করেছে। সূর্যের গতিবিধি ও পরিবর্তনের মধ্যে

মানুষকে সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট করেছে সূর্যগ্রহণ। সূর্যগ্রহণকালীন অনেক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা মানুষকে দিয়েছে অনেক নতুন নতুন তথ্যের সন্ধান। ১৮৬৮ সালে এমনি এক সূর্যগ্রহণের পর ফরাসী বিজ্ঞান আকাদেমীতে পরপর দুটো চিঠি এল—এর মধ্যে একটা ছিল ভারতের উপকূলবর্তী স্থান থেকে ফরাসী বৈজ্ঞানিক Janssen-এর, আর অন্যটা ছিল ইংল্যাণ্ড থেকে একজন ইংরেজ লকইয়ারের (Lockyer)। দুটো চিঠিরই মূল বক্তব্য ছিল মোটামুটি এক—তাঁরা দুজনেই সূর্যালোকের বর্ণালীর বিশ্লেষণ করে এক নতুন মৌলের সন্ধান পেয়েছেন। তার নাম 'হিলিয়াম'। এই তথ্য সৌরশক্তি ও সৌর রসায়নের বৈজ্ঞানিকদের নতুনভাবে আকৃষ্ট করল। তাঁরা নিখুঁত বর্ণালী-বিশ্লেষক নিয়ে নতুন উৎসাহে সূর্য-বিশ্লেষণে উঠে পড়ে লাগলেন।

স্বভাবতঃই যে দুটো প্রশ্ন প্রথমেই মনের মধ্যে জাগে তা হল এই যে—সূর্য এত শক্তি পেল কোথা থেকে? এবং সূর্যে হিলিয়াম এল কি করে? এ দুটো প্রশ্নের উত্তর পারমাণবিক রসায়ন দিয়েছে। বৈজ্ঞানিকদের বক্তব্য হল আমাদের এই মহাবিশ্ব হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের জগৎ। কেবলমাত্র আমাদের সূর্য নয়,—মহাবিশ্বের সমস্ত তারামণ্ডলীর প্রত্যেকটিতেই হাইড্রোজেন-১ হিলিয়াম-৪-এ রূপান্তরিত হয়ে শক্তি ও আলো জোগাচ্ছে। যদিও এযাবৎ সূর্যে মোট ৬০-টিরও বেশী মৌল খুঁজে পাওয়া গেছে, তবুও সূর্যের প্রচণ্ড শক্তির উৎসরূপে এই হাইড্রোজেন-হিলিয়াম রূপান্তর বিক্রিয়ার উপরেই বৈজ্ঞানিকেরা জোর দিচ্ছেন। এ ক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন স্বভাবতঃই জাগে—চারটে হাইড্রোজেনের পরমাণুকে একত্রিত করে হিলিয়ামে পরিণত করা কি খুব সহজ? সত্যি কথা বলতে কি এই একীভবন বা ফিউশন (Fusion) বিক্রিয়া বেশ শক্ত। বিক্রিয়াটি সাধারণতঃ কয়েকটি ধাপে হয়ে থাকে। প্রথমতঃ হাইড্রোজেনের দুটো পরমাণু যুক্ত হয়ে একটা ভারী হাইড্রোজেনের পরমাণু তৈরী করে তার সঙ্গে আরেকটা হাইড্রোজেনের পরমাণু যুক্ত হয়ে তৈরী হয় হিলিয়াম-৩ পরমাণু। হিলিয়াম-৩-এর দুটো পরমাণু বিক্রিয়া করে হিলিয়াম-৪ ও দুটো হাইড্রোজেনের পরমাণু তৈরী করে। এই হাইড্রোজেনের পরমাণু দুটো আবার নতুন করে বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে। এই সমস্ত রাসায়নিক বিক্রিয়া কিন্তু সহজে হয় না—এর জন্য চাই প্রায় দশলক্ষ ডিগ্রী কেলভিন উষ্ণতা (শূন্য ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা ২৭৩ ডিগ্রী কেলভিন উষ্ণতার সমান)। এই চক্রের উৎপাদিত শক্তিই সূর্যের শক্তির উৎস এবং এই চক্রই উৎপাদিত শক্তির সমতা রক্ষা করে।

আরও বেশী উষ্ণতায় আরও একটা বিক্রিয়া চক্র তৈরী হয়। এই চক্রের নাম হল নাইট্রোজেন-কার্বন চক্র, কারণ এই চক্রে নাইট্রোজেন ও কার্বন উভয়েই অনুঘটকের কাজ করে হাইড্রোজেনকে হিলিয়ামে রূপান্তরিত করতে সাহায্য করে। এই চক্রের একটা বৈশিষ্ট হল এই যে একটা হাইড্রোজেনের পরমাণু যদি এই চক্রে ঢোকে, তবে তার হিলিয়াম হয়ে চক্র থেকে বেরিয়ে আসতে সময় লাগে—(পাঠক, হৃদয়ঙ্গম করে নিন)—৫০ লক্ষ বছর। খুব তাড়াতাড়ি নিশ্চয়ই নয়,—কি বলেন? তা সত্ত্বেও আমরা অফুরন্ত শক্তি ও আলো পেয়েই যাচ্ছি সূর্যের থেকে। এর কারণ হল সূর্যের মধ্যে এত বেশী পরিমাণ হাইড্রোজেন আছে যে এই রকম অতি মন্থরগতিতে এই চক্রে হাইড্রোজেন হিলিয়ামে রূপান্তরিত হওয়া সত্ত্বেও, এই নাইট্রোজেন-কার্বন চক্র নিজের চরিত্রে অন্যান্য দুর্বলতা ও হ্রাসটের সঙ্গে অতিক্রম করে সূর্যের অফুরন্ত শক্তির ভাঁড়ারের সমতা রক্ষা করে আসছে।

বাস্তবিক সূর্য এক অফুরন্ত শক্তির খনি। চিন্তা করুন, প্রতি সেকেণ্ডে এই সমস্ত আভ্যন্তরিক পারমাণবিক বিক্রিয়ায় জন্য সূর্য ৪·৫ লক্ষ টন ভর হারাচ্ছে, ফলে দিচ্ছে অতিশক্তিশালী এক বিকিরণ স্রোত। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার হলো যে আমাদের পৃথিবীতে মোট যে পরিমাণ বিকিরণ স্রোত এসে পৌছায় তা মোটে দু'কোটি ভাগের সমান—এবং সূর্যের এই দু'কোটি ভাগই পৃথিবীর সমস্ত জীব-জগৎকে, গাছপালা, প্রাণী, পতঙ্গ, মানুষ, জলজ জীব ইত্যাদি সবাইকে, যোগান দিয়ে যাচ্ছে তাদের প্রয়োজনীয় যাবতীয় শক্তি।

সমস্ত জীব-জগৎ,—মানুষ থেকে আরম্ভ করে গাছপালা পর্যন্ত,—সকলের কাছে সূর্যের অবদান অসীম। আমরা মানুষেরা এবং প্রাণী-জগৎ অবশ্য সোজাসুজি ভাবে সূর্য শক্তিকে আমাদের কাজে লাগাতে পারি না। তবে আমাদের চামড়ার উপর সূর্যের আলোর প্রতিক্রিয়া কিছুক্ষণ রোদে ঘোরাঘুরি করলেই বেশ বোঝা যায়। গাছপালাদের কথা আলাদা। তারা সূর্য শক্তিকে সোজাসুজি নিজেদের কাজে লাগাতে পারে এবং আমাদের পরোক্ষভাবে গাছপালার উপরেই নির্ভর করে থাকতে হয় সূর্যশক্তিকে আমাদের শরীরের কাজে লাগানোর জন্য। অন্ধকারে গাছের পাতা পাণ্ডুর ও হলুদ হয়ে যায় ও পাতার স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা নষ্ট হয়। গাছও নেতিয়ে পড়ে।

গাছের পাতায় এক অত্যন্ত জটিল সবুজ রাসায়নিক পদার্থ আছে। তার নাম হল ক্লোরোফিল (Chlorophyl)। ক্লোরোফিলের কাজ হল গাছকে শক্তি জোগান। আসলে ক্লোরোফিল সূর্যের আলো ও জলীয় বাষ্পের উপস্থিতিতে বায়ুর কার্বনডাই অক্সাইডকে কার্বোহাইড্রেটে পরিণত করে। এই কার্বোহাইড্রেটই গাছের আহার ও শক্তি জোগায় এবং পরোক্ষভাবে প্রাণী-জগৎকেও আহার ও শক্তি জোগায়। শুধু তাই নয় বিষাক্ত কার্বনডাই অক্সাইডকে শোষিত করে পরিবর্তে অক্সিজেন ছেড়ে দিয়ে বায়ুমণ্ডলকে পরিশোধিত করে তোলে। চিন্তা করুন একটা কারখানার কথা যেখানে সোডা, পেট্রল, সোরা (পটাশিয়াম নাইট্রেট), সূর্যের আলো ইত্যাদি ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে যন্ত্রের একদিকে আর যন্ত্রের অন্যদিকের বিভিন্ন মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে রাশিরাশি রুটি, সন্দেশ, চিনি ইত্যাদি। ব্যাপারটা রূপকথা মনে হতে পারে—তবে সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে গাছের পাতার মধ্যে ও অবশেষে শরীরের মধ্যে অনেকটা এই ধরণের বিক্রিয়াই হয়।

আমাদের পৃথিবীর উপর বায়ুমণ্ডল প্রায় স্বচ্ছ এক আবরণ—ফলে পৃথিবী পৃষ্ঠের সঙ্গে সঙ্গে বায়ুমণ্ডলের সমস্ত অণুই সূর্যের এই অসীম বিকিরণ রশ্মির সান্নিধ্য লাভ করছে। ফলে বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন অণুর উপর এই বিকিরণ রশ্মির বিক্রিয়া হয়ে চলেছে এবং এই বিকিরণ রশ্মির সান্নিধ্যেই বায়ুমণ্ডলে নানা প্রকারের আলোক-রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে চলেছে।

আলোক রসায়নে বিক্রিয়ার ধরণটা কি রকম? সূর্যের আলো থেকে বিকিরিত রশ্মিগুলো তাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে বায়ুমণ্ডলের অণুগুলোর সঙ্গে ক্রমাগত হাতাহাতি করে চলেছে। এর মধ্যে কিছু কিছু আলোকরশ্মি তার শক্তি সহ অণুর মধ্যে ঢুকে পড়ে বা শোষিত হয় ও তার নিজের শক্তি অণুর ভেতরের ইলেকট্রনকে দিয়ে ইলেকট্রনটিকে বা একাধিক ইলেকট্রনকে তাদের নিজের রাস্তা থেকে আরও বেশী শক্তিসম্পন্ন রাস্তায় নিয়ে যায়। অণুর এই অবস্থাকে উত্তেজিত অবস্থা বলে। যখনই একবার কোন অণুকে এই উত্তেজিত অবস্থায় নিয়ে যাওয়া যায় তা বিকিরণ রশ্মির শোষণের দ্বারাই

হোক, বা কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ার দ্বারাই হোক, কিম্বা নিজের প্রতিবেশীর সঙ্গে সংঘর্ষের দ্বারাই হোক না কেন,—বেশ কয়েক ধরণের রাস্তা আছে এই উত্তেজিত শক্তির প্রশমনের জন্য। যেমন ধরা যাক।

অক্সিজেন অণু (উত্তেজিত)—অক্সিজেন অণু+ফোটন এই ধরণের বিক্রিয়ার ফলে উত্তেজিত অক্সিজেন অণু তার পূর্বের সর্বনিম্ন শক্তির স্তরে নেমে যায় ও একটি ফোটন বেরিয়ে আসে। এই বিক্রিয়াকে লুমিনেসেন্স (Luminescence) বলা হয়। লুমিনেসেন্সের জন্যই বায়ুমণ্ডলে হালকা আলোর রক্তিমাভা দেখা যায়। উত্তেজিত অণুটি আবার নিজেও আলোক-আয়নিত (photo ionised) হতে পারে বা তার আলোক-বিযুক্তিকরণ ঘটতে পারে। উপরিউক্ত উক্ত বিক্রিয়ার ফলে সহজেই বিক্রিয়া করতে সক্ষম উত্তেজিত অণু তৈরী হয় যারা আবার অন্য কোন রাসায়নিক বিক্রিয়া শুরু করতে সক্ষম অথবা বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক বিক্রিয়াকে দ্রুত সংঘটিত করতে সক্ষম।

সূর্য আমাদের সৌরজগতের সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহকে অনাদিকাল হতে আলো দিয়ে চলেছে। আজ আমরা সূর্যের আলো ছাড়াও বিজ্ঞানের কৌশলে আরও বিভিন্ন রকমের আলো দেখতে অভ্যস্ত,—তবে শিরশির জানিয়ে রাখি যে সব রকমের আলোর উৎপত্তিই হল সূর্যের থেকে। সূর্যের আলোর মাঝেই সব রঙ লুকিয়ে আছে। তারাই বিভিন্ন জিনিষের উপর পড়ে বিচ্ছুরিত হয়ে নানা রঙের ঝিলিক হয়ে ধরা পড়ছে আমাদের চোখে। আমার, আপনার এবং আমাদের সবাইকার চোখের মধ্যেও এক সৌর রসায়ন চলছে—একথায় হয়ত এ মুহূর্তে অবাক হবার কিছুই নেই। কারণ ইতিমধ্যেই 'এলিস' হয়ে আপনি সৌর রসায়নের মহাবিস্ময়কর জগতের অনেকটাই ঘুরে ফেলেছেন। আবার বলি, আধুনিক বিভিন্ন ধরণের আলোর কথা এখানে আমরা ধরছি না,—ধরছি সেই আদি ও অকৃত্রিম সূর্যালোককেই; যদিও একথা সত্য যে সূর্যালোক ছাড়াও অন্যান্য আলোতে আমরা দেখতে পাই। আমাদের চোখের মধ্যে রেটিনা নামে এক আলোক সুগ্রাহী পর্দা আছে—ঠিক ফটোগ্রাফিক ক্যামেরার প্লেটের মত। এই রেটিনাতে রোডপ্‌সিন নামে এক রঙীন ও অত্যন্ত আলোক সুগ্রাহী রাসায়নিক পদার্থ আছে। রোডপ্‌সিনের উপর আলো পড়লেই তা ফিকে হতে আরম্ভ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে এক রাসায়নিক বিক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। এই রাসায়নিক বিক্রিয়া বেশ কয়েকটি ধাপে সংঘটিত হয় ও রোডপ্‌সিন একটি রেটিনালের (Retinal) অণু ও একটি প্রোটিনের অণুতে রূপান্তরিত হয়। মধ্যবর্তী কোন এক ধাপে আলোক-সুগ্রাহী নার্ভ উত্তেজিত হয় ও বস্তুর ছায়া আমরা দেখতে পাই। রেটিনাল ভিটামিন-এ থেকে শরীরের মধ্যে তৈরী হয়। পরবর্তী কয়েক ধাপে উদ্ভূত প্রোটিন রেটিনালের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আবার সুগ্রাহী রঙিন রাসায়নিক পদার্থ রোডপ্‌সিন তৈরী করে।

একধরণের সামুদ্রিক শামুক পাওয়া যায় ভারত মহাসাগরে, আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে এবং ইউরোপ ও আফ্রিকায়। কানের মত দেখতে বলে একে ear-shell বা Abalone বলা হয়। এর মাংস অত্যন্ত সুস্বাদু বলে বহুজায়গাতেই একে খাদ্যরূপে ব্যবহার করা হয়—কোথাও পুরোপুরি এবং কোথাও কিছু অংশ বাদ দিয়ে। যেখানে পুরোপুরি অর্থাৎ কোন অংশ বাদ না দিয়েই এর মাংস খাওয়া হয় সেখানে এক ধরণের বিষক্রিয়া মাঝেমধ্যে দেখা গেছে। হঠাৎ সারা শরীর জ্বলতে

থাকে. চুলকানি শুরু হয়, চামড়া লাল হয়ে যায় এবং অবশেষে চামড়ায় ক্ষত তৈরী হয়। একটা অদ্ভুত জিনিষ লক্ষ্য করা গেছে এর বিক্রিয়া কেবল সূর্যালোকেই হয়, শরীরে জামাকাপড় থাকলে কেবল যে অংশে সূর্যের আলো পড়ছে সেখানেই চুলকানি শুরু হয়।

পাঠক, এটা কিন্তু আপনাকে মইয়ে চড়িয়ে দিয়ে মই কেড়ে নেওয়া নয়। সৌর রসায়নের এও এক বিচিত্র দিক্। আপনি চেষ্টা করলেও রসায়নবিদ্ সূর্যকে উপেক্ষা করতে পারবেন না। শুধু আমাদের পৃথিবী বা আমাদের সৌরজগৎ নয়—সমস্ত মহাবিশ্বের সমস্ত সূর্যেরই নিজস্ব রসায়ন আছে। আমাদের পৃথিবীর মত মহাবিশ্বের অন্য কোথাও প্রাণ আছে কিনা এ বিষয়ে আমি যেতে চাই না—কারণ ব্যাপারটায় তর্কের যথেষ্ট অবকাশ আছে এবং তা প্রমাণ সাপেক্ষ। তবে সম্প্রতি কয়েকজন বৈজ্ঞানিক বলেছেন যে মহাবিশ্বের যে সমস্ত জায়গাকে আমরা মহাশূন্য বলে ভাবতাম সেখানেও নানা ধরণের জৈব ও অজৈব অণুর সন্ধান পাওয়া গেছে। অর্থাৎ মহাকাশের কোথাও হয়ত প্রাণ আছে, বা প্রাণ গড়ে উঠছে। এসব আগামীদিনের বিজ্ঞানীদের বিষয়বস্তু। আসুন, আমরা বরং আগামীদিনের বিশ্বকে সেই শাশ্বত বাণী শুনিয়ে রাখি—

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।"

স মা লো চ না

ভারত চীন ও চীন ভারত পরিব্রাজকবৃন্দ—গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত। সাহিত্য সংসদ: কলিকাতা-৯, ১৯৭০, স্থান নির্দেশ, কালক্রম, নির্ঘণ্ট ও গ্রন্থপঞ্জী, রেখাচিত্র ও মানচিত্র সহ, মূল্য: দশ টাকা।

মানব সংস্কৃতি বা সমাজভিত্তিক সংগঠিত জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার উপায় ও পদ্ধতিনির্ভর কৃষ্টি কোন প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক যুগে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে গড়ে উঠতে পারে নি। উপরিউক্ত কারণে কৃষ্টি বিনিময়ের পদ্ধতি ও প্রকৃতি নির্ণয় করলে আমাদের পক্ষে পৃথিবীর প্রেক্ষাপটে মানবকৃষ্টির একটা সামগ্রিক ও সত্যনিষ্ঠ দৃষ্টিকোণের সৃষ্টি হতে পারে। এশিয়া ভূখণ্ডের সুবিস্তৃত ভৌগোলিক প্রসারতায় ভারতীয় উপমহাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় এবং চীনদেশ সমগ্র পূর্ব-এশিয়ায় মানবকৃষ্টির উত্থান-পতনের বৃহত্তম কেন্দ্ররূপে গণ্য। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ও মধ্য এশিয়ায় এই দুটি কৃষ্টি কেন্দ্র প্রভাবিত অঞ্চল সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে অতিগুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। কাজেই ভারতীয় উপমহাদেশ ও চীনের কৃষ্টি সংযোগের কথা ভারত ও চীন উভয় দেশের পক্ষেই মঙ্গলকর ও গভীরভাবে শিক্ষাপ্রদ। প্রধানত খৃষ্টীয় প্রথম সহস্রাব্দের মধ্যে ভারত ও চীনের মধ্যে বিপুলাকার ও বিরাট পরিধির কৃষ্টি বিনিময়ের তথ্য পাওয়া যায়। এর পরেও কয়েক শতাব্দী ধরে এই প্রচেষ্টার ধারা অব্যাহত ছিল।

প্রধানতঃ ভারতীয় উপমহাদেশ ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে পণ্ডিত পরিব্রাজকদের চীনদেশ পরিভ্রমণ ও চীনে অবস্থানের ও শিক্ষাচর্চার মাধ্যমেই এই সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল। এর সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই ব্যবসায়ী গোষ্ঠীদের যাতায়াত এই দুই দেশের সম্পর্কের মধ্যে নিবিড় বন্ধনের সৃষ্টি করেছিল। যাওয়া আসা চলেছিল উত্তরের পর্বতসঙ্কুল ও ভয়াবহ মরুভূমির মধ্যে দিয়ে একাধিক মরুদ্যানের ও ব্যবসায় কেন্দ্রের ঘাঁটি অবলম্বন করে। দক্ষিণে পথ চলে গিয়েছিল উপকূল থেকে উপকূলে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ স্পর্শ করে।

বৌদ্ধ জীবনবাদ ও মানবিক দৃষ্টি নিঃসন্দেহে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে সৃষ্টি করেছিল ভারতীয় উপমহাদেশ সম্পর্কে গভীর ও অধীর আগ্রহের। উত্তর-পূর্ব ও উত্তরে প্রচলিত মহাযান বৌদ্ধ মতের উদার দর্শন ও শিল্পকৃষ্টি প্রভৃতিও ভারত সম্পর্কে উৎসাহী করে তুলেছিল দূরদেশের মানুষকে।

চীনদেশ থেকে এরপরে শুরু হয়েছিল অভিযাত্রী আগমনের। হয়ত শতশত অভিযাত্রীর মধ্যে এখন আমরা নাম ও বিবরণ পাই অতি অল্প কয়েকজনের। এঁরা সহস্র যোজনপথ কেবল জল ও স্থল পথে অতিক্রম করেছিলেন তাই নয়। ভারতে এসে তাঁরা স্থানীয়ভাষা শিক্ষা করেছিলেন। ভারতীয় জীবনযাত্রাকে নিকট থেকে দেখে তার পরিচয় ও বিবরণ রেখে গেছেন। এমনকি একদিকে যেমন দর্শনচর্চা করেছেন ও মূলগ্রন্থাদির চৈনিক অনুবাদ করেছেন তেমনই অন্যদিকে চর্চা করেছেন ভারতীয় শিল্পকলা ও চিত্রবিদ্যার।

ভারত-চীন কৃষ্টি প্রাঙ্গণের আলোচনার আজ অত্যন্ত বেশী প্রয়োজন থাকলেও এদিকে কোন একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা বহুকাল দৃষ্ট হয় নি। সেদিক থেকে শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত মহাশয়ের ভারতীয় ও চীনদেশীয় পরিব্রাজকদের বিবরণ গ্রন্থটিকে একটি অতি উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা বলে অবশ্যই অভিনন্দন জানানো যেতে পারে। শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত মহাশয়ের আমাদের বর্তমানে আলোচ্য পুস্তকটির মূল্য আরও একটি কারণে অপরিসীম কারণ এযাবৎ ভারত-চীন কৃষ্টি বিনিময়ের কথা কয়েকটি অতি দুষ্প্রাপ্য য়ুরোপীয় ভাষার গ্রন্থে আবদ্ধ হয়ে থেকেছে এবং কিছু কিছু অভিপণ্ডিতের গুরুগম্ভীর কথাবার্তা ও অহেতুক বাক্য বিনিময়ের উপাদান হয়ে সাধারণের আয়ত্তের বহির্দেশে থেকেছে। আজ বাংলায় লিখিত এই গ্রন্থটির প্রকাশকে আমরা অকুণ্ঠ সম্বর্ধনা জানাতে পারি। বইটি পড়লে এর সুপরিচ্ছন্ন অথচ সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও সহজভাষা আমাদের আকৃষ্ট করে। একটি প্রারম্ভিক ভূমিকায় ও 'পূর্বাভাষ' নামাঙ্কিত অধ্যায়ে লেখক সমস্ত সাবলীলতায় পরিপ্রেক্ষিতকে উপস্থাপিত করেছেন। সমগ্র পুস্তকটির মূল অংশ কালানুক্রমিকভাবে ভারতীয় উপমহাদেশে আগত চৈনিক পরিব্রাজকদের বিবরণের দ্বারা সমৃদ্ধ। শেষ অধ্যায়টির ঠিক পূর্বে চীনদেশে ভারতীয় ও ভারতীয় ভাবধারার বাহক অন্যান্য পণ্ডিত পরিভ্রমণকারী ও আচার্যদের বিবরণ একত্রিত।

আমাদের দেশের পুস্তক প্রকাশনার ক্ষেত্রে সাধারণতঃ নির্ঘণ্ট ও অন্যান্য তথ্যপঞ্জী অবহেলিত হয়। আলোচ্য গ্রন্থটি এর এক উল্লেখ্য ব্যতিক্রম। এই গ্রন্থে উত্তরের ও দক্ষিণের ভারত-চীন সংযোগপথ হিউয়েনসাঙ্ ও ফাহিয়েন সম্পর্কিত মানচিত্রের মাধ্যমে প্রদর্শিত। গ্রন্থটি বাংলাভাষায় কাজেই পাঠের উপযোগিতায় প্রথমোক্তজনের ভ্রমণ পথের মানচিত্র আমাদের নিকট অতি মূল্যবান। পরিশিষ্ট দুটিতে বাঙালী নামের নাম সূচী ও পরিচায়িকাতে গ্রন্থকারের অধ্যবসায় শ্রমের পরিচয়ের চিহ্ন আছে। এই অংশে মূল চীনা নাম এবং তার ভারতীয় তথা মূলরূপ ও ভারতে ঐ স্থানটির রাজ্য ও জেলাভিত্তিক অবস্থানের পরিচয় দান করা হয়েছে।

ঐতিহাসিক কালানুক্রমকে অনুধাবন করলে আমাদের নিকট এশিয়ার কৃষ্টির কয়েকটি বিশেষ দিক চোখে না পড়ে পারে না। গুপ্তযুগের সময়ে ভারত থেকে চীনে বৌদ্ধজীবন দর্শনের প্রাথমিক সংযোগ হয়েছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে। পূর্ব-মধ্য এশিয়ার সুপরিচিত 'মীরন' কেন্দ্রটি ও সুবিখ্যাত তুনহুয়ানের সূচনা হয়েছিল এর কয়েক শতাব্দী পরেই। পরে এসেছে লুংমেন গুহাকীর্তি, তিয়েনলুঙ্শান এবং আরও অসংখ্য জানা—আমাদের নিকট অজানা গৌরাবিত কথা। প্রধানতঃ পরবর্তী 'হান' 'বড় রাজবংশ', উত্তর-ওয়েই রাজবংশ 'তাং রাজবংশ পরবর্তী রাজবংশ ও সুঙ্ রাজবংশ তারপর পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত থেকেছে। ভারত এবং চীনের সর্বশ্রেষ্ঠ কৃষ্টি অবদানের কাল এই সহস্রাধিক বৎসরের পরিধিটিকে নির্দিষ্ট করা যেতে পারে। বেশভূষায়, চিত্রকলায়, ভাস্কর্যে, স্থাপত্য ভাষা ও সাহিত্যে ভারত ও চীনদেশের কৃষ্টিমূলক বিনিময়ের কথা নিয়ে এপর্যন্ত খুব একটা সুপরিকল্পিত আলোচনা হয় নি। সাম্প্রতিককালে এই বিষয়ের অনুসন্ধিৎসুরা প্রধানতঃ জিয়েন্ত্রিল লেকেল ও তাঁর পূর্বে প্রকাশিত উইলিয়ম উইন্সেন্টর এর পুস্তকদ্বয়ের উপর নির্ভর করে এসেছেন। লিভহায়, জোক্তিভ্সন, লেফার লোপার, রাইট এঁদের লেখা চীন-ভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রে উল্লিখিত।

মাঝে মাঝে ভারত-চীন কৃষ্টি ক্ষেত্রের উৎসাহীদের কাছে কয়েকটি উল্লেখ্য অনুমান উপস্থাপিত

হয়েছে যায়। ভারহুত সাঁচী তথা প্রাচীন মথুরার পাথরে নির্মিত কিন্তু কাঠের কাজের পদ্ধতিতে গ্রথিত স্তূপ তোরণের সাদৃশ্য লিওনার্ড উলী প্রমুখের মনে সম্ভাবনার মত নির্দেশের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। স্তূপ তথা ভারতীয় স্মারক স্থাপত্য চীনা স্থাপত্যের বহিরাঙ্গ ও বিবর্তনের পরস্পর নির্ভরতার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। চীনাংশুক এবং চীনাবস্ত্র শিল্পের অন্যান্য দিকের কথা, চীনামাটির কাজ, কাঠের উপর লাক্ষার কাজ ও চিত্রাঙ্কণ প্রভৃতি কারুকর্মেও চীন-ভারত কৃষ্টিক্ষেত্রের পর্যালোচনা আজও বহু আলোচিত আলোকপাতে সক্ষম হতে পারে।

যদি ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে যাই তাহলে অভিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে, ভারতীয় নামের চীনারূপদানের ক্ষেত্রে এবং প্রাচীন চৈনিক রচনা পদ্ধতিতে ভারতীয় রচনা রূপান্তরের অন্তর্নিহিত গবেষণার মাধ্যমে ভাষাতত্ত্বের দর্শন-বিজ্ঞানের নবতর তথ্যাদি উদ্‌ঘাটিত হওয়াই স্বাভাবিক। এই বিষয়টিতে গভীরতর ও যথার্থ অর্থবহ কাজ চালাতে গেলে চীনদেশে ও ভারতে অধুনা প্রাপ্তব্য সমস্ত চীন-ভারত কৃষ্টি বিনিময়ের সঙ্গে যুক্ত পুঁথির একটি পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক তালিকা প্রণয়নের দরকার। সরকারী পর্যায়ে নিযুক্ত একটি যৌথ পরিষদ চীন পরিভ্রমণ করে চীনে স্থিত মূলভারতীয় ভাষায় অথবা মূলভারতীয় ভাষায় পুঁথির চীনারূপান্তরের সমীক্ষা করতে পারেন। এর সঙ্গে চীনের গ্রন্থাদিতে স্থিত চীনা ভারত পরিভ্রমণকারীদের বিবরণ ও জীবনী এবং চীনস্থিত ভারতীয়দের জীবন কাহিনীর উল্লেখাদিরও সুগ্রথিত সংগ্রহ গড়ে তুলতে পারলে উত্তম হয়।

একটা কথা চীন-ভারত কৃষ্টি বিনিময়ের আলোচনায় বার বার এসে পড়ে। চীন থেকে শুধুমাত্র পণ্ডিতেরাই ভারতবর্ষে আসেন নি। তাঁদের সঙ্গে এসেছিলেন অন্যান্য অপেক্ষাকৃত সাধারণ অনুচরবৃন্দ। তাঁরা হয়ত কেউ ছিলেন কারিগর, কেউবা অশ্বচালক, পরিচারক, দোভাষী, ব্যবসায়ী, শ্রমজীবী। হয়ত ভারত থেকে চীনেও এইপ্রকার অনেক সাধারণ লোক গিয়েছিলেন। আর স্বাভাবিকভাবেই এই শ্রেণীর লোকের মাধ্যমেই ভারতীয় সভ্যতার ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্য নিদর্শনের প্রভাব পড়েছিল ভারতে। সামাজিক ইতিহাসের এই বিশেষ দিক আজও অনালোচিত।

তৃতীয় কালগণনার প্রাক্কালে 'দেবপুত্র' রাজকীয় উপাধিটির সঙ্গে চীনের রাজকীয় উপাধির সাদৃশ্য দেখা যায়। মধ্যএশিয়ার চির ভ্রাম্যমাণ জাতি-উপজাতির মধ্য দিয়ে কুষাণ, শাখীয়, সাসানীয় ও তৎপরবর্তী মঙ্গোল তুর্ক মুঘলযুগেও চীনের কৃষ্টি সরাসরি অথবা অন্যদের দ্বারা বাহিত হয়ে বিশেষ করে পারস্যের ও পরোক্ষে ভারতের দরবারী চিত্রকলায় 'কার্পেটে' সাধারণ বস্ত্রসম্ভারের নক্সায়, চীনামাটির কাজের তৈজসে ও স্থাপত্য-আবরক অপূর্ব বর্ণবিন্যাসের সঙ্গ চীনামাটির ফলকে। কাগজের ক্ষেত্রেও এই দান বহু আলোচিত।

আমরা জানি চৈনিক পরিব্রাজকদের প্রাচীন ভারত বিবরণ ভারতের ইতিহাসের ক্ষেত্রে মূল্যবান। ধর্মীয় ও সামাজিক ইতিহাস, রাজনৈতিক ব্যবস্থা আচার ব্যবহার প্রভৃতি কোন কিছুই এর থেকে বাদ পড়ে নি। আলেকজান্ডার কানিংহাম থেকে শুরু করে আজও আমরা ভারতের বহুবিখ্যাত জনপদকে কেবলমাত্র চৈনিক বিবরণের সাহায্যেই নির্দিষ্ট করে জানতে সমর্থ হয়েছি। হিউয়েনসাঙ্‌ হতে মাহুয়ান পর্যন্ত পরিভ্রমণকারীদের বিবরণ ভারতের ক্ষেত্রে ও বিশেষ করে বাংলার সুপ্রাচীন কাল থেকে মধ্যযুগের ইতিহাস পর্যালোচনায় গুরুত্বপূর্ণ। মাহুয়ানের বর্ণনায় অর্থনৈতিক অবস্থার

স্থলের বর্ণনা ও স্থানীয় জনসাধারণের কথা জানতে পারা যায়।

চৈনিক পরিব্রাজকেরা সুপ্রাচীনকালে গৌড়দেশের ও বরেন্দ্রভূমির সমতটের এবং বঙ্গের এবং রাঢ় ও সুহ্মদেশের বহু অঞ্চলে একাধিকবার পরিভ্রমণ করেছিলেন। একথা আমাদের কাছে অতি কৌতূহলোদ্দীপক যে ফা-হিয়েন বলেছেন যে প্রাচীন তাম্রলিপ্তে চিত্রাঙ্কন বিদ্যা শিক্ষা করেছেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে শুধুমাত্র ধর্মক্ষেত্রের কথাই ভারত-চীন কৃষ্টির অধ্যায় শেষ হয় নি।

ভারতের নৃতত্বে তথা লোকজীবনে চীনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের কথাও একটি আলোচিত হবার মত বিষয়। সিকিম ভুটান অরুণাচল অঞ্চলে একাধিক স্থানীয় সংস্কৃতিতে ও বস্তুভিত্তিক কৃষ্টি-উপাদানে যুগপৎ স্থানীয়, উপজাতিক ভারতীয় ও চৈনিক ভাবধারার গভীর পরিমিশ্রণের একাধিক চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। একথা মনে রাখতে হবে যে চীনের সঙ্গে কৃষ্টিবিনিময় উপজাতিক স্থানান্তরনও বিস্তৃত পরিভ্রমণের মাধ্যমে দক্ষিণ পশ্চিম চীনের ইউনান ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চল উত্তরব্রহ্ম তাই ভূমি ও ভিয়েৎনাম উপদ্বীপাঞ্চল একই ক্রমপ্রবাহের সংস্কৃতির স্রোতে পরস্পরযুক্ত। নেপালের পাহাড়ী এলাকায় কাঠমণ্ডু উপত্যকা ও তরাই ও উত্তরবঙ্গের লোককলা ও কারুকৃতিতে এর চিহ্ন পর্যালোচিত হবার যোগ্য বিষয়। তিব্বতীয় জীবনে চীন-ভারত কৃষ্টির স্রোতধারা নিবিড়ভাবে মিশ্রিত হয়েছে চারু ও কারুশিল্পে, কাহিনী, কিংবদন্তী, ও সাহিত্যে লোককথায়। এতে অবশ্য সাধারণভাবে সমগ্র ভারতের সামগ্রিক ও বিশেষভাবে পূর্ব-ভারতের উপস্থিতি চোখে পড়ার মত।

বৌদ্ধ ধর্মপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে চীনে তথা পূর্ব-এশিয়ায় ভারতীয় জাতক কথা, মহাকাব্য, হিতোপদেশ পঞ্চতন্ত্র প্রচারিত হয়েছে। এর কোন কোন দর্শনীয় শিল্পায়নও চীনদেশে চোখে পড়েছে। আসলে ভারতের সমগ্র লোককাহিনীতে যে স্বচ্ছ জীবন দৃষ্টি রয়েছে তা, সৃষ্টি হয়েছে ভারতীয় জনসাধারণের সর্ববৃহৎ অংশ কৃষিজীবী মানুষের যুগযুগান্তরের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। অনুরূপভাবে চীনদেশের জনজীবনে লব্ধ অভিজ্ঞতা নিঃসৃত কোন উপাদান ভারতের লোক জীবনে আছে কিনা সেটি আমরা সঠিক জানি না। চীনের কাহিনীতে 'পশ্চিমের দেশ' এক সুন্দর আদর্শ নিয়ে অনুপ্রাণিত করেছে চৈনিক সাহিত্যের ও উপকথার একাধিক প্রদীপ্ত বুদ্ধি অনুরঞ্জিত মানুষ ও মর্কটের চরিত্রকে। পৃথিবীর পশ্চিম গোলার্ধে একদিন ভারতমুখীন আকাঙ্খার সূচনা করেছিল। অন্যদিকে চীনও এসেছিল ভারতে মানসিক অনুসন্ধিৎসার ও ব্যবহারিক কাজের প্রয়োজনে। ভারতে মিলিত হয়েছিল প্রাচীন পৃথিবীর সুবিখ্যাত 'সিল্ক-রাজপথ' সমগ্র মধ্য উত্তর এশিয়ার মাধ্যমে। কাজেই আজ ভারতের পক্ষে বাংলা প্রভৃতি ভারতীয় ভাষায় চীন সংযোগ ও চীনচর্চার প্রয়োজন য়ুরোপচর্চার মতই গুরুত্বপূর্ণ। প্রবন্ধের লেখক আমাদের ভাবিয়ে তুলেছেন যে আমাদের 'চীনাভবন' আছে, কলিকাতা প্রভৃতি শহরে উচ্চ বিদ্যার উচ্চতর ক্ষেত্রে চীনভাষায় আঁচড় কাটার মত শিক্ষাদান করা হয় ইত্যাদি। কিন্তু এসমস্ত অবশ্যই যথেষ্ট নয়। এর আগে সুপণ্ডিত প্রবোধচন্দ্র বাগচী চীনভারত সম্পর্কাদি নিয়ে বাংলায় আলোচনার সূত্রপাত করেছেন।

বহুদিন গত কাল সংস্কৃতি বিনিময় ও কৃষ্টি সম্প্রসারণ ও বিস্তার নিয়ে আলোচনা ছিল অনুপস্থিত। অন্যদিকে সবার দৃষ্টি নিয়ে—ভারতই সকল দুঃখের কেন্দ্র—এই মনোভাবকে বাড়তে দেওয়াই আজকের একাধিক লেখকের একমাত্র উপজীবিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারত তথা বাংলায় মানবকৃষ্টি অবশ্যই

আমাদের কৃষ্টিজগতের গভীরতম ক্ষেত্রে অবস্থিত। কিন্তু এই কেবলমাত্র গ্রহণ ও দানের এবং কৃষ্টিমূলক যাওয়া আসার আলোকেই প্রোজ্জ্বল। চীনের তথা পৃথিবীর অন্যান্য দেশবাসীর কৃষ্টির বেলাতেও কথাটি অমোঘভাবে সত্য।

প্রাগৈতিহাসিক যুগেও ভারতের সঙ্গে উত্তর ও পূর্ব এশিয়ার যে যোগাযোগছিল সেকথার ইঙ্গিত কাশ্মীরাঞ্চলের অতি প্রাচীন প্রস্তর নির্মিত অস্ত্রের গড়নের মাধ্যমে বুঝতে পারা যায়। কাশ্মীরের নব্য প্রস্তরীয় যুগের মাটির তলায় বাসগৃহ সম্বলিত বসতি বাসস্থলের রীতি-প্রকৃতি যেটা গুফ্‌কাল ও বুর্জাহোম প্রভৃতি ক্ষেত্রে পাওয়া গেছে তার জীবন যাত্রার পদ্ধতি উপাদান ও তৈজস এবং মৃৎপাত্র চীনদেশের প্রত্যন্তের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। উত্তর-পূর্ব ভারতের স্কন্ধ বিশিষ্ট কুঠার নব্যপ্রস্তরের যুগের একটি প্রামাণিক নিদর্শন। এই অতিপ্রয়োজনীয় হাতিয়ারটিরও কৃষ্টিমূলক সংযোগ উত্তর-পূর্ব-ভারত থেকে আরও পূর্বদিকে চলে গেছে চীনেরই দিকে। মহাপ্রস্তরীয় সমাধির কথাও খানিকটা একই রকম।

আজকের দিনের পশ্চিমবঙ্গে চীনা পরিব্রাজকদের বিবরণ মেদিনীপুর জিলার তমলুক বা প্রাচীন তাম্রলিপ্তের ক্ষেত্রে বিশেষ অর্থবহ। হিউয়েনসাঙের লেখায় আমরা এই অঞ্চলের অধিবাসীদের সাহস সম্পর্কে জানতে পারি। জানা যায় আরও যে এখান থেকে জলপথে ও স্থলপথে বাণিজ্য চলত দূর-দূরান্তে। ফা-হিয়েন এর লেখায় জানা যে তিনি এখানে সূত্র ও চিত্রবিদ্যার অনুশীলন করেছিলেন। ইৎসিঙ তাম্রলিপ্তে তা-চেঙ-তেঙ নামক চীনা পণ্ডিতের সাক্ষাৎ পান যিনি বারো বৎসর তাম্রলিপ্তে অবস্থান করেন ও এঁর কাছ থেকে ইৎসিঙ সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করেন। তাং নামক চীনা পণ্ডিত ব্রহ্ম ও সিংহল হয়ে তাম্রলিপ্তে এসে বারো বৎসরকাল সংস্কৃত শিক্ষা করে এই ভাষায় প্রশংসনীয় বুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। হুইলুনের বিবরণে সমুদ্রপথে চীনদেশ যাওয়ার জন্য তাম্রলিপ্তের উপযোগিতার কথা বলা হয়েছে। তাও লিন নামে আর একজন পণ্ডিত তাম্রলিপ্তে আগমন করে তিন বৎসরকাল সংস্কৃত শেখেন। হুই-তা নামে আর একজন জ্ঞানান্বেষী মালয় থেকে তাম্রলিপ্তে এসে অর্ধ-বৎসর সংস্কৃত শব্দ বিদ্যা শিক্ষা করেন। তাম্রলিপ্ত তথা দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গ যে প্রাচীনকালে এশিয়ার কৃষ্টিধারায় সমন্বয়ের কাজ করত সেকথা অস্বীকার উপায় নেই। এই প্রমাণিত কৃষ্টিকেন্দ্রের গুরুত্ব বিবেচনা করে একথা দুঃখ জনক যে আজও তমলুক ভারতীয় প্রত্ন-সমীক্ষা কর্তৃক বহুদিন ধরে অবহেলিত হয়ে আছে যদিও এখানে থেকে প্রাপ্ত অতি প্রাচীন প্রত্ন নিদর্শনের কোন অভাব নেই। সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের মধ্যে মাত্র দু'বার এখানে উৎখনন অত্যন্ত সীমিতভাবে পরিচালিত হয়েছে মাত্র। এই কেন্দ্রটির সঙ্গে নালন্দা বোধগয়া সমতট ও মধ্যবঙ্গ মধ্যভারত ও দক্ষিণে সিংহল অবধি যাওয়া চলেছিল। এটা সত্যই হতাশাব্যঞ্জক যে কলিকাতা তথা পূর্ব ভারতে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন চৈনিক ভাষা ও কৃষ্টির কোন পূর্ণাঙ্গ ও সজীব বিভাগ নেই। চীনা ইতিহাস ও কৃষ্টি ভারতে অবহেলিত বিষয়মাত্র। যথাযোগ্য আগ্রহের অভাবে শান্তিনিকেতনস্থিত 'চীনাভবন' সজীব ও ছাত্র-শিক্ষক সমন্বয়ে সার্থক হয়ে ওঠে নি। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস মধ্যযুগের ইতিহাসের ক্ষেত্রে চীন সম্পর্কিত আলোচনা আজও দুর্বল ও প্রায় অনুপস্থিত। গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত মহাশয়ের বইটি পড়ার পর মনে হয় যে দক্ষিণপূর্ব এশিয়া ও চীন সম্পর্কীয় বিভাগ একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত স্বদেশের

ইতিহাস ও কৃষ্টিকে আরও ভালভাবে জানবার জন্য। লেখকের নিকট আমরা আরও কৃতজ্ঞ কারণ এই পুস্তক আমাদের যথার্থরূপে ভাবিয়ে তুলেছে।

ভারত এবং চীনের সম্পর্কের মধ্যে এমন একটা ভাবাবেগের ও মানসিকতার ভাব রয়েছে যেটি সব সময়েই অনুসরণ ও আলোচনা করার যোগ্য। গ্রন্থের লেখক বহু পরিশ্রম করে বাংলায় সেই বিষয়টির দ্বার আজ খুলে দিলেন। আমরা সর্বতোভাবে গৌরাঙ্গবাবুর এই গ্রন্থের সুপ্রচার কামনা করি এবং একাধিক পরিবর্ধিত সংস্করণ আশা করি। লেখক অনুরূপভাবে মধ্য এশিয়া ও ভারত অথবা তিব্বত এবং ভারত প্রভৃতি বিষয়ে বাংলা ভাষায় এই প্রকারের আরও গ্রন্থ রচনা করুন এটাও আমাদের আন্তরিক আশা।

গৌরাঙ্গগোপাল বাবুর পুস্তকটি যদি কৃষ্টির অন্যান্য দিক নিয়ে ভারত-চীন সম্পর্কের বিবরণসহ একাধিক পুস্তক রচনার উৎসাহ সঞ্চার করে তবে আমাদের নিকট সেটি হবে একটি উল্লেখ্য ঘটনা।

সন্তোষকুমার বসু

Regd. No. W. B./C. C.-207 Registered with the Registrar of Newspaper for India under R. N. 2602/57 Re. 1·00

সমকালীন

ষড়বিংশ বর্ষ । কার্তি

যাত্রা,
নতুন দেশ,
নতুন মানুষের সান্নিধ্য
নয়তো বা ঘরে ফেরা
আনন্দময় দিন খুশীতে উজ্জ্বল হোক
যাত্রা হোক শুভ ।
পূর্ব রেলওয়ে

পূজোয় চাই
নতুন জুতো
খোকার জুতো খুকুর জুতো
বাবার জুতো মায়ের জুতো
সবার জন্যে বাটার জুতো
Bata

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

বাজার পাখী বাজার ঘুরে
ঘুরে ঘুরে তার পেট ভরে।
বড় বড় ঝিলে গাঁ গাঁ উড়ে
জীব নয়, জন্তু নয়, মানুষ গেলে।

• • •

হাত আছে তার মাথা নেই
পেট কলকল করে
বাঘ নয় ভালুক নয়
আস্ত মানুষ গেলে।

তাঁত, মাকু, তকলি, কাপড় ও জামা সংক্রান্ত এই ধরণের ধাঁধাঁ, প্রবচন প্রভৃতির সংখ্যার অন্ত নেই। আমাদের দেশে অন্ততঃ তিন হাজার বছরের ঐতিহ্য নিয়ে যে কারুশিল্প বেঁচে আছে তার খুঁটিনাটি নিয়ে এই জগতের সাহিত্য সৃষ্টি হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। সিন্ধুসভ্যতার পরে বৈদিক সাহিত্যের বিভিন্ন পর্বে আবরণ সম্পর্কিত নানা তথ্য আমরা পাই। ঋগ্বেদে বহির্বাবরণ হিসাবে অধিবস্ত্রের উল্লেখ বর্তমান। দ্রাপি এবং প্রতিধি পরিচ্ছদ হিসাবে সেখানে বর্ণিত হয়েছে। তখন পোষাকপরিচ্ছদ তৈরী হত সুতো ও পশম দিয়ে। যজুর্বেদে পেশকারী বা ছুঁচের কাজের কথা বলা হয়েছে। অথর্ববেদে দ্রাপি ছাড়া নীবি, উপবাসন, বস্ত্র, উষ্ণীষ, কম্বল এবং তিরিটের উল্লেখ করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ সাহিত্যে বোনা এবং সেলাই নিয়ে বলতে গিয়ে জানানো হয়েছে যে, তুলো, পশম এবং রেশম থেকে পোষাক প্রস্তুত করা হত। বাস, অধিবাস এবং নীবি এই তিন রকমের পোষাক তখন প্রচলিত ছিল। ছাত্রেরা কৃষ্ণাজিন বা কালো হরিণের ছাল দেহাবরণ হিসাবে ব্যবহার করত। কল্পসূত্র থেকেও কারুশিল্পী হিসাবে তাঁতীর কথা পাওয়া যায়। এই সময়ে তার্প্য ও পাণ্ডু নামে দুই শ্রেণীর বস্ত্রের কথা জানা যায়। তাছাড়া পশমে তৈরী তাম্বুর আচ্ছাদনের কথা আমরা জানতে পারি। পাহাড়ী ছাগলের লোমে তৈরী হত কুতপ। পাণিনিও তাঁতীর কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছেন। পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্যে কৌশেয় (রেশম) ঊর্ণ (পশম), উমা, ভঙ্গ, কার্পাস বস্ত্র প্রভৃতির উল্লেখ করতে ভোলেন নি। পাণিনির মতে পোষাক হচ্ছে তিন রকম: এক, অন্তরীয়—অর্থাৎ গায়ের সংগে লেগে থাকা আবরণ; দুই, প্রাবার—অর্থাৎ চাদর বা আলোয়ান; তিন, বৃহতিক—কাঁধ থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঝুলিয়ে দেওয়া বস্ত্রখণ্ড। এছাড়া রাঙ্কব নামে এক বিশিষ্ট জাতের চাদরের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। রামায়ণে বিছানা, আসন প্রভৃতি ঢাকা দেবার জন্য হরিণ, বাঘ ও সিংহের চামড়া প্রভৃতি ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। জীবিকার জন্য যে সব বৃত্তির কথা বলা হয়েছে তাতে বয়নের গুরুত্ব সহজে নজরে আসে। তখনকার দর্জিরা তুন্নবায় নামে আখ্যাত ছিল। আবরণ নিয়ে সভ্যতার যে জয়যাত্রা অন্ধকারময় যুগে শুরু হয়েছিল মধ্যযুগে এসে তা আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের নামে বহুধাবিভক্ত হয় এবং বিংশ শতকের শেষ পর্বে এসে আবার আন্তর্জাতিক রুচি সেই মধ্যযুগীয় আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে এক নিখিল বিশ্ব আবরণ রুচির দিকে ধাবমান হয়। বলা বাহুল্য, এই আন্তর্জাতিকতা দেশ বা অঞ্চলবিশেষের প্রাকৃতিক অর্থাৎ ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতাকে

স্বীকার করেই এগিয়ে চলেছে।

বস্ত্রবয়নের জন্মের সংগে যে যান্ত্রিক প্রয়াস ওতপ্রোত তা হল তাঁত। যুগে যুগে এই তাঁতের বিবিধ সংযোজন ও পরিবর্তন ঘটেছে ও ঘটছে। বলা বাহুল্য, এই পরিবর্তনের সংগে মানুষের আবরণ সম্পর্কিত অভিরুচিও জড়িয়ে ছিল এবং আছে। প্রাক্‌ ঐতিহাসিক যুগে তাঁতের জন্ম। তন্তু অর্থে তাঁত হলেও ব্যবহারিক অর্থ যা দাঁড়িয়েছে তাতে তন্তু বয়ন করা হয় যে যন্ত্রে তাই হল তাঁত। ভারতবর্ষ থেকে তাঁত অন্যত্র গেছে এ অভিমত অনেকেই পোষণ করেন। (১) ঋগ্বেদে বস্ত্রবয়নের উল্লেখ বর্তমান। (২) মনুসংহিতায় তাঁতির জীবনযাত্রার রীতিপ্রকৃতির উল্লেখ আছে। (৩) কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে সুতো কাটা এবং বস্ত্রবয়নের তত্ত্বাবধানের জন্য রাষ্ট্রকর্তৃক তাঁত-তত্ত্বাবধায়কের নিয়োগের কথা বলেছেন।

সানা, মাকু, বক্তি ও নরাজ নিয়ে তাঁতে কাপড় বোনা হয়। কাপড় বোনা হয় লম্বালম্বি, যাকে বলা হয় টানা এবং আড়াআড়ি বা পোড়েন। প্রথমেই সানার কথা বলার প্রয়োজন। সানার কাজ হল টানা সুতোর খেইগুলোকে পরস্পর নিজের নিজের জায়গায় রেখে টানাকে নির্দিষ্ট প্রস্থ অনুযায়ী ছড়িয়ে রাখা। সানার সাহায্যে কাপড় বোনবার সময় প্রত্যেকটা পোড়েনকে আঘাত দিয়ে পর পর বসানো হয়। এরপর হল মাকু। যে কাঠের বা লোহার কাঠামোর মধ্যে নলি ভর্তি পোড়েনের সুতো পরানো হয় তাকে মাকু বলে। মাকুর কাজ হল টানার সুতোর ভিতর দিয়ে পোড়েনের সুতো চালানো। তিন হল বক্তি। একটা ভারি মোটা চওড়া কাঠে নালি কেটে সানা বসানো হয় আর তার পাশ দিয়ে কাঠের ওপর দিয়ে মাকু যাতায়াত করে। সানাকে ঠিক জায়গায় রাখার জন্য ওর ওপরে চাপা দেবার যে নালি কাটা কাঠ বসানো হয় তাকে মুঠ-কাঠ বলে। সানা ধরে এই দু'টো কাঠ একটা কাঠামোতে আটকে ঝুলিয়ে রাখা হয়। এই সমস্ত ব্যবস্থা তাঁতের যে অংশ দিয়ে সম্পন্ন হয় তাকে বলা হয় বক্তি। চতুর্থতঃ হল নরাজ। সানার গাঁথা নকশার মত প্রস্থ অনুযায়ী টানাকে একটা গোল-কাঠের ওপর জড়িয়ে রাখা হয় তাকে বলে টানার নরাজ। তাঁতি যেখানে বসে তাঁত বোনে সেখানে তার কোলে একটা নরাজ থাকে যাকে কোল-নরাজ বলে। টানার নরাজের কাজ হল টানার সুতোকে টেনে ধরে রাখা আর কোল-নরাজের কাজ হল বুনোনির পরে কাপড় জড়িয়ে রাখা।

বোনবার জন্য তাঁতে সুতো জোড়বার আগে টানা হাটা, সানা গাঁথা এবং টানা নরাজে পেঁচানোর কাজ করে নিতে হয়। এছাড়া যে কাজটি থাকে তা হল 'ব' গাঁথা। টানা পেঁচাবার পর ওর প্রত্যেকটা খেইকে 'ব'-এর সুতো দিয়ে গেঁথে নিতে হয়। এর ব্যাপার হল, নকশা অনুযায়ী বোনবার জন্য টানার সুতোকে পর পর ওপর নীচ রাখার ব্যবস্থা করা পোড়েনের সুতো যাতে ভেতর দিয়ে যেতে পারে। 'ব' তোলা বা গাঁথা শেষ হলে টানার নরাজ কোল-নরাজ থেকে খানিক চালু করে তাঁতের কাঠামোতে ঝুলিয়ে রাখতে হয়। এইবার শুরু হল বয়ন কাজ। বয়নক্রিয়া তিন রকমের। (১) ঝাঁপ করা; (২) মাকুমারা; (৩) দা-মারা। ঝাঁপকরা: যা করলে টানার সুতো ওপর নিচ দু-ভাগে ফাঁক করে পোড়েন ভর্তি মাকু যাবার রাস্তা তৈরী হয় তাকে বলে ঝাঁপকরা। মাকুমারা: টানার সুতোর প্রয়োজন মত ঝাঁপ করে ওর ভেতর দিয়ে পোড়েন চালাবার কাজের নাম মাকুমারা।

ঘা মারা : এক একটি পোড়েন চালানোর পর তাকে শক্ত বসানো হাতি দিয়ে ঘা দিয়ে ঠাস করে বসানোকে ঘা মারা বলে। মুঠ-কাঠ হাতে ধরে পোড়েনে ঘা মারতে হয়।

সুতো নিয়েই তাঁতের যা কিছু কাজ-কারবার। সুতোর জন্মের আগে যে বস্তু দিয়ে তাকে জড়ানো তাকে বলা হয় তন্তু। তন্তু হল দু'রকমের। প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম। প্রাকৃতিক তন্তু আবার প্রাণীজ ও উদ্ভিজ। প্রাণীজ তন্তু—রেশম, পশম ইত্যাদি। উদ্ভিজ তন্তু—বীজ থেকে (কার্পাস) ছাল থেকে (পাট, নারকেল, সুপারী) পাতা থেকে (শন)। কৃত্রিম তন্তু আবার প্রাণীজাত যেমন কেসিন বা জীন, কোষজাত যেমন রেয়ন। খনিজজাত যেমন ফাইবার গ্লাস। কৃত্রিম রসায়ন থেকে পলিমার নামের অনেকধরণের তন্তু তৈরী হয়। যেমন নাইলন, ডেক্রন, অরলন, ভিনিয়ন ইত্যাদি। গুটিপোকা থেকে যে সুতো তৈরী হয় তাকে বলে রেশম বস্ত্র। এই গুটিপোকা নাগ, বকুল, বট ও লিচু এই চার রকমের গাছে জন্মায়। নাগগাছের কৃমি পীতবর্ণ, লিচু গাছের কৃমি ধূসর বর্ণের মত। বকুলগাছের কৃমি শ্বেতবর্ণের এবং বটগাছের কৃমি মাখনের মত এই সমস্ত কৃমির মধ্যে সুবর্ণকুড্য দেশের কৃমিই শ্রেষ্ঠ। কৌটিল্য সুতোর গুণাগুণ নির্দিষ্ট না করে সংক্ষেপে বলেছেন কোন্ কোন্ দেশের কার্পাস বস্ত্র শ্রেষ্ঠ। তিনি উল্লেখ করেছেন মথুরা (সম্ভবত মদুরা) কলিঙ্গ, কাশী, বংগ, মহিষ দেশের কার্পাস বস্ত্র শ্রেষ্ঠ। গোভিল গৃহসূত্রে ব্রহ্মচর্যাবস্থায় চার রকম বস্ত্র ব্যবহারের কথা বলেছেন। (১) ক্ষৌম (২) শান (৩) কার্পাস (৪) ঔর্ণ। ব্রাহ্মণের জন্য ক্ষৌম অথবা শান, ক্ষত্রিয়ের জন্য কার্পাস এবং বৈশ্যের পক্ষে আবিক বা ঔর্ণ। ক্ষুমা বা অতসী গাছের ছাল থেকে সংগৃহীত সুতোর নাম ক্ষৌম। কোশের পট্টবস্ত্র নামে অভিহিত হয়ে থাকে অর্থাৎ পাট থেকে উৎপন্ন বস্ত্র। লোম থেকে প্রস্তুত বস্ত্রের নাম ঔর্ণ এবং তুলা থেকে প্রস্তুত কাপড়ের নাম কার্পাস। যুক্তিকল্পতরুতে গুটিপোকানুসারে পরিধান বস্ত্রকে শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে। বস্ত্রকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি ভাগ করা হয়েছে। পরিধান বস্ত্র প্রসঙ্গে সূক্ষ্ম, ঈষৎ সূক্ষ্ম, দৃঢ় ও স্থূল এই চার রকমের কথা বলা হয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে যে, বস্ত্র শিল্পের প্রচলন ঘটেছে অন্তত নবাশ্মীয় পর্ব থেকে চার হাজার বছর আগে মিশর এবং চীনে বস্ত্রবয়ন বেশ উন্নত পর্যায়ে ছিল। তখনকার দিনে ব্যবহৃত বস্ত্রের বয়ন-নৈপুণ্য আজও বিস্ময়কর। চীনদেশে হান্ রাজত্বকালে ২০০ সুতোর খাত সূক্ষ্ম কাপড় পাওয়া গেছে। হনান প্রদেশে চাংশা থেকে সিল্কের উপর বিভিন্ন রংয়ের কাজ করা কাপড় উদ্ধার করা হয়েছে। সিল্কগুলির বিভিন্ন জাতের কাপড়ের ওপর বহুরংয়ের জীবজন্তু ও লতাপাতার নক্সা চিত্রিত হয়েছে। পশ্চিমাংশে ও হান্‌রাজত্বকালে কাপড়ের ওপর বিভিন্ন চিত্র ও নক্সা করা হত এবং মৃতব্যক্তিকে তা পরিয়ে দেওয়া হত। এছাড়া সিল্কের ওপর বিভিন্ন রঙের তৈরী দেবদেবীর নমুনাও পাওয়া গেছে। সিল্কের কাপড়, মেয়েদের এবং ছেলেদের তৈরী পোষাকের ওপর সোনা ও রূপোর কলকা কাজের নমুনা সংগৃহীত হয়েছে। পলিক্রোম ও হালকা সিল্কের ওপর এমব্রয়ডারীর কাজ তখনকার দিনে চালু ছিল। চীন, মিশর এবং ভারতবর্ষে সেই সময় থেকেই উজ্জ্বলের কাপড় চালু হয় এবং তার বিদেশের বাজারে বেশ কদর হয়। খৃঃ পূঃ প্রথম শতকে হনান প্রদেশের চাংশা এলাকায় সিল্ক-এর দেশ ও বিদেশে বিশেষ খ্যাতি ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে যে সমস্ত পোষাক পাওয়া গেছে তার মধ্যে সিল্কের পোষাকই বেশী সংগৃহীত হয়েছে এবং সেই সব পোষাকের রং ও

ছিল। 'নয়াহ' কাপড় পুরুষদের পরিধেয় ছিল। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গাত্র পরিধান কাপড়ের পরিবর্তন ঘটেছে। শীতপ্রধান অঞ্চলে গরম কাপড়ের ব্যবহার নজরে আসে। শরৎকালে পাতলা কাপড়, গ্রীষ্মকালে অতি মিহি কাপড়ের ব্যবহার হয়ে থাকে। বর্ষাকালে ব্যবহৃত কাপড়ের নাম বার্ষিক ও হেমন্তকালে হৈমন কাপড়ের রেওয়াজ ছিল। কিন্তু সিল্ক এবং তসর সবার বস্ত্রেই ব্যবহার করা হত। বর্তমানে তসর শুচিতা ও পবিত্রতার লক্ষণ বলে সমাজে সমাদর পেয়েছে বেশী। অতীতে সূতিকাপড় থাকতে তসর পরিধান করত না। তসর ব্যবহার শাস্ত্রবিরুদ্ধ ছিল এবং তসর পরিধান করে কোন শুভ কাজ করা যেত না। ব্রাহ্মণের জন্য ক্ষৌমবস্ত্র অথবা পট্টবস্ত্রের ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। যোগীরা ধৌত সূতিকাপড়ের অভাবে শান, ক্ষৌম অথবা আবিক কাপড় ব্যবহার করতেন। পরবর্তীযুগে বাংলাদেশে তসর ব্যাপকভাবে সমাদর লাভ করেছিল। তখন তসর পরিধান জাঁকজমকের চিহ্নস্বরূপ বলে সাহিত্যেও বর্ণিত হয়েছে :

চন্দনে চর্চিত অঙ্গ   হেন দেখি যেন তার
তসর বসন পরিধান।

এক সময়ে শিল্পজাত দ্রব্য সারা পৃথিবীতে প্রসার লাভ করেছিল এবং সমাদৃত হয়েছিল। বিভিন্ন দেশের সিল্ক ভারতে এসেছে এবং ভারত থেকে উৎকৃষ্ট সিল্ক বিদেশে রপ্তানী হত। রাজস্বের বিরাট একটা অংশ এই পথে রাজকোষে জমা পড়ত। বিদেশী দূতদের, ব্যবসায়ীদের ও প্রিয় অতিথিকে ভারতীয় মসলিন দিয়ে তৎকালে সম্মানিত করা হত। বাংলাদেশে শাড়িশিল্পের সূক্ষ্ম কাজ জামদানি শাড়ি ও রঙীন শাড়িতে দেখা যায়। জামদানি শাড়ির নক্সা সূঁচ ও মাকুর সাহায্যে ফুটিয়ে তোলা হয়। অতীতে কোন এক পর্বে ভারতীয় মসলিনের নাম ছিল গোনাথি এবং মোটাজাতীয় মসলিনের নাম ছিল পুলাইন্। মোগল সম্রাটদের সময়ে মসলিন সূক্ষ্মতার চরম শিখরে উঠেছিল। বাদশাহ ঔরংজীব অন্দরমহলে এসেছেন। তিনি দেখা করতে চান কন্যা জেবউন্নিসার সঙ্গে। ধীরে পা ফেলে এসে তিনি জেবউন্নিসার ঘরে ঢুকতে গেলেন। কিন্তু পর্দা সরিয়ে একটু দ্রুত যেন তিনি বাইরে ফিরে এলেন। তাঁর ভারি কণ্ঠস্বর শোনা গেল। আমি কথা বলতে এসেছি জেবউন, তুমি গায়ে জামা-কাপড় দাও। অপ্রস্তুত কন্যা বললেন, আমি তো বুঝতেই পারছি না বাপ্জান। আপনি এসেই বেরিয়ে গেলেন তারপর…আমার অপরাধ নেবেন না। অঙ্গে সাত সাতখানা মসলিন জড়িয়েছি আমি।

ডঃ ওয়াটসের দেওয়া তালিকা অনুসারে জেবউন্নিসার গায়ে ছিল মলমল খাসের সরকার আলি। আবরোয়া, তঞ্জেব, শবনম-শবনম, খাসা, ঝুনা, গঙ্গাজল, এবং তেরিন্দাম মলমল খাসের দলে পড়ে। এর মোটার ওপর আছে বাওয়াক্তা বা হামাম, ডিমতি, শণ, জঙ্গলখাসা, এবং গলাবন্দ। ডোরিয়া বা চাইপের মধ্যে রাজকোট, চাকান, পাদশাহীদার, বুটিদার, কাগজী এবং লোলাপাটের নাম বলা যেতে পারে। খোপকাটা, বা চারখানের দলে নন্দনশাহী, আনার দানা, কবুতরখোপি, পাকুট্টা, বাঘাদার এবং কন্টিদার রয়েছে। মলমলকে রং করে তার ওপর সূতার কাজ কাশিদা নামে চলে আসছে। এ দলে চিকন, কটাওবুনি, নৌবাতি, ইয়বি, আজিজুল্লা এবং ময়ূর নহর আছে। নারানচুপ, শাহ, বর্ণাবুটি, টোবন, জেল, জেডা এবং তুরদীয়াল সেই বিখ্যাত জামদানির দলে পড়ে।

ঢাকাইয়ের নায়িকারা, যা বুকে ধরে গেয়ে উঠেছিল, 'আর আমার এ জামদানি এদেশে নাই ইহামীং।' শাড়ির গানে, 'কেঁদে বলে এক নারী, দিদিলো দুঃখ সইতে নারি, আমি কাল কিনেছি কালোফিতারী ষোল টাকা দরে। কেউ বলে মোর, ঝলমল সুতো অতি সুকোমল, পরলে করে ঝলমল অঙ্গখানি হয়লো। কেউ বলে, মোর বুটিতোলা, সুতো তার টাকা তোলা, রেখেছিলেম করে তোলা আটপহরে ময়লো। কেউ বলে, মোর গোটা পাড় হায় হায় হায় তার কি বাহার, দেখতে অতি চমৎকার পাছলা নমুনার গো।'

অতীতের মানুষ স্ব স্ব রুচি অনুযায়ী নানা বর্ণের কাপড় ব্যবহার করতেন। অর্জুন বিরাট পুত্রকে আদেশ দিলেন 'হে নর প্রবীর! তুমি আচার্য ও শারদ্বতের শুক্লবর্ণ, কর্ণের পীতবর্ণ অশ্বত্থামা ও রাজার নীলবর্ণ বস্ত্র গ্রহণ কর।' কিন্তু আর্যশাস্ত্রে কিছু রংয়ের ব্যবহারের ব্যাপারে বাধা নিষেধ রয়ে গেছে। সধবারা রঙীন কাপড় ব্যবহার করবে। বিধবার পক্ষে রঙীন কাপড় ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল এবং আজো আছে। কুমারীগণ সাদা বস্ত্র পরিধান-যোগ্যা ছিল না। এছাড়া নীলবস্ত্র পরিধান করে স্নান, দান, তর্পণ, তপস্যা, বেদপাঠ নিষ্ফল বলে বর্ণিত। রমণীগণ উৎসবাদি সময়ে ব্যবহার করতে পারতেন। পুরাণে নীলবর্ণের ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল এমন প্রমাণ আছে। তখনকার দিনে কাপড়ের রং তৈরী হত বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদান থেকে। গাছের রস, পাতার রস, বিভিন্ন ফুল, মঞ্জিষ্ঠা ও গাছের আঠা প্রভৃতিদ্বারা রং তৈরী হত।

"কাঁথা বা আলপনার সগোত্র না হলেও নক্সার পারিপাট্যে এবং বোনার কৌশলে বাংলার তাঁতের শাড়ী আজও যে তার জনপ্রিয়তা বজায় রাখতে পেরেছে দীর্ঘদিনের পরিশীলিত অভিজ্ঞতাই রয়েছে তার মূলে। কার্পাস বস্ত্রের জন্য নদীবিধৌত বাংলার আর্দ্র বাতাস নাকি বিশেষ উপযোগী, অনেকে মনে করেন বাংলাই কার্পাসের জন্মস্থান। তাঁতের টানা আর পোড়েনের ব্যবহার যে ভারতে বহু প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত ছিল ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্র থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কার্পাস বস্ত্র কোনদিনই বাংলার মত উৎকর্ষ লাভ করে নাই। মহেঞ্জোদারোর প্রত্নতাত্ত্বিক খননে এক টুকরো কার্পাস বস্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ায় প্রমাণিত হয়েছে যে ভারতে বহু প্রাচীন কাল থেকেই কার্পাস বস্ত্রের প্রচলন হয়েছিল। এই দেশ থেকে সুদূর অতীতে মিশরে এবং খ্রীষ্ট জন্মের অব্যবহিত পরে রোমে কার্পাস বস্ত্র রপ্তানী হত। অকুণ্ঠভাবে বিদেশীরা ভারতের কার্পাস বস্ত্রের সূক্ষ্মতা এবং বয়ন কৌশলের প্রশংসা করেছেন। পরবর্তী যুগে বাংলার কার্পাস বস্ত্র মুঘল দরবারে অতিশয় আদরের সামগ্রী হয়ে উঠেছিল।' (বাংলার লোকশিল্প, কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়)

আমাদের প্রাচীন কবি মহাকবিদের সাহিত্যে ভারতীয় কাপড়ের ব্যাপক প্রসার ও প্রচলনের কথা সগৌরবে বলা হয়েছে। কালিদাস শকুন্তলার আবরণের কথা বলতে গিয়ে ক্ষৌমবস্ত্রের উল্লেখ করেছেন। ব্যাসদেবও ক্ষৌমবস্ত্র সম্বন্ধে উদাসী ছিলেন না। চণ্ডীদাস নেত্র শাড়ির বর্ণনায় বলেছেন —পটনেত্র বাসপর, গলে রত্নমালা। অথবা—

নেত পরিধান শাড়ী হাতে মোহনী বাঁশী
সে রূপ দেখাও সজনে।

থানকাপড়ে বসন পাড় ঢাকাপ্রোর নামই দেতে পারি। এই সম্পর্কে লোকবচন :

পাইয়া ইমাম বাড়ী   বুনে দেয় পাটশাড়ী।

সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র তৈরী হত প্রধানতঃ খুলনা জেলার সাতক্ষীরা, ২৪ পরগণা, বর্ধমান ও হুগলি জেলায়। অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র তৈরী হত নদীয়ার শান্তিপুরে, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামে। এছাড়া ঢাকার মসলিন খ্যাতি আজও ছড়িয়ে আছে। মুর্শিদাবাদও সিল্কের জন্য বিশেষ খ্যাত ছিল। শান্তিপুরের তানজিব মসলিন ঢাকাই মসলিনের মত সূক্ষ্ম ছিল। সুধীরকুমার মিত্র হুগলী ও চন্দননগর এলাকার মসলিনের এক সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর গ্রন্থে। চন্দননগরের যে তেত্রিশ রকম মসলিনের কথা আছে তাতে বুলবুল চশম, আবরোয়া, সাকাতী কাবেলা প্রভৃতি প্রধান। এগুলি বাংলার পশ্চিম দিককার মলমল শিল্পের অবদান। এখানকার মলমলের কথায় জানা গেল, ঘাসের উপর বিছোন ছিল একখান মলমল। একটি গরু ঘাস খেতে এসে কিছু বুঝতে না পেরে ঘাসের সংগে মলমলও উদরস্থ করে ফেলে। হুগলীর মলমল খাস শিমুল তুলো থেকে তৈরী। এখানকার সরকার আলির টানায় ১৯০০ সুতো থাকত। বর্ধমানের অগ্নিফুলী প্রসঙ্গত আলোচ্য। বর্ধমান পরিচিতিতে—
"কথিত আছে যে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে কাঞ্চননগরের বিশিষ্ট বণিক খুদ হজের শিল্পাদে ইয়োরোপের নানা স্থান হইতে বহু বণিক নিমন্ত্রিত হইয়া আসেন ও তাঁহাদের প্রত্যেককে একজোড়া অগ্নিফুলী বস্ত্র উপহার দেওয়া হয়। অগ্নিফুলী তখনকার দিনে উৎকৃষ্ট ও মহার্ঘ বস্ত্র বলিয়া বিবেচিত হইত। ইয়োরোপীয় বণিকগণ কাঞ্চননগরের এই বস্ত্র ক্রয় করিয়া স্বদেশে আমদানী করিত।"

পাগড়ীর এক খণ্ড পেয়েছেন পারস্যের শাহ। পাঠিয়েছেন তাঁর দূত মহম্মদ আলি বেগ। ডিমের মত একটি খোলে নানান্ মণিমুক্তো ভরে ৩০ গজ লম্বা কাপড়। শাহ চারদিক খুলে সবটা দেখে বললেন, অসম্ভব। এ আমি বিশ্বাস করি না। মানুষ কখনো এ জিনিষ তৈরী করতে পারে না, এ মাকড়সার জাল বা অন্য কিছু। পেরিপ্লাসের গঙ্গেটিকা নানা নাম নিয়ে শেষ পর্যন্ত মসলিনে এসে ঠেকেছিল। আরবের সলেমান পর্যটক থেকে তাভার্নিয়ের পর্যন্ত সকলের মন হরণ করেছে মসলিন। এই ঐতিহ্যপূর্ণ শিল্প সম্পর্কে রসরাজ ত্রৈলোক্যনাথ বলেছিলেন, সলোমন যখন জেরুজালেমের মাটি কাঁপাচ্ছে, রোমিউলাস যখন রোম নগরী খাড়া করতে ব্যতিব্যস্ত, হারুণ-উল-রসিদ যখন ছদ্মবেশে রাতে বোগদাদের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছেন তখন আমাদের ঘরে ঘরে সোনারকাঠি দুলছে। সাকোতা, আবি, ডুরিদার তৈরী হয়েছে যাদুহাতে যাদুস্পর্শে।

'মসলিনে নানা রকমের বুটি তুলে তৈরী করা হত রকমারি নকশার শাড়ী যাকে বলা হত জামদানী। জামদানী শাড়ীর সুতা খুব সরু, বুনট অত্যন্ত জমাট ; কিন্তু এই শাড়ীর বিশেষত্ব তার নকশায় আর বুটিতে। জামদানী নকশাগুলি মূলত রেখা ভিত্তিক, কোথাও জ্যামিতিক, কোথাও গাছ বা লতা পাতাকে সংক্ষিপ্ত আর বাহুল্যহীন করে সাজিয়ে দেওয়া হত। নকশাগুলির বনিয়াদে মূল বর্ণবিন্যাসে এবং হলদে লাল আর সবুজ এই তিনটি বর্ণের প্রাধান্যে কাঁথার নকশার সংগে এই শাড়ীর একটা নিকট ঐক্য দেখা যায়।'

যদিও আজ লোকশিল্প বলে গণ্য করা না গেলেও নকশা আর রঙের বৈচিত্র্যে মুর্শিদাবাদ বালুচরে তৈরী নামকরা বেনারসের শাড়ীর কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ না করে পারা যায় না। এই শাড়ীর

পাড়ে সাধারণ নকশা আর জমিতে নানা আকৃতির বুটি থাকে। কিন্তু এই শাড়ীর বৈশিষ্ট তার আঁচলার নকশায়। এই আঁচলার বিন্যাস চতুষ্কোণ ক্ষেত্রের মত; এই ক্ষেত্রের মাঝখানে থাকে সুন্দর গড়নের কল্‌কা; তার চারিদিকে খোপে খোপে সাজান থাকে নানা বিচিত্র নকশা। (বাংলার লোকশিল্প) মধ্যযুগের বিদেশীদের 'বেহলা' গুলিতে তৎকালীন বাঙালীর পোষাক বা আবরণ সম্পর্কে বেশ কিছু মন্তব্য নজরে পড়ে। আমরা সামান্য দুয়েকটি সূত্র এখানে উদ্ধার করছি। চীনা পর্যটক ফেই-সিন এর বিবরণীতে রয়েছে…'এদেশের পুরুষেরা সূতীর পাগড়ি মাথায় দেয় এবং সাদা রঙের লম্বা সূতীর জামা পরে। মেয়েরা খাটো জামা পরে। তার চারিদিকে সূতী, রেশম বা কিংখাব-এর ওড়না জড়ায়। এছাড়া তিনি লিখেছেন 'এদেশের স্বাভাবিক উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে সূক্ষ্ম বস্ত্র (মসলিন), সা-হুল, কম্বল, তু-লো-কিন, নানারকম কাপড়…প্রভৃতির নাম করা যায়। মধ্যযুগের আরেকজন বিদেশী পর্যটক বাঙালীদের সম্পর্কে বলেছেন, 'সাধারণ-স্তরের পুরুষরা খাটো সাদা জামা পরে, সেগুলি উরুঃ আধখানা অবধি প্রসারিত। এছাড়া এরা পায়জামা পরে এবং মাথায় তিন চার পাক দিয়ে ছোট পাগড়ী জড়ায়।' এইভাবে দেখতে গেলে প্রায় প্রত্যেক পর্যটকের বিবরণীতে আমরা সেকালের আবরণ সম্পর্কে কোন না কোন মন্তব্য খুঁজে পাই।

ভারতবর্ষে আবরণের জন্য বস্ত্রের ব্যাপক প্রসার লাভ ঘটেছিল প্রাক-মহেঞ্জোদরো যুগ থেকে। রামায়ণ মহাভারত এবং বিভিন্ন গ্রন্থে ভারতীয় পোষাকের উচ্চমানের কথা বারবার বলা হয়েছে। পুরাণে বলা হয়েছে যে তৎকালে ক্ষৌম এবং কৌশেয় বস্ত্র ভদ্র সমাজে ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল। রামায়ণ-মহাভারত সহ কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে এবং মধ্যযুগের সাহিত্যেও বিভিন্ন পোষাকের বর্ণনা রয়েছে। কৈকেয়ী, কৌশল্যা প্রভৃতি রাণী ও রাজমহিলাগণ ক্ষৌমবস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নববধূ সীতাকে মঙ্গলালাপে সম্ভাষণ করেছিল। মহাভারতে বৈদেশিক বাণিজ্যের যে চিত্র পাওয়া যায় তাতে জানা যায় চীন এবং কম্বোজ থেকে যুগচর্ম আমদানী হত। কম্বোজ রাজ যুধিষ্ঠিরকে অতি মূল্যবান বস্ত্র উপহার দিয়েছিলেন—এ তথ্য সভাপর্ব থেকে পাওয়া যায়। সিংহল থেকে পাওয়া গিয়েছিল অতি সূক্ষ্ম সূতোর তৈরী সামগ্রী। চীনা সূতোর সুখ্যাতির কথা তো প্রাচীন সাহিত্যের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। মধ্যযুগের মঙ্গলসাহিত্যে এবং অন্যত্র অসংখ্যবার আবরণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পরমধ্যযুগে তুর্কী আক্রমণের পরবর্তীকালে মধ্যপ্রাচ্যীয় আবরণ বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছে। এর পরে ইয়োরোপে ও পাশ্চাত্য দুনিয়ার অন্যান্য স্থানের পোষাক ভারতীয় আবরণ ঐতিহ্যকে মোহাবিষ্ট করেছে। শুধু ভারতবর্ষে নয় পৃথিবীর সর্বত্র ইয়োরোপীয় পোষাক আঞ্চলিক পোষাককে গ্রাস করে আন্তর্জাতিকতার রূপ দেবার চেষ্টা চলেছে।

ভারতীয় বস্ত্রও এক সময়ে সমস্ত দেশবিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল কিন্তু শিল্পযুগে পা ফেলবার সাথে সাথেই হাতের যুগ ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে পড়ল। তার মন্দা আজও চলেছে কিন্তু যখন হাতে বোনার কাপড়ের প্রসঙ্গ আসে তখন ভারতীয় কাপড়ের বাজার মন্দা এমন কথা বলা যায় না।

বাঙ্গালার গঙ্গা—জল বাণিজ্য

অশোককুমার বসু

সব তীর্থ বার বার।
গঙ্গা সাগর একবার।

পুরাণের ছড়াটিতে তীর্থপথের যদিও কিছুটা বিপদের আভাস রয়েছে, তবুও অতি প্রাচীনকাল থেকে, মাঘ মাসের মকর সংক্রান্তিতে, গঙ্গা ও সাগর সঙ্গমে স্নান করে পুণ্যার্জনের জন্য, সারা ভারত থেকে যাত্রীরা নদীপথে এই তীর্থে ছুটে গেছে পথের বিপদ কষ্টকে কেউ বাধা বলে মনে করেন নি। চর্যাপদেও গঙ্গা সাগরের উল্লেখ রয়েছে—এত্‌থু সে সুরসরি যমুনা, এত্‌থু সে গঙ্গা-সাঅরু।

আকবরের রাজত্বকালে "কপালকুণ্ডলা"র নায়ক নবকুমার সাগর-সঙ্গমে যান। এমনিই এক তীর্থযাত্রী গোবিন্দ দত্ত, গঙ্গাসাগর থেকে প্রত্যাগমনের সময়, স্বপ্নে মা কালীর আদেশ পেয়ে গঙ্গার ধারে একটি জায়গায় নেমে পড়েন এবং সেখানকার জঙ্গল পরিষ্কার করে গোবিন্দপুর গ্রামের পত্তন করেন।

যজ্ঞাশ্ব হরণের ব্যাপারে সগর রাজার ষাট হাজার পুত্র, কপিলমুনির কোপানলে ভস্মীভূত হয়। পরে সগরের নাতি ভগীরথ, যা গঙ্গাকে মর্তে নিয়ে আসেন। গঙ্গা সাগরে মিলিত হয়ে ভস্মীভূত দেহগুলি প্লাবিত করেন এবং ভগীরথ পবিত্র সলিলে তর্পণ করে বংশের পাপ মোচন করেন। কেউ কেউ বলেন ভগীরথ নাকি একজন বৈদিক বিজ্ঞানী ছিলেন। খাল কেটে, গঙ্গার প্রবাহ ঘুরিয়ে, গঙ্গা অধ্যুষিত উত্তর ভারত ও বৃহৎ ব দ্বীপ সৃষ্টি করেছিলেন।

যাই হ'ক, এতো গেল গঙ্গার প্রান্তসীমায় একটি মাত্র তীর্থস্থানের কথা। একই গঙ্গার ঘাটে ঘাটে এমনি কত শত দেব দেউল, কত সমৃদ্ধ নগর। ভাবলে বিস্ময় জাগে। মনে হয় গঙ্গা যেন ভারতের ধমনী—ইতিহাস ও ঐতিহ্য। যুগ যুগ ধরে গঙ্গার প্রবাহ ভারতকে বাঁচিয়ে রেখেছে। অথচ বয়স ও দৈর্ঘ বিচারে, পৃথিবীর অনেক নদীর চেয়ে গঙ্গা ছোট (১৫০০ মাইল দীর্ঘ)। মহেঞ্জোদরো ও হারাপ্‌পার সভ্যতা কালে, গাঙ্গেয় উপত্যকা সুপ্ত ছিল (?) কিন্তু এ আলোচনার আগে, ভারতের জন্মরহস্য নিয়ে সামান্য দু'চার কথা বলা যেতে পারে।

কার্বনিফেরাস কল্পে পৃথিবীর দক্ষিণে,—ব্রেজিল, আফ্রিকার দক্ষিণাংশ ভারতের দক্ষিণাংশ ও উপদ্বীপ এবং অস্ট্রেলিয়া নিয়ে একটি বিরাট মহাদেশ ছিল। এটিকে গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড বলা হয়। কালক্রমে গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড ভেঙে গিয়ে যে সব মহাদেশ ও ভূভাগের সৃষ্টি হয়, তার মধ্যে দক্ষিণ-ভারত একটি। কার্বনিফেরাস কল্পের শেষে বর্তমান হিমালয়ের উত্তরদেশ, চীনের অনেকাংশ, তিব্বত সমুদ্রের প্লাবনে ডুবে যায়। এই লুপ্ত সমুদ্রের নাম টেথিস। টার্শিয়ারি অধিকল্পে, টেথিস সাগরে সঞ্চিত পলল ধীরে চাপ ও তাপ পেয়ে হিমালয়ের জন্ম হয়। হিমালয় ও ভারতের দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যবর্তী ভূভাগটি তখন ছিল অগভীর উপসাগরের মত। হিমালয় ও দক্ষিণের মহানদীর নদী নিঃসৃত পললে উত্তর ভারত ও গাঙ্গেয় বদ্বীপের সৃষ্টি হয়। ভূস্তর সৃষ্টির আদিপর্বেই ছোটনাগপুরের জন্ম। গণ্ডোয়ানাযুগে

বাদীপক, ভাগিরথীর কাকদ্বীপের সৃষ্টি এবং টারশিয়ারি যুগে (অর্থাৎ কয়লাযুগের পরে) হিমালয়ের জন্ম হয়। তৃতীয় শতকী অনুযায়ী গাঙ্গেয় উপত্যকা ও গাঙ্গেয় বদ্বীপের সৃষ্টি সাম্প্রতিক। রাঢ়ভূমের অংশও এর আগে এবং সে সময়ে বঙ্গোপসাগর দেশের অনেক ভিতরে ছিল।

নিকট অতীতে, শুধু কলকাতার গঙ্গায় কেন, দামোদর, রূপনারায়ণ, বরাকর, ময়ূরাক্ষী প্রভৃতি নদনদীতে জোয়ার-ভাটা খেলতো। সমুদ্রের জল অপসরণের ফলে ও পলল সঞ্চয়ে বাঙলার দক্ষিণে অনেক ভূভাগের সৃষ্টি হয়েছে। নবদ্বীপ, চক্রদ্বীপ (চাকদা), খড়্গ দ্বীপ (খড়দা) ইত্যাদির নামকরণ এইভাবেই জন্ম। মধ্যযুগকালীন কোন মানচিত্রে, হাওড়া জলভূমি ইত্যাদি এলাকাকে বিস্তীর্ণ জলাভূমি হিসাবে দেখানো হয়েছে। বহুপূর্বে কলকাতার লবণহ্রদ প্রায় বরিশাল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কোন কোন পণ্ডিত দৃঢ় মত পোষণ করেন যে গাঙ্গেয় উপত্যকার বাসোপযোগী স্থান আধুনিক কালে সৃষ্টি হয়েছে।

মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পার সভ্যতার আগে অথবা সমকালীন অন্য কোন সভ্যতা ভারতে ছিল না, একথা আজ আর জোর দিয়ে বলা চলে না। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে, প্রত্নখননকার্যের ফলে প্রাগৈতিহাসিক ও তাম্রাশ্মীয় জীবনধারার নানা ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। বর্ধমান জেলায় অজয় নদীর তীরে, পাণ্ডুরাজার ঢিবি উৎখননে, যে সব নিদর্শন মিলেছে, পুরাতাত্ত্বিকদের মতে, অজয় উপত্যকায় তাম্রপ্রস্তর যুগ থেকে লৌহ যুগ পর্যন্ত এক চলমান সভ্যতার বিবর্তন ঘটেছিল। অজয় ও কোপাই নদীর সঙ্গমস্থলে কাটা খালের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। এখানে প্রাপ্ত বহু নিদর্শন পরীক্ষা করে পণ্ডিতরা অভিমত প্রকাশ করেন যে, এই সব জায়গা থেকে তাম্রাশ্মীয় নাবিকরা গঙ্গার পথ দিয়েই (কিংবা তখন সাগর অজয় উপত্যকার নিকটেই ছিল) বিদেশে বাণিজ্য করতে যেতো। তমলুকের নিকটবর্তী স্থান উৎখননে প্রাপ্ত মাটির পাত্রগুলি পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে প্রাপ্ত নিদর্শনের অনুরূপ। এ' ছাড়াও, বর্ধমানের বনকাটি, দামোদরের তীরে বীরভানপুর, ডায়মণ্ডহারবারের নিকটস্থ দেউলপোতা, হরিনারায়ণপুর, কলকাতার নিকটস্থ গঙ্গা ও বিদ্যাধরীর সঙ্গমস্থলে, বেড়াচাঁপা (বা চন্দ্রকেতুগড়) আদি গঙ্গার তীরে আটঘরায়, উন্নত সভ্যতার বহু নিদর্শন মিলেছে। ক্রমাগত অনুসন্ধানের ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গের এই সব অঞ্চলের সভ্যতা প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তর যুগ থেকে লৌহযুগ অতিক্রম করে চলে গেছে। পুরাকালে এসব জায়গার অধিবাসীদের সঙ্গে সুদূর মিশর, ক্রীট ইত্যাদি ভূমধ্যসাগরীয় অধিবাসীদের জলপথে যোগাযোগ ছিল। শুধু তাই নয়, নানা স্থানে বন্দরের অস্তিত্বও মিলেছে।

একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, পশ্চিমবঙ্গে এই সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল, গঙ্গার উভয় তীরে, গঙ্গা ও তার কোন শাখানদীর সঙ্গমস্থলে অথবা গঙ্গার সন্নিকটে কোন শাখানদীর তীরে। শুধু বাঙলায় নয়, হিমালয় নিঃসৃত হয়ে, সমতলে প্রবেশের মুখ থেকে মোহনা পর্যন্ত বহু রাজ্য ও রাজধানী, পুণ্যক্ষেত্র জাহ্নবীর তীরে গড়ে উঠেছে। রূপনারায়ণের তীরে তাম্রলিপ্ত বন্দরের অস্তিত্ব মৌর্য যুগেও ছিল। তবে খৃঃ পূঃ ৩০০ অব্দ থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত তাম্রলিপ্ত বন্দর হিসাবে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করছিল। বঙ্গোপসাগরের অপসারণের জন্য, সমুদ্রপথ বন্ধ হওয়ায়, তাম্রলিপ্ত বন্দর পরবর্তীকালে অচল হয়। পেরিপ্লাস, টলেমি, প্লিনি মেগাস্থিনিস প্রমুখ গ্রীক ঐতিহাসিকরা তাম্রলিপ্তের

প্রশংসা করেছেন। সে যুগে, পৃথিবীতে তাম্রলিপ্তের মত বিরাট বন্দর কমই ছিল না। নানা পণ্যের, বিশেষত সূক্ষ্ম কাপড়ের বিরাট বাণিজ্য হত এই বন্দরের মাধ্যমে। সুদূর চীন, ইন্দোচীন ইন্দোনেশিয়া, সিংহল ও পশ্চিমের নানা দেশের পণ্যবাহী জাহাজের নিয়মিত আনাগোনা ছিল। গঙ্গাবক্ষে ও পথে ভারতের নানাস্থান থেকে বিবিধ পণ্য, তাম্রলিপ্তে এসে সমুদ্রগামী জাহাজে বিদেশে রপ্তানী হত। ফাহিয়েন, হিউএনসাং, ইৎসিং প্রভৃতি চৈনিক পরিব্রাজকরা, তাম্রলিপ্তের ঐশ্বর্যের উল্লেখ করেছেন। তাম্রলিপ্ত থেকেই বোধিদ্রুম ও বুদ্ধের সমুদ্রপথে সিংহলে পাঠানো হয়।

আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৪৮০ অব্দে, গাঙ্গেয় উপত্যকায় নৌবাণিজ্যের কেন্দ্র বারাণসীই প্রধান কেন্দ্র ছিল। এখান থেকেই সমুদ্রগামী জাহাজ মাল বোঝাই করে যাত্রা করত। বারাণসীর পর মৌর্যযুগে পাটলীপুত্র ও বহুকাল পরে চম্পানগর (ভাগলপুর) বন্দর হিসাবে খ্যাত হয়।

খৃঃ পূঃ অব্দে, বঙ্গে গঙ্গারাঢ়ীগণের রাজত্বকালে গঙ্গার পশ্চিমতীরে গঙ্গানগর একটি প্রসিদ্ধ নগর ও বন্দর ছিল। টলেমী বলেছেন, এই গঙ্গানগর (বা গঙ্গে) গঙ্গার পঞ্চধারায় বিভক্ত হয়ে সাগরে মিলিত হওয়ায়, কোন একটি ধারার তীরবর্তী ছিল। কেউ বলেন গঙ্গানগর হল আজকের পাণ্ডুয়া অপর মতে, গাংপুরই গঙ্গানগরের স্মৃতি বহন করে চলেছে। বাণীগড় ও বোড়িয়াতে নৌবন্দরের সন্ধান পাওয়া গেছে। ময়নামতীর পীঠিকায় বন্দরের লোকজনিবাস সমুদ্র তীরবর্তী স্থান বলে উল্লিখিত হয়েছে। হুগলীজেলায় সিঙ্গুরের নিকট, অধুনা লুপ্তপ্রায় প্রায় ঘিয়ানদীর তীরে রাজা সিংহবাহুর সিংহপুর নামে রাজধানী ছিল। সম্ভবত সিংহপুর সে সময় গঙ্গার নিকটেই ছিল। সিংহবাহুর পুত্র বিজয় সিংহ, সাতশো অনুচর নিয়ে, সিংহপুর থেকে নদীপথে সিংহল যাত্রা করেন। বারাকপুরের উত্তরে, লুপ্তপ্রায় যমুনার তীরে জাহাজঘাটা গ্রামে বন্দরের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে। পেরিপ্লাস ও টলেমি, জলপথে ভারতে প্রবেশপথ হিসাবে গঙ্গার উল্লেখ করেছেন। রঘুবংশের রঘু দিগ্বিজয়ের পর, "গঙ্গাস্রোতোহন্তরে" অর্থাৎ গঙ্গার মধ্যবর্তী কোন দ্বীপে জয়স্তম্ভ স্থাপন করেন।

প্রসঙ্গত, সাগরদ্বীপে বর্তমান কপিলমুনির আশ্রমটি, মহাভারত ও পুরাণ বর্ণিত আশ্রম কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কাহিনী বলে, পূর্বে গঙ্গার মোহনায়, আড়াই হাজার বর্গ মাইল ব্যাপী বহু জনসম্পদ বিশিষ্ট শাকদ্বীপ ছিল। এই শাকদ্বীপেই নাকি বেদব্যাস ও কপিলমুনির আশ্রম ছিল। কোনও চৈনিক পরিব্রাজকের ভ্রমণবৃত্তান্তে কিন্তু এই শাকদ্বীপের উল্লেখ নেই। কোন কোন ঐতিহাসিক, বর্তমান সাগর দ্বীপেই 'গঙ্গে' নগরের অবস্থান ছিল, এরকম মত পোষণ করেন। পূর্ব-ভারতের অনেক দ্বীপপুঞ্জ আগ্নেয়গিরি সম্ভূত। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের কয়েকটি আগ্নেয়গিরি আছে। অগ্ন্যুৎপাতের ফলে, অনেক দ্বীপ সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়েছে। বঙ্গোপসাগরের নানা জায়গায় জনপদের ধ্বংসাবশেষ দেখা গিয়েছে। অনুমিত হয়, গুপ্তযুগে অগ্ন্যুৎপাত ও ভূমিকম্পের ফলে শাকদ্বীপ সাগরে বিলীন হয়। ভারতে এখনো শাকদ্বীপী গোষ্ঠীর ব্রাহ্মণরা বলেন তাঁদের পূর্বপুরুষ গঙ্গার মোহনার কোন দ্বীপবাসী ছিলেন।

যাই হক, দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে সহজেই বলা যায় পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা, আবহমানকাল ধরে কী ভাবে বাঙালা তথা ভারতকে সমৃদ্ধশালিনী করেছে এবং ভারতীয় সভ্যতার প্রচারের মাধ্যম হয়ে আছে।

পশ্চিমবঙ্গের সীমানায় এসে, গঙ্গা দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে। পূর্ব শাখাটির নাম পদ্মা। অন্য শাখাটি দক্ষিণে, মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্য দিয়ে এসে শাখানদী জলাঙ্গীর সঙ্গে, নবদ্বীপের নিকট মিলিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে একই নদীর তিনটি নাম—গঙ্গা ভাগীরথী ও হুগলী। মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত গেরিয়া গ্রাম থেকে জলাঙ্গীর সঙ্গম পর্যন্ত—প্রায় ৩২ কিঃ মিঃ অংশটুকুর নাম ভাগীরথী এবং জলাঙ্গী ও ভাগীরথীর মিলিত স্রোতধারার নাম হুগলী। ভাগীরথী, জলাঙ্গী ও মাথাভাঙ্গা—তিনটি নদী হুগলীর ধারায় বারিসিঞ্চন করে। হুগলীর গতিপথে অবশ্য আরও অনেক সঙ্গীর ও দ্বিতীয় নদী এসে মিশেছে। নবদ্বীপ থেকে মোহনা পর্যন্ত হুগলীর দৈর্ঘ্য ৩৫০ কিঃ মিঃ। এদের ভাগীরথী ও হুগলী অধুনা বছরের সব সময়ে নাব্য থাকে না। জলাঙ্গী ও অন্যান্য শাখানদীগুলি, বছরের বেশ কিছুকাল, প্রধান স্রোতধারা থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন থাকে। নাব্যতার সমাধানকল্পে, ফারাক্কায় বাঁধ তৈরী হয়েছে। কিন্তু মাত্র কয়েক শতাব্দী আগেও, মা গঙ্গার এ রকম দুরাবস্থা ছিল না। পদ্মাই ছিল সংকীর্ণ শাখা-নদী মাত্র। ভাগীরথী ও হুগলীই ছিল মূল স্রোতধারা। নদী তখন সারা বছরই নাব্য ছিল।

এই পথেই উত্তর ভারতের বাণিজ্য সাগরে যেতো। শ্রেষ্ঠীরা সুবৃহৎ অর্ণব পোতের বহর নিয়ে গঙ্গাবক্ষে পূর্ব ও পশ্চিম দেশে যাত্রা করত। পুরানো গ্রন্থে পাওয়া যায়, এক রাজপুত্র চম্পানগরী (ভাগলপুর) থেকে নৌবহর নিয়ে, সুবর্ণভূমি (বার্মা অথবা পূর্বভারতীয় কোন দ্বীপ) যাত্রা করেছিল। আর একটি কাহিনীতে পাওয়া যায়, এদের দুই বণিক পাঁচশো গাড়ী বোঝাই পণ্যে, নৌকা বোঝাই করে, গঙ্গাপথে মগধে পৌঁছেছিল। সে আমলে বহু সদাগর বারাণসী, পাটনা, ভাগলপুর থেকে গঙ্গাবক্ষে সুদূর প্রাচ্য ও পশ্চিম দেশে বাণিজ্য করতে যেত। কোনো কোনো সময়ে, উত্তর ভারতের পণ্য গঙ্গাবক্ষে বাঙালার কোন বন্দরে এসে, সমুদ্রগামী জাহাজে বোঝাই করা হত।

অনেক রাজার, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের রাজাদের সুবৃহৎ নৌবাহিনী ছিল। বাঙালীরা নৌযুদ্ধেও সবিশেষ পটু ছিল। যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়াও, গঙ্গাপথে যুগ যুগ ধরে জলবাণিজ্য চলত। ২০।২৫ দাঁড়ের পাঁচ হাজার মণ-এর নৌকার চলাচল ছিল। বাঙালার নৌবাহিনী বন্দরে বন্দরে পাহারা দিত, শুল্ক আদায় করত। তাম্রলিপ্ত থেকে রেশম, মসলিন, কার্পাস, কাপড়, মরিচ মশলা, পান্না, শঙ্খ, হাতির দাঁতের তৈরী নানা জিনিস, চাল, কড়ি, মণিমুক্তা ইত্যাদি নানা পণ্য জলপথে বিদেশে রপ্তানী হত।

তাম্রলিপ্তর ধ্বংসের পর, গঙ্গা, ময়ূরাক্ষী ও দ্বারকার সঙ্গমে অবস্থিত, গৌড়বঙ্গের কর্ণসুবর্ণ, বাঙালার সবচেয়ে বড় বাণিজ্যকেন্দ্র হয়। এক সময়ে কর্ণসুবর্ণ থেকে বছরে প্রায় পঞ্চাশটি নৌকায় বিদেশে রেশম তুলো, কাপড় ও অন্যান্য পণ্য রপ্তানি হত। চীন থেকে পারস্য পর্যন্ত বাণিজ্য চলত। গৌড়েশ্বর শশাঙ্কর (৬০০—৬২৫ খৃঃ) মৃত্যুর পর প্রায় একশো বছর, মাৎস্যন্যায় ও আরব জলদস্যুদের অত্যাচারে, বাঙালার নৌ-বাণিজ্য নষ্ট হয়ে যায়। পালবংশের রাজা ধর্মপালের (৭৭০—৮১৫ খৃঃ) রাজত্বকালে, বাঙালার জল-বাণিজ্য কিছুটা চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল। ধর্মপালের "শিলা" নামে অর্ণব-পোতটি ব্রহ্ম, শ্যাম, যবদ্বীপে নিয়মিত যাতায়াত করত। দিল্লী থেকেও গঙ্গা বক্ষে গৌড়ে আসার দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে আছে যে, শ্রীমন্ত সদাগর একশো গজ দীর্ঘ ও কুড়ি গজ প্রস্থের নৌকায় গঙ্গাবক্ষে পিতার (ধনপতি) অন্বেষণে সিংহল যাত্রা করেন।

পানাগড়ের নিকটে চম্পাইগ্রামে চাঁদসদাগরের বাড়ী ছিল। চাঁদসদাগর বাণিজ্যের জন্য কাশী অঞ্চলে ও গোলাহাটে যাতায়াত করত। শতবর্ষ গঙ্গার তীরে গোলাহাট বড় বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। পুরানো কাব্যে পাওয়া যাচ্ছে—

নবদুর্গা গোলাহাট বামেতে রাখিয়া।
চলিল সাধুর ডিঙ্গা পাটন বাহিয়া॥

....

গোলাহাট ডিহি শত সুরম্য নগরী।
যাহা চাঁদসদাগরের ব্যবসা নগরী॥

হাজার বছর পরে, মোগল আমলে বাঙালার জল-বাণিজ্য হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করে কিন্তু পর্তুগীজ ও মগদস্যুদের অত্যাচারে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়।

তাম্রলিপ্ত ও গৌড়ের গৌরব লুপ্ত হলে, গঙ্গার পশ্চিম তীরে, ১৩শ শতাব্দী থেকে সপ্তগ্রাম (বাঁশবেড়িয়া, কৃষ্ণপুর, বাসুদেবপুর, নিত্যানন্দপুর শিবপুর, শঙ্খচোরা ও বলদঘাটি) বন্দর হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। আদি সপ্তগ্রামের চাঁদপাল, স্তম্ভ দুর্গ ও বন্দরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। সপ্তগ্রামের গৌরবকালে ত্রিবেণীর নিকট, পূর্বে তিনটি নদীর (সরস্বতী, যমুনা ও গঙ্গা) সঙ্গম ছিল। সরস্বতী সপ্তগ্রামের পা দিয়ে সাঁকরাইলের নিকটে এসে পুনরায় গঙ্গায় মিলিত হয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দীতেও সরস্বতী সমুদ্রগামী জাহাজের পক্ষে নাব্য ছিল। পূর্ব-দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে যমুনা নদী ত্রিবেণীতে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়। ষোড়শ শতাব্দীর শেষে, ভারতে ইউরোপীয়দের আগমনকালে হুগলী ও অন্য কয়েকটি স্থান বন্দর হিসাবে খ্যাত হলেও, কলকাতাই কালক্রমে গঙ্গার তীরে প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়।

১৬৭৮ সালে, "ফক্স্" নামে একটি জাহাজ ইংলণ্ড থেকে ৪০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের পণ্য নিয়ে হুগলী বন্দরে আসে। এই উদাহরণ থেকে দেখালে, বন্দর হিসাবে হুগলীর গুরুত্ব বোঝা যায়।

ফরাসী পর্যটক বার্নিয়ার ১৬৫৮ সালের শেষে সুরাট বন্দরে আসেন এদেশে প্রায় নয় বছর ছিলেন। তিনি বাংলায় দু'বার আসেন এবং তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে, বাঙলার সম্বন্ধে অনেক কিছু বিবরণ রেখে গেছেন। তিনি বলেছেন সে সময়ে, গঙ্গাবক্ষে পাটনা, মসুলিপত্তম্ ও করমণ্ডল উপকূলে ধান চালান যেত। এমনকি সিংহল ও মালদ্বীপেও বাঙালা থেকে ধান রপ্তানী হত। এ ছাড়া তুলো, রেশম, মোম, চিনি সোরা ও বিবিধ প্রকার ঔষধি যথেষ্ট পরিমাণে জলপথেই রপ্তানী হত। পণ্য দ্রব্যের বৈচিত্র্যের জন্য বিদেশীরা বাঙালার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হয়েছিল। বার্নিয়ারের মতে, প্রচুর খাল ও শাখানদীর জন্য, নদীপথে মাল যাতায়াতে যথেষ্ট সুবিধা ছিল। গঙ্গার ও অনেক শাখানদীর তীরে বন্দর ও সমৃদ্ধ নগর ছিল। একবার বার্নিয়ার পিপলিপত্তম্ থেকে নৌকাযোগে হুগলী পৌঁছেছিলেন।

১৪৯৮ সালের শেষে, ভাস্কো-ডা-গামার ভারত অবতরণের পর, ইউরোপীয়দের এদেশে আসার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। ভারত সোনার দেশ, অফুরন্ত সম্পদ। শুরু হল জলপথে বাণিজ্য, ভারতের উপকূলে ও নদীতীরে কুঠি স্থাপন, কলহ যুদ্ধ বিগ্রহ। বাঙালায় গঙ্গা ও অতুলনীয় পণ্য সম্ভার বিদেশীদের টেনে নিয়ে এল। তাম্রলিপ্ত, কর্ণসুবর্ণ, সপ্তগ্রাম চলে গিয়ে, গঙ্গার তীরে নতুন নতুন

বন্দর মাথা তুলে দাঁড়ায়। ক্রমে সাতটি জাতি, ব্যাণ্ডেল, ভদ্রেশ্বর, হুগলী, চুঁচুড়া, চন্দননগর ও শ্রীরামপুর বন্দরের অধীশ্বর হল। বাংলার নবাবের অনুমতি নিয়ে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, বড়িষার সাবর্ণ চৌধুরীর নিকট হতে সামান্য মূল্যে গোবিন্দপুর, সুতানুটি ও কলিকাতা কিনে দুটি ধাপের পর ১৬৯০ সালে জোব চার্ণকের হাতে কলকাতার জন্ম হল। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই কলকাতা বন্দরের মানুষের কাছে অন্যান্য বন্দরগুলি নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। এই সময় থেকেই বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে গঙ্গার নাব্যতা নিয়ে কিছু পরীক্ষা শুরু হয়। কোম্পানীর রিপোর্টে পাওয়া যায়, ১৭৫৮ সালে গঙ্গার সংরক্ষণের জন্য একজন মেরিন সুপারিন্টেণ্ডেন্ট নিযুক্ত হয়। সার্ভেয়ার জেনারেল রেনেল (১৭৬৪-৭৫) গঙ্গা জরীপ করেন। ১৭৯৬-৯৭ সালের মধ্যে হুগলী নদীকে কয়েকবার জরীপ করা হয়।

কয়েক শতাব্দী আগে, প্রধান স্রোতধারা (হুগলী নদী) আদিগঙ্গার পথে মিশে সাগরে চলে গিয়েছিল। কৃত্তিবাসের (১৫শ শতাব্দী) সময়ে আদি গঙ্গা সঙ্কীর্ণ ছিল না। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে বলা হয়েছে চাঁদসদাগর আদি গঙ্গার ওপর দিয়ে সমুদ্র যাত্রা করেন। এর ১৫০ বছর পরে, ব্রুকের (১৬৬০) মানচিত্রে আদিগঙ্গাকে দেখানো হলেও, রেনেলের মানচিত্রে (১৭৬৪) আদিগঙ্গার উল্লেখ নেই। বোধ হয় আদিগঙ্গা তখন বুজে যায়। কোন ঐতিহাসিকের মতে আলিবর্দীর শাসনকালে (১৭৪০-৫৬) হুগলীর মোহানা দক্ষিণ পথ খোলা হয়। অনেকে বলেন, তিনি গঙ্গার মাটি কেটে খাঁড়ি পথের উন্নয়ন করেন নি, বরং পুরানো পথেই (অর্থাৎ সরস্বতীর মধ্য দিয়ে) নৌ-চলাচলের ব্যবস্থা করেন। ১৭৭৫ সালে, মেজর টলি, কোম্পানীর নিকট হতে, কুড়ি বছরের ইজারা নিয়ে, আদি গঙ্গার সংস্কার করেন। সেই থেকেই এর নাম টলির নালা। টলিসাহেব, এইখানে নৌকা ও পণ্য যাতায়াতের ওপর টোল আদায় করে বছরে প্রায় ৪০০০৲ টাকা আয় করতেন।

রেল ও স্থলপথের সুযোগ না থাকায়, বাংলা থেকে যাত্রীরা উত্তর ভারতে এই গঙ্গা পথেই যেতেন। ভূকৈলাসের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ১৭৭৯ গঙ্গা পথে প্রয়াগ দর্শনে যান। এমনকি ১৮৩৪ সালে [illegible] "ফার টেকার কোং" নামে স্টীমারের ব্যবস্থা করলেও, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ১০০৲ টাকায় নৌকা ভাড়া করে গঙ্গা পথে বারাণসী ভ্রমণে যান। উইলিয়াম হিকি ১৭৭৭ সালে, সমুদ্রগামী পালের জাহাজ থেকে সাগরদ্বীপের কাছে নেমে, একটি ছ'দাঁড়ির পান্সি চেপে কলকাতা রওনা হন।

কলকাতা থেকে রপ্তানি বৃদ্ধি ও জমিদারী সামলানোর জন্য সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সবিশেষ নজর দেয়। গঙ্গায় প্রতিপত্তি বাড়তে থাকে। ঠিক কবে থেকে গঙ্গায় স্টীমার চলাচল শুরু হয়, সেটি বলা কঠিন। তবে নথিপত্রে পাওয়া যায় যে, ১৮১৯ সালে অযোধ্যার নবাব গোমতীতে প্রমোদ বিহারের জন্য একটি স্টীমার তৈরী করান। যাই হক, ১৮৪৪ সাল পর্যন্ত কোম্পানীর গঙ্গায় স্টীমার চালাবার একচেটিয়া অধিকার ছিল। ঠিক পরের বছর থেকে, দুটি অন্য প্রতিষ্ঠান, কলকাতা, মির্জাপুর ও এলাহাবাদে স্বতন্ত্রভাবে স্টীমার চলাচলের ব্যবস্থা আরম্ভ করে। ১৮৬৪ সালে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে, দুটি প্রতিষ্ঠান যুক্ত হয়ে ব্যবসা চালাতে বাধ্য হয়। ১৮৮৩ সালে, ডি আসাম রেল সার্ভিস চালু হয়। তবুও এইসব কলের জাহাজ আভ্যন্তরীণ নৌ-বাণিজ্যকে আত্মসাৎ করতে পারে নি। সুদূর দিল্লী থেকে শুরু করে আসাম এমনকি নেপালের সীমানা পর্যন্ত গঙ্গাবক্ষে ও অন্যান্য নদীবক্ষে নৌকায় পণ্যের চলাচল অব্যাহত ছিল।

১৮৬০ সালে, কলকাতায় গঙ্গার তীরে চারটি স্ক্রু-পাইল জেটি তৈরী হল। ১৮৬৬ সালে বজবজে তেলের জেটি এবং ১৮৯৩ সালে খিদিরপুরের ডক তৈরী হয়।

কাজের সুবিধার জন্য, ইংরাজ সরকার ১৮৩৯-৪২ সালে জি. টি. রোডের সংস্কার করে। ১৮১৬ সালে কয়লাখনি পর্যন্ত রেলপথ হয় এবং ক্রমে এই পথ বিস্তৃত হয়। ফলে, গঙ্গায় নৌ-বাণিজ্য বিপদগ্রস্ত হল। ১৮৮১ সালেও নদীপথে, কলকাতা থেকে প্রায় ২৭ কোটি টাকার মাল আমদানী রপ্তানী হয়। কিন্তু পরের বছর থেকেই এই বাণিজ্যের ক্রমাবনতি ঘটে। ১৮২৫ থেকে ১৮৫৫ সালের মধ্যে গঙ্গ-যমুনা খাল কাটা হলে, ভাগীরথীতে জলপ্রবাহ যথেষ্ট কমে যায়।

১৭৭৫ সালে, রাণীগঞ্জে প্রথম কয়লা উত্তোলন হলেও, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ও আভ্যন্তরীণ ব্যবহারের জন্য, ১৮৪১ সাল থেকেই উত্তোলন ঠিক মত আরম্ভ হয়। বিভিন্ন জায়গায় প্রয়োজনের ও কলকাতা বন্দর হতে রপ্তানীর জন্য, খনি থেকে কয়লা রেল যোগে সরবরাহ হয়। কয়লা ক্রমে কলকাতা বন্দরের একটি প্রধান রপ্তানী পণ্য হয়। ১৮৯৯ সালে, বন্দর থেকে ১৩ লক্ষ টন কয়লা রপ্তানী হয়েছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই, বাংলায় নৌ-বাণিজ্য কী বিপুল ক্ষতিগ্রস্ত হতে শুরু হল, সেটি ই. আই. রেলওয়ের এজেন্টের একটি চিঠি থেকেই আন্দাজ করা যেতে পারে। চিঠির তারিখ— ১৮/২২শে মে, ১৮৯৯ এবং বিষয়—হাওড়া রেলওয়ে ইয়ার্ডে মালগাড়ীর ভীড়। চিঠিতে তিনি জানাচ্ছেন যে এপ্রিল মাসে শুধু, রেল যোগে ১৪০০০ টন পণ্য (কয়লা ব্যতীত) আসে এবং হাওড়ায় আসে ১লক্ষ টনের বেশী। ১৯০৫ সালে, গঙ্গায় ও বন্দরের কাজের জন্য ১৫,১৯৭টি নৌকার চলাচল ছিল এবং আসাম জলপথে ৪৭,৮৪৭টি নৌকা ছিল। কিন্তু ১৯০৭ সালে নৌকার সংখ্যা কমে যায়। ১৯১৩—১৪ সালে, পাটনা-কলকাতা নৌ-বাণিজ্য বন্ধ হল ও বাণিজ্য প্রবাহ সম্পূর্ণ ঘুরে গেল। অর্থাৎ রপ্তানি কমে আমদানী বৃদ্ধি পেল।

ভারতের বিপুল জল-বাণিজ্যের ইতিহাস আলোচনা করলে, স্বভাবতই মনে নানা বিষয়ে প্রশ্ন জাগে। যথা, সেকালে নদী ও সমুদ্রগামী নৌকার আয়তন ও গঠন প্রণালী কিরকম ছিল? কি কি ধাতু ও বস্তু দ্বারা নৌকা নির্মাণ হত? নৌ-বাণিজ্যের জন্য রীতিনীতি, আইন, শুল্ক আদায়ের পদ্ধতি কি রকম ছিল?

এই সমগ্র ব্যাপারে, বিশদ ও ধারাবাহিক ইতিহাস না থাকলেও নানা ঘটনা ও কিছু শাস্ত্র থেকে অনেক খবর সংগ্রহ করা যেতে পারে। মৌর্যযুগে নদী ও সাগরে নৌ-চলাচল ও শুল্ক আদায় সংক্রান্তব্যাপারে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ছাড়াও বহু স্মৃতি-শাস্ত্রে শুল্ক আদায়, নৌ-বাণিজ্য সম্বন্ধে উল্লেখ পাওয়া যায়। অবশ্য কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেই, বাণিজ্য জলবাণিজ্য, শুল্ক ও রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে সুচারুরূপে ও বিশদভাবে আলোচনা ও নির্দেশ আছে। এই শাস্ত্রে পণ্যকে তিনভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। স্থলপথে আমদানী দ্রব্যকে 'বাহ্য' স্বদেশের পণ্যকে 'অভ্যন্তর ও জলপথে আমদানী দ্রব্যকে "আতিথ্য" বা "প্রবাস্ত" বলা হয়েছে। জলবাণিজ্যের প্রধানকে নাবধ্যক্ষ বলা হত। নাবধ্যক্ষ জাহাজের মেরামতির কাজ, দুর্গত জাহাজের সহায়তা, মাল বোঝাই ও খালাসের পরিচালনা করত। এ ছাড়াও, জলদস্যুদের আক্রমণ থেকে বন্দর ও

উপযুক্ত বন্দর, বন্দরে আইনশৃঙ্খলারক্ষার ভিত্তি, আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসার ও বন্দরে আইন মুতাবেক দেখাশুনো মীরবহরই করত। মুঘল আমলের অন্য অনেক বন্দর শুল্ক ও অফিসারের পরোয়ানা বিনা শুল্ক আদায়ের ভার মীরবহরের উপরই ছিল। সমুদ্রগামী জাহাজের অবশেষ তাল্লাশি না করা পর্যন্ত, বন্দর ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ পাওয়া যেত না। ঘাটে ও বন্দরের শুল্কের বিভিন্ন হার ছিল। (বিবাহ দ্রব্য, পূজা দ্রব্য, উপহার দ্রব্য প্রভৃতির উপর কর ছিল না।) অস্ত্র-শস্ত্র, বহুমূল্য মণিমাণিক্য আমদানী নিষিদ্ধ ছিল। নদী ও সাগর তীরবর্তী নগর ও গ্রামে কর আদায়ের ব্যবস্থা ছিল। নদী পারাপারের সময় মাল অনুযায়ী মাশুল দিতে হত। পলাতক, পরস্ত্রী ও পরকন্যা অপহারক ও ব্যাধিগ্রস্তদের নদী-পার হতে দেওয়া হত না। বড় নদীতে ও সমুদ্রগামী নৌকার আয়তন অনুযায়ী, দাঁড়িমাঝি নিযুক্ত করার নির্দিষ্ট নিয়ম ছিল। বিদেশ থেকে আনীত পণ্য রাখার জন্য আলাদা আয়োজন থাকত। নদীর দুইকূলে জলরক্ষীরা নৌ-চলাচলের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখত। বন্দরে বন্দরে শুল্ক আদায়ের সুব্যবস্থা ছিল। মোগল আমলে এইসব নানা কানুনের বাণিজ্যের গতি অনুযায়ী পরিবর্তন হয়েছিল। আইন-ই-আকবরীতে পাওয়া যায় যে সপ্তগ্রাম বন্দরে শুল্ক আদায়ের অফিস ছিল এবং এই বন্দরের জল-বাণিজ্য শুল্ক ও স্থানীয় কর বাবদ বার্ষিক প্রায় ৩০০০০ টাকা আয় ছিল।

সঠিক কাল নির্ণয় ও লেখকের পরিচয় জানা সম্ভব না হলেও, ভোজরাজের "যুক্তিকল্পতরু" একটি প্রাচীন ও প্রামাণ্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থের "নিষ্পাদযান" অধ্যায়ে জলযান সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। লোহার নৌকা বা জাহাজ কিছু হাল আমলের নয়। ভোজ লিখেছেন, যে অর্ণব পোতকে সমুদ্রে নিয়ে যেতে হবে, সেটি লৌহ নির্মিত হওয়া আবশ্যক। এই লৌহ হবে কান্ত লৌহ। তবে দীর্ঘকাল সাগরে থাকার নিমিত্ত, তাম্রমণ্ডিত নৌকাই প্রশস্ত। ভোজ নৌকাকে প্রধানত দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—সামান্য ও বিশেষ। সামান্যকে ক্ষুদ্রা, ভীমা, চপলা, পত্রপুট, মন্থরা ইত্যাদি দশটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। সামান্য নদীতে ও বিশেষ সমুদ্রে যাতায়াতের উপযুক্ত। বিশেষ দু' প্রকার—দীর্ঘা ও উন্নতা। এই দু' প্রকার নৌকাকে পুনরায়, তরণী, লোলা, গত্বরা, তরী, জঙ্ঘলা, প্লাবনী, ঊর্ধ্বা, স্বর্ণমুখী গর্ভিণী ইত্যাদি বহু শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেক নৌকার জন্য নির্দিষ্ট মাপ আছে। প্রকোষ্ঠের অবস্থান ভেদে নৌকাকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যথা—সর্ব মন্দিরা, মধ্য মন্দিরা এবং অগ্র মন্দিরা।

আলোচিত নৌ-বাণিজ্য ব্যবস্থা গঙ্গার তীরবর্তী বন্দরের প্রযোজ্য ছিল ও উপরিউক্ত বিবিধ শ্রেণীর নৌকা গঙ্গায় ও গঙ্গাবক্ষে সাগরে যাতায়াত করত। পাঁচ হাজার, দুহাজার মণী নৌকা গঙ্গা-পথে হামেশাই চলাচল করত। শ্রীমন্ত নৌবহরে—মধুকর, দুর্গাবর, শঙ্খচূড় ইত্যাদি নামে সাতটি অর্ণবপোত ছিল। বিজয় সিংহের অর্ণবপোতে ৭০০ লোকের বাসোপযোগী ব্যবস্থা ছিল।

হালিম, পাতেং, চিত্তল, পাষানি প্রভৃতি বন্দর ও জাহাজের ছোটবড় কর্মচারীরা, মোগল আমল থেকে আজও আমাদের কাছে ঐ নামেই সুপরিচিত। নবাব শায়েস্তা খাঁর আমলে, বাংলায় বাহিরে নামে এক সাহেব এসেছিলেন। এঁর বর্ণনা অনুযায়ী—গাল্লেবা (ছ হাজার মণী নৌকা, অনেকটা ডেপ্টা), জলোয়াকো (দু দাঁড়ির যাত্রীবাহী নৌকা), বজরা, বাজরো (ধনীদের নৌকাবিহারের জন্য নৌকা), প্যাটেলা (মালবাহী) ও ভুলে (সমুদ্রগামী মালবাহী নৌকা) প্রভৃতি অনেক প্রকার নৌকার উল্লেখ

রবীন্দ্রসঙ্গীত ও অমিয়নাথ

নরেন্দ্রকুমার মিত্র

'সমকালীন' পত্রিকার পাঠক ইতিমধ্যেই সঙ্গীত সাধক শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল মহাশয়ের সঙ্গীত বিষয়ে বৈঠকী গল্পের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। এই সমস্ত গল্প ছিল বড় বড় গানের ওস্তাদ ও সমঝদারদের ঘরোয়া বৈঠককে কেন্দ্র করে। সান্যাল মহাশয় ওস্তাদদের 'মহিফেল'-এ বা জলসার বৈঠকে যা কিছু হীরা জহরৎ পাকা জহরীর মত চিনে বেছে সংগ্রহ করে রেখেছিলেন সেইগুলি তিনি তাঁর স্মৃতির ঝুলি থেকে সহৃদয় পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন।

উত্তরকালে সান্যাল মহাশয় নিজেই কয়েকটি গান বাজনার আড্ডার মধ্যমণি হয়ে বিরাজ করতেন। এর মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হল বালীগঞ্জে শ্রীসুরেশ চক্রবর্তী মহাশয়ের বাড়ীতে প্রতি শুক্রবার ও শনিবার সন্ধ্যায় এবং কৃষ্ণনগরে তাঁর নিজের বৈঠকখানায় প্রতি সন্ধ্যায় বৈঠক। এই শেষোক্ত বৈঠকের দৈনিক সান্ধ্য আড্ডায় কিছু স্থানীয় ওস্তাদদের আগমন হলেও সেই সঙ্গে কিছু সঙ্গীত রসিক ও কলা রসিকদের শুভাগমন ঘটত। এরমধ্যে স্থানীয় কিছু ভদ্রগণ ও কলেজের প্রফেসর ছাড়া আমাদের মত কলেজের কিছু অপোগণ্ড ছোকরাদেরও অবাধ গতিবিধি ছিল এইখানে। এই সমস্ত বিভিন্ন পালকওয়ালাদের একত্র সমাবেশের ফলে আড্ডার মধ্যে প্রচুর বৈচিত্র্যের আমদানী হত। এবং কথা প্রসঙ্গে প্রায়ই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতমনস্কতা সম্পর্কে অমিয়নাথের গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ হয়ে পড়ত।

এই ধরণের একটি আলোচনাকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথের গান 'আমার নিশীথ রাতের বাদল ধারা' প্রসঙ্গে সুরকার রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অমিয়নাথের একটি সাধারণ মতামত 'সমকালীন'-এর বৈশাখ ১৩৮৫ সংখ্যায় 'সঙ্গীত সাধক অমিয়নাথ সান্যাল' প্রবন্ধে ব্যক্ত করা হয়েছিল। রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে এ পর্যন্ত অনেকে গবেষণামূলক বই লিখেছেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষার অনেক স্কুল হয়েছে এবং শান্তি-নিকেতনের বিশ্ববিদ্যালয়েও এ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে সন্দেহ নেই। তবু আমাদের মনে হয় যে রবীন্দ্রসঙ্গীতের যথার্থ মূল্যায়ন বিশেষ করে সুর রচনার দিক থেকে বোধহয় হয় নি। আমাদের এই ধারণা যে অমিয়নাথের রবীন্দ্রসঙ্গীত চিন্তাকে কেন্দ্র করে একথা বলতে আপত্তি নেই। দৃষ্টান্ত হিসাবে একটা উদাহরণ দেওয়া যাক।

তখন বোধহয় ১৯৪০/৪১ সাল হবে। অমিয়নাথের সান্ধ্য বৈঠকে রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা চলছে। তখন নামকরা গাইয়েদের মধ্যে শ্রীমতী কনক দাস ছিলেন অন্যতম। শ্রীপঙ্কজ মল্লিক মহাশয় তখন রবীন্দ্রসঙ্গীতকে বাঙ্গালীর হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে চলেছেন। অমিয়নাথ সদ্যশ্রুত সোনা পঙ্কজ বাবুর 'প্রলয় নাচন' গানখানির ভূয়সী প্রশংসা করতে লাগলেন। মনে আছে বলেছেন, 'আহা কি 'ওভারটোন' ওয়ালা ভরাট গলা আর কণ্ঠেই বা কি সুরের রেশ! রবীন্দ্রসঙ্গীতের পক্ষে উপযুক্ত কণ্ঠই বটে! ধীরেন আচার্য মশাই তৎক্ষণাৎ একটি ছেলেকে গানখানি করতে বললেন। ছেলেটি খাদি গলায় তৎক্ষণাৎ গানটি আরম্ভ করেছিল। প্রথম পংক্তি শেষ না হতেই কিন্তু অমিয়নাথ

যথেষ্ট পরিচয় কিন্তু সেটা পরিচয় করে প্রচার করবার মতন শক্তি আমার ছিল না। এবং এখনও নেই। বিশেষ করে স্বরলিপি প্রকাশের ও রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে শেষ কথা বলবার অধিকার একমাত্র বিশ্বভারতীর আছে। সুতরাং অমিয়নাথের আলাপালোচনার মধ্যে যে ইঙ্গিতটুকু ছিল সেটুকু এখানে তাঁরই সুন্দর ভাষাতে (যতদূর সম্ভব) ব্যক্ত করছি।

অমিয়নাথ বলেছিলেন "ভারতীয় সঙ্গীতের এই হল মুশকিল যে সুরকার বা গীতিকার ইউরোপীয় পদ্ধতির মত স্বরলিপি করার সঙ্গে সঙ্গে তার বেগ বলে দেন না। আমাদের প্রাচীনকাল গায়ক বা বাদ্যযন্ত্রীরা প্রথমে রাগ রাগিণীর নামটি বোধক বাদ্যযন্ত্র শুনিয়ে এবং তারপর তবলা বা তানপুরার ঠেকাটি ধরে নিয়ে তার পর সঙ্গীত প্রয়োগ শুরু করেন। তার ফলে সেই গান শোনা কালীন স্বরলিপিকারের পক্ষে বেগ নির্ধারণ করবার কোনও অসুবিধা হয় না। রবীন্দ্রসঙ্গীতের বেলায় যতদূর শুনেছি এই পদ্ধতিতে স্বরলিপি তৈরী করা হয় নি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতপ্রয়োগ পদ্ধতি যতদূর শুনেছি মুখে মুখেই হত এবং পরে স্বরলিপিকারকে ডেকে রবীন্দ্রনাথ গানটি শুনিয়ে দিতেন। সেই সময় বোধহয় তিনি কোনও বেগ বা গানের আরম্ভের স্বর কাউকে বলে দেননি,—অন্ততঃ এমন কথা শোনা যায় নি। এ ব্যাপারটা এখন পরিষ্কার করতে হলে এখন স্বরলিপিকারদের নতুন করে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হয়। আমি অবশ্য দু-একজন রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রথম সারির বিশেষজ্ঞদের এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করে কোনও সদুত্তর পাইনি।"

হয়ত একটা তাড়াতাড়ার বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য এই পর্যন্ত শোনাই যথেষ্ট হওয়া উচিত ছিল কিন্তু আমার অনুসন্ধিৎসা তখন বাধা মানে নি। তাই যেটা অবশ্য জিজ্ঞাস্য তাই জিজ্ঞাসা করলুম, যে আমাদের সঙ্গীতশাস্ত্রে কি এর কোনও জবাব নেই যেখানে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে একটা নির্দিষ্ট উপায় রয়েছে?

এর উত্তরটা অমিয়নাথের ক্ষীণ কণ্ঠে গম্ভীর হয়ে উঠলো, "শুধু আছে নয়, অনেক ভাল ভাবেই আছে। প্রাচীনেরা চিন্তা করেছিলেন যে গীত বা গানের পদ যে সকল ভাবকে প্রকাশ করে সেই ভাবের অনুযায়ী বা সামঞ্জস্য ভাবে গ্রাম, জাতি বা রাগের সমাবেশকে ঐ গান বা পদের সঙ্গে যোজনা করলেই সেই গান শ্রুতিপ্রিয় বা সুন্দর হয়। এরূপ চিন্তা থেকে অনেকরূপ অনুসিদ্ধান্ত করা হয়েছে। যেমন,—গানে কিরূপ স্বর সমাবেশ হবে বা হওয়া উচিত। বলতে বাধা নেই যে উচিত বা অনুচিত চিন্তা আমাদের কাছে আজকের দিনে কিছুটা অস্বাভাবিক। কিন্তু প্রাচীন আর্যগণ বর্ণনাক্রমে উচিত ও সঙ্গত এই দুটি শব্দ প্রয়োগ করেছিলেন। উচিত অর্থ যে কার্য সম্পাদিত হতে চলেছে বা যে উদ্দেশ্য সাধন করতে হবে। না করাটা হল অনুচিত। যেমন—করুণ রসের পদে অমুক গ্রাম বা অমুক জাতি প্রয়োগ করা উচিত। গীত, বাদ্য, নৃত্য—এগুলি কৃত্রিম ব্যাপার এবং তাদের উপস্থাপিত করার মধ্যে উদ্দেশ্য আছে। সুতরাং উচিত অনুচিত বিচারও আছে। আমাদের বাংলা গানের স্বরলিপিকারদের এই দিকে নজর রাখা উচিত।"

আমি তাঁর সুদীর্ঘ বক্তব্যের ভেতরে প্রবেশ করবার চেষ্টা করলুম। কি বলতে চাইছেন অমিয়নাথ। সন্দেহ নিরসন করে নেবার জন্য জানতে চাইলুম যে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীনদের মতামতগুলো জেনেশুনেই কি গানে সুরারোপ করেছিলেন বলে তাঁর বিশ্বাস। এবং তা যদি না হবে তো

তাঁর বেশ কয়েকটি গানের বিশ্লেষণের কথাগুলো সেইদিকেই নির্দেশ দিচ্ছে কি করে। আমি আমার খাতার নোটগুলোর প্রতি অমিয়নাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করলুম।

অমিয়নাথ কিন্তু আমার খাতার দৃষ্টান্ত করলেন না—বললেন, "ওসব আমি আগেই দেখেছি। তোমার বিশ্লেষণের কথাগুলো দেখবার আগেই। এর মানে কিন্তু এটাই নিশ্চিত নয় যে রবীন্দ্রনাথ এই প্রাচীন মতামতগুলো জানতেন বা বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, উদয়শঙ্কর বা তিমিরবরণ এঁদের ভূমিকা নিয়েই সঙ্গীত জগতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এঁরা যা করেছেন বা করেছেন এ যুগে সঙ্গীত জগতে সেইটাই আদর্শ। যদি প্রমাণ হয় যে রবীন্দ্রনাথ এই প্রাচীন মতামতকে অনুসরণ করেছেন তো ভালই আর সেই মতামত না জেনেও যদি তিনি "গ্রেট মেন"দের উচিত কার্য মতন "এপাইক" চিন্তা করে থাকেন তো গোল মিটেই গেল। তোমার স্বরলিপির সঠিক ভেদের সন্ধান তো তাঁর গানেই দেখা হয়েছে।"

এবার আমার ভাববার পালা। যদি ধরে নেওয়া যায় যে কবিতাগুলোর মধ্যে রসভাবাদির নির্দেশ মতই গানের সুরারোপ করা হয়েছে তাহলে সেই গানগুলোর বাণীগুলোকে যদি নাট্যশাস্ত্রের নির্দেশ মত পর্যায় বসিয়ে দেওয়া যায় তো ভেদ খুঁজে পাবার তো কোনও অসুবিধা হওয়া উচিত নয়। আমার মনে তখনই অমিয়নাথের প্রতি একটা অনুযোগের ভাব বয়ে গেল। অমিয়নাথের কাছে শুনেছিলুম যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অমিয়নাথের একাদিক্রমে পাঁচ ঘণ্টা সঙ্গীত বিষয়ে আলাপ হয়েছিল। শান্তিদেববাবু বা শৈলজারঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে অমিয়নাথকে একাধিকবার সঙ্গীত বিষয়ে আলাপ করতে দেখেছি এবং দু-একটি ক্ষেত্রে আমিও উপস্থিত ছিলুম। বিশ্বভারতীর অনুরোধে ভারতীয় সঙ্গীতের ওপর অমিয়নাথ একখানা বেশ বড়সড় বই লিখে তার প্রকাশনার জন্যে পাণ্ডুলিপি পাঠাবার পর বিশেষ কোনও কারণে বইখানির সমগ্র প্রকাশ না করে তার নিতান্ত একটি ছোট অংশ 'প্রাচীন ভারতের সঙ্গীত চিন্তা' নাম দিয়ে বিশ্বভারতী প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ এবং বিশ্বভারতীর এত কাছাকাছি থেকেও স্বরলিপির এই ভেদ নির্ধারণ পদ্ধতি তিনি কেন চালু করতে পারলেন না। অন্তত এ সম্বন্ধে একটা প্রস্তাবও তো তিনি করতে পারতেন। সুতরাং এর উত্তরটা আমি অমিয়নাথের কাছ থেকে শুনতে চাইলুম। এবং উত্তর শুনে আমি অবাক হয়ে গেলুম। তিনি বললেন, "কি করে জানছ যে এই প্রস্তাব আমি দিইনি। তাছাড়া আমার এই 'প্রাচীন ভারতের সঙ্গীত চিন্তা' বইখানিতে আমার এই মতামত আমি যথাযথ ভাবেই উল্লেখ করেছিলুম। যাই হোক এ বিষয়ে আর বেশী কথা না বলাই ভাল। কথা বললেই কথা বেড়ে যায়। আমি যে বিশ্বভারতীর সঙ্গীত ভবনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করার জন্য একটা ডাক পেয়েছিলুম সেটা তো জান। তা সে আর হল কই?" *সেদিনকার মত এইখানেই শেষ হল। বাড়ী ফেরবার পথে মনে পড়ল যে বিশ্বভারতীর অনুরোধে তিনি রবীন্দ্র সঙ্গীতশিক্ষা পদ্ধতির আমূল সংস্কার করে একটি স্কিম খাড়া করেছিলেন

* সমকালীনের পাঠকদের অবগতির জন্য জানাই যে অমিয়নাথ বিস্তৃতভাবে যে কথা সেদিন বলেছিলেন সেইগুলো লিপিবদ্ধ করার আগে আমি, 'প্রাচীন ভারতের সঙ্গীত চিন্তা' বইখানি পড়ি এবং এই প্রবন্ধে তাঁর বক্তব্যটুকু এই বইখানি থেকেই তুলে দিয়েছি।

গীতকে অনুসরণ করত এবং নৃত্য করত বাদককে। নাট্যপ্রয়োগের চার রকমের বৃত্তি ছিল ; যেমন, কৈশিকী, সাত্বতী, আরভটি ও ভারতী। এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য প্রধানতঃ কৈশিকী বৃত্তিকে অনুসরণ করত। এই বৃত্তি সৌন্দর্য সুকুমারতার সাহায্যে যৌন, শৃঙ্গার ইত্যাদির রসকে ফুটিয়ে তোলে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটা প্রধান বিশেষত্ব হল এই যে প্রয়োগের সময় তার অর্থ একনিমেষেই প্রকাশ হয়ে পড়ে। কথাটা অবশ্য নতুন কিছু নয় কিন্তু অমিয়নাথ এই প্রসঙ্গে রেকর্ডে শোনা কয়েকটি গান ও নৃত্যনাট্যে পরিবেশন করা কয়েকটি গানের উল্লেখ করে বললেন যে গানগুলোর প্রয়োগ যথাযথ হয়নি, সে নৃত্যনাট্যের নাচ কম্পোজ করার জন্যেই হোক বা তিন মিনিট রেকর্ডের মাপ মেলাবার জন্যেই হোক।

তাঁর মতে গানের তাল ও লয় হল ভাষার সেই ভূষণ বা পরিধান যাতে অন্তরের ঢাকা পড়ে এবং সুন্দর অধিকতর সুন্দর হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের গানকে প্রধানতঃ দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। একটি হল বর্ণনামূলক গান, যেমন ঋতু বর্ণনা। সেই বর্ণনার সঙ্গে প্রাকৃতিক ধ্বনির ছন্দ (অনোমেটোপোয়িক) মিলিয়ে সাধারণতঃ দ্রুত ছন্দে গাওয়া হয়। আর সে ক্ষেত্রে লয়টাও হয় দ্রুত। আর যেখানে গানগুলো "লিরিক" ধর্মী সেখানে গানের ছন্দ ও লয় বাঁধা উচিত কিছুটা ধীরে। এর কারণ দেখাতে গিয়ে অমিয়নাথ বলেন যে গানের ভাষাকে বোঝার জন্যে শ্রোতা সব সময় গাইয়ের চেয়েও অন্ততঃ একনিমেষ পিছিয়ে চলে। সুতরাং লিরিক ধর্মের গানগুলোকে শ্রোতার কানে বোঝার মতন করে পৌঁছে দেবার জন্যে শিল্পীর এই লয়ের ব্যাপারটায় খেয়াল রাখা দরকার। উদাহরণ প্রসঙ্গে অমিয়নাথ কয়েকটি রবীন্দ্রসঙ্গীতের উল্লেখ করেন ; যেমন, হাম্বীর রাগের উপর গান "সখী আমারি দুয়ারে", ভৈরবীতে বাঁধা "অনেক দিয়েছ নাথ"। এই গানগুলির তাল চতুর্মাত্রিক খেয়ালের তাল হলেও ধ্রুপদের ছন্দে বাঁধা এবং ঢিমা লয়ে গান না করলেই গানটি মাটি।

আজ অমিয়নাথ আর ইহজগতে নেই। সুতরাং তাঁর মতামতগুলোকে যথার্থ বোঝাবার কেউ নেই একথা সত্যি। তবু মতামতগুলোর কিছু দাম আছে মনে করেই অমিয়নাথের স্মরণে রবীন্দ্রনাথ-অমিয়নাথ সংবাদ যেটুকু জানা গিয়েছিল সেটুকুই তুলে ধরা হল। সবশেষে এটুকুও বলার দরকার অমিয়নাথের মুখে আমরা শুনেছি যে এর মধ্যে অনেক কথাই তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ নাকি বলেছিলেন যে "আপনার সঙ্গে আগে আমার সাক্ষাৎ হলে আমার সঙ্গীত জীবনটা হয়ত বদলে যেতে পারত।" পাঠক এই উক্তির তাৎপর্য আশা করি নিজেই বুঝে নেবেন।

অরুণাচলের আদিভাষা ও সংস্কৃতি

[illegible] দাশগুপ্ত

অরুণাচলে প্রায় ষাটটি কথ্যভাষা (বা উপভাষা) প্রচলিত। ভাষাতাত্ত্বিকরা এগুলিকে কুড়িটি বিভাগে গোষ্ঠীভুক্ত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, ভাষা ও কথ্যভাষার মধ্যে প্রভেদ করার মত অবস্থা অরুণাচলে এখনও আসে নি। এই প্রদেশের অন্তর্গত তিরাপ জেলার খাম্‌তি উপজাতি ব্যতীত অন্য কোনও ভাষার কোন লিপি নেই।

নিছক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি কোণ থেকে দেখলে, শুদ্ধ ও কথ্য ভাষার মর্যাদায় কোন পার্থক্য নেই। সামাজিক দৃষ্টি কোণ থেকেই ভাষার মূল্যায়ন, মর্যাদা ও পৃথক সংজ্ঞার দাবী কথ্যভাষার ওপর। নানাকারণে কোন একটি কথ্যভাষা ভাষার মর্যাদা লাভ করে।

সাধারণত আমাদের অনেকের ধারণা যে উপজাতিদের শব্দভাণ্ডারে প্রাচুর্যের অভাব। এই ধারণা অবাস্তব। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক উপজাতির শব্দভাণ্ডার যথেষ্ট সমৃদ্ধ এবং এদের জীবনযাত্রা কৃষ্টি ও সংস্কৃতির জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই এরা অতি সহজেই নিজ ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করতে সক্ষম। প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, সমাজ জীবন এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা মানুষের চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে, এবং তারই প্রকাশ ভাষায়। কাজেই যে কোন উপজাতির ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে তাদের মনোজগতে প্রবেশ করতে পারা যায়। প্রত্যেক ভাষারই কিছু না কিছু স্ব-কীয় রূপ ও বৈশিষ্ট্য থাকে। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, আমরা কোন চিন্তা বা ঘটনা আমাদের ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করার প্রয়াসে হয়ত একটি বাক্য রচনা করে ফেলি, কিন্তু পৃথিবীর দুর্গম প্রদেশের কোন উপজাতি সেই চিন্তা ও ঘটনাকে মাত্র একটি কি দুটি শব্দে প্রকাশ করতে সক্ষম।

অরুণাচলের সিয়াং জেলায় আদি উপজাতিদের বাস। 'আদি' বলতে অবশ্য বহু বিভিন্ন গোষ্ঠীর উপজাতিদের বোঝায়। যেমন—গালো বা গালং, মিনয়ঙ, পদম, মীবং, পাসি, বোরি বোকার, রামো, পাসির ইত্যাদি। বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিভিন্ন কথ্যভাষা।

গঠন প্রণালীর দিক থেকে আদি উপজাতিগুলির ভাষাগুলিকে 'যোজনধর্মী' ভাষা বলা হয়। কতকগুলি অব্যয় জাতীয় শব্দ, যেগুলির নিজস্ব কোন অর্থ নেই, বাক্যের মধ্যে শিকলের মত পরস্পর যুক্ত হয়ে অর্থ প্রকাশ করে। আবার কখন ও দুটি বা তিনটি ধাতু ক্রমান্বয়ে যুক্ত হয়ে কোন ধারাবাহিক অর্থ প্রকাশ করে। বাংলা, ইংরাজী প্রভৃতি ইন্দোইউরোপীয়ান ভাষার সাথে আমরা পরিচিত বলে, এই ভাষাগুলি প্রথমে দুর্বোধ্য মনে হয়, কিন্তু এইসব যৌগিক শব্দগুলির সম্যক পরিচয় লাভ করলে এবং ব্যবহার আয়ত্ত হলে, ভাষাগুলি সহজেই শেখা যায়।

আদি উপজাতির মধ্যে মিনয়ঙ্‌ একটি বৃহৎ গোষ্ঠী। লোক সংখ্যা প্রায় কুড়িহাজার। এদের ভাষায় 'ঙ' অর্থে আমি, 'লু' অর্থে কথা বলা, 'দ' অর্থে খাওয়া। 'দুও' শব্দ বাঙালা ভাষায় 'ছে', 'ছেন' ইত্যাদি অন্ত্য বিভক্তির মত ঘটমান বর্তমান ক্রিয়ার্থ প্রকাশ করে। এখন এই শব্দগুলি

বলব না কারণ নিয়ম পালন করছি। দেখা যাচ্ছে, সম্পূর্ণ ভাবটি প্রকাশ করতে আমাদের আবার একটি বড় বাক্য রচনা করতে হয়, কিন্তু এদের ভাষায় মাত্র তিনটি শব্দে সেই ভাবটি সুন্দরভাবে প্রকাশ করা যায়।

ডক্টর ম্যাক্সমুলার তুর্কীভাষা সম্বন্ধে বলেছেন যে ভাষাটি শিখতে ভালই লাগে। প্রকৃত পক্ষে পরবর্তী ভাষাগুলির জটিলতা থেকে এটি মুক্ত এবং সহজেই শেখা যায়। ম্যাক্সমুলারের এই উক্তি আদিভাষাগুলি সম্বন্ধে ও প্রযোজ্য।

(বাংলা 'ঙ' শব্দের ব্যবহার আদিভাষাতে নেই কাজেই এটি উচ্চারণ করতে অসুবিধা হতে পারে। অঙ্গন কথাটির 'ঙ' যেমন ভাবে উচ্চারণ করা হয়, আদি ভাষায় 'ঙ'টির উচ্চারণ সেই রকম হবে)।

তেলিয়াগড়ীর প্রাঙ্গণে : শ্রীবিশ্বেশ্বর মজুমদার। 'অরুণ' ৫২, মদনা পার্ক কলকাতা ৩৬ থেকে প্রকাশিত। মূল্য পাঁচ টাকা।

তেলিয়াগড়ী কোর্ট এখন শুধুই ইতিহাস। বিহারের রাজমহলে একটা পাথরের ভগ্নস্তূপ মাত্র। লোকচক্ষুর অন্তরালে তার প্রায় হারিয়ে যাবার অবস্থা। কিন্তু একদিন তা ছিল না। উত্তর ভারত থেকে বিহারের মধ্যে দিয়ে বঙ্গদেশসহ তাবৎ বাংলার মাটিতে প্রবেশ করার একমাত্র পথ তেলিয়াগড়ী সকরিগলি-গিরিবর্ত্ম'। এই সংকীর্ণ গিরিবর্ত্ম' তাই বাঙালী জাতির উত্থান পতনের ইতিহাসে বহু বছর একটি প্রধান ভূমিকা অধিকার করেছিল। এই কেল্লার ইতিহাস বাঙালীর কাছে মোটেই উপেক্ষার নয়। 'রেলপথ স্থাপনের পূর্বে বাণিজ্যতরীর যাতায়াত এই পথেই ছিল বেশি। আর এ সম্বন্ধে সর্বপ্রাচীন সাক্ষ্য ভাস্করের কয়েকটি গল্প' এই হল বিশিষ্ট ঐতিহাসিকদের মত। প্রায় হারিয়ে যাওয়া সেই ইতিহাসকে খুঁজে এনে বাঙালীর চোখের সামনে তুলে ধরেছেন লেখক।

অধুনা সকরিগলি (লেখকের মতে সক্রীগলি। পীঠপতি শ্রীদেবাদিদেবের সহধর্মিণী সতী দেবীর নাম থেকে উৎপত্তি—কালক্রমে সকরিগলি) রাজমহল অঞ্চল বিহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলেও একদিন এ অঞ্চল ছিল বাংলা দেশের মধ্যে (আধুনিক পশ্চিমবঙ্গ)। তাই এখানকার ইতিহাস জানার ইচ্ছা বাঙালী পাঠকদের পক্ষে স্বাভাবিক। লেখকের বাল্য কৈশোর ও প্রথম যৌবন কেটেছে এই অঞ্চলের কোলে। এই অঞ্চল চিরকাল তাঁর কল্পনাকে উদ্দীপিত করেছে। এখানকার ইতিহাস তিনি চর্চা করেছেন বহুদিন ধরে। সেই ইতিহাস চর্চার ফল এই 'তেলিয়াগড়ীর প্রাঙ্গণে'।

লেখক একাধারে কবি গল্পকার ও ঔপন্যাসিক। তাঁর মন কল্পলোকের প্রাঙ্গণেই বেশি ঘোরাফেরা করে। মনে হয় তেলিয়াগড়ীর প্রাকৃতিক পরিবেশ, তার গা-ছমছম-করা নির্জনতা, তার পটভূমির রুক্ষ বন্য সৌন্দর্য তাঁর কবিমনকে আকৃষ্ট করেছে বেশি করে। কবির লেখনীর পক্ষে নীরস ইতিহাস রচনা করা শক্ত। তাই ইতিহাস হয়ে যায় কাহিনী। তার কিছু উদাহরণ দেবার লোভ সংবরণ করা শক্ত।

'ছায়া আর ছায়া নেই। সামনে দাঁড়িয়ে এক সৌম্য প্রাজ্ঞ ঋষি। মুখমণ্ডলে দ্যুলোকের জ্যোতি। সহাস্যে বলছেন:

...আমি ইতিহাস। অতীতকে আশ্রয় করে ভবিষ্যতের ধ্যানে বসে থাকি আমি চিরবর্তমান। তোমারই অনুসন্ধিৎসার সাগ্রহ আহ্বানে তোমাকে নিয়ে এলাম এই তীর্থপ্রাঙ্গণে। দুর্গপ্রাকার তোমার সঙ্গে কথা বলবে, গড়দ্বার তোমার সঙ্গে আলাপ করবে, অতীত ইতিহাসের অনেক কুশীলব স্ব স্ব ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তাদের জীবননাট্যের পুনরাভিনয় করবে তোমারই সামনে। শোনো তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা সুখ-দুঃখ বেদনা ব্যথার সংলাপ, শোনো তাদের জয়োল্লাস বা হতাশাব্যঞ্জক

চিৎকার। কতো কোলাহল, কতো হাহাকার, কতো বিলাপধ্বনি।"

এই পটভূমিতে তার পর এসেছে ইতিহাসের নারী ও পুরুষেরা একে একে কালানুক্রমে, যাদের সঙ্গে কিছুমাত্র সম্বন্ধ আছে তেলিয়াগড়ীর। লেখক মধুসূদন মোহন দাস তারিখ না খুঁজে খুঁজেছেন সেই সব তারিখের মানুষদের যারা সৃষ্টি করেছিল ইতিহাস। চেষ্টা করেছেন তাদের মনগুলোকে ছুঁতে। বৌদ্ধযুগ থেকে শুরু করে আলীবর্দি খাঁর আমল পর্যন্ত তেলিয়াগড়ীর জীবনকাহিনী রচনা করেছেন সুন্দর ঝরঝরে ভাষায় সাবলীল ভঙ্গীতে। নীরস ইতিহাস পড়ার বিরক্তি নেই অথচ তেলিয়াগড়ী সম্বন্ধে পরিষ্কার একটা ধারণা গড়ে ওঠে পাঠকের মনে। অজান্তে জানা হয়ে যায় তাৎকালিক কিছু কিছু পরিচিতি। যা সুন্দর, কিছুটা বিরল।

কট্টর ইতিহাসবেত্তারা এ ধরনের লেখাকে হয়ত ইতিহাস বলে মানতে চাইবেন না। কারণ ইতিহাসে কল্পনার ভেজাল মিশে এটা সাধারণ রসরচনার পর্যায়ে পড়ে গেছে। তা যাক। সবাই তো আর বসে বসে একটানা নীরস ইতিহাস পড়তে পারে না। ভালো লাগে না। কিন্তু তেলিয়াগড়ীর প্রাঙ্গণের মত বই একসঙ্গে একটানা বসে প্রায় সবাই পড়ে ফেলতে পারে এবং সেইসঙ্গে নিজের অজান্তে জেনে যায় কিছু ইতিহাস। সাধারণ পাঠককে ইতিহাস মনস্ক করে তোলার এ একটি সুন্দর উপায়। লেখককে আমার অনুরোধ এরকম আরো কিছু রচনা উনি সৃষ্টি করুন।

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা সাদামাটাই। মুদ্রণ ব্যাপারে কিছু সতর্ক হওয়া প্রয়োজন ছিল।

প্রকাশ পাল

SAMAKALIN November/1978 Registered with the Registrar of Newspaper for India under R. N. 2602/57. Rs. 1·00